আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৯ম খণ্ড।] ভাদ্র ১২৯০। সেপ্টেম্বর ১৮৮৩। [১ম সংখ্যা।

উন্নতি-রহস্য

শব্দটী অত্যন্ত বিস্তৃত। স্বাবলম্বন, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, সচ্চরিত্রতা, মিতব্যয়, সময়ের মূল্য জ্ঞান, নির্ভীকতা প্রভৃতি অনেক গুলি মানবীয় সদ্‌গুণ ইহার বিষয়ীভূত। সৃষ্টির অধিগম্য কাল হইতে এ পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রকৃতিতে এই সকল সদ্‌গুণ যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত আমরা যথেষ্ট পাই নাই; যাহা পাইয়াছি, তাহাও সর্ব্বতোভাবে অমশুদ্ধ নহে এবং বর্ত্তমান সময় হইতে সে সময়ের লোকসমাজের অবস্থাগত বিসদৃশতা প্রযুক্ত পৌরাণিকপক্ষ-বৃত্তান্তের সত্যতার প্রতিও অনেকে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। এ জন্য আমাদিগের ঐতিহাসিক ও জীবনবৃত্তান্তঘটিত প্রস্তাবগুলি সমস্তই আধুনিক সময় হইতে গৃহীত। ইউরোপ আজ কাল পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ উজ্জ্বল; এ জন্য অনেক স্থলে ইউরোপের প্রতিই দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমেরিকাও অবশ্য সমধিক গণনীয়, কিন্তু উহা অত্যন্ত নূতন; এজন্য উহাতে গভীররূপে প্রবেশ করি নাই।

আমাদিগের জাতি অদ্যাপি অসভ্যমধ্যে পরিগণিত, এবং অভাব আমাদিগের অসীম। ইংরাজের আগমনে আমরা ধনবিষয়ে যতই হীন হই না কেন, কতক গুলি মহামূল্য উপহার পাইয়াছি এবং আরও পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি। ইঁহাদিগের আগমনে আমরা

কেবল উহাদিগের নহে, সমস্ত পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়াছি, কিন্তু কেবল সংস্রবে উপকার হয় না। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। নিজে নিজের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ "যে স্বয়ং নিজের উন্নতির চেষ্টা করে, ঈশ্বর তাহার সহায় হন" ইহা একটী সুপরীক্ষিত চির-সত্য উপদেশবাক্য। "আমিই আমার উন্নতি করিব" এই চিন্তাই প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির [illegible]। এবং এই চিন্তা কোন জাতির বহু ব্যক্তির জীবনে লক্ষিত হইলে, সে জাতি জগন্মণ্ডলে বলবান্ এবং তেজস্বী বলিয়া আদরণীয় হয়। [illegible]র সাহায্যের উপর নির্ভর করিলে মনুষ্য স্বাভাবিক শান্তি হারাইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু আত্ম-নির্ভরতায় স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ হইয়া মনুষ্য যেন দৈববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। কোন জাতি বা কোন শ্রেণীর কোন উপকার অপর কেহ করিলে তাহাদিগের নিজে করিবার আবশ্যকতা ও উৎসাহের বহুল পরিমাণে খর্ব্বতা হয়; সুতরাং যে দেশের রাজা প্রজাদিগের সমস্ত বিষয়ের অযথা সহায়তা করেন এবং অপরিমিত ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগের কার্য্য সকল নিয়মিত করেন, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলেন।

উত্তম বিদ্যালয়ে পড়িলেই সুশিক্ষিত হওয়া যায় না। উত্তম আইন থাকিলেই সুখে কালযাপন হয় না। কারণ উত্তম বিদ্যালয়ে যদি অত্যন্ত সুবিধাও থাকে, তাহা হইলে এই মাত্র জানিবে যে, চেষ্টা করিলে শিখিতে পারা যায় এবং উত্তম আইনের উৎকৃষ্ট বিধিরও এইমাত্র উপকারিতা থাকিবে যে, নির্ব্বিঘ্নে নিজের উন্নতিসাধন করা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে সাধারণের বিশ্বাস কি! সাধারণের সংস্কার এই যে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ই সুশিক্ষার নিদান এবং অনুকূল আইনই সুখের মূল। বাস্তবিক তাহা নহে, নিজে চেষ্টা করিয়া না শিখিলে কেহ মনে বিদ্যা প্রবেশ করাইয়া দিতে সমর্থ হয় না এবং আইনেও সুখের উৎপত্তি হয় না। উহার উদ্দেশ্য এই দুই মাত্র; (১) যাহার যাহা উচিত তাহাকে তাহা দেওয়া, (২) অনুচিত-গ্রাহী কিংবা অনুচিত-ক্রিয়াকারীর দণ্ড বিধান করা সুতরাং জীবন-সম্পত্তি এবং স্বাধীনতা রক্ষা করা মাত্র। আইন সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত হইলে তাহাতে কেবল স্বল্পব্যয়ে শারীরিক বা মানসিক শ্রমলব্ধ ফলভোগ করা ভিন্ন কাহাকে কোন বস্তু বিতরণ করে না এবং সহস্র কঠিন হইলেও আইনেই অলসকে পরিশ্রমী করিতে পারে না, অপব্যয়ীকে মিতব্যয়ী করিতে পারে না, পাপীকে অপাপী করিতে পারে না। এই সকল পরিবর্ত্ত নিজের পরিশ্রম, মিতব্যয় এবং আত্মসম্বরণ প্রভৃতি সুনীতি দ্বারা লাভ করা যায় ভিন্ন আইনের বলে লাভ করা যায় না।

যেরূপ ব্যক্তিসমূহ লইয়া একটী জাতি হয়, সে জাতির গবর্ণমেণ্টও সেইরূপ ব্যক্তিগণের প্রতিবিম্ব মাত্র, অর্থাৎ যে জাতির লোকগুলি যেরূপ প্রকৃতির, সে জাতির গবর্ণমেণ্টকেও সেইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে হইবে। যদি কোন গবর্ণমেণ্ট তদীয় অধীনস্থ প্রজাগণ অপেক্ষা বেশি সভ্য সুশিক্ষিত থাকে, তাহা হইলে জাতির সংস্রবে সে গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে অবশ্যই অধোগামী হইবে। আবার জাতি অপেক্ষা তদীয় গবর্ণমেণ্ট অনুন্নত থাকিলে সে গবর্ণমেণ্টে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে হইবে। স্বভাবের নিয়মানুসারে, জলরাশি যেরূপ তাহার সমতল খুঁজিয়া লয়, জাতির প্রকৃতিও তদনুসারে তাহার উপযুক্ত গবর্ণমেণ্ট করিয়া লইবে। সম্ভ্রান্ত জাতিকে সম্ভ্রান্ত গবর্ণমেণ্ট শাসন করিবে, অসভ্য জাতিকে অসভ্য গবর্ণমেণ্ট শাসন করিবে। বস্তুতঃ সকল অভিজ্ঞতা হইতেই অকাট্যরূপে জানা যায় যে, রাজ্যের শক্তি তদীয় আইন বা সৈন্য সামন্ত নহে, প্রজার প্রকৃতিই রাজ্যের শক্তি। নানাবিধ অবস্থার বহুসংখ্যক লোক সমবেত হইলে একটী জাতি হয়। আবার সেই লোকদিগের পুরুষের, স্ত্রীর এবং সন্তানের সভ্যতাই জাতির সভ্যতা।

ব্যক্তিগত শ্রমশীলতা, তেজস্বিতা এবং ন্যায়পরতার সমষ্টিই জাতীয় উন্নতি এবং ব্যক্তিগত অলসতা, স্বার্থপরতা এবং কুক্রিয়াবলম্বিতার সমষ্টিই জাতীয় অবনতি। যদি কেহ বলে, ভারতবর্ষীয় জাতি অপেক্ষা ইংরেজ জাতি উন্নত, তাহা হইলে আমরা ইহাই বুঝিব যে এক জন ভারতবাসীর সহিত এক জন সমশ্রেণীর ইংরেজকে তুলনা করিলে ভারতবাসী অপেক্ষা ইংরেজ পরিশ্রমী, তেজস্বী এবং ধার্ম্মিক বলিয়া অনুভূত হইবে এবং যদি এরূপ কেহ বলে যে, তুরস্কের আজ কাল হীন দশা, তাহা হইলে আমরা ইহাই বুঝিব যে তুর্কিরা এক্ষণ অলস, স্বার্থপর এবং দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া পড়িতেছে। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ ভয়ঙ্কর সামাজিক কুপ্রথা বলি, তাহা ব্যক্তিবিশেষের দুর্নীতির ফল মাত্র। যদি আমরা আইনের দ্বারা এরূপ কোন কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করি, তাহাতে তাহা নিবারিত না হইয়া অন্য অবয়বে নূতন তেজে প্রকাশ হইবে মাত্র। কুপ্রথার মূল সমাজ ব্যাপিয়া নহে, কোন কোন ব্যক্তির ব্যবহারে। সেই সকল ব্যক্তির চরিত্র সর্ব্বতোভাবে সংশোধন না করিতে পারিলে উহা কখনই দূর হইতে পারে না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বদেশীয়কে স্বাধীন ভাবে নিজের পরিশ্রমে নিজে উন্নতি করিতে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করাই দেশহিতৈষিতার পরিচায়ক; দুই একটা বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তন দ্বারা স্বদেশের সুখ সাধন চেষ্টা করা প্রকৃত দেশহিতৈষিতার প্রমাণ নহে।

নিজে নিজের স্বত্তিনিচয়ের সুশাসন

করিতে পারিবার উপরই মনুষ্যের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এ জন্য কোন ব্যক্তির বাহ্যিক শাসন কিরূপ তাহা জানিতে আমরা বিশেষ ব্যগ্র হই না। বাহ্যিক শাসন শব্দে নিজের শরীরের বাহিরের সকল প্রকার শাসনই বুঝাইবে। ইহাতে কেবল গবর্ণমেণ্টের শাসন বুঝাইবে না, গুরু জনের কিংবা প্রভুর শাসনও ইহার অন্তর্বর্ত্তী। যে নিজের মূর্খতার, স্বার্থপরতার এবং দুশ্চরিত্রের দাস, সেই এ জগতে নীচতম দাস বলিয়া গণ্য। কারণ স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বাস করা একরূপ দাসত্ব হইলেও সে সত্বে কখনও কখনও স্বাধীন ভাবের কার্য্য বিকাশ পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যে জাতি অন্তরে২ উক্ত প্রকার অন্তজ দোষের দাস, ব্যবস্থা বা শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তে তাহারা মুক্ত হইতে পারে না এবং যত কাল এই ভ্রান্তিমূলক সংস্কার প্রবল থাকিবে যে গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেই জাতি স্বাধীন হইতে পারে, তত কাল সহস্র গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্ত কর না কেন, কিছুতেই উপকার দর্শিবে না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গবর্ণমেণ্ট প্রজার প্রতিবিম্ব। প্রজার হৃদয়ে স্বাধীন ভাবের উদয় না হইলে কোন গবর্ণমেণ্ট তাহা উদয় করাইতে পারে না। যদি জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিগণের আলস্য এবং নীচাশা দূর না হয়, তাহা হইলে অর্থ ও শোণিত ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্ত করিয়া কেবল ছায়াবাজির দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। স্বাধীনতার নিটুট ভিত্তি অবশ্যই ব্যক্তিদিগের নিজ নিজ চরিত্রের উপর থাকিবে। ইহাতে স্বাধীনতা কেবল চিরস্থায়ী হইবে, এমত নহে জাতিরও নিঃসংশয়িত রূপে দিন দিন উন্নতি হইবে এবং আভ্যন্তরিক অশান্তিতে এরূপ জাতির কখনও ক্লেশ পাইতে হইবে না। জন্ ষ্টুয়র্ট মিল্ বলিয়াছেন যে "যদি জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরতা থাকে, তাহা হইলে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তাও সম্পূর্ণ জঘন্য কার্য্য করিয়া উঠিতে পারে না। যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাবলম্বনতার বিনষ্ট হয়, তাহার নাম যাহাই হউক না কেন, তাহাকেই আমি প্রকৃত স্বেচ্ছাচারিতা বলি।"

অনেকের বিশ্বাস আছে, জুলিয়স সিজারের ন্যায় রাজা হইলে জাতির উন্নতি হয়। ইউরোপের ডিক্টেটর ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বলিয়াছেন, উপযুক্ত রাজার অনুবর্ত্তন করিলেই প্রজার সুখ হয়। ইহা ভয়ানক ভ্রম মাত্র। জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতি সম্বন্ধে প্রাচীন কালে যে সকল সংস্কার ছিল, এক্ষণ তাহা দূর হইয়া যাইতেছে। ক্ষমবান্ রাজার অনুসরণ করা ক্ষমতার অর্চ্চনা করা মাত্র, ক্ষমতার অর্চ্চনার সহিত অর্থের অর্চ্চনার অণুমাত্রও প্রভেদ নাই। উহাতে প্রজার কিছুই করিতে হয় না, কেবল জড় পদার্থের ন্যায় অনুগমন করিতে হয় মাত্র। এরূপ কার্য্যে কখনও

জাতির উন্নতি সংঘটিত হইতে পারে না, উহাতে জাতিকে দিন দিন আরও দাস করিয়া ফেলে। সুস্থশরীরী, বলবান্ যুবক যেমন সকল প্রকার শ্রম পরিত্যাগ-করিলে ক্রমে ক্রমে পক্ষঘাত রোগীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সে জাতিরও পরিণামে সেই দশা ঘটে। বস্তুত, ব্যক্তিগত স্বাবলম্বনের ভাবই জাতির উন্নতির প্রশস্ত পথ। এই ভাব ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া যদি সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে সেখানে ক্ষমতার অর্চ্চনা থাকিবে না। ক্ষমতা-পূজা স্বাবলম্বনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, আত্ম-নির্ভর লোক কখনও ক্ষমতার সেবায় তৃপ্ত থাকিতে পারে না।

উচ্চ জাতির সংশ্রবে উচ্চ হইব, এরূপ আশা অনেকের মনে প্রবল থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা কি স্বতঃই হইব? আমাদিগের অজ্ঞাতসারে আমরা উন্নত হইয়া পড়িব? তাহা কখনও হইতে পারে না। ডব্লিন্-শ্রমমেলার পরি-সমাপ্তি সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রকৃত হিতৈষী উইলিয়াম্ ডারগ্যান বলিয়া-ছিলেন "আমি যখন যেখানে স্বাধীনতা শব্দ উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছি, তখনই আমার স্বদেশীয়দিগকে মনে পড়িয়াছে। এ দেশ, ও দেশ, সে দেশ হইতে আমা-দিগের স্বাধীন ভাব প্রাপ্ত হইবার অনেক কথা আমি শুনিয়াছি এবং যদিও আমি অন্যদেশীয় সংশ্রবে ভূয়োভূয়ঃ মঙ্গলের আশা করি, তথাপি আমার নিগূঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদিগের পারিশ্রমিক স্বাধী-নতা আমাদিগের আয়ত্তাধীন। যদি আমরা সরল পরিশ্রম এবং সতেজ ক্রিয়ার ফল ভোগ করিতে জানি, তাহা হইলে এক্ষণ আমাদিগের ভাবী উন্নতির পথ যেরূপ প্রশস্ত ও উজ্জ্বল হইল, এরূপ কোন সময়ে ছিল না। আমরা এক পদ অগ্রসর হইয়াছি বটে, কিন্তু অধ্যবসায় ভিন্ন কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। যদি আমরা এক্ষণে সোৎসাহ চিত্তে ক্রমে অগ্রসর হই, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই আমরা পৃথবীর যে কোন জাতির সহিত আরামে সুখ এবং স্বাধীনতায় তুল্য হইতে পারিব।"

যে প্রাণীর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল পূর্ণ বিক্রমে দেহের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেই প্রাণীই জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সে মনুষ্যের হস্তপদাদি সতেজে তাহার সহায়তা করে, সে মনুষ্য ও মানব-গণের শ্রেষ্ঠ এবং যে পরিবারের প্রত্যেক অঙ্গ (Member) বা ব্যক্তি সযত্নে তৎপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেই পরিবার অন্যবিধ পরিবারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে জাতিতে এবম্বিধ পরিবারের সংখ্যা অধিক, সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ হইবে। গবর্ণ-মেণ্ট বা রাজা কি? কতকগুলি পরি-বার সম্মিলিত হইয়া যে একটী জাতি হয়, সেই জাতির সৌকর্য্যের নিমিত্ত রাজা গবর্ণমেণ্টের সৃষ্টি। সকলেই নিজ নিজ শ্রমের যৎকিঞ্চিদংশ সংগ্রহ করিয়া রাজা

বা গবর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহাতে জাতির সম্যক্রূপে শান্তি রক্ষা হয়। সুতরাং যে জাতি যেরূপ, সে গবর্ণমেণ্টও সেরূপ না হইয়া পারে না। কারণ জাতীয় শক্তি রক্ষা করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে গবর্ণমেণ্টের সেই জাতি-ভাবাপন্ন হইতেই হয়। আমরা এই জন্য বলিয়াছি, গবর্ণমেণ্ট জাতির প্রতিবিম্ব মাত্র।

যদি আমরা আমাদিগের হিন্দু এবং মুসলমান জাতির অধঃপতনের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে অভ্রান্তভাবে দেখিতে পাইব যে,ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন ভাবের অভাবেই তাহাদিগের পতন হইয়াছে। নতুবা পৃথ্বীরায়ের পতনে হিন্দুজাতির পতন হইল কেন! পৃথ্বীরায় হারিলেন, তাহাতে ক্ষতি কি? হিন্দুরা ইচ্ছানুসারে উপযুক্ত আর কোন ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলে পারিতেন। তাহা তাঁহারা করিলেন না কেন? পৃথ্বীবিজেতা মহম্মদঘোরীকেই তাঁহার যবনত্ব সত্ত্বেও রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন কেন? ইহার মূল হিন্দুজাতির স্বাবলম্বনের অভাব। স্বাবলম্বন থাকিলে তাঁহারা কখনই কর-প্রদান বিষয়ে তাদৃশ উদাসীন হইতে পারিতেন না। স্বাবলম্বী লোক মাত্রেই নিজস্ব-সম্বন্ধে ঔদাসীন্যরহিত। কারণ, স্বীয় ললাট-স্বেদলব্ধ সম্পত্তি সম্বন্ধে কেহই নির্ম্মম হইতে পারে না। যদি হিন্দুজাতির ব্যক্তিগত স্বাবলম্বন থাকিত,তাহা হইলে অপরিচিত মহম্মদ ঘোরীকে তাহারা কখনই পূর্ণ শরীরে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেন না। মুসলমানদিগের পতন-সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। আমরা দেখিতে পাইতেছি, বিখ্যাত ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ফরাসী-সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট পরাভূত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে ফরাসী জাতি পতিত হয় নাই, আবার সিড্যানের যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাজিত হইলেও ফরাসী জাতি পতিত হয় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে নিঃসংশয়িত রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে জাতিগত স্বাবলম্বন ভাবই জাতির স্বাধীনতার নিদানভূত।

আমরা পৃথিবীতে জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজ, আমেরিকান প্রভৃতি যে সকল উন্নত জাতি দেখিতে পাইতেছি, ইহারা কেহ আপনা হইতে ঐরূপ হয় নাই; বহুসংখ্যক লোকে বংশানুক্রমে পরিশ্রম এবং চিন্তা করিয়া আপনাপন জাতিকে ঐ উচ্চ অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। কত লোক কপাল ঘামাইয়া ভূমি কর্ষণ করতঃ কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিয়াছে। কত লোক বিপদপূর্ণ অরণ্য ও ভূগর্ভ তন্ন তন্ন করিয়া খনি সমূদয়ের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছে। কত আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, দ্রব্যাকার, যন্ত্রকার, শিল্পকার, কবি, বিজ্ঞানবিৎ, রাজনীতিজ্ঞ লোকে স্বীয় স্বীয় উন্নতিসৌধে কার্য্য করিয়াছে— তাহার ইয়ত্তা নাই। এক বংশ কিম্বা

পরিমাণে নির্ম্মাণ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে; পরবর্ত্তী বংশ আবার অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে তদুপরি নির্ম্মাণ করিয়াছে; এই রূপে কেবল কতকগুলি লোকের শ্রমগুণে নহে, কতক গুলি বংশ বংশানুক্রমে একাগ্র চিত্তে জাতীয় উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়াছে। আমরা জাতিদিগের যে ঔজ্জ্বল্য দেখিতেছি, তাহা এইরূপ বহু যত্নের ফলস্বরূপ। জাতীয় সভ্যতালোলুপ বীরপুরুষেরা মৃত্তিকা দ্বারা সমুদ্র পুরাইয়া কত স্থানে নূতন দেশ পত্তন করিয়াছেন, গিরিসমূহ উৎপাটিত করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করত মাতৃভূমির আয়তন বৃদ্ধি, করিয়াছেন, অসংখ হিংস্রজন্তুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অরণ্যাদি নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার স্থানে পরম রমণীয় নগরীর সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেকে পূর্ব্বপুরুষের কৃত কার্য্য উজ্জ্বল রাখিয়া তদুপরি নিজের শ্রমে হর্ম্ম্য রচনা করিয়াছেন, এবং নিজকৃত কার্য্য বংশাবলীর হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া পরম সুখে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। প্রত্যেক মহাজাতির উন্নতিই সভ্যতার এইরূপ চিরস্মরণীয় অভিনেতৃদিগের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে ভিন্ন স্বভাবত হয় নাই। হিমালয় সদৃশ শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে ঐ স্বর্গীয় অবস্থা লব্ধ হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

সাধারণ যোগ।

বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীকে ইংরেজি ভাষায় 19th Century বলে। এক্ষণে পৃথিবীর যে যে স্থানে সভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য লোক বাস করেন, সে সকল স্থানে নানা বিষয়িণী বিদ্যার আলোচনা হওয়ায় লোক সকল ভৌতিক বিষয়ে বিদিত ও বেদ্য হইতেছেন। ইহাতে সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, অঙ্কশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, ইতিহাস, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, রাজনীতি, আইন, পদার্থবিদ্যা, গান্ধর্ব্ব বিদ্যা, প্রভৃতি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়া কৃতবিদ্য হইতেছেন, তাঁহারা মানের সহিত অর্থোপার্জ্জন করত মহাস্ফীত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, আর যাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহারাও একপ্রকার মানে মানে কাল কাটাইতেছেন। যাঁহারা সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কষ্টে শ্রেষ্টে কাল হরণ করিতেছেন। ইহারা সকলেই এক সংস্কারের লোক। অনুকরণপ্রিয়, প্রারব্ধ-কর্ম্মফল-দ্বেষী, শান্তিভ্যান্তিমানীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাপ্তোপাধি, তাঁহারাই কি রাজদ্বারে, কি জাতীয় সমাজে সর্ব্বত্র মান্য গণ্য। ইহাঁরা

প্রায় তাবৎেই প্রত্যক্ষবাদী, সনাতন-দর্শী। এই প্রত্যক্ষবাদীর মধ্যে কেহ কেহ স্বেচ্ছাচারী, কেহ কেহ ব্রাহ্ম, কেহ নাস্তিক মতাবলম্বী। ইহারাই অপরাপর শ্রেণীর আদর্শহেতু। সে সকল লোকও ঐরূপ। ইঁহারা বাহ্যে মৌখিক আস্তিক, অন্তরে না আস্তিক, না নাস্তিক— কিছুই নহেন। আস্তিক ও নাস্তিক হইতে হইলে নিয়মাধীন হইতে হয়। যাঁহারা বাহ্য জগতীয় জ্ঞানালোকে মানসান্ধকার বিদূরিত করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করেন, তাঁহারা অস্তি নাস্তির ধার ধারেন না। বাহ্য জগৎ যে পরিবর্ত্তনশীল, অচিরস্থায়ী— ইহা সুধী মানব সমাজের স্বীকার্য্য। আত্মতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে বাহ্য জগৎ সাম্বরিক কার্য্য * মাত্র। সাম্বরিক-কার্য্যবেত্তাদিগকে আস্তিক নাস্তিক কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যাঁহারা সাম্বরিক কার্য্যের বৈচিত্র্য দর্শনকারী বিদ্যায় বিদ্বান্, তাঁহারাই কেবল পঞ্চীকৃত † মহাভূতের কার্য্যাকার্য্য জানিতে পারেন। তদ্ভিন্ন আধ্যাত্মিক জগতের কার্য্য সন্দর্শনের সামগ্রীর অভাব হেতু তাহা দেখিতে পান না। আধ্যাত্মিক জগৎ যদি না জানিতে পারা যায়, তবেই ভৌতিক জগৎ সত্য-স্বরূপ প্রত্যয়াস্পদ হয়। ধর্ম্ম-কর্ম্মাপেক্ষা যেমন অধর্ম্ম কর্ম্ম পশ্বাচারী লোকের নিকট প্রীতিকর ও সুমিষ্ট, তদ্রূপ অসংস্কৃত অসংযমী বিষয়াসক্ত লোকের নিকট বাহ্য অনিত্য অসত্য জগৎ আদরণীয়। ভৌতিক বিষয়ের বিদিত ও বেদ্য যোগী সকল মায়াবন্ধলাচ্ছাদিত ভগবান্ নারায়ণের প্রকৃত রূপ আর্য্যাচরিত যোগসাধনা কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কোন মতে উপলব্ধি করিতে পারেন না। যেমন সূর্য্যের প্রকৃত আকৃতি সূর্য্যকিরণে আবৃত, তদ্রূপ পরমাত্মার স্বরূপ রূপ তন্মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় বেদে অরূপ বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে। যাহার চক্ষুর শক্তি সূর্য্যকিরণ ভেদ করিতে পারে, তিনি যেমন সূর্য্যের প্রকৃত অবয়ব দেখিতে সক্ষম, তদ্রূপ যে যোগী বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণ হইয়া সুস্থির নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় মনকে স্থির করত আত্মচিন্তা করিতে পারেন, তিনিই পরমাত্মার মায়াবন্ধল উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাহার স্বরূপ রূপ জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিতে পারেন।

---

* ভোজবাজীর তামাসা।

† পঞ্চী করণার্থে পাঁচটি জিনিসে পাঁচেরই অংশ থাকে; তন্মধ্যে নিজাংশ অর্দ্ধ, আর আর জিনিস দুই দুই ভাগ যেমন ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের এই পাঁচটি মূল। পৃথিবীতে পৃথিবীর নিজ অংশ ৷৷০ আনা, আর জলাদির অংশ দুই দুই আনা। এই রূপ জলে, তেজে, বাতাসে ও আকাশের অবস্থা জ্ঞানীরা জানেন। পঞ্চীকরণ যাহাতে আছে, তাহাকে পঞ্চীকৃত বলে।

হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইহারাও পরমাত্মার স্বরূপ রূপ দেখিতে পান না।—এরূপ প্রকাশিত আছে। তবে যে সামান্য মনুষ্যে নিজ ক্ষমতায় তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষে দেখিতে পান, ইহা যিনি প্রত্যয় করেন, তিনি বড় সরল। আর জগতের কার্য্য-কারণ দ্বারা স্বীয় বিবেকশক্তি অনুসারে অন্ত জগৎ যিনি দেখিতে পান, তিনিও আবার কত বড় লোক। অপিচ যম নিয়ম প্রভৃতি ক্রিয়া ব্যতীত কেবল তর্ক ও ভৌতিক জগতের স্বভাবানুশীলন করত যিনি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পান, তিনিই বা কত বড় লোক। ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও বেদান্তশাস্ত্রে যাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতে না পারায় পরস্পরের চিরন্তন মত-ভেদ চলিয়া আসিতেছে, এমন পরা-মাত্মাকে দর্শন করা জ্ঞানবৈরাগ্য-বিহীন অযোগী ব্যক্তির অসম্ভব। বিশেষতঃ সাধুসঙ্গ ও সৎ শাস্ত্র আলোচনা-বিহীন যম-নিয়মাদি-যোগ-পরাঙ্মুখ, মায়া-নিগড়বদ্ধ সংসারী যে জীব আবাঙ্মন-সোগোচর বেদপ্রতিপাদ্য স্বতঃসিদ্ধ পরমাত্মাকে দেখিতে পান, তিনি ত জগৎ-প্রাজ্ঞ, মহাযোগী এবং সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হইতেও ভাগ্যবান্ ও ক্ষমতাবান্। আর ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সদৃশ বাহ্য জগতের নিয়মাবলি ও ভৌতিক পদার্থবিজ্ঞাপক জ্ঞানাবলম্বন করিয়া যিনি পরমাত্মার স্বরূপ সন্দর্শনের নিয়ম-রূপ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে প্রয়াসী পান, তাঁহাকে এবং তদনুভাবালম্বী মহাত্মা-দিগকে কি বলিয়া যে প্রশংসা করিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। সে রূপ বর্ণন করিতে বেদ ভীত হন।

অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।

—মহিম্নস্তব।

আদ্যং পরমং তত্ত্বং
দেবানামপ্যগোচরং।
অতএব মহেশানি
বর্ণিতুং তং কশক্যতে।

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

অনুমান ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে এই পুণ্য-ভূমি ভারতে আধ্যাত্মিক-বিজ্ঞানমূলক যোগসাধনা, হাতচালা, নখদর্পণ, শব-সাধনা প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়ার বাহুল্য ছিল। ইহার কতক অংশ যাঁহারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাপি জীবিত আছেন। লেখক তাঁহাদেরই অন্যতম ব্যক্তি। এই সময় হৃষীকেশাসে এক মহা যোগীর যোগ ভঙ্গ করা হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে পঞ্জাবে যোগী হরিদাস বাবাজীকে মৃত্তিকার মধ্যে পুতিয়া রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ নগরে জনৈক যোগী প্রাণায়াম যোগ প্রভাবে নিরবলম্বে শূন্যোপরি ৩।৪ হাত ঊর্দ্ধে উঠিতেন, এমন শুনা গিয়াছে। ভূকৈলাসস্থ যোগীর যোগ-ভঙ্গের জন্য তাঁহার হাতে পাকাগুল পোড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বিষাক্ত ঔষধ নাসিকা দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। আর গভীর জলে নিক্ষিপ্ত

বাঙ্কয়ের ন্যায় জলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হয়, তথাপি যোগিবরের যোগ ভঙ্গ হইয়া চৈতন্য হয় নাই। পরে কৌশলক্রমে মদ্য, গোমাংস, মোহনভোগ খাদ্যাইতে খাওয়াইতে যোগ ভঙ্গ হইয়া অত্যল্প কাল জীবিত ছিলেন। এই সময় হইতে বঙ্গে সাধু সমাগম বঞ্চিত হইতে লাগিল। ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এই সময় হইতে কালাস্থায়ী রাজবিদ্যা শিক্ষার্থে স্থানে স্থানে ইংরেজি বিদ্যালয় ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নালয় ও ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত ও পারস্য ভাষা বিচারালয় হইতে উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইংরেজি ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। সংস্কৃত আর পারস্য ভাষা শিক্ষার্থ আদৃশ যত্ন না থাকায় তাহার আলোচনার ত্রুটি হইতে লাগিল। কেবল কলিকাতায় সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষার্থ সংস্কৃত ও মাদ্রাসা কলেজ থাকিল। এমত অবস্থায় রাজপুরুষেরা অবসর বুঝিয়া বাঙ্গালি ও মুসলমানদিগের সন্তোষার্থ মুনসেফ, সদর আমীন, সদর আলা, ডিপুটি কালেকটর, ডিপুটি মাজেষ্ট্রেট, আবগারি সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট, পুলিসের এসিসটাণ্ট সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, স্পেসল দারগা, পুলিস ইনসপেক্‌টার, ডাক্তার, মাষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, টানসেটারি উকিল, এটর্ণি, ব্যারেষ্টার ও সিভিল সার্ভিসের পদ প্রদান করায় প্রাচীন ভাষার ও ধর্ম্ম কর্ম্ম, রীতি নীতি-সম্বন্ধে যুগ প্রলয়ের ন্যায় প্রলয় উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গালিরা যোগ যাগ, ধর্ম্ম কর্ম্ম, হিন্দু আহার, পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সভ্য বেশ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। এবং তৎসন্তান সন্ততিগণকেও নিজ নবীন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। এমন কি, স্ত্রীলোকদিগকে আপন মতে আনিতে কষ্ট বোধ হয় দেখিয়া তাহাদিগকে বিলাতি শিক্ষয়িত্রী দ্বারা বিলাতি রীতি নীতি সকল শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন বালিকাদিগকে শিক্ষাদানার্থ বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠাইতে ত্রুটি করিতেছেন না। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের মূল উৎপাটিত হইয়া অচিরেই উহার পতন হইতে আর কোন বিলম্ব হইবে না। এত দিন হিন্দু স্ত্রীলোকেরাই হিন্দুয়ানি রক্ষা করিতেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা-প্রভাবে আর তাহা থাকে না। বিধবা ও অসবর্ণা বিবাহ—ধর্ম্মবিপ্লাবক সমুদ্রের তরঙ্গ; শিক্ষাপ্রণালী—প্রচণ্ড বায়ু; রাজোৎসাহ—জলচর।

ভারত মাতার কৃপায় হিন্দুগণ প্রথমে বৌদ্ধ, তৎপরে যবনবিপ্লবন হইতেও রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই ক্ষণ আবার তাঁহারই কৃপায় কি হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না? বোধ হয়, অবশ্যই পাইবে। হিন্দুধর্ম্ম অতি সুদৃঢ় আর নির্দ্দোষ বলিয়া এত কাল এত উৎপীড়িত হইয়াও আছে। অন্য ধর্ম্ম হইলে এত অত্যাচার

সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারিত না। প্রাচীন ও নব্য ইতিহাসাদির কোন স্থানে ভারতের হিন্দুধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইবার কথা পাওয়া যায় নাই। আর তাহা ঘটিবেও না। ভারতে যখন বেদ-বিরুদ্ধাচারের প্রাবল্য হয়, তখন অমর দেবতুল্য সনক সনাতনাদি মহা-যোগিগণ মানব-দেহধারী হইয়া ধর্ম্ম বিপ্লাবন নিবারণ করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, ভগবান্ স্বয়ং ভারতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা ভারতের ভার লাঘব করেন। এ কথা যোগবাশিষ্ঠে আর ভবিষ্য পুরাণে প্রকাশ আছে।

অতএব ভারত ভ্রাতাদিগের নিকটে নিবেদন এই—যত দিন ভারতের শোণিত শরীরে থাকিবে, তত দিন ভারতীয় আচার ব্যবহার রক্ষা করত যোগ-শাস্ত্রানুসারে ভগবান্ নারায়ণে আত্মসমর্পণ কর। যদি তাহাতেও অপারগ হও, তবে চৈতন্যদেব মহাপ্রভুর মতানুযায়ী হইয়া ভগবৎ-প্রেম প্রকাশ কর; দেখ, সাধুসঙ্গম ও যোগ ব্যতীত ভারতীয় লোকের নিস্তারের অন্য উপায় নাই। ভারতভূমিই জ্ঞান-বৈরাগ্যের জননী হেতু ইনিই মুক্তিদাত্রী। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ভূমি-ভাগ ভূমি হেতু সে সকল স্থান ভূস্বর্গ। এ সকল স্থানে মুক্তি লাভ হয় না বলিয়া ভারত জননীর এত গৌরব ও ঈশ্বরপ্রিয়তা। যে ভারত-সন্ততি নিজ জননীর গৌরব রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহার জন্ম অনর্থক। মল মূত্রের ন্যায় ভারতে হিন্দু-শুক্র-শোণিতে জন্ম পরিগ্রহ করিলে, ৩টী ঋণে তাহাকে আবদ্ধ হইতে হয়। প্রথম—মাতৃঋণ; দ্বিতীয়—পিতৃঋণ; তৃতীয়—গুরুঋণ। এই ঋণত্রয় যিনি উদ্ধার করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু। ভারতভূমি তাবৎ হিন্দুর জননী; এবং তৎপতি ভগবান নারায়ণ পিতা; ঋষিকুল কুলগুরু। জননীর মুখোজ্জ্বলার্থে সন্তান সতত চেষ্টা করিয়া, তাহাতে কৃত-কার্য্য হইতে পারিলে, মাতৃঋণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ভারত-জাত হিন্দুগণ! নি[illegible] পি[illegible] ও [illegible]পিতা ভগবান্ নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করাকে পিতৃঋণ পরিশোধ করা বলে। আর আর্য্য-ঋষিগণ হিন্দুমাত্রেরই গুরু বলিয়া সেই ঋষিদিগের আজ্ঞা শিরে ধারণ পূর্ব্বক প্রতিপালন করাকে গুরুঋণ হইতে মুক্ত হওয়া কহে।*

শ্রীকালী[illegible]মল সার্ব্বভৌম।

* প্রত্যেক লেখকই স্বাধীন মত প্রকাশে অধিকারী। প্রস্তাব মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতায় যে মত আছে, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে।

—সং।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি।

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ।

(১২৮৯ সালের চৈত্র সংখ্যার ২৭৪ পৃষ্ঠার পর)

প্যাসেশ্চায় যুদ্ধ করিলে, সমুদায় সৈন্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া নেপোলিয়ন তথা হইতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ফম্বিয়ো নগর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; অষ্ট্রিয় সৈন্যও তথায় যাইয়া উপস্থিত হওয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল; কিন্তু অষ্ট্রিয়-সেনানায়ক লিপার্ট এই স্থানে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন; তাঁহার কামান ও প্রায় এক তৃতীয়াংশ সৈন্য ফরাসীগণের হস্তগত হইল। লিপর্টের সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত অন্য এক দল অষ্ট্রিয় সৈন্য কামাল নগর হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহাতে ফরাসীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; কেন না ফরাসীসেনাপতি লাহার্প এই সময় নিহত হন। অষ্ট্রিয় সৈন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলে এই যুবক সেনাপতি তাহাদের বল বিক্রম বুঝিবার জন্য গুপ্তভাবে অশ্বারোহণে গমন করেন; তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপন দলে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় শত্রুবোধে তাঁহার অধীনস্থ সৈনিকবৃন্দই তাঁহাকে হত্যা করিল, হত্যার পর সকলে জানিতে পারিল, তাহাদের সেনাপতিই নিহত হইয়াছে। যাহা হউক, এই নবাগত অষ্ট্রিয় সৈন্যও ফরাসীগণের সম্মুখে তিষ্টিতে না পারিয়া লোডী নগরাভিমুখে প্রস্থান করিল; এই স্থানে সেনাপতি বিউলিউ সেই সময় অবস্থিতি করিতেছিলেন। লোডী স্থানটী যুদ্ধ কার্য্যে অষ্ট্রিয়গণের বিশেষ সুবিধাজনক; কিন্তু ফরাসীগণের তেমনই অসুবিধার কারণ। লোডী গ্রামটি অতি বৃহৎ; ইহাতে প্রায় দ্বাদশ সহস্র লোকের বাস। গ্রামটি চতুর্দ্দিকে দুর্গ সদৃশ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; সম্মুখে গভীরা অডা নদী। তাহা পার হইবার বিশেষ সুবিধা নাই; কেবল একটি মাত্র চারি শত হস্ত দৈর্ঘ্য পরিমিত কাষ্ঠের সেতু; তাহার উপর দিয়াই পারাপার হইবার পথ; সেতু-মুখ বন্ধ করিয়া দিলে লোডী প্রবেশ করিবার অন্য কোন উপায়ই নাই; বোনাপার্টি ভাবিলেন, এই যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলেই বিউলিউয়ের সমুদায় সৈন্যই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং অডা নদী পার হইয়া লোডী আক্রমণ করিবার জন্য তিনি নিতান্ত উৎসুক হইলেন। ১০ই মে তিনি সুদক্ষ সৈন্যচয় ও কতিপয় সুদক্ষ সেনাপতি সমভিব্যাহারে লোডী গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; পথি মধ্যে কতকগুলি অষ্ট্রিয় সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

ইহারা অক্লেশেই পরাজিত হইল ও লোডী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

অভা নদীর উপর কাষ্ঠময় সেতুটিই লোডী প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ছিল। ইহা দিয়া যাহাতে ফরাসীসৈন্য তথায় প্রবেশ করিতে না পারে, এই জন্য অষ্ট্রিয় সেনাপতি ইহার উপর ত্রিংশৎটি কামান সজ্জিত করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন তথায় উপস্থিত হইলে মুহুর্মুহুঃ কামান হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল; নদীর এ পারে ফরাসীগণ তাহার যথারীতি উত্তর প্রদান করিল; এই অগ্নিকাণ্ডের সময় নেপোলিয়ন নিজে বিপন্ন হইয়াও সেই অগ্নি কাণ্ডের সম্মুখে যাইয়া অসামান্য সাহসিকতার সহিত দুইটি কামানকে কার্য্যাক্ষম করিয়াছিলেন। এইরূপ অগ্নিকাণ্ডের কিছু ক্ষণ পরেই বোনাপার্ট অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে সেতু পার হইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন; সৈন্যদল অগ্রসর হইল। এই সময়ে অষ্ট্রিয় পদাতিক সৈন্যসমূহ স্থানের অসুবিধা বশতঃ গোলন্দাজ সৈন্য হইতে কিয়দ্দূরে অপসৃত ছিল; বীর নেপোলিয়ন ইহা সুবিধারই কারণ জ্ঞান করিলেন। পদাতিকগণ সরিয়া গেলে গোলন্দাজ সৈন্যের আর কেহই রক্ষক রহিল না। সুতরাং তাহারা ফরাসীসৈন্যের অনায়াস-বধ্য হইয়া পড়িল। বোনাপার্ট আরও তিন সহস্র সৈন্য অষ্ট্রিয় গোলন্দাজ সৈন্যের নিকট দিয়াই পার করিয়া দিতে সচেষ্ট হইলেন। তিন সহস্র সৈন্য অগ্রসর হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল; নেপোলিয়ন উপযুক্ত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে অগ্রগামী অশ্বারোহী সৈন্য অষ্ট্রিয়গণের উপর পতিত হইল। নেপোলিয়ন এই সুযোগে এই তিন সহস্র সৈন্যকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন; সৈন্যগণ সাধারণতন্ত্রের জয় ধ্বনি করতঃ সেতুর উপর দিয়া চলিল। অষ্ট্রিয় গোলন্দাজ সৈন্য তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। নদী-তীরস্থিত প্রাসাদ সকলের ছাদের উপর হইতে অষ্ট্রিয়গণ রাশি রাশি বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। এই অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়া ফরাসীসৈন্য আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না; সকলেই স্তব্ধ হইয়া সেই সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইল। এতদ্দর্শনে বার্থির, লে আলেমণনি এবং করভিঁন নামক তিন জন প্রধান কর্ম্মচারী সৈন্য-স্তম্ভের অগ্রে উপস্থিত হইলেন এবং তাহারা অতিশয় নির্ভীকতার সহিত সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাদের উৎসাহে দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়া অগ্রসর হইল এবং পরক্ষণেই সেই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়া অভা নদীর পর পারে যাইয়া উপস্থিত হইল। অষ্ট্রিয় গোলন্দাজ সৈন্যের আর কোন ক্ষমতাই রহিল না; তখন সঙ্গীন বিদ্ধ

করিয়া শত্রু দূরীভূত করা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই ছিল না। গোলন্দাজ সৈন্যের নিকট অধিক সঙ্গীন ছিল না। পদাতিক সৈন্যগণ তাহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে অবস্থিত; সুতরাং বিশেষ সুযোগ চলিয়া গেলে পদাতিক সৈন্য ঠিক সময়ে আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না। এদিকে ফরাসী সৈন্য অস্ত্রিয় গোলন্দাজ সৈন্যের প্রতি সঙ্গীন চালাইতে লাগিল, সৈন্য দলে দলে বিনষ্ট হইতে লাগিল; এইরূপ প্রায় দুই সহস্র অস্ত্রিয় সৈন্য এই স্থানে নিহত হইল; অন্যান্য সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। ত্রিশটি কামান ও সহস্র সৈন্য ফরাসীগণের হস্তগত হইল; এই যুদ্ধ "লোডী সেতুর যুদ্ধ" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

সুরেন্দ্রনাথের জীবনী।*

বলা বাহুল্য যে, শীর্ষোল্লিখিত সুরেন্দ্রনাথ, ভারতসভার নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ অগ্রে সুশিক্ষিত ভারতবাসী-মাত্রেরই নিকট পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরমবন্ধু বিচারপতি নরিশের গুণে, তিনি আজ ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত। সামান্য কৃষক হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার নাম শুনিয়াছে। সকলেই তাঁহাকে হিন্দু-ধর্ম্মের পরম বন্ধু বলিয়া জানিয়াছে। মানুষ ঘটনার দাস। বড় ঘটনায় বড় লোক প্রস্তুত হয়। আজ যে অজ্ঞাতনামা—কাল সে প্রখ্যাতনামা হইতে পারে। বড় বড় ঘটনা নিত্য উপস্থিত হয় না। সেই ঘটনা-রঙ্গালয়ে অভিনয় করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা প্রস্তুত হইয়া থাকেন, সময় তাঁহাদিগকেই অভিনেতা নির্ব্বাচিত করিয়া লয়। এবং নির্নামতার অন্ধকার হইতে তুলিয়া তাঁহাদিগকে জগৎসমক্ষে [illegible] করে। [illegible] ধারণ [illegible] ফরাসি [illegible] উপস্থিত না হইলে, হয়ত নেপোলিয়ান্ বোনাপার্টকে সামান্য সৈনিকের পদে ব্রতী থাকিয়া জীবন কাটাইতে হইত। তাহা হইলে তাঁহার রণবিষয়িণী প্রতিভায় জগৎ ঝলসিত হইত না। ইংলণ্ডের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে, বোধ হয় ওয়াসিংটনের প্রতিভা অঙ্কুরে বিদলিত হইত। দৃপ্ত এডওয়ার্ড ছলে বলে কৌশলে স্কটলণ্ড হস্তগত করিবার চেষ্টা না করিলে ওয়ালেস্ ও ব্রুসের স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইত না। প্রথম চারলসের অত্যা-

---

* শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ববাট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক আনা মাত্র।

চারে ইংলণ্ড প্রপীড়িত না হইলে, বোধ হয়, হ্যাম্‌ডেন ও ক্রমওয়েলের নাম কেহ জানিতে পারিত না। অষ্ট্রিয়ার দৌরাত্ম্যে ইতালি মর্ম্মাহত না হইলে, ঋষিপ্রবর ম্যাটসিনি ও বীরবর গ্যারিবল্ডীর স্বদেশানুরাগের অদ্ভুত কাহিনী আজ জগৎকে উন্মাদিত করিত না। জন্মভূমির দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় উদ্দীপিত না হইলে কসুথ ও কসাথের স্বদেশানুরাগের জলন্ত দৃষ্টান্তে আজ জগৎ উদ্ভাসিত হইত না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, বড় বড় ঘটনায়, বড় বড় লোক প্রস্তুত হয়।

যাঁহার জীবন যে পরিমাণে তরঙ্গায়িত, তিনি সেই পরিমাণে অসাধারণ হইয়া উঠেন। ঘাত প্রতিঘাতেই চরিত্র গঠিত হয়। আরোহ ও অবরোহ যেমন সুরের জীবন, সেইরূপ ঘাত প্রতিঘাত চরিত্রের জীবন। যত দিন সুরেন্দ্রের জীবন শান্তিময় ছিল, তত দিন তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হয় নাই। যদি তাঁহার জীবনে তরঙ্গ না উঠিত, তাহা হইলে তিনি এক জন সামান্য সিবিলিয়ান্ মাত্র রহিয়া যাইতেন। তাঁহার নাম লইয়া এরূপ সর্ব্বব্যাপী আন্দোলন হইত না। যে জেলায় যখন থাকিতেন, সেখানকার লোকেই তাঁহাকে চিনিত মাত্র। কিন্তু সুরেন্দ্রের ললাটে বিধাতা অপূর্ব্ব সৌভাগ্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাই তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর ষড়যন্ত্রে তিনি সার্ব্বিস হইতে তাড়িত করিলেন। বিধির নির্ব্বন্ধকে খণ্ডন করে? সেই দিন হইতে তাঁহার অদৃষ্ট-গগণে দ্বাদশ রুদ্রের আবির্ভাব হইল। সাগর ছাঁচিয়া যে মাণিক পাইয়াছিলেন, তাহা হারাইয়া প্রথম তিনি দিশাহারা হইয়াছিলেন। স্রোতস্বিনী প্রচণ্ডবেগে যাইতেছিল, হঠাৎ এরূপ অভাবনীয় বাধা পাইয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইল। কিন্তু বিস্ময়ের ভাব তিরোহিত হইলে আবার ফিরিয়া উৎপত্তি-স্থানে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সুরেন্দ্রনাথ সার্ব্বিসে ঢুকিয়া ঘোরতর সাহেব হইয়াছিলেন, সে সময় স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অল্পই মিশিতেন। তিনি আশৈশব বৈদেশিক আচার ব্যবহারে ও রীতি নীতিতে দীক্ষিত ছিলেন, সুতরাং দেশীয় আচার ব্যবহারে ও রীতি নীতিতে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। বৈদেশিক ভাষায় তাহার অধিকতর পটুতা জন্মিয়াছিল বলিয়া তিনি বৈদেশিক ভাষায় লিখিতে, বক্তৃতা করিতে ও কথোপকথন করিতে অধিকতর ভাল বাসিতেন। এ সমস্তই জাতীয় নেতার প্রতিকূল। যাহা চাকরীর পক্ষে গুণ, জাতীয় নেতৃত্বের পক্ষে তাহা বিগুণ। চাকরী-ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সুরেন্দ্রের মনে মনে জাতীয় নেতা হইবার আশা অঙ্কুরিত হইল। যে সকল বিগুণে তিনি সে পদের অযোগ্য, সুরেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি ক্রমে ক্রমে সাহেবী ছাড়িতে লাগিলেন।

যদিও তিনি এখনও সাহেবী সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারেন নাই, তথাপি শ্রীহট্টের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এচ এস বানর্জ্জি ও ভারতসভার অধিনায়ক বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে এক পদার্থ নহেন, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন। যে সুরেন্দ্র এক দিন স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখিয়া নাসিকা সঙ্কোচিত করিয়া দূরে সরিয়া যাইতেন, আজ সেই সুরেন্দ্র অনেকের সহিত মিশিতে বিশেষ সমুৎসুক। কিন্তু পূর্ব্ব সংস্কারের এমনই বল, যে সুরেন্দ্রের বাক্য ও কার্য্য সময়ে সময়ে বিষম অসামঞ্জস্য ঘটিয়া পড়ে। তিনি লিখিবার সময়ে ও বক্তৃতার মুখে জনসাধারণের দুঃখে যেরূপ কাঁদিয়া আকুল হন, কার্য্যে সময়ে সময়ে তাহা বিপরীতাচরণ করিয়া ফেলেন। মফঃস্বলে যাইয়া তিনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর আলয়েই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। যেখানে চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় মিলে, সেখানকার আতিথ্য পারৎপক্ষে প্রত্যাখ্যান করেন না। দরিদ্রের কুটীর বা নিরন্ন গৃহস্থের জীর্ণ আবাসের অভ্যন্তরে তিনি কখন পদার্পণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। যদি বাস্তবিকই জনসাধারণের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদে, তবে তাহাদের সহিত না মিশিয়া তিনি কিরূপে থাকিতে পারেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এরূপ ব্যবহার জাতীয় নেতৃত্বের অনুকূল নহে।

কর্ম্মচ্যুত হওয়ার পর ঘাত প্রতিঘাত তাঁহার প্রতিভা বিকসিত হইতে লাগিল। অন্তর্নিগূহিত প্রতিভার স্ফুরণে প্রধানক্ষেত্র কলিকাতা। তিনি শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় আসিলে, সকলেই তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট না হয়, এই জন্য পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে মেট্রপলিটন কালেজের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার পাঠনার গুণে মেট্রপলিটন কালেজে অসংখ্য ছাত্র প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অধিক কি, প্রেসিডেন্সী কালেজ পর্য্যন্ত টল মল করিতে লাগিল। ক্যাথিড্রাল কালেজের ছাত্র এত কমিয়া গেল যে, কালেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কালেজটী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। সিটী কালেজও তাঁহার নামের মোহিনী শক্তিতে অল্প দিনের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কালেজের প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিল। তিনি নিজে প্রেসিডেন্সী স্কুল নামক যে স্কুল চালাইতেছেন, তাহাও উচ্চ দরের স্কুল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যুত ছাত্রসমাজে তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি জন্মিয়াছে যে, তিনি যেখানে যান, ছাত্রেরা যেন তাঁহার পশ্চাদ্গামী হয়। তাঁহার পদার্পণে ফ্রিচর্চ্চেরও এক্ষণে সমূহ উন্নতি হইয়াছে। ছাত্র মহলে এরূপ পসার আমাদের দেশে আর কাহারও কখন হইয়াছিল কি না আমরা জানি না।

তিনি যে শুদ্ধ কলিকাতার ছাত্রবর্গের দেবতা এরূপ নহেন। অতি দূরস্থ পল্লীগ্রামের ছাত্রেরাও তাঁহার নামে উন্মাদিত। অনেকে প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। বালকের কথা কত দূর কার্য্যে পরিণত হউক বা না হউক, সুরেন্দ্র বাবু যে তাহাদের উপাস্য দেবতা, ইহা দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এরূপ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। ফ্রান্স গ্যাম্বেটার ভাগ্যেও এইরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের একটী প্রধান উপাদান স্বরূপ হইয়াছিল।

ছাত্র-দেবতা হওয়ায় সুরেন্দ্র বাবুর একটী অনিষ্ট হইয়াছে। ছাত্রদের অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া তিনি অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছেন। অনেক শিক্ষক ও অভিভাবক আমাদের নিকট অনুযোগ করিয়াছেন যে, ছাত্রেরা আর তাঁহাদিগকে মানে না; তাহাদিগের কথা শুনে না। তাহারা পড়া শুনা ছাড়িয়া কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া বেড়ায়। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। আমরা দুই একটী সভায় দেখিয়াছি যে, ছাত্রেরা সুরেন্দ্র বাবু ও আরও দুই এক জন ভিন্ন আর কাহাকেও কোন কথা বলিতে দেয় না। বলিতে উঠিলে বিকট শব্দ করে ও করতালি দেয়*। এরূপ অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় সন্দেহ নাই। ছাত্রেরা দুর্ব্বিনীত হইলে, আমাদের দেশের সমূহ অনিষ্ট। যাহারা ভারতের ভবিষ্যৎ আশা স্থল, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব হইলে আমাদের আর কি আশা? সুরেন্দ্র বাবুকে আমরা বন্ধুভাবে অনুরোধ করি, তিনি যেন ছাত্রদের অনুবর্ত্তন না করিয়া নিয়মন করিতে চেষ্টা করেন। কারণ, নৈতিক উৎকর্ষ ব্যতীত জাতীয় উন্নতির আশা নাই। আর মনুষ্যের মাহাত্ম হওয়াও বড় প্রার্থনীয় নহে।

ছাত্রদেবতা হওয়ার আরও একটী বিষময় পরিণাম এই হইয়াছে, যে সুরেন্দ্র বাবু, তাঁহার বক্তৃতা ছাত্রবর্গের হৃদয়গ্রাহিণী হইলেই, পরিতৃপ্ত হন। যে কোটী কোটী নিরক্ষর ভারতবাসীর মুখপত্র বলিয়া তিনি আপনাকে পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহারা তাঁহার বক্তৃতা বুঝিল কি না, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না, ছাত্রবর্গের প্রশংসা পাইয়াই তিনি আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। যদি তিনি বাস্তবিক জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী হন, তাহা হইলে জনসাধারণ যাহাতে

* সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম, এই ভাব অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা আশা করি, অচিরেই উহার সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দ্ধান হইবে। সং।

তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারে তাহার বিধান করিবেন। ভবিষ্য উকিলকে বক্তৃতা করিতে শিখাইবে, দেশের বিশেষ কি উপকার করিবেন? বিধাতা তাঁহাকে অপূর্ব্ব বক্তৃতা শক্তি দিয়াছেন, ছাত্রবর্গের কোমল মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত করিবার জন্য নহে, জনসাধারণকে রাজনৈতিক ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য। জীবনীলেখক লিখিয়াছেন "বিখ্যাত ভারতসভা প্রধানতঃ ইঁহার ও শ্রদ্ধেয় বাবু আনন্দমোহন বসুর ঐকান্তিক যত্ন ও অর্থসাহায্যের ফল।" জীবনীলেখক ভারতসভা-সম্বন্ধে অতি অল্পই জানেন বলিয়া বোধ হইতেছে। দুই জন লোকের চেষ্টা ও ধনে ভারতসভা প্রবল ভারতীয় লীগ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে কখন দাঁড়াইতে পারিত না। অনেক গুলি কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া ভারত সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন; কলিকাতা ও মফঃস্বলের নানা স্থানে যাইয়া ভারতসভার অনুকূলে জনসাধারণের মত ফিরান। যে বুঝাইলে বুঝে, তাহাকে বুঝাইয়া, যে বুঝে না, তাহাকে অনুনয় করিয়া সভামন্দিরে আনয়ন করেন। যাঁহাদিগকে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে কত পরিহাস বিদ্রূপই সহ্য করিতে হইয়াছিল। এক জন বড়লোক আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে "গঙ্গার জলে টাকা ফেলিয়া দিব, তথাপি ভারতসভার চাঁদার জন্য টাকা দিব না"। কত জায়গায় যে রাজনৈতিক প্রচারকগণকে কত কথা শুনিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুরেন্দ্রবাবু ও আনন্দ মোহন বাবুকে সে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। তবে তাঁহারা যে ভারত-সভার উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। সুরেন্দ্র বাবুর নিকট ভারতসভা আবার বিশেষ ঋণী সিবিল সার্ব্বিস্, মুদ্রাবিধি, আত্মশাসনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ভারতসভা যে সকল আন্দোলন করিয়াছে, সুরেন্দ্রবাবুই সে সকল আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ।

সুরেন্দ্রবাবুর বাগ্মিতাশক্তি তাঁহার "শিখজাতির অভ্যুদয়" "ম্যাট্‌সিনি" "চৈতন্য" প্রভৃতি বক্তৃতায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সে শক্তির চিহ্ন আমাদের জাতীয় সাহিত্যে রহিবে না। বৈদেশিকেরাও যে যত্ন করিয়া সে গুলিকে নিজ সাহিত্যে স্থান দিবে, তাহার আশা নাই। সুতরাং কালে তাহা বিলুপ্ত হইবে।

সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ যোগ্যতার সহিত "বেঙ্গলী" পত্র চালাইতেছেন, তাহাতে তিনি দেশের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। প্রত্যুতঃ জমীদারগণের মুখযন্ত্রস্বরূপ হিন্দুপেট্রিয়টের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক "বেঙ্গলী" ভিন্ন অন্য ইংরাজী-সংবাদপত্র আর নাই।

হওয়া অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা অব কি করা যাইতে পারে।

সুরেন্দ্রবাবুর পরিশ্রমশক্তি যে অসাধারণ,এ বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। অতি অল্প বাঙ্গালীকেই এরূপ অবিরাম কার্য্য করিয়া অক্লান্ত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কখন তাঁহাকে নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে দেখি নাই। তিনি সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও কখন নিজের কাজ অবহেলা করেন নাই। নিজের কাজ করিয়াও সাধারণ কাজ করিবার তাঁহার যথেষ্ট সময় থাকে। তিনি যে কাজে হাত দেন, সে কাজ কখন অসম্পূর্ণ রাখেন না। এরূপ অধ্যবসায়গুণেই তিনি যে কাজে হাত দেন, সেই কাজেই কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। যাহা অপরে অসম্ভব বলিয়া উঠে, অলৌকিক অধ্যবসায় বলে তিনি তাহা সম্ভব করিয়া তুলেন। বাধা বিপত্তি তাঁহার গতিরোধ করিতে অক্ষম। তিনি নির্ভীক চিত্তে স্থির-পদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে অগ্রসর হইতে থাকেন। সেই নির্ভীক ভাব দেখিয়া ভীরুর ভয় ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সকলেই তাঁহার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হইতে থাকে। সুতরাং তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হয়। যাঁহার এরূপ শক্তি, তিনি যে জাতীয় নেতা হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

হৃদয় ও মন।

সৌন্দর্য্যের উচ্ছ্বাসময়ী, শোভার বিলাসভূমি, প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় নিয়মে আবদ্ধ। এক দিন যেখানে চারুকুসুমিত উপবন ছিল, সেখানে আজ তমসাময় বিশাল অরণ্য; এক দিন যেখানে তুষারমণ্ডিত তুঙ্গ শৈলরাজি বিরাজ করিত, সেখানে আজ গম্ভীর-গর্জ্জী ফেণাময় বিপুল সিন্ধু প্রমত্ত ভাবে ছুটিয়া যায়। রবি শশি-তারকা-শোভিত আকাশের অনন্ত বিস্তৃতিও এ নিগূঢ় নিয়মের বশীভূত।

মনুষ্যের হৃদয় ও মন, বাহা প্রকৃতির ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল। মনুষ্যের জীবন শত ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া যাইয়া যেন নূতন সংগঠিত হয়। সংসারের শোক চুল্লীতে শত বার দ্রবীকৃত হইয়া, উত্তপ্ত অশ্রুজলে শত বার মজ্জিত হইয়া,দুর্ভাগ্য-মুদ্গরে শত বার আহত হইয়া, অন্ধকার-ময় খনিজাত ধাতুর ন্যায় মনুষ্য-জীবনকে জগতের ব্যবহারোপযোগী হইতে হয়। সেই পরিবর্ত্তনশীল জীবনের সঙ্গে যে মনের ও হৃদয়ের, বুদ্ধির ও অনুভাবনার পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

হৃদয় ও মন পরিবর্ত্তনশীল বলিয়াই, তাহাদিগের উন্নতি ও অবনতি হইতে পারে। তাহাই জন্য মন ও হৃদয় শিক্ষার

প্রভাবে সুন্দর ও পরিমার্জ্জিত হইতে পারে; ও শিক্ষার অভাবে মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া যায়। ইহারই জন্য জগতে মনের ও হৃদয়ের নিয়মিত শিক্ষা ও পরিমার্জ্জন প্রয়োজনীয়।

যেমন কতকগুলি সত্য আছে, যাহাকে প্রকৃতিস্থ মনমাত্রেই বিশ্বাস করিবে; তেমনি জগতে কতকগুলি সুন্দর পদার্থ আছে, যাহাকে প্রকৃতিস্থ হৃদয় মাত্রেই ভাল বাসিবে। কিন্তু কঠিন সত্য হইলে যেমন কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য, বুঝাইতে এক জন বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ গুরুর আবশ্যক করে; তেমনি কখন কখন কোন্‌টি সুন্দর, কোন্‌টি অসুন্দর, ইহা বুঝাইতে এক জন প্রেমী ও কবির সহায়তার প্রয়োজন। মনের অশিক্ষা হইলেও মন মনের প্রকৃতি হইতে প্রায়ই এত দূরবর্ত্তী হয় না, যে সামান্য সত্য বিশ্বাস করিতে পারে না। ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ড যে পুনর্ব্বার ভূপতিত হয়, এ জলন্ত সত্য কে না স্বীকার করিবে? তেমনি অশিক্ষিত হৃদয়ও জীবন্ত সৌন্দর্য্যকে অসুন্দর ভাবিতে পারে না। পূর্ণিমা নিশীথিনীর শান্ত জ্যোৎস্না প্রাতঃসবিতার দীপ্ত প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধতা, গোলাপ কুসুমদলের মাধুর্য্য কয় জন না স্বীকার করিবে? মনুষ্যের প্রকৃতি—জ্ঞান ও প্রেম। মন স্বভাবতঃই বিশ্বাস করিতে, ও হৃদয় স্বভাবতঃই ভাল বাসিতে চায়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, অন্তর্জগতের চিরন্তন স্বভাব। কিন্তু যেখানে সত্য ও সৌন্দর্য্য বোধ হওয়া দুরূহ, যেখানে সত্য ও অসত্যের মধ্যে, সৌন্দর্য্য ও অসৌন্দর্য্যের মধ্যে ক্ষীণ রেখাপাত করিতে হইবে, সেখানে এক জন বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানী, প্রেমী ও কবির সহায়তার প্রয়োজন।

জগতে মনের শিক্ষা আকাঙ্ক্ষিত পরিমাণে হইলেও হৃদয়ের শিক্ষা হয় না। তাহারই জন্য সংসারে এত কোলাহল ও অরাজকতা, হিংসা ও কৃতঘ্নতা, ক্রোধ ও অপ্রেম। তাই মনুষ্যের এ সুন্দর সংসার আজ কণ্টকাকুল গভীর অরণ্যের ন্যায়, বাত্যাসংক্ষুব্ধ ঘূর্ণমান উন্মত্ত জলধরের ন্যায়, সাহারার অনলবর্ষী, দিগন্তপ্রসারী মরুভূমির ন্যায়; সাধুর ও প্রেমীর, উদার চেতার ও কবির বাসযোগ্য স্থান নহে। তাই তাহাদিগের মাঝে মাঝে সংসার ছাড়িয়া যাইতে বাসনা হয়; অরণ্যের নির্জন প্রদেশে বাস করিতে অভিলাষ হয়।

আমি জানি, বিজ্ঞান উচ্চ, বিজ্ঞান মহৎ। বিজ্ঞান না থাকিলে এ বিশ্বজগৎ এক অনন্ত কোলাহল; বিজ্ঞানের সহায়তায় ইহা অনন্তপ্রসারী এক সমতান মহাসঙ্গীত। পূর্ব্বে যেন গ্রহ তারা, রবি সুধাংশু অনিয়মিত মার্গে, উদ্দেশ্যহীন পথভ্রষ্ট উল্কার ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতেছিল; এখন বিজ্ঞানের কুহক-দণ্ডের আজ্ঞায় তাহারা নির্দ্দিষ্ট পথে, নির্দ্দিষ্ট গতিতে, অনন্ত বিশ্রান্ত মধুর সঙ্গীত গাইতে গাইতে আকাশে ঘুরিতেছে। বিজ্ঞান-সহায়তায়, বিমান-

রথ গর্ব্বে মেঘাশ্লিষ্ট গগনে বিহার করে, বাষ্পীয় যান সদর্পে মহীতলে বিচরণ করে। বিজ্ঞানবলে দুর্ভেদ্য নির্জ্জন অরণ্য আজ কোলাহলপূর্ণ রাজপুরী; ঝঞ্ঝাকুল আবর্ত্তময় সিন্ধু আজ মনুষ্যের পদদলিত। তাই বলি, বিজ্ঞান মহৎ ও উচ্চ। বিজ্ঞান মানবের মহীয়সী কীর্ত্তি, প্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশ, সভ্যতার গৌরবময় ফল। ভাস্কর ও আরিষ্টটল, গ্যালিলিও ও কেপ্লার, লাপ্লাস ও নিউটন মনুষ্যের গৌরব, জগতের আরাধ্য দেবতা।

কিন্তু তাই বলিয়া কি হৃদয়ের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন বিস্মৃত হইব? হৃদয়ের শোচনীয় অন্ধকার ভুলিয়া যাইব? বিজ্ঞান মহৎ বটে কিন্তু বিশ্ব-প্রেম মহত্তর। বিজ্ঞান আমাদিগের পার্থিব ও ভৌতিক সুখের ও আরামের নিদান; বিশ্বপ্রেম আত্মার স্বর্গীয় উচ্চ প্রীতি ও শান্তির আধার। ইহারই অভাবে আজ সংসারে এত কোলাহল, এত দ্বন্দ্ব। প্রতি হৃদয়ের প্রকৃত শিক্ষা হইলে, প্রতি হৃদয় সুন্দর হইলে ও সৌন্দর্য্য বুঝিলে, কি সংসার এক অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে পরিণত হইবে না?

আমি স্বীকার করি যে, প্রতি হৃদয় সুন্দর হইলেও, প্রতি মনুষ্যের বহিরাকার সুন্দর হইতে পারে না। তবে কি প্রকারে মনুষ্যে মনুষ্যে প্রেম হইবে? আমি বলি যে, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য দেহসৌন্দর্য্য হইতে অধিক আকর্ষণীয়। মুহূর্ত্তের জন্য বহিঃসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও হৃদয়ের অসৌন্দর্য্যে এ মোহ, এ প্রীতি মেঘস্থ চপলার ন্যায়, প্রভাতের সুখস্বপ্নের ন্যায়, সন্ধ্যার আন্দোলিত স্মৃতির ন্যায়, ক্ষণিক ও মুহূর্ত্তস্থায়ী। কিন্তু হৃদয়ের সৌন্দর্য্যজাত, আনন্দবর্দ্ধিতমেঘ প্রতিভাত হৃদয় প্রশান্ত হ্রদের ন্যায়, প্রভাতের সূর্য্যকরসহত সংসারের ন্যায়, পূর্ণচন্দ্রমার প্রশস্ত কিরণের ন্যায় স্থির ও নিশ্চল। যে হৃদয় সুন্দর, যাহা প্রীতি, শান্তি, পবিত্রতার আবাসভূমি, সে হৃদয়কে কয় জন ভাল না বাসিবে? রমোলাতে (Romula) সুখে লালিতা রমোলা ও পথিক টাইটো (Tito) উভয়েই সুন্দর। কিন্তু তাহাদিগের প্রেম কয় দিন স্থায়ী হইয়াছিল? আবার আডাম বিডে (Adam Bede) আডাম প্রথমে সুন্দরী হতভাগিনী হেটিকে ভাল বাসিলেও পরিশেষে স্বর্গীয় জ্যোতিঃপূর্ণহৃদয়া কোমলা নাতিসুন্দরী ডাইনাকে (Dina) যথার্থ ভাল বাসিয়াছিলেন। ডাইনাও আডাম নাতিসুন্দর হইলেও তাহার হৃদয়সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সে প্রেমের প্রতিদান করিয়াছিলেন। তাই বলি, হৃদয়সৌন্দর্য্যই যথার্থ সৌন্দর্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া বলি না যে, বহিঃসৌন্দর্য্য মুগ্ধ করে না। নির্জ্জীব জগতে সুকুমার শশী, মৃদুনাদী তরঙ্গিণী, শ্যাম প্রান্তর, প্রভৃতির হৃদয় নাই; কিন্তু প্রকৃত কবি তাহাদিগকে সহৃদয়া নারীর ন্যায় ভাল বাসেন। কিন্তু হৃদয়বান্

মানুষও, হৃদয়ের অসৌন্দর্য্যে বহিঃসৌন্দর্য্য মুগ্ধ করে না।

জগতে হৃদয়ের শিক্ষা হয় না, তাহারই জন্য মানুষ এত দুঃখী। তাই সে সংসারের পীড়নে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যথার্থ সৌন্দর্য্য প্রাণের সহিত ভাল বাসিতে পারিলে সে এত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিত না। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী। তাহাকে ভাল বাসিলে আবার কিসের দুঃখ। সে "আমারই এ নিখিল ভুবন" মনে করিয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। কর্ম্মশ্রান্ত ও সঙ্গিতাক্ত শরীর ও মনের প্রকৃতিই ঔষধ ও প্রতিকার *। সন্ধ্যার দূরপ্রসারী প্রান্তরের দৃশ্য, মহী-আলিঙ্গিত নীলাকাশ সিন্ধু, মগ্নপ্রায় রবি-করের কনকলহরী, কোমল মধুর নবরঞ্জিত মেঘমালা তরণী,—এ দৃশ্য কোন্ দুঃখ কে নূ যন্ত্রণা দূর না করিবে। শিক্ষিত হৃদয়ের এ শোভা বুঝিতে সেলির বা কালিদাসের প্রয়োজন নাই।

কবি কে? কবি সৌন্দর্য্যের শিক্ষাদাতা। প্রেমী আপনিই ভালবাসেন, কবি নিজে ভাল বাসিয়া জগৎকে ভাল বাসা শিক্ষা দেন। কি সুন্দর, কি অসুন্দর, ইহাই তিনি মধুর ভাবে বুঝাইয়া দেন। সেক্ষপীয়র ও কালিদাস কবি; কারণ তাঁহারা জগতের সৌন্দর্য্যসাগর মথিত করিয়াছেন। সেক্ষপীয়র সৌন্দর্য্যের সহিত অসৌন্দর্য্যের ছবি আঁকিয়া সৌন্দর্য্যকে আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। কালিদাস শুদ্ধ সৌন্দর্য্যই তাঁহার অনুপম তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন। উভয়েই মহান্ কবি ও গুরু। উহাঁরা হৃদয়রাজ্যের গ্যালিলিও ও ভাস্কর, কম্‌ট্ ও গৌতম। উঁহারা তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্যের পূজ্য; উঁহারা মনুষ্যজাতির অলঙ্কার, জগতের গৌরব, বিশ্বের শিক্ষাদাতা। আমরা তাঁহাদিগের নিকট সৌন্দর্য্যতত্ত্ব শিক্ষা করিব।

তবে তাঁহাদিগের শিক্ষক কে? যে আরিষ্টটল ও নিউটনের শিক্ষক, সেই দয়াময়ী প্রকৃতি তাঁহাদিগের গুরু। প্রকৃতিই তাঁহাদিগের নিকট, তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর নিকট, নিত্য সত্য সৌন্দর্য্যপ্রদর্শনী। নিউটন ও সেক্ষপীয়রের ন্যায় প্রতিভাশালী দেবতার, প্রকৃতির নিকট শিক্ষা হয়; কিন্তু আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মনুষ্যের শিক্ষার নিমিত্ত নিউটন ও সেক্ষপীয়রের সহায়তা চাই।

কার্লাইল বলেন যে, জাতির নব অভ্যুত্থান-সময়ে এক জন অবতার-স্বরূপ জন্মিয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়, তাহাতেই জাতীয় অভ্যুত্থান। সকল জাতি প্রথমে আপন ভাবে চিন্তা করে। তাহার মন প্রথমে কতক সত্য ও বহু অসত্য বিশ্বাস করে। সেই অসত্যে বিশ্বাসের অপনয়নের জন্য জ্ঞানী

* To the body and mind which have been cramped by noxious work or company, nature is medecinal and restores their tone"
—*Emerson's Nature, III, Beauty.*

অবতারের জন্ম। তেমনি সেই আদিম অবস্থায় জাতি কতক বাস্তবিক সৌন্দর্য্য, কতক অসৌন্দর্য্য ভাল বাসে। ইহারই জন্য এখনও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন অনুভব-শক্তি। ইহারই জন্য চীনবাসী, আফ্রিকাবাসী ইউরোপবাসীদিগের সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন ধারণা। সেই সৌন্দর্য্যকে সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক্ করিবার জন্য কবি ও প্রেমী অবতারের জন্ম। সকলেই হোমর ও আরিষ্টটল্ হইতে পারে না; উহাঁরা উপাস্য দেবতা; উহাঁরা জগতের শিক্ষক। আমরা উহাঁদিগের শিষ্য।

পূর্ণ সৌন্দর্য্যই ঈশ্বর। যিনি পূর্ণসৌন্দর্য্য বুঝাইতে পারেন, তিনি প্রেমসন্ন্যাসী। ঈশা, চৈতন্য এই ধর্ম্মের প্রচারক। সেক্ষপীয়র কালিদাস উচ্চ, কিন্তু ঈশা চৈতন্য উচ্চতর। পূর্ণসৌন্দর্য্য মনুষ্যের অগম্য, বোধের অতীত; ইহা পূর্ণশশীর ন্যায় মধুর; মানুষ তাহার নিকটে যাইতে চায়, কিন্তু বিফল হয়। যে যত দূর নিকটে যাইতে পারে, সে তত দূর উচ্চ। যে পূর্ণপ্রেম প্রচার করে, সেই মহৎ, সেই দেবতা। হিউম্ ও বেন্থামের সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম জগতে থাকিতে পারে না। সে পার্থিব ধর্ম্ম রক্ত-মাংসহীন অস্থির ন্যায় কঠিন ও জীবনহীন। হৃদয় শিক্ষিত হইলে, এ ধর্ম্ম দূরে পলায়ন করিবে। নূতন হৃদয়ের ধর্ম্ম জগৎকে আলিঙ্গন করিবে। মন ও হৃদয়ের, বুদ্ধি ও অনুভাবনার উভয়ের রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইবে।

পুরুষ রমণীর কোমল সঙ্কীর্ণ প্রেম এই উচ্চ পূর্ণ প্রেমের প্রথম সোপান। তাহাদের প্রেমে, আত্মার পরিণয়ে এই সুখময় ফল উৎপন্ন হয়। যদি না হয়, তবে পরিণয় যথার্থ ফলপ্রদ নহে। সাধারণের ধারণা অপেক্ষা পরিণয়ের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। স্বামী স্ত্রীর হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন না হইলে, সে উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। হৃদয়ের মিলনের নিমিত্ত সমাজে অন্য প্রকার বিধির প্রয়োজন। হৃদয়ের বিনা মিলনে পরিণয় পরিণয়ই নহে। পরিণয়ের ঈপ্সিত ফল কেবল সন্তান নহে; ইহার অভিলষিত উদ্দেশ্য হৃদয়ের শিক্ষা। পুরুষ রমণী বিবাহিত হইয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্ব শিক্ষা করিবে, পরস্পরের সৌন্দর্য্য পরস্পর ভাল বাসিয়া পরে হৃদয়কে আরও শিক্ষিত করিয়া বিশ্বের সৌন্দর্য্য ভালবাসিতে শিখিবে; পরে ঈশ্বরকে ভাল বাসিবে। এই প্রেম তাহার গম্য স্থান। এ প্রেম নির্ম্মল, স্থির, পবিত্র। এ প্রেম অনন্ত সুখময়, হৃদয়োন্মাদী। এই প্রেমোন্মত্ত হইয়া চৈতন্য তরঙ্গিণী-হৃদয়-প্রতিভাত চন্দ্রমার শতধীকৃত মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। সে প্রেমের বিষয় আর লেখনী কি কহিবে। লেখনী স্থির হউক। আইস অনন্ত নীরবতা তাহা সভক্তি বিস্ময় ধ্যান করি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

জগৎ-কৌশল।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

কৌশলযুক্তি ঈশ্বরবাদিদের প্রধান যুক্তি বটে, কিন্তু আমরা পূর্ব্ববারে প্রদর্শন করিয়াছি যে, সেই যুক্তি হইতে সাক্ষাৎ-ভাবে ঈশ্বরনির্ণয় হয় না। কৌশলযুক্তির পর কার্য্যকারণ যুক্তি স্বতঃই সম্ভূত হয়, কিন্তু কার্য্যকারণ কোন আদি কারণে লইয়া যাইতে পারে না; বরং তাহা আদিকারণ-অনুমানের বিরোধী। যদি বল, যিনি কৌশলজ্ঞ পুরুষ, আমার পক্ষে তিনিই ঈশ্বর, আমার আদি কারণে যাইবার আবশ্যক নাই, তাহা হইলে সে অনুমান হইতে আর কয়েকটী সিদ্ধান্তও উত্থিত হয়।

(১) উপাদান শক্তিযোজনকারী কৌশলজ্ঞপুরুষ কৌশলের প্রণেতা এবং একবিধ ঈশ্বর।

(২) কৌশলোপযোগী উপাদান-শক্তি সকল কৌশলপ্রণেতার পূর্ব্বে বর্ত্তমান। সুতরাং সেই উপাদান শক্তি সকলও অন্যবিধ ঈশ্বর।

(৩) কৌশল নানাবিধ, জটিল, এবং পরস্পর-বিরোধী। এ জন্য যত প্রকার কৌশল আছে, তত জন ঈশ্বর সম্ভবনীয়; সুতরাং অসংখ্য ঈশ্বরের সম্ভব হইতেছে।

(৪) এই অসংখ্য ঈশ্বর অনুমানের খণ্ডন করিতে হইলে পৃথিবীর সমুদায় দৃষ্ট কৌশলের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করা আবশ্যক। কিন্তু এই পৃথিবীতে যখন ন্যায় অন্যায়, ভাল, মন্দ, সুখ দুঃখ, ঘটিতেছে, তখন প্রতীত হইতেছে যে, অনেক কৌশল ব্যর্থ হয় এবং অনেক কৌশল অপরের বিরোধী; সুতরাং সকল কৌশলই যে এক মাত্র পুরুষ কর্ত্তৃক বিন্যস্ত হইয়াছে, এমত প্রতীত হয় না।

(৫) যখন কৌশলের সামঞ্জস্য নাই, তখন বলিতে হইবে, তৎপ্রণেতা অসংখ্য ঈশ্বরেরও সামঞ্জস্য নাই। সুতরাং অসংখ্য কৌশল বিরচনকারী অসংখ্য ঈশ্বর সকলের মধ্যে নিদান কতক গুলি ঈশ্বর-বিরোধ-ভাবসম্পন্ন।

(৬) কৌশল উৎপাদনের জন্য যদি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা আবশ্যক হয়, তবে সেই কৌশল রচনার পূর্ব্বে তদ্রূপ ঈশ্বর বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু তৎপরে সেই ঈশ্বরের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয় না। যেমন, অট্টালিকা নির্ম্মাণের পর তাহার নির্ম্মাতার অস্তিত্ব সেই অট্টালিকা আর সপ্রমাণ করে না।

(৭) কৌশল সকল, চিন্তা ও ভাবনা প্রভৃতি মানসিক শক্তি-চালনারই পরিচায়ক। মানব-মনের সহিত জগতের বিশেষ প্রকার সম্বন্ধ-জনিত চিন্তা ও ভাবনার উদয় হয়। কৌশল মানিতে হইলে মানবের সহিত জগতের যে সম্বন্ধ,

ঈশ্বরের সহিতও জগতের সেই সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং কৌশলজ্ঞ পুরুষ মানবের ন্যায় মনঃবিশিষ্ট।

(৮) যদি কৌশলজ্ঞ পুরুষ মানবের ন্যায় মনঃবিশিষ্ট হন, তবে তিনি দেহী নন কেন, এবং ইচ্ছার সহিত যদি দেহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, তবে ইচ্ছাবিশিষ্ট ঈশ্বর দেহী নন কেন, তাহার অকাট্য যুক্তি আবশ্যক। যেহেতু দেহ বিচ্ছিন্ন ইচ্ছা ও মনের সত্তা অসম্ভব এবং দেহ ভিন্ন ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব।

(৯) কৌশল উদ্দেশ্যের পরিচায়ক। যেখানে উদ্দেশ্য অথবা বিঘ্ন নাই, সেখানে কৌশল অসম্ভব। উদ্দেশ্য ইচ্ছা-জনিত। ইচ্ছা জ্ঞান জনিত। জ্ঞান মনের সহিত জগতের বিশেষ প্রকার সম্বন্ধ জনিত। সুতরাং জ্ঞানী, ইচ্ছা পরায়ণ, উদ্দেশ্যযুক্ত কৌশলজ্ঞ পুরুষের বিদ্যমানতা জগতের উপাদান সত্তার পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। এবং সেই উপাদানের সৃষ্টির সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি সেই উপাদানের বিশেষ প্রকার বিন্যাসকারী মাত্র। যে হেতু—

(১০) ইচ্ছা ও জ্ঞান দেহাবলম্বন দ্বারা উপাদান সামগ্রী সকলকে আপনার মত গড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু কিছুরই সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং কৌশলজ্ঞ পুরুষই যে জগৎস্রষ্টা হইবেন, এমত প্রমাণিত হয় না।

(১১) শক্তির অভাবেই কৌশলের আবশ্যকতা। শক্তি থাকিলে কে কপি কল দিয়া কড়ি কাঠ তুলিতে যাইবে? যেখানে সম্যক্ শক্তি আছে, সেখানে কৌশলের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কৌশল, শক্তির অভাবেরই পরিচায়ক। এজন্য কৌশলরচয়িতা জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বশক্তিমান নহেন।

(১২) যদি কৌশল—ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের পরিচায়ক হয় এবং শুভ ও সুখ যদি কৌশলের উদ্দেশ্য হয়, তবে অশুভ এবং দুঃখ ও কৌশলের উদ্দেশ্য নয় কেন? অশুভ ও দুঃখ যদি কৌশলের উদ্দেশ্য না হয়, তবে শুভ এবং দুঃখও নহে। আর যদি বল, অশুভ কিছুই নাই, যে হেতু, অশুভ হইতে শুভ উৎপন্ন হয়, তবে অবশ্য বলিব শুভও কিছুই নাই, যে হেতু শুভ হইতে অশুভও উৎপন্ন হয়। সুতরাং, শুভ যদি কৌশলের উদ্দেশ্য হয়, অশুভও তদ্রূপ কৌশলের উদ্দেশ্য। তবে কৌশলজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বমঙ্গলময় হইতে পারেন না। যাঁহার শুভাশুভ নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও নহেন। যাঁহাকে অশুভ হইতে কৌশল করিয়া শুভ আনিতে হয়, যখন অশুভই শুভের দ্বার, এবং শুভই যদি তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। যেহেতু সর্ব্বশক্তিমানের উদ্দেশ্য শুভ হইলে, একেবারে শুভই সমুৎপন্ন হইত। সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময়ের রাজ্যে অশুভ

স্থান পাইবে কেন? যদি বল, তুমি বুঝিতে পার না বলিয়াই অশুভ বলিতেছ, তদুত্তরে আমি বলিব, আমি যদি না অশুভ বুঝিতে পারি তবে শুভই কিরূপে বুঝিলাম। যে জ্ঞানে আমি শুভ বুঝিতেছি সেই জ্ঞানে আমি অশুভ বুঝিতেছি। তবে তুমি বলিতে পার যে, মনুষ্যের শুভাশুভ বুঝিবার ক্ষমতা নাই। যদি মনুষ্যের শুভাশুভ বুঝিবার ক্ষমতা না থাকে তবে আমি বলিব, যাহা জগতে কৌশল বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহা যে বাস্তবিক কৌশল, একথা বলিতে মনুষ্য অধিকারী নহে। আর যদি আমার কৌশল বুঝিবার ক্ষমতা থাকে, তবে শুভ বুঝিবার বেলা আমি ক্ষমতাবান্ এবং অশুভ বুঝিবার বেলা আমি অসমর্থ কেন? আর যদি আমি শুভাশুভ কৌশল বুঝিতে পারি, তবে অবশ্য বলিব, কৌশলের যিনি রচয়িতা তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বমঙ্গলময় নহেন।

(১৩) কৌশল রচনাকারী ঈশ্বর যে শুদ্ধ সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বমঙ্গলময় নহেন এমত নহে, তিনি অনন্তজ্ঞানবান ও সর্ব্বজ্ঞ ও নহেন। পার্থিব কৌশল সমুদায়ে যে জ্ঞানের পরিচয় হইতেছে, তাহা যত অধিক হউক না কেন, তথাপি পরিমিত জ্ঞান, তাহা মনুষ্যের জ্ঞান অপেক্ষা পরিমাণে অধিকতর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় নাই। পরিমিত জ্ঞান হইতে অনন্ত জ্ঞানের অনুমান নিষিদ্ধ। সুতরাং কৌশল দেখিয়া কখন কৌশল-বিরচনকারী ঈশ্বরকে অনন্ত জ্ঞানবান ও সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না।

১৪। ঈশ্বর কৌশলজ্ঞ হইলে তিনি যে শুদ্ধ শক্তিহীন, সর্ব্বমঙ্গলউদ্দেশ্যহীন অনন্ত জ্ঞানহীন এমত নহে, তিনি সম্পূর্ণও নহেন। যে হেতু যাঁহার কৌশল, তাহার কৌশল রচণের উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্য ইচ্ছাজাত, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা জাত। যাঁহার আকাঙ্ক্ষা আছে তাঁহার অভাব আছে। যে হেতু অভাব ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। সুতরাং যাঁহার অভাব আছে তিনি সম্পূর্ণ নহেন। আবার দেখুন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বমঙ্গলময় এবং অনন্তজ্ঞানবান নহেন, তিনি সম্পূর্ণও নহেন।

কৌশল হইতে কৌশলজ্ঞ পুরুষের অনুমান যদিসিদ্ধ হয়, তবে সেই কৌশলবিরচনকারী পুরুষের অনুমান কতদূর গ্রহণীয়, তাহারই পরীক্ষার জন্য আমরা দেখিলাম সেই অনুমান হইতে কত প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই সকল সিদ্ধান্ত যদি স্বীকার্য্য হয় তবেই সেই মূল অনুমান গ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধান্ত যদি পরিহার্য্য হয় তবে সেই মূল অনুমান ও পরিহার্য্য বলিতে হইবে। এখন আস্তিকেরা দেখুন, এ সমস্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য কি না? তাহারা নিশ্চয় বলিবেন স্বীকার্য্য নহে, সুতরাং তাঁহাদের মূল প্রতিজ্ঞা সঙ্গত হয় নাই।

আবার দেখুন, যখন বলিলে—জ্ঞানবান পুরুষভিন্ন কৌশল উৎপাদিত হইতে পারে না, তখন তোমার সেকথার যুক্তি এই যে, সমান হইতেই সমানের উৎপত্তি হয়। আমরা প্রথমে তোমার একথা স্বীকার করিয়া লইলাম। তুমি বলিলে যে হেতু সমান ভিন্ন সমান উৎপন্ন হইতে পারে না, তজ্জন্য জ্ঞানবান পুরুষ ভিন্ন জ্ঞান-পরিচায়ক কৌশল উৎপন্ন হইতে পারে না। ঈশ্বর জ্ঞানবান এই জন্য, যে হেতু জগতে জ্ঞানের পরিচয় আছে। জগতে জ্ঞানের পরিচয় আছে বলিয়া যদি ঈশ্বর জ্ঞানবান হন, তবে সেই যুক্তি অনুসারে জড়ের ঈশ্বর অবশ্য জড় হইবেন। কৌশল রচনার পূর্ব্বে জড় উপাদানের সত্ত্বা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং, জ্ঞানের উৎপত্তি যদি জ্ঞান হইতে হয়, জড়ের উৎপত্তি তবে জড় হইতে না হয় কেন? তাহা হইলে ঈশ্বর দ্বিবিধ হইল। একরূপ ঈশ্বর জড় অন্যরূপ ঈশ্বর জ্ঞানবান। এ জগতের ঈশ্বর তবে দ্বিবিধ, জড় ঈশ্বর হইতে জড় জগৎ উৎপন্ন এবং জ্ঞানবান ঈশ্বর হইতে জ্ঞান-জগৎ রচিত হইয়াছে। ঈশ্বরবাদিরা যদি এই সিদ্ধান্ত স্বীকার না করেন, তবে তাহাদের মূল যুক্তিও স্বীকার্য্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ। সমান হইতে যে সমানের উৎপত্তি হয়, বিজ্ঞান একথা সকল সময় স্বীকার করেন না। সুতরাং এটি সাধারণ বাক্য নহে। অম্লজানের প্রধান ধর্ম্ম দহন-সহায়তা, এবং উদজানের গুণ দাহ্যতা। কিন্তু উহাদের সংযোগে যে জল উৎপন্ন হয় তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। জল উদজানের ন্যায় দগ্ধ হয় না এবং অম্লজানের ন্যায় দহনকে পোষণও করে না। জলের উপস্থিতিতে দহনের কার্য্য বরং রহিত হইয়া যায়। হীরক এবং অঙ্গার দেখিতে অসদৃশ বটে, কিন্তু মূলে এক পদার্থ। কিন্তু হীরকের যে গুণ, অঙ্গারের কি সেই গুণ? এইরূপ দৃষ্টান্ত বিস্তর আছে। এই অসংখ্য দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয় যে, সমান হইতে সকল সময়ে সমানের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং এ অনুমান সিদ্ধ নহে। যখন এ অনুমান সিদ্ধ নহে, তখন এই অনুমান হইতে যে সিদ্ধান্ত হইবে, সে সিদ্ধান্তও সিদ্ধ নহে। অতএব কৌশল হইতে জ্ঞানবান পুরুষের অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে।

তৃতীয়তঃ। যখন ঈশ্বরবাদিরা বলেন যে, জ্ঞানবান পুরুষ ভিন্ন জ্ঞান-পরিচায়ক কৌশল উৎপাদিত হইতে পারে না; তখন তাহারা পাকতঃ এই মাত্র বলিলেন যে, কৌশল উৎপাদন করা জড়ের ক্ষমতাতীত। তাহারা যদি এমত অনুভব করিতে পারিতেন যে, জড়ের কৌশলোৎপাদনের শক্তি সম্ভবনীয়, তাহা হইলে জড় অতীত এক স্বতন্ত্র ঈশ্বর পুরুষের কল্পনা আবশ্যক হইত না। এই জড় জগৎই কৌশলোৎপাদনের কারণরূপে স্থিরীকৃত হইত। সেরূপ স্থির

করিতে পারেন নাই বলিয়া দ্বৈতবাদিরা মনুষ্যের দৃষ্টান্ত লইয়া ঈশ্বর কল্পনা করিলেন। তবে তাহাদের যুক্তি এই; যাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না তাহা অসত্য। আমরা অনুভব করিতে পারি না, কিরূপে জড় কৌশল উৎপাদন করিবে, এজন্য কৌশলের কারণ জড় হইতে পারে না। যাহা আমরা অনুভব করিতে পারি তাহাই সত্য, একথা বলিলে অনেক বিষয় সত্য হয়। যাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না, তাহা অসত্য হইলে অনেক বিষয় অসত্য হয়। আমাদের উপস্থিত বিষয়ই ধরুন না কেন? ঈশ্বরবাদিরা কি অনুভব করিতে পারেন, কিরূপে ঈশ্বর সৃষ্টি করিলেন? তবে তাঁহারা ঈশ্বরকে জগৎ-স্রষ্টা বলেন কেন? আমরা কি অনুভব করিতে পারি, কিরূপে আমাদের ইচ্ছা হইতে স্নায়বিক কার্য্যোৎপন্ন হয়? পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি কিরূপে কার্য্য করিতেছে, তাহা কি আমরা অনুভব করিতে পারি? এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তবেই সপ্রমাণ হইতেছে আমাদের অনুভবের উপর কখন সত্যাসত্য নির্ভর করে না। কারণ, কোন বিষয়ে ত আমরা সে যুক্তি প্রয়োগ করি না। তবে এ তত্ত্বেই বা করিব কেন? অতএব জড়েতে যে কৌশলোৎপাদিকা শক্তি থাকিতে পারে, একথা অসম্ভব নহে।

আমরা মনুষ্যের দৃষ্টান্ত ধরিয়া অনুমান করিয়াছি যে, বুদ্ধিশীল প্রাণী ব্যতীত কৌশলোৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু আমরা বুদ্ধিহীন প্রাণীকেও কৌশলোৎপাদন করিতে দেখিয়াছি। আমরা মধুমক্ষিকাকে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি, বাবুইকে পরিপাটী বাসা বানাইতে দেখিয়াছি। এমত কি, জড়কেও কৌশল উৎপাদন করিতে দেখিয়া থাকি। শর্করা আপনাপনি দানা বাঁধিয়া মিছারী হইয়া পড়ে। যদি বল কৌশলোৎপাদনের জন্য এই সমস্ত ইতর প্রাণী ও জড় পদার্থে যে সমস্ত মানসিক কার্য্য এবং ভাবনা চিন্তা আবশ্যক, সে সমস্ত কার্য্য তাহাদের হইয়া ঈশ্বরই করিয়াছেন, তাহা হইলে তুমি এই কথা বলিলে যে, ঈশ্বর বুদ্ধি ও চিন্তাশীল পুরুষ। জগতের সহিত আমাদের যে বিশেষ প্রকার সম্বন্ধ জনিত ভাবনা চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্যোৎপন্ন হয়, তুমি কি জান, সৃষ্টির সহিত ঈশ্বরের ও সেই প্রকার সম্বন্ধ? জগতের সহিত ঈশ্বরের সেই প্রকার সম্বন্ধ কি না তৎপক্ষে মনুষ্য সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং কৌশলোৎপাদন পক্ষে যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা যখন ঈশ্বরে আছে কি না, আমরা জানি না, তখন কি আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে, জগতে যাহা কৌশল বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহা কি বাস্তবিক কৌশল? দ্বৈতবাদীর ঈশ্বর

কি বাস্তবিক কৌশল করিয়া এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন? সুতরাং পেলি, বেল, এবং চামার্স, যে কৌশলের দৃষ্টান্ত আনিয়া ঈশ্বর স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের যুক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। ম্যাক্ কসের বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা সে যুক্তির বল কিছুই বৃদ্ধিত হইতেছে না। কারণ, দৃষ্টান্ত মাত্র যাহা প্রমাণ করে, বহু দৃষ্টান্তেও তাহাই প্রমাণ করে। অতএব যখন জগতের পরিদৃশ্যমান কৌশল সকল বাস্তবিক কৌশল কি না আমরা জানি না, তখন সেই কৌশলের দৃষ্টান্ত হইতে কোন অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। যখন সে সমস্ত কৌশল বাস্তবিক কৌশল কি না তাহা জানি না, তখন তাহাদের রচনাকারী ঈশ্বর-অনুমান অসিদ্ধ।

যদি বল, ঈশ্বর ভাবনা চিন্তা না করিয়া জগৎ-কৌশল বিরচন করিয়াছেন, [তাহা] হইলে বিশ্ব-কৌশল আর এক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইল। ভাবনা চিন্তা-সমুৎপন্ন যাহা তাহাকেই যখন কৌশল বলিয়াছ, তদভাবে যাহা সমুৎপন্ন তাহাকেও কি কৌশল বলিবে? মনুষ্য-কৌশলকে যদি কৌশল বল, তবে জগৎ-কৌশলকে কৌশল বলিতে পার না। অতএব, যাহাকে তুমি জগৎ-কৌশল বলিতেছ, বাস্তবিক তাহা কৌশল নহে। সুতরাং সে কৌশল হইতে এক জন জ্ঞানবান্ পুরুষের অনুমানও সিদ্ধ নহে।

এক্ষণে ঈশ্বরবাদীর যে মূলতর্ক* আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার শেষ তিন বাক্য খণ্ডিত হইতেছে। তাহার দ্বিতীয় বাক্য এই:—

২। কৌশল জ্ঞানের পরিচায়ক॥ এ কথা মানবীয় কৌশল সম্বন্ধে খাটে বটে, কিন্তু জগৎ-কৌশল সম্বন্ধে যে খাটিতে পারে না তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ, জগতে যে কৌশল প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা নিশ্চয় জ্ঞানের পরিচায়ক নহে, এবং তাহা যে বাস্তবিক কৌশল এমত স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। মানব-কৌশলের সহিত জগৎ-কৌশলের কোন সাদৃশ্য নাই। মানব-কৌশল শিল্প, জগৎ-কৌশল শিল্প নহে, তাহা মূল প্রকৃতি। ঈশ্বরবাদীর মূল তর্কের তৃতীয় বাক্য এই:—

৩। জগৎ-কৌশলের কারণ স্বরূপ জগৎ-অতীত এক জন জ্ঞানী পুরুষ অবশ্য আছেন।

মানবীয় কৌশলের সহিত মানবের যে নিত্য সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ জগৎ-কৌশলে খাটিতে পারে না। যেহেতু, মানবীয় কৌশলে কার্য্যের সহিত কারণের যে নিত্য সম্বন্ধ জগৎ-কৌশল ঠিক সেই রূপ কার্য্য নহে। এজন্য, তাহার কারণও অন্যরূপ হইবার সম্ভাবনা। যাহা নির্ম্মাণ-কার্য্যের নিয়ম, তাহা সৃষ্টি

* গত বারের আর্য্যদর্শনে "জগৎ-কৌশল" প্রস্তাবের প্রথম পত্র দেখ।

ব্যাপারে খাটে না। আমরা অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়া মানবীয় কৌশলের সহিত মানবের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছি; কিন্তু আমরা কোন সৃষ্টি-ব্যাপার দর্শন করি নাই যে বলিব, এক জন জ্ঞানী পুরুষ ভিন্ন সৃষ্টি-কৌশল সমুৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ জগৎ পদার্থ নিহিত যে শক্তি রহিয়াছে, যখন সেই শক্তির স্বরূপ আমরা কিছুই জানি না, তখন জগৎ গাত্রে যে কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে সেই কৌশল যে সেই প্রাকৃতিক-শক্তিজাত নহে, এমত প্রমাণিত হয় না। এই কৌশল যে প্রাকৃতিক-শক্তি-জাত, মনুষ্যের চিন্তায় এমত অনুভব হয় না বলিয়াই যে তাহা অসম্ভব এবং অসত্য একথা যুক্তি-সঙ্গত নহে। কারণ, যাহা মানবের পক্ষে অচিন্তনীয়,তাহাই যে অসম্ভব ও অসত্য, একথা মানব অন্যান্য অনুমানে স্বীকার করেন না। এই কৌশল যদি প্রাকৃতিক শক্তি-জাত না হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলেই যে তাহা অপ্রাকৃতিক এবং অলৌকিক শক্তিজাত হইবে, এমত প্রমাণিত হয় না। বরং দ্বৈতবাদী পাকতঃ বলেন যে, জগৎ-কৌশল স্বয়ং সম্ভূত। যেহেতু তিনি বলিলেন যে, এই কৌশল এক জন জ্ঞানী পুরুষ হইতে উৎপন্ন; কিন্তু সেই জ্ঞানী পুরুষ যখন ঈশ্বরবাদীর মতানুসারে স্বয়ংসম্ভূত, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, সেই পুরুষের যে জ্ঞান কৌশলের কারণ, সে জ্ঞানও স্বয়ংসম্ভূত। সুতরাং জগৎ-কৌশল স্বয়ংসম্ভূত জ্ঞানোৎপন্ন। যাহা স্বয়ংসম্ভূত জ্ঞানোৎপন্ন, তাহাকে পাকতঃ স্বয়ংসম্ভূতই বলা হইল। কারণ, ঈশ্বরবাদী এমত প্রমাণ করিতে পারিবেন না যে, যাহাকে তিনি জ্ঞানী পুরুষ বলিতেছেন, তাহা জগৎ-নিহিত শক্তির অতীত এক স্বতন্ত্র শক্তি।

ঈশ্বরবাদীর মূল তর্কের চতুর্থ বাক্য এই যে,

(৪) সেই জ্ঞানী পুরুষই ঈশ্বর। সেই জ্ঞানী পুরুষকে ঈশ্বর বলিলে সে ঈশ্বরের ভাব কেমন পরিমিত এবং সঙ্কীর্ণ হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। ঈশ্বরবাদী কি সেরূপ ঈশ্বর স্বীকার করিতে চাহেন? যদি না স্বীকার করেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে জগৎ-কৌশল হইতে ঈশ্বরানুমান সিদ্ধ হয় না। আর যদি স্বীকার করেন, তবে তাঁহার ঈশ্বরের ভাব অবশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। জগৎ-কৌশল হইতে যে ঈশ্বরের ভাব প্রতিভাত হয়, আমরা সেই ঈশ্বরেরই অনুমান করিয়াছি। ঈশ্বরের ভাব যদি অন্যবিধ হয়, জগৎ-কৌশল তাহা সপ্রমাণ করে না।

আমরা ঈশ্বরবাদীর মূল তর্কের প্রথম বাক্য বরাবর স্বীকার করিয়া লইয়া সেই মূল তর্কের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। সেই মূল তর্কের প্রথম বাক্য এই:—

(১) জগতের সর্ব্বত্র কৌশল বিদ্যমান আছে।

আমরা প্রথমে এই বাক্য বরাবর স্বীকার করিয়া লইয়াছি। তৎপরে জগৎ-কৌশলরূপ স্বীকার্য্য হইতে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। আমাদের সিদ্ধান্ত সকল অবশ্য দ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। সুতরাং আমরা জগৎ-কৌশল স্বীকার করিয়াও দ্বৈতবাদীর অনুমত ঈশ্বরানুমানে উপনীত হইতে পারি নাই। এক্ষণে দ্বৈতবাদীর মূল তর্কের প্রথম বাক্য বিচার্য্য। জগতে যে সর্ব্বত্র কৌশল বিদ্যমান আছে এ কথা কি সত্য? প্রথমে স্বীকার কর, সত্য। তবে ধর, পৃথিবীতে যাহা যাহা ঘটিতেছে, সমুদায়ই কৌশলানুমত। কারণ, এক ঈশ্বরের রাজ্যে সকলই এক কৌশলের নিয়মে চলিতেছে। জড় জগতে যে কৌশলের নিদর্শন, এবং জীবজগতে যে কৌশলের নিদর্শন, ঘটনামণ্ডলেও সেই কৌশলের নিদর্শন। সমগ্র জগৎ এরূপে বিন্যস্ত যে, সমুদায়ই কৌশলের পরিচয় দিতেছে। জড়ের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়, জীবের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়ে কৌশলেরই পরিচয়। যদি সমস্ত প্রাণিদেহ কৌশলানুমত রচিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য দেখিতে হইবে যে সেই সমস্ত প্রাণিদেহের কৌশল কি? গাভীর দেহ এরূপে রচিত যে তাহা প্রতিদিন সহস্র সহস্র তৃণ শস্য সংহার করিয়া আপন জীবন ধারণ করিবে। তদ্রূপ মাংসাশী প্রাণিগণ প্রত্যহ অপর জীব সংহার করিয়া দিনপাত করিবে। যদি প্রাণিদেহে কৌশল থাকে, তবে তাহাদের জীবিকাবলম্বনও কৌশলানুযায়ী হইতেছে। মাংসাশী প্রাণিগণ কত যন্ত্রণা, কত কষ্ট দিয়া প্রাণীশিকার পূর্ব্বক উদরপূর্ত্তি করিতেছে। তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইল, জগতের কৌশলই এইরূপ যে, সেই কৌশল কেবল প্রাণিগণের দুঃখোৎপাদনের জন্যই রচিত হইয়াছে। শুদ্ধ দুঃখ নহে; পীড়ন, অত্যাচার, অপহরণ, অনিষ্টসাধন প্রভৃতিও সেই কৌশলের উদ্দেশ্য। আবার দেখুন, যদি কোন জীবকে রক্ষা করাই তাহার দেহ-কৌশলের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা অপর জীবের জীবিকার স্থানীয় হইয়া কেন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এক প্রকার জীব না জন্মিতে জন্মিতে অন্য জীব আসিয়া তাহাকে সংহার করিতেছে। কেন একের দেহ-কৌশলের প্রয়োজন অন্য জীবের কৌশল দ্বারা ব্যর্থ হইতেছে? তবে অবশ্য বলিতে হইল, যাহা শিকারস্থানীয়, তাহা যে সুরক্ষিত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, এরূপ কৌশলেই সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং তাহাতে কৌশল নাই। কিন্তু সকল জীবই পরস্পর খাদ্য-খাদক-সম্বন্ধে অবস্থিত। সুতরাং কোন্ জীবে কৌশল আছে বলিব এবং কোন্ জীবে নাই

বলিব। তাহা হইলে বলিতে হয়, কোন জীবেই কৌশল নাই।

আবার দেখুন, জগতে অসংখ্য জীব বিকলাঙ্গ অথবা বিশেষ বিশেষ অঙ্গহীন হইয়া জন্মিতেছে এবং অসংখ্য প্রাণী মরিয়া অকালে এমত কি হয়ত জন্মিবা মাত্রেই নিহত হইতেছে, অথবা আপনাপনি পঞ্চত্ব পাইতেছে। যাহা বিকলাঙ্গ অথবা অঙ্গহীন, তাহার দেহের কৌশল কি? এবং যাহা সম্পূর্ণ দেহ লইয়া জীবন সম্ভোগোদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিল, তাহা জন্মিবামাত্র পঞ্চত্ব পাইয়া তাহার জীবনের প্রয়োজন সাধন করিল কই?

আবার যদি ধর, জীবের সুখসাধন এবং স্থিতিই জগৎ-কৌশলের উদ্দেশ্য—তবে যিনি সেই সকল কৌশলের প্রণেতা, সেই ঈশ্বর এত জীবনিগ্রহ কষ্ট ও অনিষ্টসাধনে সুখবোধ কেন করেন? যদি সুখোৎপত্তি করা তাঁহার সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তবে যখন সেই সৃষ্টি হইতে সমূহ দুঃখোৎপত্তি হইতেছে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, হয় জীবের সুখোৎপত্তি-সাধন করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নহে, না হয় তাঁহার কৌশল ব্যর্থ হইতেছে। যখন কৌশল ব্যর্থ হইতেছে, তখন হয় বল, তাহা কৌশল নহে, নতুবা বল, ঈশ্বর সেরূপ ব্যর্থতা নিবারণে অসমর্থ। যদি অসমর্থ, তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর নহেন।

সজীব জগৎ ছাড়িয়া একবার নির্জ্জীব জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যাহার অভিপ্রায় তুমি অবগত আছ, এবং যাহার কার্য্য সেই অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছে, তাহাকেই তুমি অবশ্য কৌশল বলিবে। এই রূপ পদার্থকে যদি তুমি কৌশল বল, তবে কি তুমি সে কৌশল পৃথিবীতে দেখিতে পাও? এই বৃহৎ জগৎ সৃষ্ট হইবার অভিপ্রায় কি? সে অভিপ্রায় যখন তুমি জান না, তখন তুমি কিরূপে বলিতে চাও, এই বিশ্ব, কৌশলের পরিচয় দিতেছে। যদি সমুদয় বিশ্ব কোন কৌশলের পরিচায়ক না হয়, তবে তাহার কোন অংশ কিরূপে কৌশলের পরিচায়ক হইতে পারে? তুমি যখন বলিতে পার না, কোন্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য এই বিশ্বের রচনা হইয়াছে, তখন তুমি কিরূপে বলিতে পার যে বিশ্বমণ্ডলে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহা ঈশ্বরের এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য? কারণ, সমুদায় বিশ্ব যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য রচিত হইয়াছে, তাহার প্রতি ঘটনাও সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে। কিন্তু আমরা যেমন সমুদয় বিশ্বরচনার প্রয়োজন জানি না, তদ্রূপ প্রতি ঘটনারও প্রয়োজন জানি না। তখন কিরূপে বলিতে পার, এই বিশ্বমণ্ডল একটি বৃহৎ কৌশল?

কৌশল দূরে থাক, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেরূপে রচিত রহিয়াছে তাহাতে বরং অমিতব্যয়িতা, অবিবেচনা এবং অকৌশলেরই পরিচয় দেয়। এই সৌরমণ্ডল যেরূপে সংস্থিত তাহাতে সূর্য্য হইতে

গ্রহগণ বহুদূরস্থিত হওয়াতে সূর্য্যের কত তাপ এবং কত আলোকের বৃথা অপব্যয় হইতেছে! এই পৃথিবীর সকল অংশ সমাবস্থ নহে কেন? স্থলবিশেষে পৃথিবীর এত বৈষম্য কেন? কেন শীতমণ্ডল বরফে আবৃত এবং জীবনিবাসের অনুপযোগী, কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডল ফল ফুলে শোভিত এবং জীবনিবাসের উপযোগী? সেই শীতমণ্ডলের ছয় মাস রাত্রে কি কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? এস-কুইমোরা কি তাহাদের দেবতাগণকে মঙ্গলময় বলিয়া পূজা করে? তাহারা কি দেবতাই মানে? ভয়ঙ্কর ঝটিকা এবং জলপ্লাবন, মহামারী এবং আকাল, অগ্ন্যুৎপাত এবং দাহ, যুদ্ধবিগ্রহ এবং দেশব্যাপী পীড়া প্রভৃতির অভিপ্রায় বুঝা বড় সহজ কথা নহে। শত সহস্র কৃষিবলের আশাস্বরূপ ধন-ধান্য-পূর্ণ ক্ষেত্র কেন বহু অসংখ্য পঙ্গপালের ভক্ষ্য হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, অথবা জলপ্লাবনে কিম্বা ঝটিকায় ধ্বংস হইতেছে? কিন্তু অন্য দেশেই বা কেন সেইরূপ অন্য ক্ষেত্র কৃষিজনের আশানুরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে? এই দুই বিপরীত ঘটনা পৃথিবীর কোন্ সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতেছে? যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এক হয়, তবে ঘটনা সকল বিপরীত ফলদায়ী হয় কেন? সর্ব্ব ঘটনা এক উদ্দেশ্য-সাধনে তৎপর হয় কেন? ঈশ্বরের উদ্দেশ্য যদি একমাত্র থাকিত, সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী হইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়মিত হইতেছে না কেন? যদি বল, নিয়মিত হইতেছে, তাহা হইলে তুমি সে উদ্দেশ্য কি বুঝিয়াছ, বল, এবং সেই উদ্দেশ্যানুযায়ী সমুদায় ঘটনার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দেও। না বুঝিয়া থাক, তবে স্বীকার কর, এই পৃথিবী যে কোন অভিপ্রায়-সাধনোপযোগী কৌশলের পরিচয় দিতেছে, অথবা ইহা একটী যন্ত্র মাত্র; এ কথা বলিতে তুমি অধিকারী নহ। তুমি যাহাকে জগৎকৌশল বল, তাহা বৃথা প্রতারণা মাত্র। এ জগতে যখন কৌশলের পরিচয় নাই, তখন অন্য জগতে থাকিবার সম্ভাবনা কি? ইহকালে যখন কৌশলের পরিচয় নাই, পরকালে তখন থাকিবার সম্ভাবনা কি? যদি স্বীকার কর, সকল জগতে এবং সর্ব্বকালে এক ঈশ্বর বর্ত্তমান এবং তিনি যদি অপরিবর্ত্তনীয় ও ন্যায়পরায়ণ সত্য-স্বরূপ হন, তবে তিনি বিভিন্ন জগতে এবং বিভিন্ন কালে বিভিন্নরূপে কেন প্রকাশিত হইবেন? তাঁহার নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান হইবার সম্ভাবনা। তাহা যদি না হয়, তবে সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বকালে এক অপরিবর্ত্তনীয় সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর বর্ত্তমান নাই। তবে এ জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড কেবল গোলযোগ ও বিসম্বাদী ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং ঈশ্বর একটী অলীক শব্দ মাত্র।

বঙ্গীয়-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনোপায়।

আজি কালি এদেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের জীবনোপায় উপার্জ্জন করা সাতিশয় কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছু কাল পরে আরও কঠিনতর হইয়া ক্রমশঃ অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। চিকিৎসা, ওকালতি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যাবসায়ে এত অধিক লোকসমাবেশ হইয়াছে যে, তাহাতে নূতন ব্রতীর কিছু করিয়া উঠা অসম্ভব। কয়েক জন বুদ্ধিমান কৃতবিদ্য যুবকের সহিত লেখকের পরিচয় আছে। তাঁহারা কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন আদালতে প্রায় ২।৩ বৎসর যাবৎ বাহির হইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের গাড়ী ভাড়ার টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন হয় না। মফস্বলে অধিকাংশ বন্ধুরও সেই অবস্থা। চিকিৎসা ব্যবসায়ে আরও অধিকসংখ্যক লোকের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু অবিশ্রান্ত জনসংখ্যাকে উহা চিরকাল প্রতিপালন করিতে পারে না। ইঞ্জিনিয়ার ভায়াদেরও প্রায় আজি কালি চাকুরি ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তাহাও কুপার হিল (Cooper's Hill College) হইয়া মাথা খাইয়াছে। এই গুলি ছাড়া গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ও সওদাগরি আফিসে চাকরি, শিক্ষকতা কার্য্য, সাহিত্য ব্যবসায় প্রভৃতি কতিপয় ব্যবসায় আমা দিগের শিক্ষিত যুবকদিগের আশাস্থল।

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমাদিগের উচ্চ শিক্ষা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্বন্ধে এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে নিম্নে কয়েকটী সংখ্যা উদ্ধৃত করিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তি গণের কত সংখ্যা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাহা পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। সংখ্যাগুলি ১৮৮১ শাল পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

জুডিশিয়াল বিভাগে		২৩০	জন
একজিকিউটিভ	"	৭৮	"
শিক্ষা	"	১৭৩	"
ডাক	"	৯	"
কেরাণী	"	৫০	"
অন্যান্য	"	৩৬	"
	মোট	৫৭৬	জন

কলিকাতার মধ্যে যে কয়েকটী বড় বড় আফিস আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত রূপ উপাধিধারীর সংখ্যা আছে—

	৫০ টাকার বেতনের অধিক কর্ম্মচারীর সংখ্যা।	তন্মধ্যে উপাধিধারীর সংখ্যা।
ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টঃ—		
ফরেন বিভাগ	৩৯—	০
হোম "	২৩—	১
রাজস্ব "	১৬—	১

ফাইনানস্যাল	"	৫৭—	৫
পবলিকওয়ার্ক	"	৩১—	১
লেজিসলেটিব	"	১৯—	০
কণ্ট্রোলার জেনারেলর আফিস	"	৯৮—	৫
সৈনিক আফিফ		৫৫৩—	৩
রেলওয়ে	"	৭০—	০
	মোট	৯০৯—	১৬

বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট:—

সেক্রেটেরিয়াট আফিস ও প্রেস		৯৯—	৯
একৌণ্টাণ্ট জেনারল	"	১৭৬—	১
পবলিকওয়ার্ক	"	৪৮—	১
একজামিনার	"	৬৬—	০
বোর্ড অব রেবিনিউ	"	৮১—	০
শুল্ক বিভাগ	"	৬৫—	০
ছোট আদালত	"	২৫—	০
	মোট	৫৬০—	১২

ডাকবিভাগ।

ডাইরেক্টর জেনেরল আফিস	১৭—	৩
জেনেরেল পোঃ আঃ / ডেড লেটার আঃ	৮৬—	০
পোষ্টমাষ্টার জেনেরল কণ্টোলার আঃ	৯— ১০৪—	০ ৪
মোট	২১৬—	৭

বেঙ্গল হাইকোর্ট	১১৫—	৫
টেলিগ্রাফ আফিস	৫৫—	০
মোট	১৭০—	৫

উপরি লিখিত তালিকা দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে উচ্চ-শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকের মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যকই উচ্চতর রাজ কর্ম্ম পাইয়া থাকেন। রাজকীয় উচ্চ কর্ম্ম সকল আমাদিগের দেশীয় শিক্ষিত লোকের প্রাপ্য, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আজিও তাঁহাদিগকে উহাতে প্রবেশাধিকার দেন নাই। সৈনিক বিভাগ ও নৌবিভাগ আমাদিগের পক্ষে এক বারেই বন্ধ। সুতরাং রাজ-কর্ম্মের যে পথ, আমাদের পক্ষে তাহা অতীব সঙ্কীর্ণ। যদি কখন গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের আন্দোলনে সমুদায় রাজ কর্ম্মের পথ বর্ণনির্বিশেষ সকলের পক্ষে অবাধে উন্মুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য হন, এবং যদি রাজকীয় সমস্ত কর্য্যই শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পূরিত হয়, তথাপি তাহাতে সপ্ত কোটী মানবের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্থান হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মুষ্টিমেয় মাত্র লোক চাকরীর আশা করিতে পারে।—বাকী লোক যায় কোথা? সওদাগরী আফিস, শিক্ষকতা প্রভৃতি অন্যান্য যে সমস্ত উপায় আছে, তাহাও এখনই সাতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা নিবারণ হয় কি রূপে? এই সমস্যার শীঘ্র মীমাংসা আবশ্যক হইতেছে এবং যিনি এই প্রকাণ্ড সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই বঙ্গের যথার্থ বন্ধু।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বর্ণবিভাগ প্রবল ছিল। যে বর্ণের যে ব্যবসায়, সে সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। কুম্ভকারের পুত্রকখন স্বর্ণকারের ব্যবসায় অথবা রজকের পুত্র কখন তন্তুবায়ের ব্যবসায় কিম্বা নাপিতের ব্যবসায় করিত না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এই দুই শ্রেণী উচ্চ শ্রেণী বলিয়া সম্মানিত ছিল; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের যজন যাজন, অধ্যয়ন অধ্যাপনই ব্যবসায় ছিল। কেবল কায়স্থ শ্রেণীই কতকটা স্বাধীন ছিল। তথাপি ইহারা কৃষিকার্য্য বাণিজ্য চাকুরী এবং লেখা পড়া সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য ব্যতীত যে আর কিছু করিত, এমন বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বর্ণবিভাগের এইরূপ বাঁধাবাঁধি বন্দোবস্তের কদাচিৎ অন্যথা হইত। সুতরাং তখনকার সমাজ নিয়ন্ত্রিত ভাবে একরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে চলিত। এক্ষণে সে ভাবের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বিদেশীয় প্রতিযোগিতা কতক শ্রেণীর ব্যবসায় এক বারেই উঠাইয়া দিয়াছে। বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক শিল্পে এবং বৈদেশিক মূলধনে এদেশের শিল্প বাণিজ্যের একবারে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকেরই জীবনোপায় সম্বন্ধে মহা গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। ইহার পর শিক্ষাপ্রণালী আবার দেশের মধ্যে মহা গোলযোগ বাধাইয়াছে। পূর্ব্বে উচ্চ শ্রেণীর অতি স্বল্প সংখ্যক লোকই লেখা পড়া শিখিতে পাইত; কিন্তু এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় কৃষকের কুটীর দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহাদের কথঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে, তাহারা পুত্রবর্গকে সহজে লেখা পড়া হইতে ছাড়ায় না। বিদ্যাশিক্ষার ফল এই, যে যে অবস্থার লোক, সে সেই অবস্থা হইতে উৎকৃষ্টরূপে থাকিতে ও উৎকৃষ্টতর এবং অল্পায়াস-সাধ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়। সুতরাং যাহার যাহা পৈতৃক ব্যবসায়, তাহা আর তাহার ভাল লাগে না। এইরূপ কতকটা বাধ্য হইয়া, কতকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সকলেই উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী হওয়াতেই এই গোলযোগ।

এত গেল শিক্ষিতের পক্ষে কথা। এ ভিন্ন আর এক পক্ষীয় লোক আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতীব বিস্তৃত। ক্রমশঃ আরও বিস্তৃত হইবে। যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা কতক করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষা করিতে পারেন নাই, কতক দূর লেখা পড়া করিতে করিতে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন, এরূপ লোকের উপায় কি? শিক্ষিত লোকের বরং কতকটা আশা আছে; কিন্তু ইহাদিগের আশা কোথায়? শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে ইহাঁরা শিক্ষিত অথবা অভ্যস্ত নহেন, অথচ উচ্চ ব্যবসায়ের জন্য যে শিক্ষা ও বিদ্যার প্রয়োজন, তাহাও ইহাদিগের নাই।

সুতরাং না এ দিক, না ও দিক হইয়া ইহাঁরা বিষম জঞ্জালে পড়েন। কেরাণী বাবু, রেলের বাবু, ট্রামওয়ের বাবু ইত্যাদি বাবু-রূপে ইহাঁরা জীবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। কথঞ্চিৎ মাসে ২০।২৫ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিলে, ইহাঁরা আপনাদিকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এই ২০।২৫ টাকার মধ্যে ইহাদিগের পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ, সন্তানবর্গের বিদ্যাশিক্ষা, এবং অন্যান্য ব্যয় কথঞ্চিৎ কোন রূপে হইয়া উঠা ভার; অথচ এই ২০।২৫ টাকার জন্য ইহাদিগকে জীবের অধম হইয়া চলিতে হয়। যে তেজ, যে নির্ভীকতা, যে স্বাধীনতা, যে উচ্চ আশা পুরুষের লক্ষণ, ইহাঁরা তাহা হইতে একবারেই বঞ্চিত। দারিদ্র্যের পীড়নে, দাসত্বের পেষণে ইহাঁদিগকে মনুষ্যত্ব শূন্য হইয়া সজীব যন্ত্রবৎ চালিত হইতে দেখা যায়।

আমরা জাতীয় অভ্যুদয় লাভের প্রয়াসী; কিন্তু এদিকে দেখিতেছি, জাতীয় অভ্যুন্নতি যাহাদিগের দ্বারা হইবে, সেই শ্রেণীর লোক একবারে দরিদ্র্যের অধস্তন প্রদেশে পতিত হইতেছে। সে শ্রেণীর লোকের উদ্ধার না হইলে জাতীয় অভ্যুদয় কোথায়? "জাতীয় গৌরব" "স্বাধীনতা" বলিয়া যতই কেন গোল করি না, এই শ্রেণীর লোকের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সংসাধিত না হইলে কখনই দেশের মঙ্গল নাই।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় এবং বৈদেশিক মূলধনে এদেশের শিল্প বাণিজ্যের সম্পূর্ণ বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, অতএব অভিনব উন্নত প্রণালী অনুসারে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইবে, তাহার জন্য যে যে উপায়ে মূল ধন সংগ্রহ করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে। যেরূপ বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে, যেরূপ বৃহৎ আকারে কারখানা স্থাপিত করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে। শিল্পের যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী সমস্ত উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে;—তবে যদি দেশের কোন উন্নতি হয়, তাহার আশা করা যাইতে পারে। এ সমস্ত হইয়া উঠা কিছু সময়-সাপেক্ষ; কিন্তু আর একটি বিষয় আছে, যাহা অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং যাহাতে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সেটি

কৃষিকার্য্য।

কৃষিপ্রধান শব্দটি বঙ্গ দেশের প্রতি যতদূর প্রযুজ্য অন্য কোন দেশের প্রতি তত নহে। খনিজ পদার্থ অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় এদেশে অতি সামান্যই আছে। ইহার অতি অল্পাংশ মাত্র সমুদ্রতীরবর্ত্তী, আর যে টুকু সমুদ্র তীরবর্ত্তী, তাহাও বন্দরের অনুপযোগী, সুতরাং সমুদ্র বাণিজ্যের পক্ষে এদেশ

অনেকাংশে নিকৃষ্ট। কিন্তু বিধাতা ইহার গর্ভে যে অনন্ত রত্নরাজি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা আর কাহারও ভাগ্যে লিখেন নাই। এ রত্ন উচ্চ, নীচ, সকল শ্রেণীর লোকেরই অধিগম্য। ঈশপ রচিত একটি গল্প আছে, গল্পটি এই।—এক গৃহস্থের কতকগুলি সন্তান ছিল, গৃহস্থ মৃত্যুকালীন তাহাদিগকে বলিয়া যায় যে সে অমুক ক্ষেত্রে তাহাদের জন্য বিপুল অর্থ পুতিয়া রাখিয়াছে অতএব তাহার মৃত্যু হইলে যেন তাহারা উহা উত্তোলন করিয়া ভাগ করিয়া লয়। ক্ষেত্রের কোন্ স্থানে ধন পোতা আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া না যাওয়াতে তাহারা সমস্ত ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে বাধ্য হইল এবং তৎক্ষণাৎ কোন ধন পাইল না বটে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এত অধিক শস্যোৎপন্ন হইল যে তাহাতেই তাহাদের ধনের আশা পরিতৃপ্ত হইল। গৃহস্থের ন্যায় আমরাও বলি বঙ্গদেশের ইতস্ততঃ বিপুল ধনরাজি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, যে ব্যক্তি আয়াস স্বীকার করিয়া কুড়াইয়া লইতে পারে সে তাহারই হয়।

বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন অবস্থা—সেই সুখের অবস্থা সেই স্বচ্ছন্দের অবস্থা, যাহার জন্য আমরা এক্ষণে লালায়িত—পর্য্যালোচনা করুন। দেখিবেন একখানি গ্রামের মধ্যে কয় ঘর শিল্পজীবী এবং দোকানী পসারী ব্যতীত আর সকলেই কৃষি কার্য্য নিরত। গৃহস্থ পরিবারের সকলেরই কিছু না কিছু চাষ আছে, তাহাতে বাৎসরিক ধান্যের সংস্থান হয়; পুষ্করিণীতে মৎস্য আছে, গৃহে গাভী আছে. আর বাস্তুসংলগ্ন যে বাগান আছে তাহাতে ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য সামগ্রী উৎপন্ন হয়। ইহার উপর যদি কোন পরিবারে নগদ দশটাকা আয় থাকিল ত সে সংসার "রাজার হালে" চলিল। তখন গৃহস্থ কেমন যত্নপূর্ব্বক বাগান করিতেন, কেমন নিজ হস্তে গাছ পুতিতেন, ঘাস নিড়াইতেন, নিজ হস্তে গো সেবা করিতেন, এবং কৃষাণগণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া চাষের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। কৈ তখন ত এত চাকুরীর জন্য হুড়াহুড়ীর প্রয়োজন ছিল না? তখন ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের ১০।১৫ টাকার চাকুরীর প্রার্থী হইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিবার আবশ্যক ছিল না? তখন ত বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের মুখে স্বাস্থ্যভঙ্গ, বিষাদ এবং নৈরাশ্যের রেখা দেখা দেয় নাই? আজি কৃষিকার্য্যের প্রতি উচ্চতর শ্রেণীর লোকের আস্থা নাই—উচ্চতর কেন বলি, উচ্চ, নীচ, কোন শ্রেণীর লোকের তাহাতে আস্থা নাই, কৃষির উন্নতিদিকে লক্ষ্য থাকা দূরে থাকুক, পারত পক্ষে কেহ কৃষি কার্য্য অবলম্বন করিতে চাহে না। আজি কালি লোকের মনে সভ্যতা ও সম্মান বিষয়ক কেমন একটা ভ্রান্ত সংস্কার ও অভিমান জন্মিয়াছে। সে সংস্কার হইতে এদেশের

লোকের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী হইতে সে সংস্কারের উৎপত্তি, এবং সেই সংস্কার ও অভিমান লোকের মনে বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই তাহার উচ্ছেদ করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বঙ্গদেশের ভূমিতে বিপুল ধন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, কুড়াইয়া লইলেই হয়। আরও দেখিলাম বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন স্বচ্ছন্দের অবস্থা কৃষি কর্ম্ম জনিত। অতএব আমরা কৃষিকার্য্যকেই বঙ্গীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অবলম্বনীয় স্বাধীন বৃত্তি বলিয়া অসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি। কৃষি কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিবরণ এবং লাভালাভ ইত্যাদি বিষয়ের কতকটা বিস্তারিত বিবরণ প্রস্তাবান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। আমরা এক্ষণে ঐ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

আমাদিগের দেশে এক্ষণে যাহারা চাষ করে, তাহারা মূর্খতা, দারিদ্র্য এবং হীনাবস্থার জন্য সমাজের নিম্নতম স্থানে পড়িয়া আছে; বাস্তবিক তাহারা সামান্য কুলী ব্যতীত আর কিছুই নহে। বঙ্গের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই বৃহতী শ্রেণীর শিক্ষা—এই বৃহতী শ্রেণীর উন্নতিসাধন না হইলে, বঙ্গের প্রকৃত উন্নতি কখনই হইতে পারে না। এই শ্রেণীর শিক্ষা ও উন্নতির উপায় উদ্ভাবন জন্য দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ এবং উদার গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত উৎসুক ও সচেষ্ট আছেন; এবং এ বিষয় সমাধান করিবার জন্য অনেকে অনেক উপায় নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আমরা বলি যে, শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের কৃষিকর্ম্ম অবলম্বনই, সে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার একটী প্রধান উপায়।

শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিলে দেশের অভ্যন্তর ভাগে ক্রমশঃ যাইবেন। তাঁহারা কৃষিকার্য্যের অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালী সমস্ত অবলম্বন করিবেন এবং বিস্তীর্ণ ভাবে কৃষিকার্য্য করিবেন। তাঁহাদিগের সংস্রবে আসিয়া কৃষিসম্প্রদায়ের শিক্ষা এবং উন্নতির যত সম্ভাবনা, অন্য কিছুতে তত নহে। কৃষক সম্প্রদায়ের এ উন্নতি সামান্য ব্যাপার নহে এবং যিনি এই উন্নতির সহায়তা করেন, তিনি প্রকৃত দেশহিতৈষী শব্দে বাচ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ইংলণ্ডে gentlemen farmer (ভদ্র চাষী) বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছেন। ইহাঁরা সমাজের একটী অতি প্রয়োজনীয় শ্রেণী। ইহাঁরা স্বাধীন ও সমৃদ্ধ; এবং স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির আনুষঙ্গিক সদ্গুণে বিভূষিত। সামাজিক উন্নতি, রাজনৈতিক উন্নতি প্রভৃতিতে ইহাদিগের যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন, সেই সমস্ত উন্নতি সাধন করিবার জন্য তাঁহাদিগের সেইরূপ সময় এবং সামর্থ্যও আছে। ইংলণ্ডে এই ভদ্র চাষীদিগের

সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। বাস্তবিক ইংলণ্ডের যে মধ্যবিত্ত লোক এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাশালী শ্রেণী, এই ভদ্র চাষিগণ তাহার একটি প্রধান অংশ। আমাদিগের দেশে সেরূপ শ্রেণীর লোক এক্ষণে নাই; পূর্ব্বে কতকটা সেরূপ ছিল, তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং এক্ষণে সেই শ্রেণীর লোক প্রস্তুত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের স্থির বিশ্বাস, এক্ষণকার শিক্ষিত লোকদিগের দ্বারাই সে শ্রেণী গঠিত হইবে।

আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপীয় উপনিবেশ সমুদায়ে বহুতর অগাধ ধনশালী কৃষক আছেন ইহাদিগকে চলিত ভাষায় লোকে Farmer Princes অর্থাৎ কৃষকরাজ বলিয়া থাকে। বিস্তৃত কৃষিকর্ম্মেই তাহাদিগের শ্রীলাভ হইয়াছে। এদেশেও চা, নীল, কাফি প্রভৃতি দ্রব্যের চাষ করিয়া ইংরাজেরা বিপুল ধন সঞ্চয় করিতেছে। আর আমরা?—সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভের কর্ম্ম খালি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছি, উমেদারীর জন্য চাটুবাদে জিহ্বাকে কলুষিত করিতেছি, প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য আত্মাকে নীচ হইতে নীচতর করিতেছি, এবং এত করিয়াও দারিদ্র্য ও দুঃখের ভীষণ মূর্ত্তিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিতেছি না; এবং আমাদিগের বর্ত্তমান ব্যবহারে নিরত থাকিলে কখন যে পারিব, তাহার কোনই আশা দেখি না। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিলে দুর্দ্দশা হইবে না ত কি? মাটিতে ধন বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহা কুড়াইয়া লইতে অবহেলা করিলে দুঃখ পাইব না ত কি?

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজসরকারের উচ্চতর কর্ম্ম সকল শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের পাওয়া উচিত এবং গবর্ণমেণ্টকে জাতি ও বর্ণনির্ব্বিশেষে উচ্চতর রাজকার্য্যের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বলি না যে চাকরী শিক্ষিত লোকদিগের অভীপ্সিত হওয়া উচিত। কতক লোকের চাকরী করা অপরিহার্য্য কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই গড্ডলিকা প্রবাহ ন্যায়ে সেই দিকে ধাবিত হইবে কেন?—উচ্চ হইতে উচ্চতর ব্যবসায় থাকিতে নীচ হইতে নীচতর ব্যবসায়ের প্রয়াসী হইয়া অকারণ দাসত্ব শৃঙ্খল পায় পরিব কেন?

কৃষিকার্য্য একটি উচ্চ ব্যবসায়। অগণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। রোমান্ ডিক্‌টেটর সিন্‌সিনেটস্, বীরচূড়ামণি ওয়াশিংটন ও গ্যারিবল্ডি, ইহাঁরা সকলেই কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্গের সে দিন কখনও কি কল্পনায় আইসে, যে দিন কোন বঙ্গীয় মহাপুরুষ সিন্‌সিনেটসের ন্যায় হলত্যাগ করিয়া স্বদেশোদ্ধারোদ্দেশে যাত্রা করিবেন অথবা মহাত্মা ওয়াশিংটন ও

গারিবাল্ডির ন্যায় কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া জন কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত প্রদেশ ব্রহ্মচর্য্য করিবেন এবং স্বহস্ত-রচিত উদ্যানের মধ্যে স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম কালে অসংখ্য জনমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ শুনিয়া স্বর্গের বিমলানন্দ ভোগ করিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্র——

আয়ুর্ব্বেদ ও বঙ্গদেশীয় বৈদ্য।

(৮ম খণ্ডের ৫ম সংখ্যার ২০৯ পৃষ্ঠার পর)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ব্যবসায়াদি বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের অধিকার শাস্ত্রসিদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত কি না, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বমুদ্রিত পত্রিকাতে পঞ্চম দফায় সুশ্রুত ও চরকসংহিতার যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিন উদ্দেশ্য সাধনার্থ আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন ও ব্যবসায় এবং তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

এক্ষণে বিজ্ঞ পাঠকবর্গ এই সমস্ত অনুধাবন পূর্ব্বক বিবেচনা করুন যে, ভৈষজ্যরত্নাবলী পুস্তকের উক্ত,—

"মোহাৎ দ্বিজাতিবর্ণাদৈ্যঃ
পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তীভবেৎ শূদ্রো
জাতিহীনো ভবেৎ দ্বিজঃ॥"

সাধারণতঃ এই শ্লোকের যেরূপ অর্থ প্রস্তাবের প্রথমে লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত অর্থ হইলে, এই ব্যবস্থা কত দূর প্রামাণিক, অথবা আয়ুর্ব্বেদীয় মূল সংহিতা শাস্ত্রের সহিত ইহার সামঞ্জস্য কিরূপ?

অপরন্তু, ইহাও বিবেচ্য যে, আয়ুর্ব্বেদীয় চরকসংহিতা প্রভৃতি প্রধান শাস্ত্র সকলে বৈদ্যশব্দে কেবল অম্বষ্ঠ-নামক জাতিবিশেষকে বুঝায় কি না? অর্থাৎ পূর্ব্বের লিখিত বচনে,

"বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ"

এই বিধান-স্থলে, যে বৈদ্য শব্দ আছে, তাহা কেবল অম্বষ্ঠ জাতির পর্য্যায় কি না?

চরকসংহিতাতে লিখিত আছে যে,

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া (১) জাতিরুচ্যতে।

(১) কলিকাতা-মুদ্রিত চরক-সংহিতা গ্রন্থে, "তৃতীয়া জাতিঃ" স্থলে "দ্বিতীয়া জাতিঃ" এবং "ত্রিজঃ স্মৃতঃ" স্থলে—"দ্বিজঃ স্মৃতঃ"

আপ্লুতে বৈদ্যশব্দং হি ন
বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মতঃ ॥
বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা
সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ
তস্মাৎ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ ॥
নাভিধ্যায়েন্ন চাক্রোশে-
দহিতং ন সমাচরেৎ।
প্রাণাচার্য্যং বুধঃ কশ্চি-
দিচ্ছন্নায়ুরনিত্বরম্ ॥"

—চরক, চিকিসিতস্থান, ১ অ।

অর্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত উপনয়ন ক্রিয়াকে শাস্ত্রে দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তজ্জন্য সেই উপনয়নের পরে ঐ তিন জাতির "দ্বিজ" এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ঐ তিন জাতীয় ব্যক্তি যদি ভিষক্ হয়েন, অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অবলম্বন করেন, তবে সেই আয়ুর্ব্বেদের বিদ্যাসমাপ্তিকে তাঁহাদিগের পক্ষে তৃতীয় জাতি (তৃতীয় জন্ম) বলা যায়। এই নিমিত্ত যে দ্বিজাতি ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদ পাঠ ও তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে বিদ্যাসমাপ্তির জন্য "বৈদ্য" এবং তৃতীয় জাতি (তৃতীয় জন্ম) লাভ করাতে "ত্রিজাতি" বলা যায়। অপরন্তু আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করাতে তাঁহাদিগের মনঃ (সত্ত্ব) তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগের মনের ন্যায় হইয়া উঠে, এই নিমিত্ত তাঁহারা সকলেরই মাননীয় এবং প্রাণাচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়েন। অতএব যে ব্যক্তি আপনার দীর্ঘ আয়ুঃ প্রার্থনা করেন, তিনি উল্লিখিত প্রাণাচার্য্যের বিষয়-সম্পত্তি গ্রহণের বাসনা অথবা তাঁহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ও তাঁহার অহিতাচরণ করিবেন না।

আয়ুর্ব্বেদের প্রধানতর মূলগ্রন্থ চরক-সংহিতাতে বৈদ্য শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে; এতদ্ভিন্ন চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতাতে অম্বষ্ঠ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় অন্যান্য গ্রন্থে যে বৈদ্য শব্দের উল্লেখ আছে, শাস্ত্রীয় মীমাংসার নিয়মানুসারে তাহারও ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, আয়ুর্ব্বেদীয় মূল সংহিতা গ্রন্থে সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তির প্রতি আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও দীর্ঘকাল হইতে এতদ্দেশে অম্বষ্ঠ জাতীয় অধিকাংশ ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন কেন?

এই পাঠ আছে। কিন্তু জল্পকল্পতরু-নামক আধুনিক টীকা সহ মুরসিদাবাদের মুদ্রিত পুস্তকে আমাদিগের লিখিত রূপ পাঠ ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ব্যাখ্যার সকল অংশ আমাদিগের অনুমোদনযোগ্য না হইলেও, যে পাঠ ও ব্যাখ্যা আমাদিগের গ্রহণযোগ্য বোধ হইল, আমরা তাহাই গ্রহণ করিলাম।

আমাদিগের বিবেচনায় এ বিষয়ের যেরূপ সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়, তাহা এই,—

পুরাকালে ব্রাহ্মণজাতীয় মহর্ষি ও ক্ষত্রিয়জাতীয় রাজর্ষিগণ পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আনয়ন, প্রচার, গ্রন্থ রচনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দ্রব্য সকলের গুণাগুণ পরীক্ষা, রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা কার্য্য করিবার পর যখন দেখিলেন যে, এতদ্বিষয়ক তত্ত্ব নির্ণয়ের অধিক অবশিষ্ট নাই, তখন ঈশ্বরের ধ্যান ধারণাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্যে আপনাদিগের অবকাশ গ্রহণার্থ কোনও এক সময়ে (২) ঔষধ দ্রব্য সংগ্রহাদি অধিক পরিশ্রম ও অধিক সময়সাধ্য ব্যাপারের অধিকাংশ ভার অন্য জাতির প্রতি অর্পণ করিয়া অল্প কার্য্যের ভার আপনাদিগের হস্তে রাখেন। সম্ভবতঃ অম্বষ্ঠ নামক জাতির প্রতি এই ভার অর্পিত হইয়া থাকিবে (৩) এবং তৎকালে অথবা তৎপরবর্ত্তী কালে, অম্বষ্ঠ নামক জাতি বৈদ্যপর্য্যায়ে পরিগণিত হয়েন।

কিন্তু এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অল্প স্থানেই হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষে এক্ষণকার ৪০ চল্লিশটী প্রদেশ বা অঞ্চলের মধ্যে বঙ্গ প্রদেশ ব্যতীত অন্য ৩৯ টী প্রদেশে ব্রাহ্মণাদি জাতি চিকিৎসা বিষয়ে বৈদ্যসংজ্ঞাতে অভিহিত হয়েন এবং চিকিৎসাব্যবসায় করেন, আর বৈশ্যজাতীয় (উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যাহাদিগকে বেণিয়া বলে) ব্যক্তিগণ ঔষধ দ্রব্য সংগ্রহ ও বিক্রয়াদি করেন। এই প্রত্যক্ষ উদাহরণ আমাদিগের সিদ্ধান্তের পোষকতা করিতেছে।

পরমধার্ম্মিক আর্য্যজাতির প্রণীত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, বৈশ্য ও শূদ্র—সর্ব্বজাতির প্রতিই সাধারণতঃ ধর্ম্মের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায় করিবার বিধান ও ধর্ম্মহীন চিকিৎসার নিন্দাবাদ-রূপ শাসন-বাক্য রচিত হইয়াছে। যথা,—

"ধর্ম্মার্থং নার্থকামার্থম্
আয়ুর্ব্বেদো মহর্ষিভিঃ।
প্রকাশিতো ধর্ম্মপরৈ-
রিচ্ছদ্ভিঃ স্থানমক্ষয়ম্॥
নার্থার্থং নাপি কামার্থং

(২) সেইকাল নির্ণয় করিবার বিশেষ প্রমাণ অপ্রাপ্য।

(৩) বৈদিক কাল হইতে তৎপরবর্ত্তী কালের সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বর্ত্তমান সময়ের লোকদিগের যেরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহাতে অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে জাতিগত ব্যবসায় ছিল না। কিছুকাল পরে যে জাতি যেরূপ ব্যবসায় করিবার যোগ্য বোধ হইয়াছিল, তাহাদিগকে সেই ব্যবসায়ের ভার দেওয়া হয়; এইরূপ স্থির হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত যদি গ্রাহ্য হয়, তবে ঐরূপ ব্যবস্থার সময়, বোধ হয়, অম্বষ্ঠ জাতিকে এই কার্য্যে অধিক উপযুক্ত বোধ করাতে বঙ্গদেশীয় অম্বষ্ঠ জাতির প্রতি এই কার্য্যের অধিকাংশ ভার প্রদত্ত হইয়া থাকিবে।

অথ ভূতদয়াং প্রতি।
বর্ত্ততে যশ্চিকিৎসায়াং
স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে॥
কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং
চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ং।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং
পাংশুরাশিমুপাসতে॥

—চরক, চিকিৎসিত-স্থান, ১ অ।

অর্থাৎ ধার্ম্মিক মহর্ষিগণ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অবিনশ্বর স্থান অর্থাৎ মুক্তিপদ পাইবার উদ্দেশেই পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করিয়াছেন; অর্থ ও কামের নিমিত্ত নহে। অতএব, যে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী ব্যক্তি অর্থ ও কামের জন্য না করিয়া প্রাণীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশার্থ ব্যবসায় করিবেন, তিনি সকলকে অতিক্রম করিবেন। যে ব্যক্তি চিকিৎসাকার্য্যকে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রয় করিয়া (অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী অর্থ গ্রহণ করিয়া) আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ব্যক্তি সুবর্ণ-রাশি (এস্থলে ধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া পাংশুরাশির (ছাই—এস্থলে অধর্ম্ম) উপাসনা করিতেছে।

কিন্তু মনুষ্যের লোভ, কাম প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল এমনই দুর্দ্ধর্ষ যে, কর্ত্তব্য কার্য্যের বিধান ও অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে দোষশ্রুতি থাকিলেও তাহারা অকর্ত্তব্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় না; ইহা লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রকর্ত্তারা বিধি-শাস্ত্রে প্রবলতর দণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিয়া লোকদিগকে কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত ও অকর্ত্তব্য কার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। (৪)

উল্লিখিত কারণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি দ্বিজাতিগণকে আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায়ে অল্প মনোযোগ ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্যে অধিক নির্ভর করাইবার উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন (৫) পুরাণাদি শাস্ত্রে, "মোহাৎ দ্বিজাতিবর্ণাদৈঃ" ইত্যাদি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। প্রকৃত পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায়ে দ্বিজাতিগণের অধিকার নাই, এ কথা প্রমাণিত করা ঐ বচনের উদ্দেশ্যও নহে, সাধ্যায়ত্তও নহে।

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই, ভৈষজ্যরত্নাবলী সদৃশ সংগ্রহ-পুস্তক সকল সঙ্কলিত হইবার সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদের অধিকার-নির্ণয়-বিষয়ে কুসংস্কার বশতঃ (অথবা স্বার্থপরতা প্রযুক্তই হউক) আপাততঃ ব্রহ্মণাদি জাতির অনধিকার-বাধক বচন গুলি পুস্তক মধ্যে অযথা-স্থানে বিন্যস্ত হওয়াতে বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদের অবনতি হইয়া আসিতেছে এবং এক্ষণেও উন্নতির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে।

(৪) "পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা।"—অর্থ, তিথি-বিশেষে পুঁই শাক ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।

(৫) আর্য্যজাতির প্রধানতম ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ অপেক্ষা পুরাণ ও তদ্বৎ তন্ত্রশাস্ত্র যে আধুনিক, তাহা আর একণে প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই।

অতএব, এতাদৃশ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের আর কুসংস্কার থাকা উচিত নহে। এ বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলে এবং সাধারণে তাহার মীমাংসা হয় এই আমাদের প্রার্থনা। *

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ—২য় খণ্ড; শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত; ৫ নং মুসলমান-পাড়া লেন, বেঙ্গল সুপিরিয়ার যন্ত্র মূল্য ২৸০ টাকা।

ইংরাজী ভাষায় লিখিত লাইব্রেরি অব মেডিসিন (Library of Medicine) নামক প্রকাণ্ড পুস্তকের ন্যায় পুস্তকবলী বাঙ্গালা ভাষায় প্রকটিত হওয়া আবশ্যক, অনেক দিন হইতে আমরা বলিয়া আসিতেছি। বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ সে বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন দেখিয়া, বড়ই সুখী হইলাম। এ কার্য্যের জন্য যথোপযুক্ত সাহায্য করা কর্ত্তব্য। মহেশচন্দ্র বাবু বয়োবৃদ্ধ এবং চিকিৎসাজ্ঞানেও প্রবীণ ও বহুদর্শী ব্যক্তি। বহু কাল যাবৎ রীতিমত এলোপাথি চিকিৎসা করার পর ইনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছেন। প্রায় ১৫ বৎসর হইল, হোমিওপ্যাথি মতে কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। সুতরাং এই কার্য্যেও তাঁহার অভিজ্ঞতা বেশ জন্মিয়াছে।

পুস্তকের ভাষা উত্তম হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস হইতেছে—জনসাধারণ উৎসাহী গ্রন্থকারের উদ্যম দ্বিগুণিত করিতে কথনই ক্রটি করিবেন না।

মীনতত্ত্ব, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত, নববিভাকর যন্ত্র; মূল্য ৷৷০ আনা।

এই পুস্তকের প্রণয়ন জন্য জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে অনেক অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। এ শ্রেণীর গ্রন্থ আর কথন আমরা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। লেখা খুব সহজ। পুস্তকের স্থূল

* প্রস্তাবলেখক এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি। কিছু দিন পূর্ব্বে ইনি শিক্ষাবিভাগের কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন যাইতেছে দেখিয়া, কোনও দেশহিতৈষী ব্যক্তি ইহাঁকে বৈদ্যশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের মত বজায় রাখিতে বলেন। তদবধি ইনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থী হন। কয়েক বৎসর হইল, ইনি পাঠ সমাপন করিয়া কলিকাতার এক জন প্রবীণ বৈদ্যের নিকটে চিকিৎসাপ্রণালী শিক্ষা করিতেছেন। আমরা ইঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি, কঠিন সমস্যার মীমাংসাপারগতা ও সরল প্রণালীতে সংগৃহীত আয়ুর্ব্বেদীয় বিষয় বিভাগ দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়াছি। বঙ্গদেশের মহানুভব ব্যক্তিরা সাহায্য করিলে ইনি প্র্যাকটিস অব মেডিসিন, Practice of Medicine ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বা এনাটমি (Anatomy) সর্জরী (Surgery) ও ঔষধতত্ত্ব (Materia Medica) এই ৪ ভাগে আয়ুর্ব্বেদকে বিভক্ত করিয়া দিতে পারেন। সং।

স্থানে কিছু কিছু অশুদ্ধি, অসম্পূর্ণতা ও অভাবাদি রহিয়া গিয়াছে। সেটী প্রথম প্রয়াস বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে।

রন্ধনার্থ মসলার গুণ, রন্ধনকার্য্য, পাচিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি সুন্দর নিয়মে ও সাধু উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার রন্ধন-সম্বন্ধে আমাদের পুরস্ত্রী-কুলের অনাস্থার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশের এই অংশের অমুন্নতি নিবারণার্থ ভদ্রমহলে যে আবেদন করিয়াছেন, আমাদের সংস্কার, তাহা ব্যর্থ হইবে না। মহিলাজাতি একে তো প্রাকৃতিক নিয়মে দুর্ব্বল। তাহার উপর আবার নির্বীর্য্য সৌখীন বাঙ্গালীর কোমলাঙ্গী নারীগণ তাঁহাদের অন্যান্য দশীয় ভগ্নীগণ অপেক্ষা অধিকতর বলহীনা। মূর্চ্ছাদি রোগ আমাদের দুর্ব্বল স্ত্রীসমাজে ক্রমশঃই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমন অবস্থায় সামান্য পরিশ্রমের কার্য্য রন্ধনে অবহেলা করাতেই অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

৭ম অধ্যায়ের প্রথমে "আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের উপকারিতা" লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ অংশে আমিষ ভোজন শাস্ত্রীয় প্রমাণে নিষিদ্ধ, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ঐ অধ্যায়ের অন্য ভাগে মৎস্য ভক্ষণে শাস্ত্রীয় বিধান ও স্বতন্ত্র করিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয়।

একটী বিষয়ে কিন্তু আমরা গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত "বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" পুস্তকে পদার্থবিদ্যাবেত্তা, রসায়নশাস্ত্রবিৎ ও শারীরবিদ্যাভিজ্ঞ বহুল পণ্ডিতের মত উদ্ধার করিয়া নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত, প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা আমিষ ভক্ষণের যে অপকারিতা প্রতিপাদন করেন, ইনি সেই মতের বিরুদ্ধে অর্থাৎ আমিষ ভক্ষণের সপক্ষে কোন রূপ বৈজ্ঞানিক মত না দিয়া কথায় মাত্র এই বলিয়া সারিয়াছেন যে, "উক্ত নিরামিষ ভোজনের ঔচিত্য বাদ মত খণ্ডন পক্ষে, মত উদ্ধৃত করিয়া যদিও আমিষ ভোজনের হিতকারিতা প্রতিপন্ন করিতে পারি, কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনানুসারে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় এরূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন বিবেচনায় আমিষ ভোজনের পোষক প্রমাণ গুলি উদ্ধার করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বোধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম।"

আমরা জিজ্ঞাসা করি, গ্রন্থকর্ত্তা তবে চরক, মনুসংহিতা, ভবিষ্যপুরাণ, তিথিতত্ত্ব, নারদীয় পুরাণ, আহ্নিক তত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, কূর্ম্ম পুরাণ, ভৈরব তন্ত্র, কাশীখণ্ড, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, আগমসার, দ্রব্যগুণাভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন কেন? মুখে বলিয়া গেলেই তো চুকিয়া যাইত। ২।৪টী পুস্তকে আমিষের স্বপক্ষে মত পাইলেও, আমরা নিজে আমিষভোজী হইলেও,

বৈজ্ঞানিক মত উপেক্ষা করিতে অধিকারী নহি। ফলতঃ, অক্ষয়বাবু যে সকল মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করা না হউক, তদ্বিরুদ্ধে জ্ঞানেন্দ্র বাবু অন্ততঃ ২০টী প্রমাণ দিলেও, তাহা বিচার্য্য বিষয় হইত। গ্রন্থকার অন্যত্র—

"আমিষ-ভোজনে যে সুস্থতা বৃদ্ধি এবং রোগ প্রশমন হয়, তাহার উদাহরণ ভিন্ন দেশীয় গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত না করিয়া এতদ্দেশীয় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের—

'আমিষ আমিষ করি যিনি করিতেন
গোল।
অবশেষে তাঁর পথ্য হলো গুগ্‌লির
ঝোল।'

পদ্য উদ্ধৃত করিয়া" কৃতকার্য্য হন নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা সুরুচির মস্তকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করে। তাঁহার অধিকাংশ কবিতা ব্যঙ্গভাবে রঙ্গ করিবার জন্যই লিখিত হইত। জ্ঞানেন্দ্র বাবু সেই কবিতাকে উদাহরণ-স্থানীয় করিয়া ভাল করেন নাই।

বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বুঝিয়াই "মীনতত্ত্বের" আমাদের এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আমরা ঐরূপ সূক্ষ্মভাবে সন্দর্শন করিয়াও স্থির করিলাম—বাঙ্গালায় এরূপ স্বাধীন ও মহৎ উদ্দেশ্যের পুস্তক হইলেই বঙ্গদেশের আশু শুভ সাধিত হইবে। চিকিৎসাগ্রন্থ, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থাবলী; প্রাণিবৃত্তান্ত, প্রাকৃত ভূগোল, বামাবোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা পুস্তকাদি; এবং কাউণ্ট ডি বফুন, হোট মেকিঞ্জি, গোল্ড্‌স্মিথ্, প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থ হইতে এই "মীনতত্ত্ব" সংগৃহীত হইয়াছে। যে দিনে বঙ্গের অধিকসংখ্যক লোক জ্ঞানেন্দ্র বাবুর দৃষ্টান্তে সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপে বিচরণ করিবেন, সেই দিনে আমাদের মনের ক্ষোভ নিবারিত হইবে।

নীতিকুসুম, ১ম ভাগ. শ্রীভবনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। বসু যন্ত্র, মূল্য ।/০ আনা।

বিদ্যালয়ে সাধু-উদ্দেশ্যপূর্ণ সৎ সাহিত্য প্রচলনার্থ দুই এক জন উৎসাহী ব্যক্তি মনোনিবেশ করিতেছেন বটে, কিন্তু শিক্ষা বিভাগে পাঠ্য পুস্তকের একচেটিয়া উঠিয়া না গেলে আমাদের অভিলাষ সফল হইবার কোন আশা নাই। অনেক জঘন্য পুস্তক কেবল খাতিরেই বিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে। অনেক ভাল ভাল পুস্তকও সময়ে সময়ে শিক্ষা বিভাগের উৎসাহ বিরহে নির্ব্বাচিত হয় না। এমন অবস্থায়, আমরা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে এই অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি যেন, তাঁহারা স্ব স্ব অধীনস্থ বিদ্যালয়ে নীতিকুসুমের ন্যায় পুস্তকের পাঠনা প্রচলিত করেন। ইহার পাঠগুলি সুন্দররূপে, যথাস্থানে এবং যথা নিয়মে সজ্জিত করা হইয়াছে। রচনাটীও বেশ সুখপাঠ্য।

নর-শারীর-বিধান, শ্রীআশুতোষ মিত্র প্রণীত, বীণাযন্ত্র।

বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ যে প্রণালীতে রচিত হইলে, সাধারণ পাঠকের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় এই পুস্তক সেই ধরণে লিখিত হইয়াছে। ইংরাজীতে যেমন Science Primer গ্রন্থাবলী বিজ্ঞানের প্রাঞ্জলতা সম্পাদন করিয়াছে, বাঙ্গালায় আমরা সেইরূপ পুস্তকের অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। এই পুস্তক দ্বারা সেই অসদ্ভাবের কিয়দংশ নিরাকৃত হইয়াছে। এই পুস্তক বিদ্যালয়ের এবং সাধারণ লোকের পাঠ্যস্বরূপে গৃহীত হইলে, বড় সুখের হয়। "অন্যান্য দেশের পণ্ডিতেরা চিকিৎসা-বিদ্যার্থী না হইলেও, জীবতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন; কারণ, এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে, তাঁহার

বিবেচনা করেন, তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না।" এ বাক্যের প্রথম বর্ণের আমরা অনুমোদন করি। ফলতঃ ইহা যে এক খানি সহজ-ভাষা-লিখিত বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, তাহাতে কিছুমাত্রও সংশয় নাই। গ্রন্থকারকে একটা কথা বলিবার আছে। কনিংহাম সাহেবকে উৎসর্গ করা হইয়াছে বলিয়া যেন ইংরাজীতে উৎসর্গ ও বিজ্ঞাপন লেখা হইল। কিন্তু বাঙ্গালায় আর একটী করিয়া ঐরূপ উৎসর্গ ও বিজ্ঞাপন লেখা কর্ত্তব্য ছিল। আর জিজ্ঞাসা করি, আবরণ পত্রটীও আদ্যোপান্ত কেন ইংরাজীতে লিখিয়াছেন? পুস্তক খানি প্রথম দেখিয়াই মনে হইয়াছিল, বুঝি ইহা ইংরাজীতে লিখিত এক খানি Physiology.

মানবতত্ত্ব, শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত; নূতনসংস্কৃত যন্ত্র, মূল্য ১।০ টাকা।

বীরেশ্বর বাবু আর্য্যদর্শনের লেখক হইলেও, তাঁহার ও আমাদের মধ্যে যে মতভেদ নাই, এমন নহে। এই মতভেদ পুস্তকের প্রথমার্দ্ধে বড় নাই; শেষার্দ্ধের অধিকাংশে আমাদের আপত্তি আছে। সভ্যতা, স্ত্রীস্বাধীনতা, অন্তঃপুর, সগোত্র বিবাহ, গান্ধর্ব্ব বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদাদি বিষয়ে আমাদের যেরূপ মত, লেখকের সেরূপ নহে। ইনি গান্ধর্ব্ব ও বিধবা বিবাহের বিরোধী এবং বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী। ইনি বলিয়াছেন "ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, অধিকবয়স্ক পুরুষের ঔরসে অল্পবয়স্কা নারীর গর্ভে জাত সন্তান দুর্ব্বল হয় না।" এই ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের নাম নির্দ্দেশ না করিয়া গ্রন্থকার অন্যায় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের সুশ্রুতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে "২৫ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক পুরুষের ঔরসে ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে প্রায় গর্ভেই মৃত হইবে; কোন স্থলে যদি ঐরূপ ঘটনা না হয়, তবে জন্মিবার পরে অধিক দিন জীবিত থাকিবে না; যদিই বা দৈবাৎ কোন স্থানে জীবিত থাকে, তবে দুর্ব্বল হইয়া জীবিত থাকিবে। অতএব অত্যন্ত বালিকার গর্ভাধান যেন না হয়।" *

বীরেশ্বর বাবু যখন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের মত বলিয়াই নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট আছেন, তখন বিজ্ঞমাত্রকেই সুশ্রুতের এই বচন বলবৎ মানিতে হইতেছে।

প্রথমাংশে লিখিত বিশ্ব, সৃষ্টি, মানব, পূর্ব্ব ও পরকাল, ঈশ্বর, জ্ঞান ও বিশ্বাস, স্বত্ত্বসাম্য ও স্বাধীনতা, শিক্ষা ও শাসন প্রবন্ধগুলি জ্ঞানাঙ্কুর ও আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিলাম।

এই সকল রচনা করিতে বীরেশ্বর বাবুকে চিন্তা করিতে হইয়াছে, পাঠমাত্রেই বুঝা যায়। তাঁহার স্বাধীন মন ও অপ্রতিরুদ্ধ চিন্তার পরিচয় পাইয়া প্রত্যেক পাঠক পুলকিত হইবেন। পুস্তকের ভাষা সরল, মাধুর্য্যাত্মক সুতরাং হৃদ্য হইয়াছে। মুদ্রাকার্য্যেরও কোন ত্রুটি হয় নাই। দুই শতাধিক পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকের ১।০ মূল্য সুলভ, অনায়াসেই বলিতে পারা যায়। অপিচ পুস্তক-প্রতিপাদ্য বিষয় গুলির প্রয়োজনীয়তা হিসাবে গণনা করিলে ঐ মূল্য বঙ্গদেশে পরিশ্রমের অনুরূপ নহে।

কয়েকটী প্রতিদ্বন্দ্বী মত ইহাতে থাকিলেও, ইহা সকলেরই পাঠ করা বিধেয়।

* ঊনষোড়শবর্ষায়াম প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্। যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥ জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

জাতীয় সংস্থান।

সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাসের অমৃতময় ফল "জাতীয় সংস্থান"। যদি কোন কারণেসুরেন্দ্র বাবুর নাম ভারত-বক্ষে চিরঅঙ্কিত থাকে, ত এই "জাতীয় সংস্থানেই" থাকিবে। জাতীয় সংস্থান নূতন কথা নহে বটে, কিন্তু, এ বিস্তৃত ও নূতন আকারে আর কেহ কখন ইহার অবতারণা করেন নাই। ইহাকে এরূপ নিত্য আকার দিতে আর কেহ কখন চেষ্টা করেন নাই। পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে কেহ কৃতকার্য্য হইতেন কি না জানি না। পূর্ব্বে বোধ হয় সময় হয় নাই। কারণ সময় হইলে বোধ হয় চেষ্টাও হইত। সময় উপযুক্ত প্রস্তাবক প্রস্তুত করিয়া লইত। সময় আসিলে লোকের অপ্রতুল হয় না। সকল লোকের মনে যখন একইরূপ ভাবের উদয় হয়, তখনই সময় আসিয়াছে মনে করিতে হইবে। যে সেই ভাব প্রথমে ফুটিয়া বলে, লোকে তাহাকেই নেতা করিয়া লয়। সেই সৎসাহসের উৎসাহ দিবার জন্যই বোধ হয় লোকে এইরূপ করিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবাবিবাহের প্রস্তাব করেন; তখন কৃতবিদ্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই অন্তরে বিধবাবিবাহের আবশ্যকতা ও যৌক্তিকতার ভাব অঙ্কিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহস করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বসমক্ষে সেই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন বলিয়াই সুশিক্ষিত সমাজ আজও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। তিনি বিধবা-বিবাহ বিষয়ে এখন বড় হস্তক্ষেপ করেন না, তথাপি লোকে প্রতি বিধবা-বিবাহের সময়েই তাহার নাম সঙ্কীর্ত্তিত করিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর ও বিধবা-বিবাহ যেন চির-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ।

সেইরূপ জাতীয় সংস্থানের সহিত সুরেন্দ্র বাবুর নাম অচ্ছেদ্য সূত্রে চির-সম্বদ্ধ থাকিবে। বড় বড় বিপদে বড় বড় ভাব মনে উদিত হয়। সুরেন্দ্র বাবু কারাগৃহের লৌহপিঞ্জরে বসিয়া ভারতের ভাবী মঙ্গলের পথ আবিষ্কৃত করিয়াছেন। সমস্ত ভারত একতা-সূত্রে আবদ্ধ না হইলে আর কোন আশা নাই। সে একতার ভাব একদিনে জন্মে না। আমরা সবে ভাই ভাই— কেবল মুখে এই কথা বলিয়া বেড়াইলেও—একতা শিক্ষা হয় না। যতদিন আমরা সেই ভাই ভাই ভাব কার্য্যে পরিণত না করি, ততদিন তাহাতে আমাদের বিশেষ উপকার নাই। সেই ভাই ভাই ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে তাহাকে নিজ নিজ রুধিরে পরিপুষ্ট করিতে হইবে। ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের উপকারার্থ প্রতিদিন প্রত্যেক ভারতবাসীকে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মত্যাগ করিতে হইবে। সমাধি ও

অনুষ্ঠান—ভাবের পুষ্টিসাধনে দুইই অপরিহার্য্য উৎপাদন। 'আমরা সবে ভাই ভাই'—প্রতিদিন এই মন্ত্র জপ করিলেও ফল আছে সত্য, কিন্তু নিত্য অনুষ্ঠান দ্বারা সেই জপের জীবন্ত ভাব দেখাইতে পারিলে তদপেক্ষাও অধিকতর ফল। যিনি উপদেষ্টা তিনিও পূজনীয় সত্য কিন্তু যিনি দৃষ্টান্ত-দর্শয়িতা তিনি অধিকতর পূজনীয়। যে উপদেষ্টা স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম প্রচার করিয়া বেড়ান, তিনিও পূজার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু যিনি স্বজীবনে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, সেই দেবতা অধিকতর পূজার্হ।

এতদিন আমরা স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের প্রচার করিয়া আসিয়াছি মাত্র। এখনও আমরা নিজ নিজ জীবনে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি নাই। অল্পদিনে সে শিক্ষা হয় না। যে জাতি এত কাল পতিত রহিয়াছে, সে জাতিতে আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সহসা আবির্ভূত হইতে পারে না। এতদিনে আমাদের দেশে ভাব-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এখন সেই সকল ভাব কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাসে বিশ্বজনীন সহানুভূতি দ্বারা জানা গিয়াছে, ভাব-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, এবং কার্য্যকাল উপস্থিত হইয়াছে।

কার্য্য করিতে যাইলেই অর্থের আবশ্যকতা। বিপুল অর্থ ব্যতীত বড় বড় কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না। সেই বিপুল অর্থ একদিনেও সংগৃহীত হইতে পারে না। এক জনেও তাহা দিতে পারে না। অসংখ্য লোকে কিছু কিছু করিয়া দিলে অল্পকাল মধ্যে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইবে অথচ কাহারও গাত্রে আঁচ লাগিবে না। যে ভারত পঞ্চবিংশ কোটী মানবের আবাস-ভূমি, তাহার কিসের অভাব? পঞ্চবিংশ কোটী অধিবাসী বৎসরে এক পয়সা করিয়া দিলেও অল্পকাল মধ্যে জাতীয় ধনাগার ধনে পূর্ণ হইবে। আর অতি দীন হীন কাঙ্গালও বৎসরে এক পয়সা দিতে কাতর হইবে না। জাতীয় সংস্থানের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই অর্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে আপনিই আসিবে। সমস্ত ভারতবাসীর অন্তরে এই আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিবার জন্যই কতিপয় রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর এবং এক খানি সুলভ দৈনিক পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন। ভারতসভা অন্যান্য আগড়ম বাগড়ম ছাড়িয়া দিয়া কতিপয় রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর ব্যয়ভার গ্রহণ ও একখানি সুলভ দৈনিক পত্রিকা প্রচার করুন। এই দুই করযন্ত্র দ্বারা ভারত সভার মহৎ উদ্দেশ্য অচিরকাল মধ্যে সংসাধিত হইবে। দানশীলতা ভারতবাসীর চিরলালিত ধর্ম্ম। এমন গৃহ নাই যেখানে প্রতিদিন এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া হয়

না। প্রতিদিন প্রতিগৃহ এক মুষ্টি করিয়া চাউল দিলে, জাতীয় সংস্থান হইতে কয় দিন লাগে? ভারতবাসী ব্যক্তিগত দানশীলতায় চিরাভ্যস্ত। আমাদিগকে কেবল ব্যক্তিগত দানশীলতার কিয়দংশ জাতীয় দানশীলতায় পরিণত করিতে হইবে। সেই প্রকাণ্ড স্রোতস্বিনী হইতে খাল কাটিয়া আমাদিগকে ভারতের নানা স্থানে লইয়া যাইতে হইবে এবং সেই কৃত্রিম সরিতের জলে ভারতের জাতীয় জীবন অভিসিঞ্চিত করিতে হইবে। ইহা অতিমানুষ কার্য্য নহে—তবে বিনা লোকবলে সিদ্ধ হইবার নহে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—ভারতসভা সব ছাড়িয়া কতকগুলি রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর ব্যয়ভার গ্রহণ করুন। ইহাদিগ দ্বারা শুদ্ধ জাতীয় সংস্থান কেন আরও অনেক মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইবে। ইঁহারা ভারতবাসী জনসাধারণের রাজনৈতিক ধর্ম্মের দীক্ষাগুরু হইতে পারিবেন। আপাততঃ প্রতি জেলায় এক জন করিয়া রাজনৈতিক সন্ন্যাসী থাকিলে চলিতে পারিবে। কার্য্যের প্রসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাবাহুল্যের প্রয়োজন হইবে। ইঁহারা প্রতিগ্রামে গিয়া রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, এবং জাতীয় সংস্থানের চাঁদা সংগ্রহ করিবেন। প্রস্তাবিত সুলভ দৈনিক পত্রিকা এই নব ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ সহায়তা করিবে। জেলায় যাহাতে শক্তি-সামঞ্জস্য থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। শাসনকর্ত্তারা শাসিতদিগের প্রতি অবিচার বা অত্যাচার করিলে অমনি তাঁহারা জাতীয় সংবাদপত্রে প্রচার করিবেন, ইহাতে শাসনকর্ত্তাগণের চরিত্র সংশোধন ও জাতীয় সুখ বৃদ্ধি হইবে।

ভারতের দুর্দ্দশার মূল গৃহশত্রু ও আত্মবিচ্ছেদ। ভারতের সম্প্রদায়-বিশেষ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া ইহারই মধ্যে জাতীয় জীবনের এই প্রথম কার্য্যের বিরুদ্ধেই খড়্গ-হস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাছে ভারতসভা প্রজার দুঃখাপনোদনার্থ জাতীয় ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করেন, এই ভয়ে জমিদারগণ জাতীয় সংস্থান প্রতিষ্ঠাপনের উদ্যমকে অঙ্কুরে বিদলিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। তাঁহারা এই কার্য্যের উপযোগী নেতাও পাইয়াছেন। যে মহাপুরুষ জমিদারগণের জন্যে জমিদারেতর সমস্ত ভারতবাসীর পূজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তিনিই এই বিনাশ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার লেখন-চাতুর্য্যের প্রশংসা না করে, এমন লোক নাই। এত জ্ঞান রাশি অল্প লোকেই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সে জ্ঞানরাশি তিনি কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই ব্যয়িত করিয়া থাকেন। জমিদারগণ হইতে তিনি বিবিধ উপকার পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, সুতরাং তিনি তাঁহাদিগেরই স্বার্থসিদ্ধি বা স্বার্থ-

রক্ষার জন্য আপনার বহুকালার্জ্জিত জ্ঞানরাশি ব্যয়িত করিয়া থাকেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগ কৃতজ্ঞতার নিকট পরাস্ত হইয়াছে। জাতীয় সংস্থান বিষয়ে সমস্ত দেশীয় সম্পাদক একদিকে, আর তিনি এক দিকে। এ স্থলে তিনি যে জাতীয় নেতা তাহা আর বলিব কিরূপে? বিরোধী দলের যুক্তি আমাদের নিকট অতি অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন জাতীয় সংস্থানের কোন আবশ্যকতা নাই। যে দেশ কোন বিষয়েই সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে জানে না, সে দেশে সমবেত কার্য্য করণের শিক্ষা অনাবশ্যক এ কথা কেমন করিয়া বলিব? যদি সমবেত কার্য্য করণের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে, ত জাতীয় সংস্থানের অনুষ্ঠানও একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ জাতীয় সংস্থান বিনা কোন সমবেত জাতীয় কার্য্য হইতে পারে না। আর সমবেত কার্য্য ব্যতীতও জাতীয় জীবন দৃঢ় হয় না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা বলেন যে, যখন কোন কাজ উপস্থিত হইবে তখনই টাকা তোলা যাইবে। এখন ত কোন কাজ উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং টাকা তোলার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কাজ করিলেই আছে, আর না করিলে নাই। যে জাতির চতুর্দ্দিকে এত অভাব, সে জাতির করিবার কোনও কাজ নাই এ কথা স্থূলদর্শী অলস ব্যতীত আর কেহ বলিবে না। অদূরদর্শী অলস ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে আগুণ লাগিয়াছে দেখিয়াও বলিবে—যে এখন সুখে নিদ্রা যাই, যখন আমার ঘরে আগুণ লাগিবে তখনই উঠিয়া থামাইবার চেষ্টা করিব। এদিকে ভগবান্ বিশ্বাবন্ধু আসিয়া হয়ত নিদ্রিত মানব সহ সেই গৃহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যাঁহারা অবশ্যম্ভাবী আপদের জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া না থাকে তাহাদের দশা প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ তাঁহারা বলেন যে, জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ জমিলে অনেক সময় অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিবে। এ যুক্তি বরং ব্যক্তিবিষয়ে অধিকতর প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ ব্যক্তিবিশেষ অনিয়ন্ত্রিতভাবে সংগৃহীত অর্থের অপব্যবহার করিতে পারেন কিন্তু জাতীয় ধনের অপব্যবহার করা কাহারও পক্ষে বড় সহজ নহে। আর এক জনের হস্তেই কিছু জাতীয় ভাণ্ডার সমাস্ত হইতেছে না। যাঁহারা ট্রষ্টি হইবেন, তাঁহারা যদি কখন জাতীয় বিশ্বাসের অপব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে জাতি সাধারণ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত করিতে পারেন। জাতিসাধারণের মত না লইয়াই বা কেন তাঁহারা কোন খরচ করিবেন। যদি বল যে জাতিসাধারণও কুপথগামী হইতে পারে, যদি তাহাই হয় তোমার ঠেকাইয়া রাখিবার সাধ্য কি? আর

সে স্থলে ভাল মন্দ নির্ণয় হইবেই বা কিরূপে? তুমি যাহাকে কুপথ বলিতেছ তাহা যে বাস্তবিকই কুপথ—তাহা স্থির করিবে কে? সুতরাং যখন আমরা সম্পত্তি ব্যক্তি-বিশেষের হস্তে দিতে ভীত হই না, তখন জাতীয় নেতৃবৃন্দের হস্তে দিতে ভীত হইব কেন? জাতীয় নেতৃদলে বিশ্বাস না থাকিলে, কখন আমরা একটী জাতিরূপে পরিণত হইতে পারিব না। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হওয়াতেই আমাদের আজ এই দুর্দ্দশা।

চতুর্থতঃ তাঁহারা বলেন যে, জাতীয় ভাণ্ডারে অর্থ থাকিলে জিত ও বিজেত্রী জাতির মধ্যে শান্তি থাকিবে না। বিজেত্রী জাতি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধচিত্তে আমাদিগকে দেখিবেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা শাণিত খড়্গাগ্রে ভারত শাসন করিতে চাহেন, তাঁহারা সন্দিহান হইতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা অকৃত্রিম রাজভক্তিকেই শাসন-সৌধের ভিত্তি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মনে কখন কোন সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। মহামতি লর্ড রীপণের ন্যায় শাসন-কর্ত্তাগণের মনে কখন কোন আশঙ্কার উদয় হইবে না। ভারতবাসী চিরদিন রাজভক্ত, অকৃত্রিম স্নেহ ও অবিচলিত বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতিদান দিতে কখনই পরাঙ্মুখ নহে। বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম অপরাধ বলিয়া মনে করে। লর্ড রীপণের ন্যায় শাসনকর্ত্তা চিরদিন পাইলে জিত-বিজেতৃ-বিদ্বেষ তাহাদিগের মন হইতে এক বারে তিরোহিত হইবে। ভারতপ্রবাসী ইংরাজবর্গের নিকট তাহারা এত যে গালি খাইতেছেন, তথাপি এক লর্ড রীপণের গুণে তাঁহারা অম্লান বদনে সমস্ত সহিতেছেন। এখন ত ভারতবাসীই প্রকৃত রাজভক্ত—লর্ড রীপণের গবর্ণমেণ্টের প্রধান সমর্থক।

যে রাজা প্রজার বিরোধী, তাঁহার সহিতই প্রজার সংঘর্ষ হইতে পারে। যিনি বলেন যে, হাতে টাকা থাকিলেই প্রজারা রাজার সহিত অকারণ বিবাদ করিবে, তাঁহাদের মানবপ্রকৃতির উপর বিশ্বাস নাই। অকারণে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া মানবপ্রকৃতির স্বধর্ম্ম নহে। রাজা প্রজার মঙ্গল কামনায় সতত নিমগ্ন আর প্রজা রাজার সর্ব্বনাশে সতত নিরত—এরূপ ঘটনা ঘটে নাই এবং ঘটিতে পারে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস নাই। তবে রাজার স্বার্থের সহিত যদি প্রজার স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখনই উভয়ে বিবাদ বাদে। রামচন্দ্রের ন্যায় রাজা সে স্থলে আত্মস্বার্থ প্রজাস্বার্থে বলি দিয়া থাকেন। যে রাজা তাহা করিতে পারেন, প্রজাগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। প্রথম চার্লসের ন্যায় রাজা সে স্থলে আত্মস্বার্থে প্রজাস্বার্থ বলি দিতে চেষ্টা করেন। যদি তিনি কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা হইলে প্রজার দুঃখের আর সীমা রহিল না। প্রজা যখন দুর্ব্বল থাকে, তখন রাজাই

প্রজাকে প্রদমিত করিয়া রাখেন। যেখানে হ্যাম্‌ডেনের ন্যায় প্রজা থাকে, সেখানে প্রজায় রাজাকে দমিত করিয়া রাখে। রাজায় প্রজায় ক্রমিক এইরূপ সংঘর্ষ হওয়াতেই ইংলণ্ডের আজ এত সৌভাগ্য। যদি ইংলণ্ডীয় রাজবৃন্দ প্রজাবৃন্দকে চিরকাল দমিত করিয়া রাখিতেন তাহা হইলে আজ ইংরেজের এত প্রাদুর্ভাব হইত না। যখন প্রজাসাধারণের রাজ্যের শাসনকার্য্যে মমত্ব থাকে, তখনই রাজ্যের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। যখন শাসিতে ও শাসনকর্ত্তায় সহানুভূতির অভাব হয়, তখনই রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। কারণ প্রজাসাধারণ রাজ্যরক্ষা না করিলে তাহা অচিরকাল মধ্যে শত্রুকবলে পতিত হয়। হিন্দুরাজত্বের পতনের মূল প্রজাসাধারণের শাসনকর্ত্তাগণের সহিত সহানুভূতির অভাব। মুষলমান রাজত্বের পতনের মূল প্রজাসাধারণের সহিত শাসনকর্ত্তাগণের বৈরভাব। ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণের প্রতি এখনও প্রজাসাধারণের বিশ্বাস আছে বলিয়াই এখনও ইংরাজরাজত্ব অটুট রহিয়াছে। যদি কখন জাতিসাধারণের মন হইতে সে বিশ্বাস চলিয়া যায়, তখন কোটী কোটী বেয়নেটেও সে রাজত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না। আর যতদিন সে বিশ্বাস থাকিবে, ততদিন ভারত শাসনের জন্য বেয়নেটেরও প্রয়োজন নাই। গভীর রাজনীতিজ্ঞ লর্ড রিপণ এই গূঢ়তত্ব বুঝিয়াছেন বলিয়াই তিনি প্রতি ভারতবাসীর হৃদয়-রাজ্যে এতদূর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। তাই বলিতেছি, যতদিন রাজা প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী থাকিবেন, ততদিন প্রজা তাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিবে যদি রাজা কখন সেই রাজধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বৈধ আন্দোলনের প্রয়োজন। আমাদিগকে সে আন্দোলন এখানে ও বিলাতে উভয় স্থানেই করিতে হইবে। ইহা বহু ব্যয়-সাধ্য। সুতরাং এরূপ ভবিষ্য বিপদের জন্য আমাদের জাতীয় সংস্থান একান্ত প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন এমন অনেক সৎকার্য্য আছে, যাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রজার সাহায্য-সাপেক্ষ হইতে পারেন। সে সকল স্থলেও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ জাতীয় ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে। জাতীয় শিক্ষাবিধান, জাতীয় স্বাস্থ্যবর্দ্ধন, জাতীয় শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন জাতীয় কৃষিবিদ্যার উন্নতি বিধান, শত্রুর আক্রমণ নিবারণ প্রভৃতি অসংখ্য হিতকর কার্য্যে জাতীয় ভাণ্ডার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিতে পারে। প্রজাসাধারণের সহানুভূতি পাইলে গবর্ণমেণ্ট দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত কত মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

আর এক আপত্তি এই যে, প্রাদেশিক কার্য্যের জন্য জাতি সাধারণের

নিকট চাঁদা সংগ্রহ করা অনুচিত। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভারতসভা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই জাতীয় অর্থ কখন প্রাদেশিক কার্য্যে ব্যয়িত হইবে না। যে সকল কার্য্যে, জাতিসাধারণের স্বার্থ, জাতীয় অর্থ কেবল তাহাতেই ব্যয়িত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাদেশিক সংস্থান দ্বারা প্রাদেশিক অভাব মোচন হইলেই, প্রকারান্তরে জাতীয় অভাব মোচন হইবে। এরূপ আপত্তি নিতান্ত অসার, কারণ সমস্ত ভারতবাসীকে একতাসূত্রে সম্বদ্ধ করিতে হইলে, সমবেত কার্য্যের প্রয়োজন। মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে না শিখিলেও, পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ জন্মিবে না। সমস্ত ভারতবাসীর যে এক স্বার্থ—কার্য্য দ্বারা তাহা না দেখাইলে একতাবন্ধন দৃঢ়ীভূত হইবে না। আর এমন অনেক কাজ আছে, যাহাতে জাতীয় সমবেত উদ্যম প্রয়োজনীয়। প্রাদেশিক সভা ও প্রাদেশিক সংস্থান দ্বারা তাহা সংসাধিত হইতে পারে না। জাতীয় সভা ও জাতীয় সংস্থানের প্রাদেশিক শাখা সংস্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় তরু অগ্রে রোপিত করা চাই। তাহাকে অভিষিঞ্চিত করিলে—তাহার পুষ্টিসাধন করিলে—সেই তরু হইতেই শাখা প্রশাখা আপনিই বাহির হইবে। যাঁহারা সেই মূল তরুকে অঙ্কুরে বিদলিত করিতে চান, তাঁহাদিগকে আমরা আত্মঘাতী বলিব।

ভ্রাতৃগণ! এখন বিবাদের সময় নয়। আমাদিগকে শ্রেণীগত বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই প্রকাণ্ড জাতীয় ভাবে আত্ম-আহুতি প্রদান করিতে হইবে। নিজ স্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলি দিতে হইবে, নিজ সুখ জাতিসাধারণের সুখে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রজা স্বার্থে রাজস্বার্থ বলিদান দেওয়াই প্রকৃত রাজধর্ম্ম শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র-প্রমুখ রাজবৃন্দ সেই প্রকাণ্ড নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হইয়া আজ তোমরা সে রাজধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেছ কেন? আর্য্যসন্তান হইয়া আর্য্যধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছ কেন? সন্তানের ন্যায় প্রজাগণকে স্নেহ কর, প্রজাগণও তোমাদিগকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিবে। স্নেহ নিম্নগামী। অগ্রে তোমাকে স্নেহ দেখাইতে হইবে, তবে ভক্তি পাইবে। যদি বড় হইতে যাও, তোমাকে অগ্রে নামিতে হইবে। যে আপনা হইতে উচ্চ আসনে গিয়া বসে সে বড়লোক নহে, কিন্তু যাঁহাকে জাতিসাধারণ উচ্চ আসন দেয়, তিনিই প্রকৃত বড় লোক। জাতিসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উচ্চ আসন গ্রহণ করিলে জাতিসাধারণ তোমাদিগকে নামাইবে। সে সংঘর্ষে জাতিসাধারণের জয় হইবে। সে প্রচণ্ড পবনের সম্মুখে দুই চারি শত জমিদার তৃণের ন্যায় উড়িয়া যাইবে।

ফরাশিবিপ্লবের সময় ফরাশি জমিদারগণ এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়ায়, তাঁহারা জাতীয় দেবতার নিকট বলি পড়িয়া ছিলেন। তাই বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ! জাতিসাধাররণের ইচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত করিও না। এবং জাতীয় সঞ্জীবনের দিন দূর-বিপ্রকৃষ্ট করিও না। জানিও, এ সংঘর্ষে তোমরাই মরিবে—জাতিসাধারণ মরিবে না। তবে জাতীয় সঞ্জীবনের দিন বিলম্বিত হইবে মাত্র। এ আত্ম-ধ্বংসে—এ জাতীয় অনিষ্ট-সাধনে—তোমাদের কি লাভ—কি সুখ?

তাই বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ! শ্রেণীগত বিদ্বেষ ভুলিয়া এই মহৎ জাতীয় কার্য্যে যোগ দান কর। জানিও,জাতিসাধারণের সহানুভূতি থাকিলে, কেহ তোমাদিগের কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না। তোমাদিগের মহত্ত্ব দেখিলে প্রজাগণ আপনা হইতেই তোমাদিগের পূজা করিবে। জানিও, মহত্ত্বের পূজা জগৎ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, এবং কখন বিলুপ্তও হইতে পারে না।

শ্রী ক, বি,

যোগ।

হিন্দুধর্ম্ম প্রমাণার্থে আর্য্যদর্শন পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে লেখা গিয়াছিল, এক্ষণে ভবিষ্যৎ প্রমাণার্থ—হিন্দুদিগের ভবিষ্য পুরাণের কতিপয় দৃষ্টান্ত-ঘটিত প্রবন্ধ লেখা যাইতেছে। পাঠক মহাশয় এই প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের ক্ষমতা ও সত্যতা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের সপ্তশতী চণ্ডিকায় কথিত হইয়াছে,—

> বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে
> অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
> নন্দগোপগৃহে জাতা
> যশোদা কুক্ষিসম্ভবা॥

শুম্ভনিশুম্ভ বধান্তে দেবতাগণ মন প্রাণ ঐক্য করিয়া দেবীর স্তব করিলে ভগবতী দুর্গা দেবতাদিগের উপর পরিতুষ্ট হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন,—"আমি বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি *যুগে তোমাদিগের হিতার্থে নন্দগোপ*-গৃহে যশোদার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিব।" এই বাক্য যখন বলা হয়, তখন বৈবস্বত মন্বন্তর হয় নাই। তৎকালে অন্য মন্বন্তর চলিতেছিল। পরে বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের ঠিক অষ্টাবিংশতি যুগের সন্ধিস্থলে যখন বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ পৃথিবীর ভার হরণার্থ মথুরায় বসুদেব-গৃহে দৈবকী দেবীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন তৎকালে ভগবতী দুর্গা বসুদেবের সাহায্যার্থ যোগমায়া-রূপে যশোদার গর্ভে প্রবেশ

করত গোকুলে ভূমিষ্ঠ হন। সেই যোগমায়া পৃথিবী নিরুপদ্রব হইলে, বিন্ধ্যাচল-শিখর-দেশে বাস করেন।

এতদ্ভিন্ন অযোধ্যাধিপতি মহাত্মা রামচন্দ্র জন্মিবার দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহামুনি বাল্মীকি, রামায়ণ অর্থাৎ রাম-লীলা প্রকাশ করায় তৎপরে বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রথম দিব্য যুগের ত্রেতাবসান-সন্ধিস্থলে ভূতভাবন ভগবান্ শ্রীরাম নামে অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের আত্মজ-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্মীকি মুনির ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়া তন্মর্য্যাদা রক্ষা পায়। উক্ত মুনির স্বরচিত রামায়ণে যাহা বর্ণিত হইয়াছিল, শ্রীরামচন্দ্র তৎসমুদায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন; তাহাতে বিন্দুমাত্র অন্যথা হয় নাই।

সাবর্ণি মন্বন্তরে দেবীযুদ্ধ হয়। মন্বন্তর সংখ্যায় সাবর্ণি মন্বন্তর অষ্টম মন্বন্তর। বৈবস্বত মন্বন্তর সপ্তম মন্বন্তর। মোটে চতুর্দ্দশটি মনন্তর। এক এক মনন্তর ৭২ যুগে পর্য্যবসিত হয়। ৮৬৮ যুগে এক কল্প হয়।*।

দেবীবাক্যও বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি যুগে সফল হওয়ায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের বৃত্তান্ত প্রমাণিত হয়। যত দিন যশোদাগর্ভে ভগবতীর জন্ম পরিগ্রহ না হইয়াছিল, তত দিন বোধ হয়, দেবীবাক্যানুযায়ী কার্য্য না হওয়ায়, মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রতি বিশ্বাস জন্মে নাই।

* হরিবংশ, ৭ম অধ্যায় দেখ।

অতঃপর মহামুনি ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্বাক্যের কতিপয় উদাহরণ দেখান যাইতেছেঃ—

বর্ণাশ্রমাচাররহিতঃ প্রবৃত্তির্ন কলৌ যুগে।

কলিযুগে ভারতবাসী হিন্দুরা যে যে বর্ণ ও যে যে আশ্রমে থাকিবে, তাহাদিগের বেদ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত আচার ব্যবহারে বিরাগ জন্মাইবে। ইহা বর্ত্তমান শতাব্দায় সপ্রমাণ হইতেছে। ইহা ভিন্ন আবো বলিয়াছেন—

অন্নানাং নিয়মো নাস্তি
যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ।

এই বর্ত্তমান কলিযুগে আর্য্যজাতির অন্ন ও যোনি বিচার একেবারে থাকিবে না। তাহারা পশু-ধর্ম্মী হইবে। ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদব্যাস এই সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন। এখন ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের আর্য্যসন্তানগণের যে প্রকার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাহাতে অন্ন আর যোনীবিচার বিরল হইতেছে।

ধর্ম্মং বক্ষ্যন্তি ধর্ম্মজ্ঞা
অধিরুহ্যোত্তমাসনং।
কেচিদ্বেদং বিনিন্দন্তি
পুরাণমপরে জনাঃ।
সর্ব্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি
সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয়!
শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥

কলির বল প্রবল হইলে, কস্মিন্ কালেও যাহারা দেববিহিত ধর্ম্মের মর্ম্ম

জাত নন, তাঁহারাই ধর্ম্মাসনে অধিরোহণ করিবেন। আর কেহ কেহ বেদ ও কেহ কেহ পুরাণ শাস্ত্র সকলের নিন্দা করিবে। আর সকলের মুখেই ব্রহ্ম মন্ত্র ওঁকার উচ্চারিত হইবে। তাহাতে অধিকারীর নিয়ম থাকবে না। অপিচ তাবতেই কেবল শিশ্নোদর-পরায়ণ হইবে। এই যে ভবিষ্য বাক্য, ইহা বর্ত্তমান সময়ে যেমন সফল হইতেছে, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এত সুফলপ্রদ হয় নাই।—যেরূপ কালের গতি দেখা যাইতেছে, আর ১০।২০ বৎসর মধ্যেই অন্যান্য ভবিষ্য বাক্য সফল হইবে।

ভারতবর্ষের ধর্ম্মাসনে চিরকাল বৈদিক-ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অধিরোহণ করিয়া আসিতে ছিলেন। ভবিষ্য বাক্যের প্রভাবে সেই আসনে যবন ও ম্লেচ্ছগণ অধিরোহণ করত আর্য্য ধর্ম্ম কর্ম্মের বিচার করিতেছে। ইহাতে কি মুনি-বাক্য সপ্রমাণ হয় না? অনার্য্য যবন ও ম্লেচ্ছ জাতি ভারতের ধর্ম্মাসন গ্রহণ করিবেন, এ কথা ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।

বেদব্যাসের অপর ভবিষ্যদ্বাক্য এই যে, ভূতনাথ ভগবান্ ভবানীপতি দেবদেব মহাদেব ধর্ম্মসংস্থাপন ও আত্মতত্ত্বজ্ঞান-প্রচারার্থ কলিযুগে শঙ্করাচার্য্য-রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীমন্নারায়ণের অংশে বিষ্ণুস্বামী নামক পরিব্রাজক জন্মিবেন। ৮৯০ বৎসর অতীত হইল, ঐ ব্যক্তিদ্বয় জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভবিষ্যদ্বাক্য সফল করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ব্যাসবাক্য কূর্ম্ম পুরাণে প্রকাশিত আছে।

হরিবংশের ভবিষ্য পর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে,

> গতে পঞ্চসহস্রাব্দে
> কিঞ্চিন্ন্যূনে দ্বিজর্ষভ!।
> ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেতবর্ণা
> ধরাং ভোক্ষ্যন্তি বীর্য্যতঃ॥

ইহার অর্থ এই যে, কলিযুগের কিঞ্চিদূন পাঁচ হাজার বৎসর হইলে, ম্লেচ্ছ সেনাপতি শুক্লবর্ণ ম্লেচ্ছরাজা সমুদয় ভারতবর্ষ নিজ বিক্রমে ভোগ করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাক্য বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণরূপে সফল হইতেছে। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ঘটনা যে ভারতে ঘটিবে, তাহা কেহই বলিতে বা বুঝিতে পারে নাই। এখন সকলে দেখিতেছেন যে, অতি দূরদেশবাসী শ্বেতবর্ণ বিক্রমশালী রাজপুরুষরা অবলীলাক্রমে ভারতভোগ করিতেছেন। ইহাতে কি ভবিষ্যদ্বাক্য প্রমাণিত হইতেছে না?

> কেচিদ্ধর্ম্মং বিনিন্দন্তি
> বেদোক্তমপরে জনাঃ।
> ব্রতোপবাসরহিতাঃ
> সুরাপা ব্রহ্মবাদিনঃ॥

হরিবংশ, ভবিষ্যপুরাণ।

কলিযুগে ভারতীয় আর্য্য সকলের মধ্যে কতকগুলি লোক শ্রুতি, স্মৃতি,

পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সকলের এবং আর কতক গুলি লোক বৈদিক ধর্ম্মের নিন্দা-করত ব্রতোপবাস পরিত্যাগ করিবে। আর আর্য্য সন্তানগণ অবৈধরূপে ব্রহ্মো-পাসনা করিয়া লোকসমাজে ব্রহ্মবাদী হইয়া সুরাসেবা করিতে ত্রুটি করিবে না। এই ভবিষ্য বাণী কি সফল হইতে বাকী আছে? এতদ্ভিন্ন ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে যে—

অজাশ্চৈবোপদুহ্যন্তি
গবাঞ্চৈব পরিক্ষয়ং।
গোমাংসভোজিনো বিপ্রাঃ
ধর্ম্মচিহ্নবিবর্জ্জিতাঃ॥

কলি প্রবল হইলে, ভারতে এত গো-হত্যা হইবে যে, গাভীর অভাবে ছাগী পোষিত হইয়া তাহাকেই দোহন করিতে হইবে। গাভীদুগ্ধ প্রায় থাকিবে না। যে কিছু থাকিবে, তাহা সামান্য ধন-শালীর দুষ্প্রাপ্য হইবে। আর ব্রাহ্মণ-গণ অম্লান বদনে গোমাংস ভক্ষণ করিবে এবং ধর্ম্মচিহ্ন শিখা ও যজ্ঞোপবীত পরি-ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। পাঠক মহাশয়! ত্রিকালজ্ঞ মহাযোগী পরাশর-নন্দন ব্যাসদেবের এ সকল বাক্য সফল হইতেছে কি না দেখিতেছেন না? অতঃপর অধ্যাত্ম রামায়ণের আদি-কাণ্ডে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে কলিযুগসম্বন্ধে কতিপয় ভবি-ষ্যদ্বাক্য লেখা যাইতেছে। যথা—

প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে
নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে
সত্যবার্ত্তাবিবর্জ্জিতাঃ॥

ঘোর কলিযুগে অর্থাৎ কলিযুগ হওয়ায় কিছু কম পাঁচ হাজার বৎসর হইতে ভারতীয় আর্য্য সন্তানেরা পুণ্য পরিশূন্য হইয়া কেবল পাপাচারী ও সত্যধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইবে।

পরাপবাদনিরতাঃ
পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ।
পরস্ত্রী-সক্তমনসঃ
পরহিংসাপরায়ণাঃ॥ ১০।

উক্ত সময় হইতে অধিকাংশ হিন্দু-জাতি পরনিন্দা করিতে কাতর বা কুণ্ঠিত হইবে না। এতদ্ভিন্ন পরদ্রব্যে সর্ব্বদা অভিলাষী ও পরস্ত্রীতে আসক্ত হইবে; পরের হিংসা করিতে উৎসাহী হইবে। এই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইতে কিছু মাত্র বাকী নাই, ইহ সকলেই স্বীকার করিবেন।

দেহাত্মদৃষ্টয়ো মূঢ়াঃ
নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
মাতৃপিতৃকৃতদ্বেষাঃ
স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ॥ ১১॥
বিপ্রাঃ লোভগ্রহগ্রস্তা
বেদবিক্রয়জীবিনঃ।
ধনার্জ্জনার্থমভ্যস্ত-
বিদ্যামদবিমোহিতাঃ॥ ১২।

নারদ বলিতেছেন, পিতঃ! কলি যুগে লোক সকল এমনই পশুবুদ্ধি-সম্পন্ন হইবে যে, পশুরা যেমন আপন দেহ ভিন্ন আত্মাকে জানিতে পারে না,

তদ্রূপ মানব সকল আপন আপন দেহকে আত্ম জ্ঞান করিবে। আর বেদ, পুরাণ, তন্ত্রাদি শাস্ত্র সকল বিশেষরূপে জানিতে না পারায়, নিতান্ত মূঢ় ও নাস্তিক হইবে এবং পিতা মাতাকে দ্বেষ করত আপন স্ত্রীকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহারই আজ্ঞাবহ, সুতরাং কাম-কিঙ্কর হইবে। ব্রাহ্মণগণ নিতান্তই লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইবে, বেদ বিক্রয় করিবে; আর অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাহাতেই বিমোহিত হইয়া সকলের নিকটে গর্ব্ব করিবে। এতদ্ভিন্ন আরো ভবিষ্যদ্বাক্য যাহা আছে, তৎসমুদয় প্রস্তাব বাহুল্য-ভয়ে লেখা গেল না। যাহা লেখা হইল তাহাতেই যথেষ্ট জ্ঞান হইবে। লিখিত ভবিষ্যদ্বাক্য গুলি যদি সফল হইতে পারিল, তবে কেনই বা যোগ-শাস্ত্রলিখিত বিষয়গুলি সফল হইবে না? যাঁহারা যোগশাস্ত্র-প্রণেতা, তাঁহারই ভবিষ্যদ্বাক্যপ্রচারক ও রচয়িতা।

দেবতা এবং ঋষিতে ভ্রম প্রমাদাদি দোষ নাই; অথচ সত্যবক্তা হেতু সকল জীব অপেক্ষা উহাঁরা তাবৎ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এ জন্য প্রাচীন সমীচীন আর্য্যেরা উহঁ দিগের নির্দ্ধারিত ঐহিক পারত্রিক নিয়ম সকল পালন করিতেন; তাহাতে সুখ বৈ কেহই দুঃখ পান নাই।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

মুসলমান ও ইংরাজ-রাজত্ব।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ ভারতের অধঃপতনের মূল। মুসলমান-রাজত্ব হইতেই সোপান-পরম্পরায় ভারতের অধোগতি আরম্ভ হইয়াছে। রণোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া যখন ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী যবনগণ ধর্ম্মের আশ্রয়ে নির্ব্বিরোধে ও নির্ভীক চিত্তে আপনাদের জয়স্তম্ভ দেশে দেশে নিখাত করিতে আরম্ভ করিল ও পরিশেষে ভারতের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইল, সেই দিন হইতেই ভারতের সৌভাগ্যগগনে একটী ক্ষুদ্র মেঘের আবির্ভাব। এই মেঘ তিল তিল বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ভারত আচ্ছন্ন করিল। ইহার বিষময় ফল 'ভারতের স্বাধীনতা লোপ,' 'ভারত রমণীগণের অবরোধে রক্ষা,' 'হিন্দুশাস্ত্র কলাপে উপেক্ষা ও অধিকাংশেরই নাশ'। মহম্মদের অনুচরগণের দ্বারা আমরা যে কিছু মাত্রই উপকৃত হই নাই, এমত বলি না; কিন্তু তাঁহাদের হস্তে উপকারের ভাগ অপেক্ষা অপকারের ভাগই অধিক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যদিও আকবর প্রভৃতি মনীষিগণ হিন্দুদিগকে উচ্চ-পদাভিষিক্ত করিয়া সাধ্যমতে তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্বে বদ্ধ হইতে এক প্রকার কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি

হিন্দুদিগের জন্য তিনি এমত কিছুই করিয়া যান নাই; যাহা তাঁহাদের স্থায়ী সুখের নিদানভূত। মুসলমান-দিগের মধ্যে আকবরের ন্যায় বিবেচক ও পরিণামদর্শী সম্রাট আর কয় জন ভারতের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন? কিন্তু আকবরও নিষ্কলঙ্ক নহেন। নরোজা স্মরণ করিলে কোন্ হিন্দুচিত্ত ক্রোধে ও মনোদুঃখে উত্তেজিত না হয়? কোন-হিন্দু ধমনী-মধ্যে রক্ত খরতর বেগে বাহিত না হয়? পৃথ্বীরাজ পত্নী ধন্য। তোমার যশঃ ও সতীত্ব চিরদিন ইহলোকে ও পরলোকে গীত হউক। এই ত আকবর! আবার তাঁহার পর যাঁহারা ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মীর পথ-প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে দুঃখে ও ক্ষোভে আমাদের মন জর্জরিত হয়। ঘোর অত্যাচার, শঠতা, কপটতা, লম্পটতা, তোষামোদ-প্রিয়তা ও বিলাসপ্রিয়তা ইত্যাদি অপগুণ সকল তাঁহাদের অঙ্গের অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়াছিল। ধর্ম্মচর্চ্চা ও বিদ্যাচর্চ্চা রাজভবন হইতে বিদূরিত হইয়া নির্জ্জনতার পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহাদের রাজত্বকালে মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিস্তার ও পারসিক ভাষার উন্নতি কিছু-মাত্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কিয়ৎ পরিমাণেও ভারতবাসী হিন্দুদিগের পক্ষে শুভফলদায়ক না হইয়া বরং তাঁহাদের অমঙ্গলের নিদান হইয়াছিল। রাজদরবারে সম্মানের নিমিত্ত অনেকেই স্ব স্ব ভাষা এবং এমন কি, ধর্ম্ম পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং হিন্দুরাজত্ব-কালে সংস্কৃত ভাষার ও প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের যে ক্রমিক উন্নতি হইয়া আসিতেছিল, সেই উন্নতির বেগ সহসা এই সময়েই নিস্তেজ হইয়া পড়িল। হিন্দু-সমাজ নিশ্চল হইল। হিন্দুজাতির কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক যে কিছু উন্নতি পরিদৃশ্যমান ছিল, তাহা যবন-কুঠারাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কেবল মাত্র কঙ্কালে পরিণত হইল।

মুসলমান-রাজত্ব আমাদের বুদ্ধি ও বিদ্যার অবনতির কারণ। ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা ইহার জলন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ। এই রাজত্বে আমাদের শারীরিক কোনই অবনতি হয় নাই বলিলেই হয়, এবং তজ্জন্যই সে বিষয়ে কিছু বলা অনাবশ্যক।

মুসলমান রাজত্বের এই বিষময় ফল। ইহারই পর ইংরাজ-রাজত্ব। ইংরাজ রাজত্বের দোষ ও গুণ বিচার করা আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এক কথায় বলিলে যথেষ্ট হইবে যে মুসলমান-রাজত্ব অপেক্ষা ইংরাজরাজত্ব আমাদের পক্ষে অনেকাংশেই শুভকর ও কতক অংশে দুঃখের কারণ হইয়াছে। ইঁহাদেরই রাজত্বকালে আমাদের দেশে বিজাতীয় আচার ও ব্যবহার আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মুসলমানেরা যদিও বিদেশী, তথাপি এক ভূখণ্ডে (Continent) বাস করিয়া এবং প্রায় একপ্রকার

জল ও বায়ু উপভোগ করিয়া ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে প্রায়ই সমভাবাপন্ন ছিল। সুতরাং ইঁহাদের রাজত্বকালে আচার ও ব্যবহার সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে কোনই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ইংরাজেরা অন্য ভূখণ্ডে বাস করিয়া ও অন্য প্রকার জল ও বায়ু দ্বারা গঠিত হইয়া আচার ও ব্যবহার এবং এমন কি, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সম্বন্ধেও আমাদের হইতে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন। এই কারণেই আমাদের পক্ষে যে সকল আচার ও ব্যবহার শুভকর, তাঁহাদের পক্ষে সে সকল আচার ও ব্যবহার কখনই শুভকর হইতে পারে না। কিন্তু আমরা যার পর নাই অনুকরণে তৎপর। ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া অনুকরণে যত্নশীল। শীতপ্রধান দেশে বাস করেন বলিয়া ইংরাজ ব্রাণ্ডি খান। কিন্তু অনুকরণ-প্রিয় বলিয়া আমরাও ব্রাণ্ডি খাইতে শিখিয়াছি। আমি স্বীকার করি যে, প্রাচীন ভারতে মাদক দ্রব্য পানের ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা সোমরস পান করিতেন। কিন্তু বিলাতী মদ্য এবং আর্য্য সোমরস এই উভয়ের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে এতই পার্থক্য, লক্ষিত হয় যে, প্রথমটী আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল এবং দ্বিতীয়টী অনুকূল। এই বিষপান করিয়া আমাদের দেশের কত কৃতবিদ্য লোক অকালে কাল-কবলে পতিত হন, তাহা গণনা দ্বারা ঠিক করা যায় না। ইহারই লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া কত শত লোক চিররোগী হইয়া পৃথিবীর ভার মাত্র হইয়া থাকেন। পৃথিবীর ও জনসাধারণের উপকার করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এমনই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন যে, কোন বিষয়ে আপনার ভাল ও কোন বিষয়ে আপনার মন্দ হয়, তাহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগম্য হইয়া উঠে। এই ত মদ্যপানের ফল—এই ত বিষপানের ফল। এখন দেখা যাউক, অন্যান্য আচার ও ব্যবহার পরিবর্ত্তনে আমাদের কি ফল ফলিয়াছে।

আজি কালি দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা যতই ইংরাজি পড়িতেছি, ততই ইংরাজি অনুকরণে উৎসাহশীল হইতেছি। আমরা অখাদ্য বলিয়া আর গোমাংস প্রভৃতি খাইতে অনিচ্ছুক নহি, আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বাটীর বাহির করিতে আর ধর্ম্মহানি বিবেচনা করি না, এবং আমরা অবলীলাক্রমে সংস্কৃত পুস্তক সকল কিছু নয় বলিয়া আর দূরে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমরা এমনই নির্ব্বোধ হইয়াছি যে, কখনও অনুধাবন করিয়া দেখি না যে, দেশ কাল, ও পাত্র-ভেদে আচার ও ব্যবহার-সম্বন্ধে ভিন্নতা লক্ষিত হয়। এক প্রকার খাদ্য শীত-প্রধান দেশের উপযুক্ত, অন্য প্রকার গ্রীষ্ম দেশের উপযুক্ত। এই হিসাবে একপ্রকার বসন ও ভূষণ ইংরাজদিগের উপযুক্ত ও অন্য প্রকার আমাদিগের। আমরা হ্যাট্ ও কোট্ পরিধান করি কেবল ইংরাজদিগের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত—কেবল রাজদরবারে সম্মান প্রাপ্তির আশা।

ধুতি ও চাদর ব্যবহার করি বলিয়া ইংরাজেরা আমাদিগকে অর্দ্ধ সভ্য বলেন। জানি না, বসন ও ভূষণের উপর সভ্যতা কত দূর নির্ভর করে। কিন্তু ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বসন ও ভূষণ-ভেদে সভ্যতার তারতম্য বিজ্ঞ বিবেচকের নিকট সর্ব্বদা অনুমোদনীয় হইতে পারে না। বসন ও ভূষণ সম্বন্ধে তারতম্য দেশভেদে জল ও বায়ুর অনুগত, সুতরাং আমরা এই সম্বন্ধে স্বদেশীয় জল ও বায়ুর অনুসরণ করি বলিয়া অসভ্য হইতে পারি না। আমাদের সভ্যতা আমাদেরই থাকুক। ইংরাজের সভ্যতায় আমাদের প্রয়োজন নাই। ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ যে, সকল বিদেশীয় আচার ও ব্যবহার কখন কোন দেশের উপযোগী হইতে পারে না। অনুপযোগী বিদেশীয় আচার ও ব্যবহার অনুসারে চালিত হইলে পরিশেষে এই ফল হয় যে, স্বয়ং নিস্তেজও অনেক সময়ে চিররুগ্ন হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। এই সিদ্ধান্তটী যেমন ব্যক্তিগত সত্য, তেমনই ইহা একটী সমাজগত ও জাতিগত সত্য।

প্রাচীন ভারতে সামাজিক ও রাজনৈতিক যে সকল নিয়ম বর্ত্তমান ছিল, অল্প বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা আমাদের শারীরিক সচ্ছন্দতা ও মানসিক উন্নতির অনুকূল। তখন রাজকার্য্য প্রাতে সার্দ্ধ সপ্ত ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সম্পাদিত হইত। এই নিয়মটীর কারণ বোধ হয়, সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন। কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আমাদের দেশে গ্রীষ্মের প্রাবল্য। এখনকার ইউনিভারসিটীর মতন তখন বিদ্যা লইয়া এত টানাটানি হইত না; এবং ছাত্রদিগেরও মস্তিষ্ক বল পূর্ব্বক শুষ্কখাদে পরিচালিত হইত না। তখন স্বেচ্ছায় ছাত্রেরা আপন আপন মনোমত বিষয় লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিত এবং সুতরাং সেই সেই বিষয়ে পরম উন্নতি সাধন করিত। পরীক্ষার বিষময় ফল লইয়া তাহাদের মন কলুষিত করিতে হইত না, এবং তজ্জন্য যে শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক বৃত্তির হানি সংঘটিত হয়, তাহাও তখন দেখিতে পাওয়া যাইত না।

আমাদের জাতি-বিভাগ একটী পরম মঙ্গলের নিদান ছিল। প্রত্যেকে আপন আপন জাতীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া সেই সেই ব্যবসায়ে এমত উন্নতি সাধন করিত যে, ততদূর উন্নতি আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদের দেশের কি না ছিল? পুরাবৃত্ত পাঠ কর, দেখিতে পাইবে যে, আমাদের যাহা ছিল, তাহার সমুদয় এখনও অন্য কোন সভ্যজাতির নাই। আমরা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি যে, ঐ সকল উন্নতি জাতি-বিভাগের ফল। প্রত্যেক মনুষ্যের যদি সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে সে কোন কার্য্যেই সম্পূর্ণ দক্ষ হইতে

পারে না। সুতরাং কোন কার্য্যই উন্নতির চরম সীমায় উঠিতে পারে না। এক এক জন যদি এক একটী কার্য্য লইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সেই কার্য্যে উন্নতি শীঘ্র সংঘটিত হয় এবং সেই সেই কার্য্যই উন্নতির চরমসীমায় উঠিতে পারে। এই সিদ্ধান্তটী বোধ হয়, সকলেরই অনুমোদিত। তবে কেন আমরা বৃথা ব্রাহ্মণদিগকে স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করি? ব্রাহ্মণদিগের ত উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না। মনু পাঠ কর, দেখিতে পাইবে—শূদ্রদিগেরও ব্রাহ্মণ হইবার বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মহাভারত স্পষ্টাক্ষরে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। শারীরিক বলের ও মানসিক বুদ্ধির তারতম্যে জাতিবিভাগের সৃষ্টি। পাছে তাৎকালিক হীনবুদ্ধি মনুষ্যেরা বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া তাহাদের অপব্যবহার করে, এই ভয়ে প্রাচীন ঋষিরা অতিশয় সতর্কতার সহিত ঐ সকল গ্রন্থ শূদ্রদিগের হস্তে প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতি তখন বুদ্ধি ও বিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিল না। তবে ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর কিরূপ? তাৎকালিক অবস্থানুযায়ী কার্য্য করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা স্বার্থপর হইতে পারেন না।

আর একটী কথা,—আমাদের নীতিসম্বন্ধে অবনতি। এইটী ইংরাজরাজত্বেরই ফল। মুসলমান রাজত্ব ইহার নিমিত্ত কোন অংশেই দায়ী নহে। প্রাচীন ভারত নীতি-সম্বন্ধে যত দূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা বৈদেশিক ঐতিহাসিকদিগের গবেষণায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরিয়ান ও হায়েনসান আমাদের নীতি-সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, নব্য পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। তাঁহাদের মতে আমাদের দেশে শঠতা, কপটতা, মিথ্যা ব্যবহার এবং উহার আনুষঙ্গিক অপগুণ সকল কদাচও দৃষ্টিগোচর হইত না। ভারতবাসীরা এত দূর সরলচিত্ত ছিল যে, ঋণস্বরূপ কাহাকে অর্থদান করিলেও তাহার প্রমাণের নিমিত্ত লেখা পড়া করিয়া লইত না। আজি কালি মোকদ্দমার সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত বিচারালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু ভারতের সৌভাগ্যের দিনে মোকদ্দমার নাম মাত্রও শ্রুতিগোচর হইত না। তখন রাজদরবার ভিন্ন বিচারালয় কোথায় ছিল? প্রতিবাসী ও প্রতিবাসীতে বিবাদ হইলে, গ্রামস্থ অন্যান্য প্রতিবাসীরা তাহা মিটাইয়া দিত। ইহাতে যদি না মিটিত, তবেই রাজদরবার শেষ আশ্রয়স্থল। এই নিয়ম মুসলমানরাজত্বকাল পর্য্যন্তও অনেকাংশে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে ইহার পরিবর্ত্তে যেরূপ বিচারের নিয়ম ও পদ্ধতি আরম্ভ হইয়াছে, নিঃসঙ্কুচিত হৃদয়ে বলিতে হইলে, বলিব, তাহা আমাদের কোন অংশেই শুভকর নহে।

এক দিকে অর্থব্যয়, ও অন্য দিকে দুষ্ট লোকের এক প্রকার প্রশ্রয়। প্রমাণা-ভাবে সত্যও মিথ্যা এবং মিথ্যাও সত্য। এই ত বিচারপদ্ধতি! আমাদের পুরাকালের বিচার-পদ্ধতি নির্দ্দোষ না হইলেও, ইহা অপেক্ষা সংস্রাংশে উৎ-কৃষ্টতর ছিল। অধুনাতন বিচারালয় গুলি দুষ্ট লোকদিগের এক প্রকার আশ্রয়-স্থান, এবং তজ্জন্যই নীতি-সম্বন্ধে অবনতির একটী কারণ।

আমরা প্রায় দেখিতে পাই যে, রাজপুরুষদিগের দোষ ও গুণ প্রায়ই প্রজাদিগের দোষ ও গুণ হইয়া পড়ে। নব্য ভারত ইহার একটী দৃষ্টান্তস্থল। ইংরাজদিগের দোষ ও গুণ আমাদের সমাজের মধ্যে এত দূর প্রবেশ করিয়াছে যে, বোধ হয়, কিছু দিন পরে হিন্দুসমাজ ও ইংরাজসমাজে কোনই বৈষম্য দৃষ্ট হইবে না। অদ্য আমরা জুয়াচোর, আমরা ঠক, আমরা মিথ্যাবাদী—মেকলের এই দৃঢ় বিশ্বাস। জানি না, মেকলের এই সিদ্ধান্তটী কত দূর সত্য। আমার বিবেচনায় ইহাতে অল্পমাত্রই সত্য নিহিত আছে। ইংরাজদিগের একটী বিষম দোষ যে, তাঁহারা দুই একটী লোকের স্বভাব দেখিয়াই সমগ্র জাতির সেই স্বভাব ধরিয়া লন। আবার এ সম্বন্ধে মেকলে যত দূর দোষী, তত দূর অন্য কোন ইংরাজ লেখককে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি হিন্দুদিগের বিষয়ে কোন স্থলে নিরপেক্ষ-ভাবে লিখিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার লেখনীই ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষীস্বরূপ। কিন্তু মেকলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইলেও, তাঁহার সিদ্ধান্তটীতে যে কিছু মাত্র সত্য নাই, তাহা বলিতে পারি না। আমার বোধে ইহাতে অবশ্যই কিছু সত্য নিহিত আছে। আমার বিশ্বাস যে, ইংরাজ রাজত্বে নীতিসম্বন্ধে আমাদের অনেক অবনতি হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের দোষে ও বিজাতীয় সংঘর্ষে আমাদের এই অবনতি—এই মনুষ্যত্বহীনতা। ইংরাজদিগের সহিত একত্র বাস করার এই বিষময় ফল। মুসলমান রাজত্ব-কাল হইতে ইংরাজ-রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত কেবল পর-পদসেবা করা যে জাতির কার্য্য, সে জাতি কেমন করিয়া আর স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে সক্ষম হইবে? সহস্র বৎসর ধরিয়া বৈদেশিক আক্রমণ ও বৈদেশিক অত্যাচারে যাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত, সে জাতি কেমন করিয়া আবার সবল হইয়া আপন পদভরে মেদিনী কম্পিত করিবে? জানি না, ভবিষ্যৎ গর্ভে ভারতের কি আছে। কিন্তু যে জাতি স্বকীয় আচার ও ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় আচার ও ব্যবহারে মুগ্ধ, এবং তজ্জন্যই পীড়িত, ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত, সে জাতির উন্নতি ও উদ্ধার আমার আশার অতীত। বৈদেশিক চিকিৎসা না হইলে, যাহারা পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিতে পারে না, ধর্ম্মনিষিদ্ধ মাংসাদি ভক্ষণ না

করিলে যাহারা সুস্থ হইতে পারে না, তাহাদের শরীরে কেমন করিয়া আর্য্যরক্ত দূষিত না হইয়া থাকিতে পারে? আর দূষিত আর্য্যরক্তে মহত্ত্ব কোথায়? পরকীয় আচার ও পরকীয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আমাদের এই হীন অবস্থা। আমাদের এই পরমুখপ্রেক্ষতায় আমাদের এই লজ্জাকর জীবন। জানি না, আমাদের এই দুঃখের জীবন কিসে পরিণত হইবে। পরমেশ্বর জানেন, আমাদের আশা কখন ফলবতী হইবে কি না। আশা সুদূরে, ভরসা কিছু মাত্র নাই।

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠা।

ইদানীন্তন প্রচলিত ভাষায় যে রোগ ওলাউঠা নামে সাধারণে প্রসিদ্ধ, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহা বিসূচিকা নামে কথিত ও বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অতিসার অধিকারোক্ত ত্রিদোষাপন্ন প্রভৃতি অতিসারও ভয়ানক ও আশু মারাত্মক হইয়া উঠিলে, তাহাও ওলাউঠা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ওলাউঠা অতিসার ও বিসূচিকা হইতেও স্বতন্ত্র নহে; বিসূচিকা স্থলবিশেষে অতিসারের অবস্থান্তর-বিশেষ।

আজ কাল অনভিজ্ঞতা ও অদূরদর্শন হেতু অনেকের মনের ধারণা এই যে, ওলাউঠা নূতন রোগ। আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ বা বর্ণনা কিছুমাত্র নাই। এটী নিতান্ত ভ্রান্ত মত। যাঁহারা সর্ব্বাঙ্গীন রূপে পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুসরণ করিয়া আপনাদিগকে তৃপ্ত বোধ করেন, তাঁহারা এবংবিধ মতের কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা উভয়শাস্ত্রজ্ঞ,সমদর্শী—তাঁহারা এ মতের পোষকতা করিবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। আমাদের আর্য্য পিতামহগণের কীর্ত্তিকলাপ সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল, কাল-মহাত্ম্যে নিষ্প্রভ ও মরিচাধরা। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদিগকে ক্রমে পাশ্চাত্য রুচির অনুবর্ত্তক করিয়া তুলিয়াছে। আমরা উজ্জ্বল বলিয়া কাচ পাত্রে সমাদর করি; ভঙ্গ-প্রবণ বলিয়া তাহাতে পরাঙ্মুখ নহি। কোট পেণ্টুলন দুরন্ত গ্রীষ্মে অসহনীয় হইলেও, পাশ্চাত্য রুচির অনুমোদনীয় বলিয়া তাদৃশ ক্লেশ করিয়াও তদ্ব্যবহারে প্রস্তুত আছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-রূপ অত্যুজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ আমাদের কোমল চক্ষুকে ঝল্‌সাইয়া দিয়াছে। আমরা এক্ষণে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেই গৃহস্থ সমস্ত বস্তুকে অন্ধকারাবৃত দেখি। সুতরাং গৃহস্থ কোন বস্তুরই প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারি না। যদি আমরা পূর্ব্বে পৈতৃক বস্তু সমূহের তথ্য জ্ঞাত হইয়া, স্বদেশজাত রত্ন সমূহের মর্ম্মাবগত হইয়া, বিদেশীয় ধনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে অনায়াসে তুলনায় সমা-

লোচনা করিয়া পরস্পরের পার্থক্য ও আমাদের প্রকৃতি এবং অবস্থানুসারে কাহার উপযোগিতা অধিক, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ইহারই অভাবে আজ আমাদের এত দুর্গতি!

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বিসূচিকা রোগের বিষয় এই প্রকার উল্লিখিত আছে—

"সূচিভিরিব গাত্রাণি তুদন্
সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
যস্যাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈরুচ্যতে
তু বিসূচিকা॥
নতাং পরিমিতাহারা
লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো
লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥
মূর্চ্ছাতিসারো বমথুঃ পিপাসা
শূলং ভ্রমোদ্বেষ্টন-জৃম্ভ-দাহাঃ।
বৈবর্ণকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ
ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ॥

রোগ-বিনিশ্চয় গ্রন্থের (অধুনা মাধব নিদান নামে খ্যাত) সংগ্রহকার মাধবকর তাঁহার সংগ্রহেও এই কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি প্রথম কবিতাটীর দ্বিতীয় চরণের শেষ পাঠ এই প্রকার করিয়াছেন—'বিসূচীতি নিগদ্যতে'। বোধ হয়, তৎকালে মুদ্রণ প্রথা প্রচলিত না থাকায় পুস্তকান্তরে এই সামান্য পাঠান্তর থাকিতে পারে।

মাধবকর-সংগৃহীত রোগবিনিশ্চয় গ্রন্থের টীকাকার বিজয় রক্ষিত বিসূচী সংক্রান্ত উপরোক্ত কয়েকটী বচনের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সূচীভিরিত্যাদি—

বাহুল্যাদ্বায়ুনা সূচীভিরিব তোদনমিতি বিসূচী নিরুক্তিঃ। পাণ্ডুরোগবৎ সূচীভিরিব তোদনং বিহায় অন্যেঽপি দোষা-ভেদা ভবন্ত্যেব, যদুক্তং তন্ত্রান্তরে বিবিধৈর্ব্বেদনাভেদৈর্ব্বায়্বাদি ভৃশ কোপতঃ সূচীভিরিব গাত্রাণি ভিনত্তীতি বিসূচিকা। বিদিগতা মা বিদিতাগমা বৈদ্যা মূঢ়া ভক্ষ্যাণ-ভিজ্ঞাঃ অজিতাত্মানো অজিতেন্দ্রিয়াঃ অশনে লোলুপাঃ পশুবদ প্রমাণ-ভোজিনঃ।

মূর্চ্ছেত্যাদি।

বমথুর্ব্বান্তিঃ, শিরসশ্চ ভেদঃ শিরঃশূলং, অত্র চ বমনাতিসারৌ মিলিতৌ লক্ষণমিতি সৌশ্রুতাঃ সুশ্রুতে অধোগাঃ আমাতিসারণগ্রহণা দূর্দ্ধাগায়াশ্ছর্দ্দিশ্চ। চরকে তু পঠ্যতে উর্দ্ধঞ্চাধশ্চ। প্রবৃত্তাম দোষাং যথোক্তরূপাং বিসূচীং বিদ্যা-দিতি। অত্রোর্দ্ধগা বিসূচী ভবতি তথাধো-গাপি। চরকে আমাতিসারস্য ন পঠিত-ত্বাৎ চরকদ্বয়গাপি চেতি ব্যাচক্ষতে, উর্দ্ধগাবাশ্চাপক্বাহারবমনেন ত্রিদোষজ-ছর্দ্দিভ্যো ভেদ ইতি মন্তব্যং।

বিসূচী রোগের অসাধ্য লক্ষণ-সম্বন্ধে সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে উক্ত অধ্যায়ে এই প্রকার লিখিত আছে।

যশ্চাব দন্তৌষ্ঠ নখোঽল্পসংজ্ঞো বম্যার্দ্দিতো ভ্যন্তর যাত নেত্রঃ। ক্ষামস্বরঃ

ার্ব্ববিমুক্তসন্ধির্যাম্নরঃ সোহপুনরাগমায়।

মাধবকরও এই বচনটী সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার একটু মাত্র পরিবর্ত্তিত আছে। প্রথম চরণ 'ছর্দ্দ্যার্দ্দিত' উল্লেখ আছে। এই বচনের ব্যাখ্যা বিজয়রক্ষিত এরূপ বলিয়াছেন।

যঃশ্চাত্যা বস্ত্যাদি।

... সা মোহমুক্তঃ, অভ্যন্তরবাত নেত্রঃ কোটবাক্ষঃ, সর্ব্ববিমুক্তসন্ধিঃ শিথিলীভূত-সর্ব্বপর্ব্বাস্থিসন্ধিঃ, অপুনরাগমনায় মরণায়।

সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রে বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তর উল্লেখ আছে। আমরা বিস্তৃতি জন্য তাহা হইতে আর উদ্ধৃত করিলাম না। আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠার অস্তিত্ব প্রদর্শনই এখানকার উদ্দেশ। বিস্তৃতি প্রদর্শন এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। চরকের বিমান স্থানে অজীর্ণ রোগের অধিকারে বিসূচিকার নিদান ও লক্ষণাদি সবিস্তার বর্ণিত আছে। বাভটের নিদান স্থানে বিসূচী রোগের আর কয়েকটী অতিরিক্ত লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা এই—

নিদ্রানাশো রতি-কম্প মূত্রাঘাতো বিসংজ্ঞতা। অমী উপদ্রবা ঘোরা বিসূচ্যাঃ পঞ্চ দারুণাঃ॥

ওলাউঠা নূতন রোগ নহে, আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। আমরা উপরে যে কয়েকটী প্রামাণিক বচনের উল্লেখ করিলাম, তাহার সবিশেষ আলোচনা করিলে, স্পষ্টতঃ জানা যায়, আমাদের পূর্ব্বতন আয়ুর্ব্বেদ প্রচারকগণ, অন্যান্য রোগের সহিত ওলাউঠার চিকিৎসায় অপারদর্শী ছিলেন না। তবে ইহা বোধ হয়, অপ্রকৃত নয় যে, অধুনা যেমন ওলাউঠা সর্ব্বাগ্রগণ্য, মহাপ্রলয়কারী, অসংখ্য লোক-সংহারক ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বে এত দূর ছিল না। তখন কদাচিৎ এই রোগে মৃত্যু হইত। সুতরাং জ্বরাদি রোগের ন্যায় ইহার আলোচনায় আয়ুর্ব্বেদকারগণ তত ব্যতিব্যস্ত হন নাই। অলসক ও বিলম্বিকা নামে দুইটী রোগের বর্ণনা অবস্থার রূপে আমরা আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাই। এই দুটী রোগে পীড়িতের সংখ্যা পাঁচ শতের মধ্যে একটীও দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং অনেকেই পৃথক ভাবে ইহার চিকিৎসাতত্ত্ব পরিজ্ঞানে সম্যক উৎসাহী নহেন। কাল সহকারে এই দুইটী রোগ যদি বিসূচিকার ন্যায় আশু মারাত্মক ও ভয়ানক হইয়া উঠে, তাহা হইলে উদ্যমশীল অনুসন্ধিৎসু ডাক্তারেরা ইহার চিকিৎসার অগ্রণী হইয়া দাড়াইবেন; স্বাভাবিক শিথিলতা ও স্থিতিশীলতা আসিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া দিবে। তখন হয়ত অনেকে উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন, ইহা নূতন রোগ; আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ বা বর্ণনা কিছুই নাই।

কোন কোন, খ্যাতনামা বহুদর্শী

আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ডাক্তারও আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এবং তাঁহারা আপনাপন পুস্তকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিসূচিকার লক্ষণাদি উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদে ইহার আলোচনা আছে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম, ডি, তাঁহার "বিসূচিকা চিকিৎসা প্রকরণ" নামক পুস্তকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত পূর্ব্বলিখিত দুইটী বচন উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদে বিসূচিকার লক্ষণাদির উল্লেখ ও বর্ণনা আছে। বাবু বসন্তকুমার দত্তও তাঁহার 'বিসূচিকা বিজয়' নামক ওলাউঠা চিকিৎসা পুস্তকে "মূর্চ্ছাতিসারেত্যাদি" বচনটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ইহাও বলেন যে, যখন নিদানেও ওলাউঠার এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়, তখন আমাদের দেশে যে এই রোগের বহুল প্রচার-স্থল, তাহার আর সন্দেহ নাই। যাঁহাদের মতে ওলাউঠা নূতন রোগ, তাঁহারা বসন্ত বাবু কৃত ওলাউঠার ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান সময় হইতে পাঁচ ছয় শতাব্দী পূর্ব্বেও এই পীড়ার বহুল প্রাদুর্ভাব ছিল। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখার রীতি প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা যায় না। অধুনা যেমন রাজনিয়ম অনুসারে জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা গ্রহণ করা রাজকর্ম্মচারীদিগের অন্যতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; বৎসরান্তে জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা, কোন পীড়ায় কত লোকের মৃত্যু হয়, পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ, ইত্যাদি যত্ন পূর্ব্বক লিখিত এবং সুরক্ষিত হয়; পূর্ব্বে এবম্প্রকারকিছুমাত্র ছিল বলিয়া অনুমান হয় না। সুতরাং আমাদিগের জানিবার কোন উপায় নাই, যে এদেশে বিসূচিকার কীদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে. রোগ না থাকিলে, তাহার বর্ণনা চিকিৎসা শাস্ত্রে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আয়ুর্ব্বেদে *ওলাউঠার যে কয়েকটী লক্ষণ লিখিত* আছে, অধুনা তদতিরিক্ত কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আর প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের সহিত দুই একটী লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, তাহা রোগান্তর উপস্থিত হইল, তাহা অনুমান করাও তত সঙ্গত বলিয়া বোধ করা যায় না। আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠা এই নামে কোন রোগ নাই সত্য; ভেদ—ওলা নামা ও বমন উঠা—এই প্রকারে বোধ হয় ওলাউঠা নামের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। মুসলমানেরা এই পীড়াকে হায়েজা বলিয়া অভিহিত করেন।

আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদের অবনতির যে সমস্ত কারণ (১) ওলাউঠা চিকিৎসার অবিস্তারের কারণও তাহার

(১) আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ ১২৮৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্যাদর্শনে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে।

সংসৃষ্ট। যে সময়ে অয়ুর্ব্বেদের সংক্ষেপ সাধন হইতে আরম্ভ হইল, তখনকার সংগ্রহকারগণ তৎকালে যে সকল রোগের বহুল প্রচার দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহারই লক্ষণ, চিকিৎসাপ্রণালী প্রভৃতি যথেষ্টরূপে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যে সকল রোগ তৎকালে বিরলপ্রচার ছিল, কখন কোন লোকের হইত—অনুসন্ধান পূর্ব্বক সেই সেই রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসাপ্রণালী সংগ্রহে তাঁহারা তত মনোযোগ করেন নাই। সেই কারণে ওলাউঠার চিকিৎসা-প্রণালী যাহা ছিল তাহাও লুপ্তপ্রায়।

প্রথমতঃ ডাক্তারি চিকিৎসা রাজ-চিকিৎসা, রাজা ইহার উন্নতিসাধনে সম্যক যত্নবান। কবিরাজী চিকিৎসার উন্নতিতে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই। কবিরাজী চিকিৎসা ফলপ্রদ হইলেও রাজবিধি অনুসারে অনেককে অনেক সময় ডাক্তারি চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। জগতের নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, দেশের উন্নতিশীর্ষ ব্যক্তিগণ যাহার পক্ষপাতী, তাহা সদোষ হইলেও অপরাপর লোক সমূহ তাহার অনুবর্ত্তন করে। সুতরাং কবিরাজী চিকিৎসার যোগ্যতা অনুসন্ধান না করিয়াই লোক ডাক্তারি চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করে। আয়ুর্ব্বেদের লোপের ইহাও একটী মহৎ কারণ। আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন অনায়াসসাধ্য নহে; সংস্কৃত ভাষায় অধিকার লাভ না করিতে পারিলে, আয়ুর্ব্বেদে পারদর্শী হওয়া যায় না। আজ কাল আমাদের দেশে সংস্কৃতের আদর পূর্ব্ববৎ নাই, সংস্কৃত শিক্ষার উপায়ও পূর্ব্বের ন্যায় সহজ নহে সুতরাং আজ কাল অনেক আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়াভিলাষী ভ্রমপূর্ণ অসম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ, বটতলার দুই এক খানি সংগ্রহ গ্রন্থ কেহ বা পূর্ব্বপুরুষগণ-সংগৃহীত সংস্কৃত বৃহৎ পুস্তকের পার্শ্বলিখিত দুই দশটী জায় সংগ্রহ করিয়া "কবিরাজ মহাশয়" ইত্যভিধানে অভিহিত হইতে থাকেন। ইহাদের আয়ুর্ব্বেদ-জ্ঞান সেই পার্শ্ব লিখিত জায়ের পরিমাণানুরূপ থাকে। সুতরাং তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইলে অনেক স্থলেই অনেক রোগের অস্তিত্ব আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পান না। ইহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও আদর কমিয়া যায়। একে ত আয়ুর্ব্বেদ অবনতমস্তক, তাহাতে রাজার এবং তদনুকরণে প্রধান প্রধান লোকের নিকট হতাদর, আবার তদ্ব্যবসায়ীদিগের সঙ্কীর্ণ জ্ঞান। এবম্বিধ কারণে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার দূরে থাকুক, এখনও যে ইহার কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহাই তৎপ্রণেতা আর্য্য পিতামহগণের পুণ্যফল। মূলের প্রতি হতাদর হইলে তাহার শাখা প্রশাখার প্রতি যত্ন কে করে? মূল আয়ুর্ব্বেদের প্রতি যখন লোকের আদর কম, তখন তাহাতে ওলাউঠা চিকিৎসা আছে, কি ছিল কি না

তাহার অনুসন্ধান কে করে। সুতরাং অনেকে জানেন না, বা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না যে, আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠা চিকিৎসার কোন প্রসঙ্গ ছিল বা আছে কি না; যাঁহারা অনুসন্ধান করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা জানিয়াছেন ও জানিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদে ওলাউঠার বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল, এক্ষণও আছে। প্রমাণস্বরূপ আমরা পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সরকার ও বসন্তকুমার দত্তের নাম উল্লেখ করিতে সক্ষম।

আস্তিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, করুণাময় জগৎপিতা জগদীশ্বর তাঁহার বিশ্বরাজ্য পরিপালনার্থ যে সমস্ত নিয়ম করিয়াছেন, তৎ সমস্তই মঙ্গলোদ্দেশ্য-সাধক। তাঁহার প্রতি কার্য্য জীবের হিতার্থ; তাঁহার দয়া পক্ষপাত দোষ বিমুক্ত, তাঁহার বিধি সর্ব্বত্র প্রসারিত। তাঁহার নিকটে শ্বেত-কৃষ্ণ ভেদ নাই পশুপক্ষী মনুষ্যে ভিন্নতা নাই। ধনী দরিদ্রে, রাজা-প্রজায় ইতর বিশেষ নাই। যিনি ঈদৃশ অপক্ষপাতী দয়াময়, তাহার রাজ্যে ইহাও কি কখন সম্ভব যে, তিনি এক দেশে রোগ কল্পনা করিয়া অন্যত্র তাহার ঔষধ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অপক্ষপাত অপার করুণা স্বীকৃত হইলে ইহাও অস্বীকার্য্য নয়, যে যে ভারত শিল্প সাহিত্যের জন্মভূমি, দর্শন, বিজ্ঞানাদির স্থান, বীর পরাক্রমের প্রসূতি, সভ্যতা মার্গের প্রথম সোপান, আয়ুর্ব্বিদ্যার আবিষ্ক্রিয়া স্থান, সেই ভারতে অন্যান্য রোগের সহিত তৎ কাল প্রচলিত বিসূচিকা রোগের চিকিৎসা-প্রণালীও ভারতবাসী আর্য্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনাবিষ্কৃত ছিল না।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

ওয়ালেস্।

দশম অধ্যায়।

ফিটমুর ও লামারমুরের যুদ্ধ।

ষ্টার্লিং ব্রিজের যুদ্ধের পর স্কটলণ্ড পাঁচ মাস কাল শান্তিসুখ ভোগ করিলেন। পাঁচ মাস ইংরাজেরা আসিয়া স্কটলণ্ডের শান্তিসুখ ভঙ্গ করিতে সাহসী হইল না। সেই অভ্যন্তরীণ শান্তির সময় ওয়ালেস্ পার্থ নগরে একটী জাতীয় সভা আহুত করিলেন। স্কটলণ্ডের সমস্ত সামন্ত ও ভদ্রলোক সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। কেবল বিশ্বাস-ঘাতক ডনবারাধিপতি কস্‌প্যাট্রিক সেই সভায় আসিতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি নিজ দুর্গমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া সমবেত জাতীয় বলকে উপেক্ষা করিলেন। এবং সেই জাতীয় আহ্বান লইয়া অনেক কৌতুক পরিহাস করিলেন।

সভাস্থ সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাইবার জন্য ওয়ালেসকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ওয়ালেস তাহা না করিয়া প্রথমে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন 'যে যদি তিনি পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন তাহা হইলে এবার তাঁহাকে ক্ষমা করা যাইবে।' এই কথা শুনিয়া কস্‌প্যাট্রিক্ হাঁসিয়া উঠিলেন, এবং প্রত্যুত্তরে দূতকে বলিলেন 'তোমাদের বুনো রাজাকে গিয়া বলিও যে, কস্‌প্যাট্রিক জীবন থাকিতে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিবে না, এবং আপন রাজ্যে রাজত্ব করিতেও ভীত হইবে না।

এই দৃপ্ত ব্যবহারে সমস্ত জাতীয় সভা কস্‌প্যাট্রিকের বিরুদ্ধে ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে ওয়ালেসের নয়ন দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, কস্‌প্যাট্রিক ও তিনি—উভয়ে স্কটলণ্ডে রাজত্ব করিতে পারেন না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ওয়ালেসের যে প্রতিজ্ঞা, সেই কার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ দুই শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ডন্‌বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার সৈন্য দ্বিগুণিত হইল।

আরল্‌ পাট্রিক নয় শত সৈন্য লইয়া সেই প্রবাহিনীর গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই দুর্নিবার প্রবাহিনী তৃণরাশির ন্যায় প্যাট্রিকের সৈন্য ভেদ করিয়া ডন্‌বার দুর্গের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে বেগে আসিলেন, সেই বেগেই দুর্গ অধিকার করিয়া সিটনের হস্তে তাহার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। এ দিকে কস্‌প্যাট্রিক প্রাণভয়ে দুর্গ ফেলিয়া ইংলণ্ডাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন। ওয়ালেস্ তিন শত মাত্র অনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রমিক তাড়াইয়া এট্রিক নামক অরণ্য পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। আর অনুসরণ অনাবশ্যক মনে করিয়া তিনি ফিরিলেন।

এ দিকে পলায়মান সামন্ত দলের সহিত ব্রুস ও বিসপ্ বেক্ প্রভৃতি সামন্তগণ আসিয়া যোগ দিলেন। ব্রুস ইহাতে সহজে যোগ দিতেন না কিন্তু তাঁহারা ব্রুসকে এই বলিয়া রাজি করিলেন যে, ওয়ালেস স্বয়ং স্কট্‌লণ্ডের মুকুট-প্রার্থী হইয়াছেন। আরল প্যাট্রিক বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া স্বয়ং ডন্‌বার অবরোধ করিয়া রহিলেন এবং নৌসেনা দ্বারা জলপথে আহার-সামগ্রী আসার পথ বন্ধ করিলেন। এদিকে বিসপ বেক্ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া নর্হামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ওয়ালেস্ এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র পাঁচ সহস্র সৈন্য লইয়া সীটনের সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। সীটন্ অধিকাংশ সৈন্য দুর্গের রক্ষাকার্য্যে

নিযুক্ত করিয়া কতিপয়মাত্র অনুযাত্রিক সহ ওয়ালেসের সহিত আসিয়া যোগ দিলেন। এদিকে বিসপবেক্ দশসহস্র সৈন্য লইয়া স্পিটমুরে গুপ্তভাবে থাকিয়া ওয়ালেসের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে প্যাট্রিক ও দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত সেনা লইয়া স্পিট্-মুরে বেকের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। শত্রুসৈন্যের বল সুতরাং ত্রিশসহস্র বা ততোধিক হইল। ওয়ালেস ইহার পঞ্চমাংশ বা যষ্ঠাংশ সৈন্য লইয়া সেই মহতী সেনার প্রতিকূলে ধাবিত হইলেন। প্রচণ্ড জলপ্রপাত যেন তরঙ্গিণীতে পড়িয়া তাহার জলরাশি আলোড়িত করিল। ওয়ালেস্ ও তাঁহার বীরবৃন্দের গতিরোধ করে, কাহার সাধ্য? ওয়ালেস্ দুর্নিবার গতিতে অসি হস্তে একাকী শত্রু ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অসংখ্য শত্রুসৈন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। যেন সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে বধ করিতে উদ্যত হইল। কস্প্যাট্রিক্ তাঁহাকে ঈষৎ আহত করিলেন। তাঁহার অশ্ব হত হওয়ায় তাঁহাকে পাদচারী হইয়া যুদ্ধ করিতে হইল। এদিকে তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অনেকেই ভগ্নমনে সে স্থল হইতে অপসৃত হইল। তাঁহার এই বিপৎ-বার্ত্তার কিছুমাত্র তাহারা জানিতে পাইল না। কস্প্যাট্রিক অশ্ব পৃষ্ঠে আসীন হইয়া পাদচারী ওয়ালেস্কে বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ওয়ালেসের অসাধারণ রণনৈপুণ্যে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল। এদিকে গ্রেহাম, লণ্ডার, লায়ল্, হে, বাম্‌জে, লণ্ডিন্ বয়েড্, সীটন্ প্রভৃতি সামন্তবর্গ ওয়ালেস্কে দেখিতে না পাইয়া পাঁচসহস্র সৈন্য সহ শত্রুব্যূহ্ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে গিয়া বিসপ্ বেক প্রতিহত হন। যেমন মাতঙ্গদল কদলীবনে গিয়া সম্মুখস্থ কদলীবৃক্ষবৃন্দকে ভূতল শায়িত ও পদদলিত করে, সেইরূপ সেই বীরদল প্রতিরোধকারী ইংরাজ সৈন্যগণকে ভূতলশায়িত ও পদদলিত করিয়া ওয়ালেসের উদ্ধার সাধন করিলেন। ওয়ালেস্ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সদলে অনুসরণকারী শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে আপনাদিগের ছাউনীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সেখানে তাঁহার চারিসহস্র অনুযাত্রিকগণ আসিয়া জুটিয়াছিল। স্কটিশ যোদ্ধৃগণ রণস্থল হইতে অপসৃত হওয়ায় কস্প্যাট্রিকেরই জয় হইল সত্য, কিন্তু সে জয় তাঁহাকে অতি উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই রণক্ষেত্রে সপ্ত সহস্র ইংরাজসেনা সমাধিনিহিত হয়। এদিকে স্কটিশ দলে মৃত্যু-সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক হয় নাই, এবং কোন স্কটিশ কর্ম্মচারীও হত হয় নাই। বিজয় লাভ করিয়াও কস্প্যাট্রিক্ সুখী হইলেন না; কারণ অসংখ্য সৈন্যনাশে ও ওয়ালেসের পলায়নে তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন।

বিসপ্ বেক্ স্কটিশসেনার পুনরাক্রমণ-

ভয়ে ন্যাগারমুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে স্কটিশ সেনার পশ্চাদ্ভাগ উভয় দিকে উদ্ভাসিত হওয়ায় স্কট্‌লণ্ডবাসিগণ দ্রুত হইয়া চারিদিক্ হইতে স্কটিশ জাতীয় পতাকা মূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বশুদ্ধ দুই সহস্র নূতন সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এই উপচিত সৈন্য লইয়া ওয়ালেস বিসপ্ বেকের অনুসরণে ন্যাগারমুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রত্যূষে তাঁহারা হঠাৎ ইংরাজ-শিবিরের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইংরাজসেনা পূর্ব্ব হইতে এ আক্রমণের কোন সংবাদ পায় নাই, সুতরাং শান্তিদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে অকাতরে বিশ্রাম করিতেছিল। স্কটিশ্ সেনা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া দুই দিক্ হইতে ইংরাজ শিবির আক্রমণ করিল। অসংখ্য সৈন্যকে নিদ্রার ক্রোড় হইতে আর উঠিতে হইল না। যাহারা উঠিল, তাহারা কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার স্থিরতা রহিল না। কিন্তু বিসপ্ বেক্ আপনার স্থান হইতে এক পাদ বিচলিত হইলেন না। তিনি লণ্ডিনের খড়্গাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন, তথাপি অমিত তেজে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, তখন তিনি রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। কস্প্যাট্রিক্ ও ক্রসও পঞ্চ সহস্র সৈন্য সহ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিলেন। পলায়মান ইংরাজ সেনা অবশেষে নর্হাম দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিজয়ী ইংরাজ সৈন্য টুইড্ নদীর তীর পর্য্যন্ত ইংরাজ সেনা অনুসরণ করিয়াছিল। রণস্থলে ও পলায়ন-পথে সর্ব্বশুদ্ধ বিংশ সহস্র ইংরাজ সৈন্য হত হয়। স্পিট্‌মুরের যুদ্ধে ইংরাজেরা বিজয়লাভ করিয়াও সপ্ত সহস্র সৈন্য হারাইয়াছিলেন; এবার ন্যাগারমুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিংশ সহস্র সৈন্য হারাইলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মনে আর উৎসাহ রহিল না। সেই মহতী ইংরাজ সেনা চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। ওয়ালেস্ সময় পাইয়া এখন কস্প্যাট্রিকের দুর্গ সকল উন্মূলিত ও ক্ষেত্র সকল বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। কেবল ডন্‌বার দুর্গ অটুট রাখিলেন।

সমরের প্রারম্ভ হইতে অষ্টাদশ দিবসে ওয়ালেস পার্থনগরে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও তথায় জাতীয় সভার অধিবেশন হইতেছিল। ওয়ালেসের বিজয়সংবাদে সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। জাতীয় সভা তাঁহাকে সমস্ত স্কট্‌লণ্ডের গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত করিলেন। সামন্তবর্গ এবার একবাক্যে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। ওয়ালেস্ ষ্টার্লিং সমরের বিজয়ের পর নিজ বন্ধুবান্ধব ও সেনা কর্ত্তৃক গবর্ণরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এবার সমস্ত জাতি একবাক্যে তাঁহাকে সেই গৌরবের পদে অভিষিক্ত করিলেন। এখন হইতেই তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্কট্‌লণ্ডের প্রতিনিধি ও শাসনকর্ত্তা বলা যাইতে পারে।

স্কট্‌লণ্ডের গবর্ণর-পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর সেনাবিভাগে ওয়ালেসের সর্ব্ব

প্রথম ও বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। গ্রন্থের প্রারম্ভেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সামন্ততন্ত্রে রাজারও সর্ব্বাঙ্গীন সহায়তা পাওয়া দুর্ঘট হইত। সামন্তবর্গের ঈর্ষা ও অহঙ্কারের কুফল ওয়ালেস্ পূর্ব্বেই ভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বিপৎ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোনও সাহায্যের আশা করেন নাই। কৃষক ও দাসগণের স্বার্থ সামন্তবর্গের স্বার্থের সহিত যেরূপ জড়িত ছিল, তাহাতে তাহাদিগের নিকট হইতেও কোনও প্রকার সাহায্যের আশা ছিল না। সুতরাং ওয়ালেস্ স্থায়ী সৈন্য সংস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী অবলম্বন করিলে পাছে সামন্তবর্গের কোপানলে পতিত হন, এই জন্য তিনি প্রথমে মধ্য পথ অবলম্বন করিলেন। বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্য সংস্থাপিত না করিয়া তিনি আধুনিক মিলিসিয়ার (অস্থায়ী সৈন্য) সূত্রপাত করিলেন। তিনি সমস্ত স্কট্‌লণ্ডকে কয়েকটী জেলায় বিভক্ত করিলেন। ষোল ও ষাইট্ বৎসরের মধ্যে যাহাদিগের বয়স— তিনি তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অস্ত্রগ্রহণ ক্ষম—তাহাদিগের একটী তালিকা গ্রহণ করিলেন। এই অস্থায়ী সৈন্য মধ্যে তিনি একপ্রকার নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। প্রত্যেক চারি জনের উপর পঞ্চম, প্রত্যেক নয় জনের উপর দশম, প্রত্যেক উনিশ জনের উপর বিংশ, এইরূপ ক্রমে উঠিয়া প্রত্যেক একোন-সহস্রের উপর সহস্রতম ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। তাহার আদেশ যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য প্রতি পল্লীতে একটী করিয়া ফাঁসী কাষ্ঠ বিলম্বিত হইল। যে ভীরু কাপুরুষ স্বদেশের রক্ষার নিমিত্ত আহূত হইয়াও অস্ত্রগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইত, দৃষ্টান্ত দ্বারা অপরের অবাধ্যতা নিবারণ করিবার নিমিত্ত, তাহাকে ফাঁশিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। যে সকল সামন্ত আপন আপন প্রজাবর্গকে দেশহিতৈষী দলে প্রবিষ্ট হইতে বাধা দিত, তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত বা তাহাদিগের সম্পত্তি জাগীর-কোষ-সাৎ করা হইত। এই রূপে তাঁহার অস্থায়ী সৈন্য সংগৃহীত হইল। ইহাদিগের সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে হইত না, আপন আপন দলপতির অধীনে থাকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত এবং আহূত হইলেই জাতীয় পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত।

ওয়ালেস্ ও তদীয় সহকারী যবে এই রূপে জাতীয় সেনার প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে জাতীয় বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। ওয়ালেস্ যে শুদ্ধ অসাধারণ বীর ছিলেন এরূপ নহে, রাজ্যের আভ্যন্তরী। সমৃদ্ধিসাধন ও শৃঙ্খলাস্থাপনেও তিনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাঁহারা হ্যাম্বর্গ ও লুবেক নগরের সহিত স্বাধীন বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। সেই সন্ধিপত্রে ওয়ালেসের রাজনীতিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ওয়ালেস্ এখন প্রভুত্বের চরম সীমায় উপনীত। অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুতা লাভ করি-

য়াও তিনি নিজে সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত রাজনৈতিকসন্ন্যাসী। "আদানং হি বিসর্গায়"* পরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা কেবল দানের নিমিত্ত। এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া সেই বীরসন্ন্যাসী বিজয়লব্ধ ভূমি ও সম্পত্তি সমস্তই অনুচরবর্গকে দান করিলেন। রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদে তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করিলেন। যাহারা স্বদেশের উদ্ধারব্রতে জীবন আহুতি দিবার জন্য তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই অনুচরবর্গকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তাই আজ তাঁহার আয়ত্তাধীন যাহা কিছু ছিল, সমস্ত তাহাদিগকে দিয়া তাঁহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি নিজের আত্মীয় স্বজনকে কপর্দ্দকমাত্রও দান করেন নাই, বা সামান্য পদও প্রদান করেন নাই। কারণ তাঁহার নিজের বা আত্মীয় স্বজনের আর্থিক উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজে সর্ব্বত্যাগী ছিলেন এবং আত্মীয় স্বজনকেও সর্ব্বত্যাগী হইয়া জাতীয় ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে বলিতেন।

তিনি ইচ্ছা করিলে এ সময় অনায়াসেই স্কট্‌লণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন। কারণ তাঁহার ইচ্ছার গতি রোধ করিতে সমর্থ এরূপ লোক তৎকালে স্কট্‌লণ্ডে একজনও ছিল না। কিন্তু তিনি ইংরাজবন্দী স্কট্‌লণ্ডেশ্বর বেলিয়লের রাজমুকুট স্কটিশ্‌ সিংহাসনের উপর রাখিয়া তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে ন—ইচ্ছা, বেলিয়লকে ইংরাজ-করকবল হইতে উদ্ধার করিয়া স্কটিশ্‌ সিংহাসনে বসাইয়া নিজে তাঁর দাসী হইবেন। স্বাভ্যুদয়স্পৃহা ওয়ালেসের হৃদয়কে কখন কলুষিত করে নাই। তথাপি "দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম।"‡ মন্দ লোকে মহাত্মাগণের চরিত্রে দ্বেষ করিয়া থাকে। অধিক কি বীরবর কমিন্‌ও ওয়ালেসের দেবোচিত চরিত্রে সন্দিহান হইয়া বিপক্ষপক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। পরস্পরে বিশ্বাসের অভাবই জাতীয় পতনের মূল। সেইরূপ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিচলিত বিশ্বাসই জাতীয় অভ্যুদয়ের অদ্বিতীয় উপাদান। তাহার অভাবেই আজ ভারতের এ দুর্গতি!

বঙ্গবামা।

(প্রতিবাদ।)

বিগত ফাল্গুন মাসের আর্য্যদর্শনে "বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থা" শীর্ষক যে প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইল। কারণ, প্রস্তাবের সর্ব্বাবয়ব পরস্পর সুসঙ্গত নহে। লেখক স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন রাখিতে চান, অথচ তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা করিতে চান। তিনি বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত

* রঘুবংশ। ‡ কুমারসম্ভব।

করিবার জন্য এবং বাল্যবিবাহ উঠাইবার জন্য বঙ্গসমাজকে উত্তেজন বাক্যে সম্বোধন করিয়াছেন। আমরা জানিতাম, স্ত্রীজাতির মূর্খতা, চির বৈধব্য, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহপ্রথা স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ অধীনতারই ফল। মহিলাগণ পুরুষের অধীন থাকিবে, অথচ তাহার রুচি এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারিবে, এরূপ কখন সঙ্গত হইতে পারে না।

শুদ্ধ এক প্রকার শিক্ষার সহিত অধীনতার সামঞ্জস্য আছে। আমরা ঘোটককে আমাদের উপযোগী করিয়া শিক্ষিত করিয়া লই। বানরী এবং ভল্লুককে আমরা নৃত্য করিতে শিখাই। ঘোটক, বানরী এবং ভল্লুক সকলই শিক্ষিত এবং মনুষ্যের অধীন। অধীন থাকিবার জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক, তাহাকেও আমার শিক্ষা বলি এবং অধীন বামাগণকে আমরা কেবল সেই প্রকার শিক্ষাই দিতে পারি এবং কিয়দংশে দিয়া থাকি। স্ত্রীজাতির যে সকল আচার ব্যবহার অধীনতার উপযোগী, তাহাকে সদাচার এবং সুনীতি বলিয়া তদনুযায়ী বামাকুলকে শিক্ষিতা করিয়া আনাকে যদি পুরুষজাতি স্ত্রীশিক্ষা বলেন, তবেই স্ত্রীশিক্ষা অধীনতার সহিত সমঞ্জসীভূত হইতে পারে। লেখক বোধ হয় এই প্রকার স্ত্রীশিক্ষারই কথা বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু কথা এই, এরূপ শিক্ষাকে কি প্রকৃত শিক্ষা বলিব? মনুষ্যের কার্য্যোপযোগী করিয়া ঘোটককে শিক্ষা দিলে, পাখীকে খাঁচায় পুরিয়া হরিনাম বলাইলে যদি তাহাদের শিক্ষা হয়, তবেই অবশ্য লেখকের স্ত্রীশিক্ষার অর্থ হয়, নহিলে নহে। কিন্তু এরূপ শিক্ষাকে বোধ হয় কেহই প্রকৃত শিক্ষা বলিবেন না। এরূপ শিক্ষা বড় গ্রন্থ অধ্যয়নের উপর নির্ভর করে না। এ গ্রন্থশিক্ষা বিশেষরূপ তরিবদ মাত্র। অধীন অবস্থায় থাকিবার জন্য যেরূপ আচরণ আবশ্যক, এই স্ত্রীশিক্ষা সেই প্রকার তরিবদ এবং এই তরিবদ আমাদের স্ত্রীজাতি এক্ষণেও প্রাপ্ত হয়েন। আমাদের বামাগণে পুস্তক অধ্যয়ন না করিয়াও পতিপরায়ণা, সতী, ধীরপ্রকৃতি এবং লজ্জাশীলা। তাহাদের বিশেষ প্রকার অবস্থায় এরূপ না হইয়াই থাকিতে পারে না। এপ্রকার ব্যবহার তাহাদের অবস্থা বিশেষের অবশ্যম্ভাবী ফল।

লেখক কি স্ত্রীজাতিকে জ্ঞানবতী করিতে চাহেন? যদি চাহেন তবে কিরূপ জ্ঞানে তাহাদিগকে জ্ঞানবতী করিতে চাহেন? তিনি বলেন "পূর্ব্ব কালে কামিনীগণ নানা শাস্ত্র ও নানা কলা শিক্ষা করিতেন।" আমরা জিজ্ঞাসা করি এরূপ উদার শিক্ষা ক্রমশঃ রহিত হইয়া আসিল কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া কি তিনি বলিয়াছেন যে, অধীন স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য? আমরা জানি, প্রকৃত উদার শিক্ষার সহিত অধীনতার সামঞ্জস্য নাই। বামাগণের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া যদি তাহারা প্রকৃত সদসৎবিবেচনায় পারদর্শিনী হয়, তবে তাহারা পুরুষজাতির সম্পূর্ণ অধীন থাকিতে পারে

না, তবে তাহারা ক্রমশঃ স্বাধীনতা লাভের জন্য যত্নবতী হইতে থাকে। স্ত্রীজাতির জ্ঞানধ্বনি যত স্ফুরিত হইবে, ততই অধীনতার বল কমিয়া আসিবে, পুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব বাঁধিবে, নানা বিষয়ের বিচার হইবে এবং পুরুষ জাতির সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি হইতে থাকিবে। আমরা বলি, এইজন্য ভারতে ক্রমে স্ত্রীশিক্ষা রহিত হইয়া গিয়াছে।

যে দেশে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন অথচ বিধবাবিবাহ প্রচলিত এবং বাল্যবিবাহ অপ্রচলিত, সে দেশে দেখা যায়, ভারতের পুরুষজাতির রুচি যেরূপ, তদ্দেশীয় পুরুষজাতির রুচি সেরূপ নহে। আমাদের পুরুষজাতি কৃতসংস্কার বালিকাগণকে এবং কোন পুরুষসংসর্গ-বিলাসিনীকে গ্রহণ করিতে একান্ত কুণ্ঠিত। তাহারা প্রভুজাতি, সুতরাং তাহাদের ইচ্ছাই বলবতী। কারণ, যেখানে এক জাতি সম্পূর্ণ অধীন, সমাজের সেখানে প্রভুজাতি যথেচ্ছাচারী। নিয়মই এইরূপ। যেখানে প্রজাবর্গ সম্পূর্ণ অধীন, সেখানে নৃপতি যথেচ্ছাচারী। অধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারিতার সামঞ্জস্য আছে। স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারিতার সামঞ্জস্য হইতে পারে না। যেখানে স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ অধীন, সেখানে পুরুষজাতি সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচারী। ভারতে স্ত্রীজাতির অধীনতার যত বৃদ্ধি হইল, পুরুষজাতির যথেচ্ছাচারিতারও তত বৃদ্ধি হইল। পুরুষজাতীয় যথেচ্ছাচারিতার বৃদ্ধির সহিত বিধবাবিবাহ রহিত হইল এবং বাল্য ও বহুবিবাহ প্রচলিত হইল। যে কারণে বিধবাবিবাহ রহিত হইল, সেই কারণেই বাল্য ও বহুবিবাহ প্রচলিত হইল। এখন এই প্রভু পুরুষজাতির ইচ্ছা প্রবল। বিধবাকে এবং কৃতসংস্কার বালিকাকে গ্রহণ করিতে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। এই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য। এই জন্য বলি, স্ত্রীজাতির অধীনতা সত্ত্বে, এবং পুরুষজাতির যথেচ্ছাচারিতা সত্ত্বে, বিধবাবিবাহের প্রচলন হওয়া দুঃসাধ্য। বিধবাগণ হাজার যন্ত্রণা পাউক, লেখকের মতে বাল্যবিবাহ বহু দোষের আকর হউক, কিন্তু যথেচ্ছাচারী পুরুষজাতি তাহা দেখিবে না। পুরুষজাতি আপনাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রবলা রাখিতে চাহেন, এবং স্ত্রীজাতির অধীনতা বজায় রাখিতে চাহেন। পাখী খাঁচায় ছট্‌ফট্‌ করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, এক বার হরিনাম বলিলেই আমাদের সন্তোষ। লেখক কি এ কথা বুঝিয়া বিধবাবিবাহের জন্য চীৎকার করিয়াছেন? বোধ হয়, নয়।

এক্ষণে এক বার দেখা যাউক, লেখক স্ত্রীজাতির অধীনতা কিরূপে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি এই অধীনতা সমর্থনার্থ কতকগুলি মিথ্যা হেতুর কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। যাহা প্রধান হেতু, তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। বোধ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা হইয়াছে। আমরা কি সেটি বলিয়া দিব? সে হেতু এই;—কে এত সাধের প্রভুত্ব নষ্ট করিতে যায়? কোন্ রাজা আপন প্রভুত্ব নষ্ট করিতে চায়?

প্রভুত্ব কেহ ছাড়িতে চায় না—সহজে নহে। অতএব স্ত্রীজাতির অধীনতা অবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চয় মঙ্গলকর। মনে মনে এই কথা রহিল, তবে বাহিরে কতকগুলি অন্যরূপ হেতু দিয়া নিজ ইচ্ছাকে বলবতী করা চাই। আমরা সচরাচর যে সকল হেতু শুনিতে পাই, লেখক সে সকলগুলি বলেন নাই। দুই একটি উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দেখা যাউক, এই হেতুগুলি কিরূপ দাঁড়ায়। লেখক বলেন "যে কারণে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন হইতে হইয়াছে, সেই কারণেই তাহাদিগকে চিরদিন অধীন থাকিতে হইবে।" থাকিতে হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে। কিন্তু তাহা ত কথা নয়, সেরূপ অধীন রাখা উচিত কি না? ইতালী এককালে অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল, গ্রীশ এককালে তুর্কের অধীন ছিল। কেহ কি বলিয়াছিল, যে কারণে তাহাদিগকে অধীন হইতে হইয়াছে, সেই কারণে তাহাদিগকে অধীন থাকিতে হইবে? যাহা ছিল এবং যাহা আছে, তাহা আরও বহু কাল থাকিতে পারে। কিন্তু যাহা ছিল এবং যাহা আছে, তাহাই যে নিশ্চয় ভাল এবং হওয়া উচিত এ কথা কেহ বলিবে না। যদি এই মত মানিতে হয়, তবে মনুষ্যের উন্নতি চেষ্টা করা অন্যায়।

লেখক বলেন "পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি স্ত্রীজাতির আকৃতি প্রকৃতি হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন এবং বিভিন্নতাই স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থার কারণ।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, কে কাহার কারণ? স্ত্রীজাতির আকৃতি প্রকৃতি সামাজিক বিভিন্নতার কারণ, না সামাজিক বিভিন্নতা আকৃতি প্রকৃতির বিভিন্নতার কারণ? সামাজিক বিভিন্নতা স্ত্রীজাতির আকৃতি প্রকৃতিকে দুর্ব্বল করিয়াছে, না স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্ব্বলা বলিয়া পুরুষের অধীন হইয়াছে? লেখক এ সংশয় পূরণ করেন নাই। অথচ এ সমস্যা বহুকাল বর্ত্তমান।

যদি বল, স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্ব্বলা, তবে কথা এই, আমরা স্বাভাবিক যাহাকে যেরূপ চাই, তাহাকে সেইরূপ রাখাই কি উচিত? স্বভাবে অনেক বিষয়ের অভাব থাকে, আমরা কি সে সকল অভাব পূরণ করিয়া লই না? মনুষ্যের এত কালের সভ্যতা কি সাক্ষ্য দেয়? মনুষ্য স্বাভাবিক অবস্থায় পশুবৎ। যদি স্বভাবই উৎকর্ষের আদর্শ হইত, তবে মনুষ্য কেন সভ্য হইতে চেষ্টা করিল? দুর্ভেদ্য পর্ব্বত, অরণ্যানী এবং সাগর মনুষ্যকে দেশ-দেশান্তরে যাইতে নিষেধ করিতেছে, তবে কেন সেই নিষেধ মানিয়া মনুষ্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না? স্বভাবকে অতিক্রম করিতে চায় কেন? স্বভাবের অভাব পূরণ করে কেন? আমরা কোন বিষয়ে ত ঠিক স্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকি না, তবে এ বিষয়ে কেন করিব? কিন্তু স্ত্রীজাতির অধীনতা যে আমরা এই হেতু দ্বারা কেন সমর্থন করি, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে তাহা বলা বাহুল্য।

স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্ব্বলা এ কথা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার দুর্ব্বলতাকে চিরকাল রক্ষিত করিতে হইবে, অথবা তাহাদিগকে চিরকাল দুর্ব্বলা করিয়া রাখাই ভাল, এমত প্রতিপাদিত হইতে পারে না। কিন্তু তাহাদিগকে দুর্ব্বলা বলাও কতদূর সঙ্গত, তাহাও বুঝা যায় না। মনুষ্যের বল কি শারীরিক বল,না মানসিক বল? শারীরিক বলই যে মনুষ্যের বল, এমন প্রতিপাদিত হয় না। মনুষ্যের বল মানসিক বল ও বীর্য্য। আমরা জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি কি পুরুষ জাতির মানসিক শক্তি অপেক্ষা হীনতর? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা এক্ষণে দুরূহ। যেহেতু, এ বিষয় পরীক্ষাসাপেক্ষ। জগতে আজিও কুত্রাপি সমান অবস্থায় ও সমান যত্নে স্ত্রী পুরুষের শিক্ষা হয় নাই। সুতরাং কাহার মানসিক শক্তি ও বীর্য্য অধিকতর, তাহা স্থির সিদ্ধান্ত করা দুঃসাধ্য। তবে যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি ও বীর্য্য যে পুরুষ অপেক্ষা অধিক কম আছে, এমত বলা যাইতে পারে না।

স্ত্রী জাতীর শারীরিক অসমর্থতা পুরুষ অপেক্ষা ন্যূনতর। সেই জন্যই বোধ হয় সকল সমাজের আদি কাল হইতে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। যেহেতু, মানবসমাজের প্রথমাবস্থায় আসুরিক বলই প্রধান হয়। ক্রমশ বুদ্ধিবল শারীরিক বলকে পরাজয় করে। এজন্য সর্ব্ব সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন। কিন্তু মনুষ্যসমাজে শারীরিক বলকেই প্রধান রাখা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু স্ত্রীজাতির বুদ্ধিবল হইতে যে সামাজিক লাভ হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে সমাজ বঞ্চিত থাকে। আর যখন পুরুষজাতি বুদ্ধিবলে ক্রমশ বলীয়ান হইয়া চারি দিকে মানসিক রাজ্য বিস্তার করিল এবং মানসিক সুখের প্রয়াসী হইল, তখন আপনাদিগের সহবাসিনী মহিলাগণকে পশুবৎ অধীনস্থ রাখিয়া তাহাদিগের আন্তরিক সৌন্দর্য্যের সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকা আপনাদিগেরই অসুখের কারণ বলিতে হইবে। স্ত্রীজাতি হইতে মনুষ্যসমাজ যে সম্যক্ মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে,তাহা তাহাদিগের স্বাধীনতা ব্যতীত কখন সম্ভবে না। এক্ষণে স্ত্রীজাতি অধীন থাকাতে, তাহাদিগের সত্তা পুরুষসত্তার সহিত মিলিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের স্বতন্ত্র সত্তা কিছুই নাই। সমাজসম্বন্ধে তাহারা অর্দ্ধ মৃত প্রায়। সুতরাং তাহাদিগের স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বাধীনতা হেতু যে মঙ্গল প্রসাধিত হইতে পারে, সমাজ সে মঙ্গল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। অথচ, স্ত্রীজাতির অধীনতা হেতু পুরুষজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কার্য্য করিতে পারিতেছে না। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা হেতু সমাজের যে কত ইষ্ট সাধন হইতে পারে, তাহা একবার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অসমর্থতা থাকিলেই যে সেই জাতিকে অধীনস্থ করা উচিত,এ কথা কখন স্বীকার করা যাইতে

পারে না। এ কথা যদি স্বীকার্য্য হয়, তবে প্রতি সবল ব্যক্তি প্রতি দুর্ব্বলকে অধীনস্থ করিবে, প্রতি সবল জাতি প্রতি দুর্ব্বল জাতিকে অধীনস্থ করিবে। কিন্তু সংসারে কি এ নিয়ম খাটে, না এ নিয়মে সংসার চলিতেছে? পঞ্জাবীরা বাঙ্গালী অপেক্ষা সবল তবে যদি আজি পঞ্জাবীরা বাঙ্গালিদিগকে অধীনস্থ করে, বাঙ্গালিদের দ্বিরুক্তি করা উচিত নহে। আমার বড় দাদার অপেক্ষা হয় তো আমার বল অধিক, তবে যদি আমি বড় দাদাকে অধীনস্থ করিয়া রাখি, আমি নির্দ্দোষী। আমার এক জন প্রতিবেশীর শারীরিক অসমর্থতা অধিক, তবে তাহাকে অধীনস্থ করিয়া রাখিলে আমার দোষ কি? সকলেই বলিবেন, দোষ আছে। কোন অস্ত্রে তবে প্রতি ব্যক্তির দুর্ব্বলতা এবং প্রতি জাতির দুর্ব্বলতা রক্ষিত হইতেছে? যে অস্ত্রে তাহা রক্ষিত হয় তাহা মনুষ্যের সামাজিক বল, এবং সেই সামাজিক বল মনুষ্যের বুদ্ধিবল হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মানবের শারীরিক দুর্ব্বলতা কিছুই নহে।

যদি কোন ভবিষ্য সমাজে স্ত্রীজাতি স্বাধীন হয়, তবে সে সমাজের ব্যবস্থা ও নিয়মাদি যে বর্ত্তমান সমাজের ব্যবস্থা ও নিয়মাদি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সমাজের ব্যবস্থাদি স্ত্রীজাতির অধীনতার উপর স্থাপিত, এক্ষণকার পরস্পর কর্ত্তব্যাদি সুতরাং সেই অধীনতামূলক। স্ত্রীজাতি স্বাধীন হইলে যে এই সমস্ত কর্ত্তব্য অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা নিশ্চয়। কিন্তু পরিবর্ত্তনের অর্থ সমাজের বিনাশ নহে, সমাজের অন্যরূপ নিয়মে স্থিতি বুঝায়। মনুষ্যসমাজ কখন বিনষ্ট হয় না। সমাজ আপনার নিয়ম আপনি গড়িয়া লয়। সমাজস্থ মনুষ্যমণ্ডলীর মন ও মতামত যে রূপে ফিরুক না কেন, সমাজও সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া দাঁড়াইবে এবং সুব্যবস্থা সকল গড়িয়া লইবে। কোন কালে কোন সমাজ এক নিয়মে চলে নাই, অথচ চিরকাল মনুষ্যসমাজ চলিয়া আসিয়াছে। সমাজের যখন এই রূপ গঠনশক্তি রহিয়াছে, তখন কোন পরিবর্ত্তনে সমাজনাশের আশঙ্কা নাই। স্ত্রীজাতি স্বাধীন হইলে যে সমাজ গঠিত হইবে, হইতে পারে সে সমাজের অবস্থা আমরা সম্যক্ অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু এক্ষণকার সামাজিক নিয়মাদি যে সে সমাজে চলিবে না তাহা নিশ্চয়। স্ত্রীজাতি স্বাধীন হইলেই যে পুরুষাবলম্বন পরিত্যক্ত হইবে, এরূপ অসম্ভব; যেহেতু স্ত্রীর সহিত পুরুষের কতকগুলি প্রাকৃতিক সম্বন্ধ আছে এবং উভয়কেই এক সমাজে অবস্থান করিতে হইবে। সুতরাং উভয়েই পরস্পর সাহায্য লইবে এবং উভয়েই আপন আপন বলবৃদ্ধির জন্য সুব্যবস্থা সকল স্থাপন করিবে। স্ত্রীজাতির যাহা অভাব থাকিবে, তাহা স্ত্রীজাতীয় সামাজিক ব্যবস্থায় সম্পূরণ হইয়া যাইবে। উভয়ের পরিতোষার্থে উভয়ে চেষ্টা করিবে।

তখন পরস্পরে পরিতোষ সাধন করা পরস্পরের অনিবার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইবে অথচ পরস্পরের যথেচ্ছাচারিতা পরস্পরে শাসন করিবে। এখন পুরুষ জাতিকে যেমন স্ত্রীজাতিরও ভাবিকার্জ্জন করিতে হয়, তখন সেই পুরুষজাতির শ্রমের অনেক লাঘব হইবে। কাযেকাযেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা উন্নতির মূল। সুতরাং সামাজিক উন্নতি অনেক পরিমাণে সাধিত হইবে।

অনেক লোক এমন আছেন, যাঁহারা পরিবর্ত্তনে কেবল বিপদ দেখেন। বর্ত্তমান সমাজ যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছে তাঁহারা সেই ভূমির উপরে অবস্থিত হইয়া ভবিষ্য সমাজের প্রতি দৃক্‌পাত করেন, সুতরাং তাঁহারা কেবল বিপদই দেখিতে পান। কিন্তু তাঁহারা জানেন না, পরিবর্ত্তনই মনুষ্যসমাজের জীবন। মনুষ্যসমাজ চিরকাল পরিবর্ত্তনেই জীবিত রহিয়াছে। পরিবর্ত্তনে অনিষ্ট হইতে পারে সত্য কিন্তু পরিবর্ত্তন নহিলে ইষ্ট হইবার যো নাই। হিন্দুসমাজ চিরকাল পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তবে সেই পরিবর্ত্তনের গতি অত্যন্ত মৃদু, এত মৃদু যে সে গতি আছে কি না ঠিক বুঝা যায় না। আমাদের সমাজ ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল আজি তাহা নাই। ভাল হউক, মন্দ হউক, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। সমাজ কখন এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না যে পরিবর্ত্তনই সমাজের জীবন, সে পরিবর্ত্তন একেবারে সমাজের অনিষ্টের কারণ হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের লেখক যে বলিয়াছেন "রমণীগণ পুরুষাবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রা হইলে, পদে পদে তাহাদের বিপদ ঘটিবে" একথা সত্য নহে। প্রথমে দেখুন, রমণীগণ সম্পূর্ণরূপে পুরুষাবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না এবং পুরুষগণও রমণীগণকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। উভয়েই পরস্পরের সুখের নিদান এবং উভয়েই পরস্পরের সাহায্যাবলম্বন করিবে। দ্বিতীয়তঃ, রমণীগণের বর্ত্তমান অধীনতা ঘুচিলে সমাজ একরূপে পরিবর্ত্তিত ও ব্যবস্থিত হইবে তাহাতে কাহারই বিপদ না ঘটিয়া বরং উভয়েরই সুখের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। একরূপ ঘটা এক দিনের কাজ নহে, কিন্তু সমাজ ধীরে ধীরে অতি মৃদু গতিতে এইরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। সমাজের গতি অলঙ্ঘনীয়। যিনি যাহাই বলুন সমাজের গতি কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। এক কালে বঙ্গসমাজের গতিক্রমে স্ত্রীজাতির অধীনতা এবং পুরুষজাতির প্রভুত্ব অথবা যথেচ্ছাচারিতা দিন দিন বাড়িতেছিল, ক্রমশঃই সেই অধীনতা এবং যথেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা ঘটিতেছিল। কিন্তু সমাজের একরূপ নিয়ম আছে যে তাহা অশুভের একটি সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অশুভ ঘটিয়া ঘটিয়া অবশেষে তাহা একরূপ সীমায় আইসে,

যখন সেই অশুভ আর অধিক দূর যাইতে পারে না, যাইলে সমাজস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটে। অশুভ যখন এই সীমায় আইসে তখন সেই অশুভের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়ে এবং লোকে তাহার প্রতি বীতরাগ হয়। আধুনিক বঙ্গ-সমাজের কৌলীন্যপ্রথার এই দশা ঘটিয়াছিল। এই প্রথা প্রথমে যে শুভ উদ্দেশে স্থাপিত হউক না কেন, কিন্তু সমাজের গতিক্রমে দিন দিন যখন তাহা হইতে গরল উৎপন্ন হইতে লাগিল তখন তৎপ্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল এবং যতদূর সাধ্য তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে লোকের চেষ্টা নিয়োজিত হইল। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সমাজের গতি অনিবার্য্য, তাহা এক দিকে না এক দিকে যাইবেই যাইবে। ভাল দিকে যাইলে তো ভালই, মন্দ দিকে যাইলেও ক্রমশঃ ফিরিয়া দাঁড়াইবে। আমরা এই গতি হয় প্রতিরোধ করিতে পারি, না হয় সেই গতির প্রবাহ বর্দ্ধিত করিতে পারি। এখন কথা এই, স্ত্রীজাতির অধীনতা এবং পুরুষজাতির যথেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন এক্ষণে বঙ্গসমাজ যে অবস্থায় আসিতেছে, এই অবস্থায় আমরা সুখী না অসুখী, স্ত্রীজাতির চিরবৈধব্যে আমরা সুখী না অসুখী, স্ত্রীজাতির ঘোর মূর্খতায়, আমরা সুখী না অসুখী, স্ত্রীজাতির বাল্যবিবাহে আমরা সুখী না অসুখী? পুরুষ-জাতির বহুবিবাহ এবং স্ত্রীজাতির এক মাত্র বিবাহে আমরা সুখী না অসুখী? যদি সুখী হইয়া থাকি আইস পুরুষ-জাতির যে যথেচ্ছাচারিতার এই সমস্ত অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং নারীজাতির যে ঘোর অধীনতা অথবা দাসত্বের এই সমস্ত অবশ্যম্ভাবী ফল, পুরুষজাতির সেই যথেচ্ছাচারিতা এবং নারীজাতির সেই অধীনতার গতি আরও বর্দ্ধিত করি। কিন্তু লেখক বলেন সুখী নই; যদি সুখী না হইয়া থাকি, আইস, পুরুষজাতির যথেচ্ছাচারিতার গতি প্রতি-রুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হই। সেই যথেচ্ছাচারিতা নিবারণের অমোঘ উপায় স্ত্রীস্বাধীনতা। কারণ, পুরুষজাতির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার বল যেমন সমাজকে একদিকে টানিতেছে, স্ত্রীস্বাধীনতার বল তদ্বিপরীতে কার্য্য করিলে সমাজের যে স্থানে আসা উচিত ঠিক উহা সেই স্থানে আসিতে পারিবে। পুরুষজাতিকে যদি নিজে নিজে তাহাদের যথেচ্ছাচারিতার বল নিবারণ করিয়া কর্ত্তব্যতার অবধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে সে, যথেচ্ছাচারিতা কখন সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, সে উদ্যোগ পুরুষজাতির স্বার্থ, ইচ্ছা ও অন্ধতা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ করিবে। কিন্তু তৎবিরুদ্ধে স্ত্রীজাতির আর্ত্তনাদধ্বনি উত্থিত হইলে তাহার প্রকৃত অবস্থা নিশ্চয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে; এবং স্ত্রীজাতির উন্নতিতে যদি পুরুষজাতির সুখ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, পুরুষজাতি যদি

এতকালের পরীক্ষা ও শিক্ষায় এমত অনুভব করিয়া থাকেন এবং সেই স্ত্রীজাতির সম্যক উন্নতি যদি স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে, তবে কি পুরুষ জাতির কর্ত্তব্য হইতেছে না, যে আপনাদের উন্নতির সহিত, আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত স্ত্রীজাতির উন্নতি ও জ্ঞান বৃদ্ধি সাধন করেন। কিন্তু নারীজাতির প্রকৃতিমধ্যে যে দেবভাব নিহিত আছে, মানবপ্রকৃতির যে মহত্ত্ব প্রোথিত আছে, স্বাধীনতা নহিলে কি সে দেবভাব স্ফুরিত হইবে? প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রীড়া ও সম্প্রসারণ না হইলে কি কন্যাদাস্ত দেবভাব স্ফুটিত হয়? স্বাধীনতার বিস্তারিত কার্য্যক্ষেত্র এবং স্বাধীন-শিক্ষার উদার কর্ষণ নহিলে নারীজাতির প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রীড়া ও সম্প্রসারণ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যদি স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতির উপর পুরুষজাতির সুখ নির্ভর করে, তবে অবশ্য বলিব, একমাত্র স্ত্রীস্বাধীনতা সেই উন্নতির নিদান, এবং এই স্বাধীনতা সম্পন্ন করা পুরুষজাতির কর্ত্তব্য।

আমাদের লেখকের আর একটি কথা ও প্রতিবাদসহ। আমাদের বঙ্গবামার অধীন অবস্থাকে যাঁহারা দাসীর অবস্থা বলিয়া উল্লেখ করেন, লেখক তাঁহাদের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন যে বঙ্গবামাকে দাসী বলা উচিত নহে। এ কথার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে যদি এরূপ অধীন অবস্থাকে দাসীর অবস্থা না বলিব, তবে দাসীর অবস্থা কি? লেখক কাহাকে দাসী বলেন? আমরা বিবাহকালে যার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যে দাসী আনিতে যাই, গৃহে আনিয়া কি সহধর্ম্মিণীকে সংসারের সেই দাসী করিয়া রাখি না? যাহা হউক, একটী শব্দ লইয়া গোলযোগ করা উচিত নহে। লেখক আর একটি বড় আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রস্তাবের এক স্থানে বলিলেন, পুরুষের বল স্ত্রীলোকের যদি থাকিত, পুরুষের সাহস ও দৃঢ়তা স্ত্রীলোকের যদি থাকিত, তাহা হইলে স্ত্রীলোক পুরুষের অধীনতা আদৌ স্বীকার করিত না। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সর্ব্বত্রই প্রবল, এই জন্যই স্ত্রীলোক অধীন হইয়াছে।" এস্থলে লেখক স্বীকার করিয়া গেলেন যে স্ত্রীলোক পুরুষের অধীন অথবা স্ত্রীলোক পরাধীন। লেখক অন্যত্রে বলিতেছেন "স্নেহ যে অধীনতার বন্ধনরজ্জু, সে অধীনতাও কি পরাধীনতা?" এস্থলে লেখক বলিতেছেন যে অধীনতা যদি স্নেহ বন্ধনে গ্রথিত হয়, তবে সে আর পরাধীনতা হইল না। আমরা অধীনা, সহিষ্ণু, সেবিকা স্ত্রীকে ভালবাসি বলিয়া স্ত্রী পরাধীন নহে। এই অর্থে পিঞ্জরবদ্ধ পাখীও পরাধীন নহে। যেহেতু পক্ষীকেও আমরা স্নেহ করি, কিন্তু আমরা পাখীকে কতক্ষণ ভালবাসি? যতক্ষণ পাখী পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া আমাদের মনস্তুষ্টি করে। লেখক বলেন পাখীর

অবস্থা পরাধীনতা নহে, কিন্তু পাখী কি তাহা জ্ঞান করে? লেখক বলেন, স্ত্রীর অবস্থা বেশ সুখের অবস্থা, কে বলে স্ত্রী পরাধীন? কিন্তু স্ত্রীলোক কি সেইরূপ ভাবে? তবে অভ্যাসবশতঃ তাহাদের অবস্থা কতক অংশে সুখের অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। আমরা গল্প পড়িয়াছি, একজন কয়েদী অতি দীর্ঘকাল কারাবাসে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তৎপরে সে উন্মুক্ত হইলে আবার কারাবাসেই যাইতে চাহিল। তদ্রূপ যে পাখী চিরদিন পিঞ্জরবদ্ধ আছে, সে একদিন পিঞ্জরদ্বার খোলা পাইলে উড়িয়া পলায়ন করে বটে, কিন্তু বহু কালের অভ্যাসজন্য প্রকাণ্ড আকাশে উড়িতে অসমর্থ হইয়া যখন আবার সে দ্বার দিয়া পিঞ্জরবদ্ধ হয়, তখন যেন পিঞ্জরে আসিয়া কিছু স্বচ্ছন্দ জ্ঞান করে। আমাদের স্ত্রীজাতির পরাধীনতার সুখ সেইরূপ। সর্ব্বশেষে লেখক বলিয়াছেন "স্ত্রীপুরুষ-সংমিশ্রণ কদাচ কল্যাণকর নহে।" তিনি আরও বলেন "যে প্রথা (স্ত্রীপুরুষ-মিশ্রণ) অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে, সে প্রথা পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য।" লেখক কেবল "কল্যাণকর নহে" "অবিবেচনার কার্য্য" প্রভৃতি কতগুলি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন মাত্র। কেন কল্যাণকর নহে, কেন অবিবেচনার কার্য্য, তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। সুতরাং এতৎসম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে পারিলাম না। লেখককে শুদ্ধ এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সন্তুষ্ট হইব যে, যদি স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হয় এবং যখন স্ত্রী স্বাধীন সমাজে স্ত্রীজাতি অধিকতর বলবতী ও সাহসিনী হইবে, তখন কি স্ত্রীপুরুষ-মিশ্রণ অকল্যাণকর হইবে, না তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে? পূর্ব্বে যদি কখন অকল্যাণকর হইয়া থাকে তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, তখন স্ত্রীজাতি সমাজে সম্পূর্ণ অধীন এবং তজ্জন্য দুর্ব্বলা ছিল কি না? আর যদি স্ত্রীপুরুষ-মিশ্রণ অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াথাকে তবে জিজ্ঞাস্য এই, যখন পরিত্যক্ত হইয়াছে তখন স্ত্রীজাতির অবস্থা কিরূপ ছিল এবং কোন্ জাতি তাহা অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে? স্ত্রীজাতিকে অধীন করিয়া যদি পুরুষসমাজ তাহাদিগকে সমাজমধ্যে রক্ষা না করিতে পারে, যদি অধীনা স্ত্রীজাতি সমাজে অরক্ষিতা থাকে, তবে সেরূপ সমাজের দুর্ব্বলতা কাহার দোষে ঘটিয়াছে? স্ত্রীজাতি স্বাধীন হইলে তাহারা সমাজ মধ্যে কি অধিকতর বলবতী, সাহসিনী, এবং আত্মরক্ষায় সমর্থা হইবে না? সমাজের সমধিক বল থাকিলে কি স্ত্রীপুরুষ সংমিশ্রণে অকল্যাণ ঘটে? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার উপর লেখকের কথার সত্যাসত্য নির্ভর করিতেছে।

"মানবতত্ত্ব" লেখক বলিয়াছেন, "অন্তঃপুর না থাকিলেও স্ত্রীদিগকে যথেচ্ছ ভ্রমণে বাধা না দিলে, যে ব্যভি-

চার বৃদ্ধি হয় তাহা ইউরোপ ও ভারতে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ইংলণ্ডে যে এককালে অন্তঃপুর-প্রথা নাই এমত নহে, এবং তথায় যে স্ত্রীজাতিরা ইচ্ছা হইলেই পুরুষের ন্যায় যথেচ্ছ ভ্রমণ ও বাস করে তাহাও নহে, তথাপি অন্তঃপুরপ্রথার কিঞ্চিৎ শিথিলতা থাকাতেই তথায় কত ব্যভিচার দৃষ্ট হয়।" এই কথাগুলি যে কত দূর সত্য লেখক তাহা প্রতিপাদন করেন নাই। আমরা জানি, সকল জাতিই আপনাদের স্ত্রী-সতীত্বের অহঙ্কার করেন। "মানবতত্ত্ব" লেখক যে ইংলণ্ডকে ব্যভিচারী বলিয়াছেন, সেই ইংলণ্ড আবার ভারতকে ঘোর ব্যভিচারী বলেন। ব্যভিচার কোথায় অধিক তাহা তুলনা করিবার যো নাই, কারণ তাহা গোপনীয় বিষয়। কিন্তু লেখক তাহাই তুলনা করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। তিনি নিজে সে তুলনা করিতে পারেন নাই। তিনি বোধ হয় নিজ জাতীয় সংস্কারের বিশ্বাস ও কথা বলিয়াছেন। তিনি লোককে বলিয়াছেন, তোমাদের বিশ্বাস কি না ইংলণ্ড অধিকতর ব্যভিচারী? তাহা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য ইংলণ্ড অধিকতর ব্যভিচারী। এ যুক্তি ধরিলে সকল জাতিই ব্যভিচারী হয়। ইংরাজের বিশ্বাসে আমরা অধিকতর ব্যভিচারী; তবে আমরা বা ব্যভিচারী কম কিসে? আবার দেখুন, আমাদের বর্ত্তমান অন্তঃপুরপ্রথা অধিক দিনের নহে। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতে যে অন্তঃপুরপ্রথা ছিল তাহার নিয়মও এক্ষণকার অপেক্ষা অনেকাংশে শিথিল ছিল। তখনকার শিথিলতা ইংলণ্ডের শিথিলতার সঙ্গে সমান হইতে পারে। সুতরাং "মানবতত্ত্ব" লেখকের যুক্তি অনুসারে ভারতের ব্যভিচারস্রোত ইংলণ্ডের ন্যায় সমপ্রবল ছিল। "মানবতত্ত্ব" লেখক কি বলেন মুসলমান জাতি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যভিচারী? কারণ, মুসলমান জাতিমধ্যে অন্তঃপুরনিয়মাদি অধিকতর কঠিন।

আমরা এ প্রস্তাবে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার অধিকাংশই "বঙ্গবাসীর সামাজিক অবস্থা" নামক প্রবন্ধ লেখকের প্রতি প্রযোগ করিয়া বলিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের কথাগুলি "মানবতত্ত্ব" লেখকের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে পারে। কারণ, শেষোক্ত লেখক স্ত্রীজাতির অধীনতা সমর্থনার্থ যে সকল হেতু দিয়াছেন, প্রথমোক্ত লেখকও তাহার অধিকাংশ দিয়াছেন। "মানবতত্ত্বের" অন্যান্য সামাজিক প্রবন্ধগুলির প্রতিবাদ করাও আমাদের কল্পনা রহিল। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীশ—

তৃষিতের বিষপান।

গরজে জলদ বরষে আকাশ,
খেলিছে বিজলী ছুটিছে বাতাস,
পূর্ণমাত্রা করি পুরাও গেলাস,
সহেছি অনেক সহে না আর!

সহিয়াছি যাহা সহিবার নয়,
প্রচণ্ড অনলে দহেছি হৃদয়,
নিষ্ঠুর বিধাতা তবু তৃপ্ত নয়,
নাহি পূর্ণ তবু মানস তাঁর!

নিদয় বিধাতা নিষ্ঠুর সংসার!
বিষময় ধরা দুঃখ-পারাবার!
বিন্দুমাত্র সুধা রেখেছে তোমার
অধরে মদিরে, সৃজিল ধাতা!

যে বলে বলুক ধাতা দয়াময়
মূর্খেতে বলুক ধরা সুখময়!
বুঝাইতে পারি দেখায়ে হৃদয়
কেমন দয়াল জগৎপাতা!

একটী কমল নীরব সাগরে,
একটী লতিকা এ মরু মাঝারে,
একটী কুসুম কণ্টক আগারে,
ধাতার প্রাণেতে নাহি রে সয়!

থাকরে সে কথা পুরারে গেলাস
জুড়াইব জ্বালা মিটাব পিয়াস
গরজে জলদ বরষে আকাশ
খেলিছে বিজলী ছুটিছে বায়!

কোরস্।

গরজে জলদ বরষে আকাশ,
বাড়িলরে আজ প্রাণের পিয়াস!
পূর্ণমাত্রা করি পুরাও গেলাস,
শূন্য দশ দিক্ আঁধার দেখি!

হলোনা হলোনা দাও আরবার!
শূন্য তবু প্রাণ, হৃদয় আঁধার!
অই যে রে হায় হেরিছি আবার
সে বিধুবদন সে নীল আঁখি!

অই যে আবার প্রিয়ার বদন,
প্রীতি মাখা সেই বিশাল লোচন,
সুধার উচ্ছ্বাস মধুর বচন,
আবার! আবার! পড়িছে মনে!

নিশার স্বপন তাওরে ফুরায়,
সাধের প্রতিমা বিসর্জ্জন যায়,
আঁধার গগনে বিজলী বিলয়
আঁধারে রাখিবে পথিক জনে!

পূর্ণ-কোরস্।

নিদয় বিধাতা নিষ্ঠুর সংসার,
সহেছি অনেক সহে না রে আর,
লয়েছি মদিরে শরণ তোমার;
কাতর হৃদয় জুড়াব আজ!

লয়েছি মদিরে। তোমার শরণ
সুখময় ধরা জেনেছি কেমন
নিষ্ঠুর ধাতার নিষ্ঠুর বচন
আকাশ-কুসুম! নাহি রে কাজ!

নিশার স্বপন তাওরে ফুরায়!
সাধের প্রতিমা বিসর্জ্জন যায়!
আঁধার গগনে বিজলী-বিলয়,
আঁধারে রাখিয়ে পথিকে হায়!

তরঙ্গ আঘাতে মৃণাল টুটেরে!
ছিন্ন সরোজিনী প্রবাহে ছুটেরে!
অই যে গগনে তারকা ফোটেরে
অসীম শূন্যেতে ছুটিয়ে যায়!

একটী তরণী অকূল সাগরে,
একটী তারকা এ ঘোর তিমিরে,

একটী রতন আঁধার সংসারে,
হারিয়ে বিধাতা হরিল তায়!

গরজে জলদ বরষে আকাশ,
দাও আরবার পুরায়ে গেলাম।

মিটাইব তায় প্রাণের পিয়াস,
এ পিয়াস যদি মিটান যায়!

পরিব্রাজক।

জাতীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়।

এই রোগশোকপূর্ণ পৃথিবীতে—এই অকালমৃত্যুবিধুর জগতে—চিকিৎসকের ন্যায় মানবের এমন বন্ধু আর কে? প্রাণদাতা অপেক্ষা প্রাণপ্রিয় আর কে? ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া জীবনযাত্রার উপযোগী দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া, রোগের ঔষধ রাখিয়া দিলেন ইতস্ততঃ। তিনি সব দিলেন সত্য, কিন্তু কোন্‌টী আমাদের ঔষধ তাহা বলিয়া দিলেন না। আমরা বহুকাল অন্ধকারে হাতড়াইলাম, পথ্য ও ঔষধ নির্ণয় করিতে না পারিয়া দলে দলে মারা পড়িতে লাগিলাম, চতুর্দ্দিক্ হাহাকারে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, পৃথিবী রসাতলে যায়, এমন সময় ধন্বন্তরি আবির্ভূত হইলেন। গুরুতর আবশ্যকতা অমানুষী প্রতিভার উদ্ভাবক। পৃথিবীর কষ্ট দেখিয়া ধন্বন্তরির হৃদয় ব্যাকুল হইল। তিনি পৃথিবীকে নিরাময় করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চিকিৎসকের জীবন চিরকালই কষ্টসঙ্কুল। তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিয়া গাছগাছড়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, নিজের প্রতি সেইগুলি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগের গুণ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সকল গবেষণা পুস্তকাকারে পরিণত হইল। এইরূপে আর্য্য আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি হইল। তিনি অসংখ্য শিষ্যপরিবৃত হইয়া অবিরাম চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক এক শিষ্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এক একজন মহারথী হইয়া উঠিলেন। পৃথিবী নিরাময় হইল, রোদনের ধ্বনি কিছু দিনের জন্য থামিল। অকালমৃত্যু বহুদিনের জন্য ভারত হইতে অন্তর্দ্ধান করিল।

কিন্তু হায়! কি পাপে আমরা সে স্বর্গসুখ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম? কেন আবার ভারত রোগশোকে পরিপূর্ণ হইল? অকালমৃত্যুজনিত আর্ত্তনাদে আবার ভারতগগন কেন পরিপূরিত হইতেছে? সে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এখন কোথায়, যাহার প্রভাবে মৃত সঞ্জীবিত হইত, কাটামুণ্ড জোড়া লাগিত, ভগ্ন অঙ্গ সংলগ্ন হইত? আজিও ভারতের জঙ্গলে সেই সকল গাছগাছড়া রহিয়াছে। আজিও ভারতের খনিতে সেই সকল ধাতু রহিয়াছে, তবে আজ ভারতে এত অকালমৃত্যুর রোল কেন? ভারতসন্তানগণ আজ কঙ্কালাবশিষ্ট কেন? পতিবিয়োগ বিধুরা রমণীর ক্রন্দনে, অঙ্কগত-শিশুবিয়োগ-বিহ্বলা জননীর আর্ত্তনাদে ভারতের পাষাণ

বেগবান হইতেছে কেন? ধন্বন্তরি সুশ্রুতের জন্মভূমি ভারতে চিকিৎসক নাই, একথা ভাবিতে আমাদের বুক ফাটিয়া যায়! চিকিৎসক নাই এমন কথা আমরা বলি না। তবে ধন্বন্তরির সে গবেষণা নাই, সেই নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধিৎসা নাই। রোগের মূল তত্ত্বনির্ণয়ে সে আত্মোৎসর্গ নাই। এখনও অনেক কবিরাজ আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কেবল পুরাতন বাঁধি গৎ কণ্ঠস্থ করিয়া— নিরক্ষর বেণের উদ্ভিদ-নির্ব্বাচন-শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সহজ-বৈদ্যত্ব লাভ করিয়া থাকেন। অর্থ তাঁহাদিগের জীবনের লক্ষ্য, সুতরাং যাহাতে শীঘ্র ও সহজ উপায়ে অর্থ লাভ করা যায়, তাঁহারা কেবল তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান অনন্ত উন্নতিশীল। চেষ্টা করিলে প্রতিদিন নব নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যেরা কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে চিকিৎসাতত্ত্ব—যে উদ্ভিজ্জতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, কত সহস্র বৎসর অতীত হইল, আজও তাহার উপর আর একটীও নূতন তত্ত্ব, একটীও নূতন উদ্ভিদ্ আবিষ্কৃত হইল না। গুঁড়া ঔষধ অপেক্ষা টিংচরের শক্তি অধিক। কিন্তু আর্য্যচিকিৎসা শাস্ত্রে টিংচর প্রস্তুত করার সুব্যবস্থা নাই। কত কাল গিয়াছে, গুঁড়া ও বটিকার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহার উপর আর উন্নতি হইল না। কবিরাজেরা আধুনিক উন্নত রসায়ন শাস্ত্রের সহায়তা লইয়া আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিতে পারিলেন না। আর, আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্রে যাহা ছিল, তাহাও প্রকৃত নির্ব্বাচন অভাবে ক্রমে ক্রমে লোপ হইতে লাগিল। কবিরাজেরা স্বয়ং অন্ধ, সুতরাং বেণেরা অনেক স্থলেই 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' করিয়া থাকে। যে দ্রব্যের যে গুণ নির্ণীত হইয়াছে, সে দ্রব্যের পূর্ণ পরিজ্ঞান (Identification) অভাবে, অনেক স্থলে ভিন্নগুণাবলম্বী দ্রব্যের ব্যবহার হওয়ায় অনেক স্থলেই ভয়ানক সম ফলিয়া থাকে। এই জন্য কোন কোন স্থলে আর্য্যচিকিৎসাশাস্ত্রের উপর লোকের ভীষণ বীতরাগ জন্মিয়া থাকে। ধন্বন্তরিপ্রমুখ প্রাচীন বৈদ্যগণ স্বয়ং গাছগাছড়ার গুণ আবিষ্কার করিতেন, এবং কোন্ কোন্ গাছ গাছড়ার কি কি গুণ, নিজের উপর প্রয়োগ করিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। আধুনিক হোমিওপেথিক (Simila similibus curantor) এর অনুরূপ বাক্য 'বিষস্য বিষমৌষধম্' আর্য্যচিকিৎসাশাস্ত্রে বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্বয়ং মহাদেব নিজ সুস্থশরীরে বিষপ্রয়োগ করিয়া বিষজনিত বিকার আবির্ভূত করাইয়া আবার বিষপ্রয়োগ দ্বারাই সেই বিকার নষ্ট করিতেন। এই প্রণালীতে ঐক্য থাকায় আর্য্যচিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে আধুনিক হোমিওপেথির অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ প্রণালী নয়, মাত্রাসম্বন্ধেও উভয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সৌসা-

দৃশ্য আছে; উভয়প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ মাড়ায় বা পুনঃ পুনঃ নাড়ায় ঔষধের শক্তি বাড়িয়া থাকে। বৈদ্যেরা স্পষ্ট বলিয়া থাকেন যে, ধাতুঘটিত ঔষধ যত মাড়িবে, ইহার শক্তি ততই বাড়িতে থাকিবে। সেইরূপ হোমিওপেথির প্রচারকেরা বলিয়া থাকেন যে, ঔষধ যত নাড়িতে থাকিবে, ততই ইহার শক্তি বাড়িবে। ডাইলিউসনের মূলতত্ত্ব এই নাড়ন। পুনঃ পুনঃ নাড়নে বা মাড়নে ঔষধ ক্রমিক বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইতে থাকে। একটী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ঔষধকণা অস্পৃষ্ট ঔষধকণা অপেক্ষা বহুগুণ শক্তি ধারণ করে। ১০ গ্রেণ কাঁচা কুইনাইনে যে শক্তি বিদ্যমান, ১ ফোটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট টিংচর কুইনিতে তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক শক্তি বিদ্যমান। এইরূপ অণুপরিমিত কবিরাজি ঔষধে যে শক্তি আছে, রাশি রাশি এলোপেথিক ঔষধেও সে শক্তি নাই। অথচ বহু পরিমাণ ঔষধ সেবনের বিষময় ফল আমাদিগকে ভুগিতেই হইবে, এইরূপে এলোপেথি আমাদিগের ক্ষীণ দেহকে আরও ক্ষীণতর করিয়া তুলিতেছে। এ অবস্থায় কবিরাজি বা হোমিওপেথি আমাদের অন্যতর আশ্রয়স্থল। অতিরিক্ত ঔষধসেবনজনিত প্রতিক্রিয়ার কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অনেকেই এক্ষণে কঠোর এলোপেথি অপেক্ষা সৌম্যমূর্ত্তি হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজি মতে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এরূপ যোগ্য লোকের সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন অনেকেরই সে মনোরথ পূর্ণ হয় না। সেহাৎ হাতুড়ের উপর নির্ভর করিতে অনেকেরই সাহস হয় না। এই জন্য এই উভয় মতের প্রকৃষ্ট প্রচারের জন্য উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি হোমিওপ্যাথী ও কবিরাজির সামঞ্জস্য সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে একটী মিলিত কলেজ সংস্থাপিত হইলে দেশের অতিশয় মঙ্গল। কবিরাজিতে যাহা আছে, হয়ত হোমিওপেথীতে তাহার সমস্ত নাই। সেইরূপ হোমিওপেথীতে যাহা আছে, হয়ত কবিরাজিতেও তাহার সমস্ত নাই। সুতরাং উভয় প্রণালীর উৎকৃষ্ট ভাগ গ্রহণ করিয়া এবং অপকৃষ্ট ভাগ পরিহার করিয়া একটী নূতন প্রণালী সংস্থাপন করিতে পারিলে, বড়ই ভাল। সেইরূপ এলোপেথির অস্ত্রচিকিৎসা ও রসায়ন তত্ত্ব পরিহার করা অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় চিকিৎসাবিদ্যালয়ে এই তিন প্রণালীরই সারাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তিন প্রণালীর সমন্বয় সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সেইটীই বিশেষ প্রার্থনীয়। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এই জাতীয় কালেজে তিন প্রকারের উপদেশ দিতে হইবে। ছাত্রেরা তিন প্রণালীতে দীক্ষিত হইলে প্রণালীত্রয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বুঝিয়া লইতে পারিবে। ক্রমে কুসংস্কার অপনত হইলে

তিন প্রণালীরই উৎকৃষ্ট ভাগ রহিয়া যাইবে এবং অপকৃষ্ট ভাগ স্খলিত হইবে। ক্রমে তিনেরই উৎকৃষ্ট অংশ এরূপ মিশিয়া যাইবে যে, তখন প্রণালীগত পার্থক্য আর অনুভূত হইবে না। সেই ঘনীভূত চিকিৎসাপ্রণালীই কালে জাতীয় চিকিৎসা প্রণালী বলিয়া গৃহীত হইবে। শুদ্ধ এই তিন প্রণালী কেন, হাকিমী চিকিৎসাপ্রণালীর সারাংশও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ প্রকাণ্ড জাতীয় চিকিৎসাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপনের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এই জন্য আমরা ভারতবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া এই জাতীয় কার্য্যের সংসাধনে কৃতসঙ্কল্প হন। সঙ্কল্প করিয়া বসিলে আজ হউক, কাল হউক, সিদ্ধিলাভ করিবেনই। আমরা শুনিলাম, জষ্টিশ মিত্র মহাশয় নাকি এই বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন। যদি সত্য হয়, ত কৃতবিদ্যমাত্রেরই তাঁহার সহিত যোগ দেওয়া উচিত। সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহোদয়দ্বয়ও হোমিওপ্যাথী মতে জাতীয় বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। তাঁহাদিগেরও এই জাতীয় উদ্যমে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ তাঁহারা একাকী এই গুরুতর বিষয় সংসাধন করিয়া উঠিতে পারিবেন না। কিন্তু জাতীয় উদ্যমের সহিত যোগ দিলে তাঁহারা দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। কি হোমিওপ্যাথ, কি এলোপ্যাথ, কি কবিরাজ, কি হাকিম—স্বদেশানুরাগী চিকিৎসক মাত্রেরই এই জাতীয় উদ্যমে যোগ দিয়া জাতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিসাধন করা উচিত। এই অভীপ্সিত, জাতীয় কালেজে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও থাকিবে না, ধর্ম্ম বা বর্ণগত বিদ্বেষবুদ্ধি থাকিতে পাইবে না। জাতীয় স্বাস্থ্য ও জাতীয় জীবন রক্ষাই ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে। সত্যের অনুসন্ধান ও বিজ্ঞানের চর্চ্চাই ইহার একমাত্র কার্য্য হইবে। এরূপ জাতীয় চিকিৎসাবিদ্যালয়ের আবশ্যকতা হইয়াছে। যখন ইহার আবশ্যকতা হইয়াছে, তখন আজ হউক, কাল হউক, ইহা প্রতিষ্ঠাপিত হইবেই হইবে। সময়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা অলসের কার্য্য—আইস ভাই, আমরা আর কিছু করিতে না পারি, অবিরাম আন্দোলন দ্বারা লোকের মনকে ইহার জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করি।

বোম্বায়ের পার্সীসম্প্রদায়।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

নিয়মগুলি কঠিন হইলেও পারসিকগণ অবাধে ঐগুলি পালন করিয়া আসিতেছেন। অধুনাতন পারসিকগণের মাতৃভাষা গুজরাটী। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পারসিকগণ এই ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। গুজরাটঅধিবাসীদিগের এই ভাষার প্রতি যত মায়া, যত যত্ন, ইঁহাদিগেরও তাহার প্রতি সেই মমতা, সেই আদর। ইঁহাদিগের প্রাচীন ভাষা "পহ্লবী", যাহা পারস্য হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, যাহা ইঁহাদের পিতৃপিতামহগণের মাতৃভাষা ছিল, ইঁহারা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার আলোচনা কিছু দিন পূর্ব্বে যেমন আমাদিগের ভট্টাচার্য্যগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, তেমনি পহ্লবী ভাষা ও শাস্ত্রের আলোচনা ইঁহাদিগের পুরোহিত—'দস্তুর" এবং "মোবেদগণের" মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়াছে। পারসী স্ত্রীলোকগণের পরিচ্ছদ অবিকল গুজরাটী হিন্দুদিগের ন্যায়; ইহার পরিধানপ্রণালীও প্রায় হিন্দুপ্রণালীর অনুরূপ। কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে, হিন্দুস্ত্রীগণ বসনাগ্র কটিদেশ হইতে দক্ষিণ দিক্ দিয়া বক্ষোপরি পরিধান করিয়া বাম স্কন্ধদেশ দিয়া ঘুরাইয়া লয়েন এবং ইঁহারা তৎপরিবর্ত্তে বাম দিক্ দিয়া লইয়া মস্তক বেষ্টনপূর্ব্বক দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া ঘুরাইয়া পুনরায় কটিদেশে গুঁজিয়া রাখেন। তদ্ভিন্ন আর একটি বিশেষ এই যে, পারসী রমণীরা প্রায়শঃ মস্তকে শ্বেত বর্ণের রুমাল বন্ধন করেন। গুজরাটী রমণীদিগের মধ্যে এ প্রথা নাই।

পুরুষদিগের পরিচ্ছদে অনেকটা প্রভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, মূলে হিন্দুদিগের সহিত তাহা অনেকাংশে একই প্রতীত হইবে। ইহাদের পরিধান পায়জামা, কোট এবং পাগড়ী; বিশেষের মধ্যে "সদ্রা" এবং "কুস্তি"। পায়জামা পারসীগণ সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের ন্যায় ধুতি পরিধান ইহাদের মধ্যে নিয়ম নাই। মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে কাহাকে কাহাকে কখন ধুতি পরিতে দেখা যায়। তাহাতে বোধ হয়, ইঁহারা পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ব্যবহার্য্য ধুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারা যে কোট ব্যবহার করেন, তাহা হিন্দুদিগের জামার রূপান্তর, ঝলঝলে অংশ বাদ দিয়া ছাঁটিয়া ছুটিয়া আপন ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে

ভদ্রবংশীয় পারসিকগণ পূরা জামা ব্যবহার করিতেন দেখা গিয়াছে। পারসীদিগের পরিচ্ছদের মধ্যে পাগড়িটাই কিছু বিশেষ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহাও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খিড়কিদার পাগড়ীর রূপান্তর; বিশেষ এই যে, হিন্দুদিগের পাগড়ী অপেক্ষা এই পাগড়ি কিছু লম্বা ঢপের। পূর্ব্বে শ্বেত বস্ত্রে এই পাগড়ি নির্ম্মাণ হইত, এখনও ইহাদিগের "দস্তুর" এবং "মোবেদগণ" ঐ বর্ণের পাগড়ি ব্যবহার করেন, কিন্তু সম্প্রতি ইহারা রঙ্গীন কাপড়ের পাগড়ি প্রস্তুত করে, যেহেতু উহা শীঘ্র ময়লা হয় না।

"সদ্রা" কার্পাসনির্ম্মিত ছোট জামা। ইহা শরীরের অব্যবহিত পরেই পরিহিত হয়। "কুস্তি" পশমের ৭২ গাছি সূত্রে পাকান ১ গাছি রজ্জু। ইহা তিন পেঁচ করিয়া কোমরে জড়ান থাকে, এবং গ্রন্থি দিয়া বাঁধা থাকে। দিবসে ছয় বার ইহাকে মন্ত্রপূত করা হয়। ইহার গ্রন্থি প্রত্যহ খোলা হয় এবং বাঁধিবার সময় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বাঁধা হয়। ইহা হিন্দুদিগের যজ্ঞোপবীতের প্রতিরূপমাত্র, বিশেষ এই যে, উপবীত হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল পুরুষগণই ধারণ করে, "কুস্তি" পারসীক স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই পরিধান করে। "সদ্রা"ও স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পরিধেয়। "সদ্রা" ও "কুস্তি" পারসীকদিগের অতি পবিত্র সামগ্রী। ইহা কবচস্বরূপে অনিষ্টাপাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করে, এই তাহাদের বিশ্বাস। ৭ বৎসর বয়সই পারসীকদিগের "সদ্রা" এবং "কুস্তি" পরিধান-সংস্কারের প্রশস্ত কাল। অতি সমারোহ পূর্ব্বক পারসীকগণ পুত্র কন্যাগণের এই সংস্কার সম্পন্ন করান।

পাগড়ীর নীচে একটি খাট টুপি এবং পদতলে চর্ম্ম পরিধান করা পারসীকেরা বিশেষ আবশ্যক মনে করে। খালি মাথায় থাকিলে প্রেতাত্মাগণ আবির্ভূত হইয়া উপদ্রব করে, এই তাহাদের বিশ্বাস।

● গোরোচনা পারসিকদিগের মধ্যে অতি পবিত্র সামগ্রী। পারসীক ভাষায় ইহাকে "নিরঙ্গ" বলে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে গোরোচনা মুখে দিয়া পবিত্র হওয়া প্রত্যেক পারসীকেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। দিবসের মধ্যে দ্বিতীয় বার পবিত্র হওয়া আবশ্যক হইলে, পুনরায় গোরোচনা মুখে দিতে হয়। বিশেষ পবিত্র হওয়া আবশ্যক হইলে গোরোচনা পানই বিধি। গোরোচনা দুষ্প্রাপ্য হইলে ছাগীর প্রস্রাব তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং লেবুর রস ছাগীমূত্রের পরিবর্ত্তে ব্যবহার হয়। পারসীক নব্য সম্প্রদায় এক্ষণে গোমূত্রে পাবন-ক্রিয়ার বিশেষ প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সঞ্জননগরের অনতিদূরে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পারসিকদিগের বাসস্থান নিরূপিত হয়। এই স্থান বিশেষ উর্ব্বর এবং পারসিকগণ নিজ শিল্পচাতুর্য্য,

পরিশ্রম এবং মিতাচারিতার গুণে অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠে এবং এই স্থান হইতে ক্রমশঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং নানা স্থানে ইহাদিগের বাস স্থাপন করে।

বহু কাল এইরূপ সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হয়, পরে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভে অহমেদাবাদাধিপ মহম্মদ বেগদা সঞ্জনের ঐশ্বর্য্যের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহাকে করগত করিতে বাসনা করিলেন, এবং তৎপ্রদেশীয় হিন্দু রাজার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক কর গ্রহণ করিতে ও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সেনাপতি আলেফ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। পারসিকগণ প্রাণপণে আপনাদিগের রক্ষাকর্ত্তা উক্ত হিন্দু রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইল এবং ১৪০০ চৌদ্দশত সাহসী পারসিক আক্রমণকারী যবনদিগের প্রতিকূলে সমরার্থে প্রস্তুত হইল। তাহাদিগের অধিনায়ক অর্দ্দশীর অসীম সাহসে যবনদিগের সহিত অনেক সংগ্রাম করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত উদ্যোগ ও পরাক্রম ব্যর্থ হইল। অবশেষে তিনি নিধন প্রাপ্ত হইলে পারসিকগণ পরাস্ত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং প্রাণভয়ে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বানসোদা নামক স্থানে বহুসংখ্যক পারসিক পলায়ন করিল। সে সময়ে বোম্বাই সহরের সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং তথায় আর কেহ গমন করিল না।

সুরাট-নগরে বহুসংখ্যক পারসিক বাস করিত। বৈদেশিক ব্যবসায়িগণ তাহাদিগের হইতে অনেক উপকার পাইত, কারণ তাহারা মধ্যস্থ থাকিয়া বৈদেশিক ও অধিবাসিগণের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় সুগম করিয়া দিত। এই উপায়ে তাহারা ক্রমে ক্রমে বিলক্ষণ ধনী হইয়া উঠিল। যখন ইংরাজগণ বোম্বাই নগরটি প্রাপ্ত হইলেন, সে সময়ে দোরাবজী নানাভাই নামক এক জনমাত্র পারসিক উক্ত নগরে বাস করিত। সেব্যক্তি নানা বিষয়ে ইংরাজদিগের উপকার করিয়া তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজাধিকারে বোম্বাই নগর ক্রমে ক্রমে সুরাট নগরকে সৌভাগ্যে অতিক্রম করিতে লাগিল, এবং অনেক পারসিকও সুরাট পরিত্যাগ করিয়া অভিনব বোম্বাই নগরে আসিয়া বসতি করিতে লাগিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের শেষে বোম্বাই নগর বিস্তর পারসিকের আবাসভূমি হইয়া উঠিল।

পারসিকগণ ভারতবর্ষ প্রবাস কালে সকলেই যে স্ত্রী সমভিব্যাহারে আসিয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। অধুনাতন কালে রেলওয়ে, বাষ্পীয়পোত এবং গতায়াতের অন্যান্য সুগম উপায় উদ্ভাবিত হওয়াতেও দেখা যায় যে, ইউরোপ খণ্ড হইতে বৎসরে বৎসরে যে অসংখ্য জন মণ্ডল প্রবাসী হইয়া উপনিবেশ সমূহে যাত্রা করে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতীব স্বল্প। সুতরাং

তখনকার কালে সে সকলে পুত্র কলত্রাদি লইয়া আসিতে পারিয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ লোকগণ তাহাদিগকে লইয়া আইসে, আপামর সাধারণে তাহাদিগকে লইয়া আসিতে পারে নাই, সুতরাং বোধ হয় হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে দল পুষ্ট করিতে হইয়াছিল এবং এই কারণে বোধ হয় যে, পারসীদের ধমনীমধ্যে পারসিক অপেক্ষা গুজরাটী রক্ত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

পারসিকগণের নামকরণ অধিকাংশ স্থলে শাহনামা ও জেন্দ আবেস্তার উল্লিখিত বীর পুরুষ এবং দেবদেবীগণের নামের অনুকরণে হইয়া থাকে। বহরাম (পূত দিব্য অগ্নি), হরমজ্ (দিব্য পুরুষ), অর্দ্ধশির (শাসান রাজবংশের অধিষ্ঠাতা), নৌশেরবান্ (স্বনামখ্যাত রাজা), খুরশেদ (সূর্য্য), মহতাব (চন্দ্র), কৈকোবাদ, খস্রু ইত্যাদি নাম সচরাচর বিশেষ প্রচলিত। হীরা, মাণিক, মতি, রতন প্রভৃতি নাম স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। পারসিকগণ এই সমস্ত নাম শুদ্ধ ব্যবহার করেন না, এই নামের পশ্চাতে একটি "জি" উপসর্গ জুড়িয়া দেন। যথা—বহরামজি, হরমস্‌জি, জেমসেটজি। এই "জি" উপসর্গ সংস্কৃত জীব শব্দের অপভ্রংশ। হিন্দুস্থানে এই শব্দ "জিউ" ইত্যাকারে প্রচলিত আছে। যথা—কিষেণজিউ, হনুমানজিউ ইত্যাদি। বাঙ্গালাতেও ইহা প্রচলিত। যথা ভাইজিউ, বাবাজিউ, ইত্যাদি।

বঙ্গদেশে নাম ও উপাধি লইয়া পূর্ণ নাম হয়। যথা—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল। বাঙ্গালায় এই উপাধি বংশপরিচায়ক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শুদ্ধ একটি নাম মাত্র ব্যবহৃত হয়, উপাধি প্রায় ব্যবহার হয় না। যথা—সূর্য্যমল্ল, সদাশিব ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাটীদিগের মধ্যে নাম এবং উপাধির মধ্যে পিতার নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ অর্থাৎ ত্র্যম্বকের পুত্র কাশীনাথ—উপাধি তৈলঙ্গ (তৈলঙ্গদেশীয়)। পারসিকেরা এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। যথা—হরমসজি শাহপুরজি ওয়াদিয়া অর্থাৎ শাহপুরজির পুত্র হরমসজি, উপাধি ওয়াদিয়া (পোতনির্ম্মাতা)। কখন কখন কোন উপাধি থাকে না, তখন কেবল নাম ও পিতৃনামে পূর্ণ নাম হয়। যথা—মাণিকজি রোস্তমজি ইত্যাদি।

পারসী উপাধিগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং ভারতবর্ষীয় চলিত ভাষা সমূহ হইতে গৃহীত। উপাধিগুলিতে ব্যবসায়, জন্মস্থান ইত্যাদি জ্ঞাপন করে। যথা—মুদি, বাঙ্গালি, ওয়াদিয়া (পোতনির্ম্মতা), শেঠ, শ্রফ (মহাজন) মতিওয়ালা, মিস্ত্রি, প্যাটেল (গ্রাম্য পাটয়ারি), রেডিমনি (নগদ টাকাওয়ালা) ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকদিগের নাম প্রায়শঃ ভারতবর্ষীয় ভাষা সমূহ হইতে গৃহীত। যথা—হীরা, মাণিক, রতন, মতি, অন্ন ইত্যাদি। পুরুষদিগের নামের পর যেরূপ "জি" উপ-

সর্গ ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকগণের নামের পর "বাই" শব্দ ব্যবহৃত হয়। কোন স্ত্রীলোক যতই কেন নীচবংশোদ্ভব হউক না, তাহার নামের পর "বাই" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাটিদিগের মধ্যে "বাই" শব্দ কেবল সম্ভ্রান্ত স্ত্রীগণের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বোম্বাই নগরে তিনটি সুসজ্জিত বাটী আছে, উহা কেবল বিবাহার্থীদিগের ব্যবহারার্থ ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহাদের নিজ বাটীতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইবার সুবিধা না হয়, তাঁহারা ঐ বাটী ভাড়া লন এবং সেই স্থানেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পারসিকদিগের বিবাহপদ্ধতি কতকটা হিন্দুদিগের ন্যায়। বিবাহের সময় উপঢৌকন আদান প্রদান, নৃত্য গীত, বাদ্য ভোজ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক মন্ত্র পঠিত হইয়া বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়; বর ও কন্যা উভয়ের মধ্যে একখানি বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। সেই সময়ে পুরোহিত "আবেস্তা" হইতে মন্ত্রোচ্চারণ করিলে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তৎপরে বৃদ্ধগণ বর ও কন্যার মস্তকে ধান্য ও নারিকেলের শাঁস ছড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহক্রিয়া দিবাভাগেই সম্পন্ন হয়।

পারসিকদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিছু বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত। অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহারা শবের দাহ অথবা সমাধি করে না। পশু পক্ষিগণের ভক্ষণার্থ উহা বিজন প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া আইসে। নগরমধ্যে অথবা জনাকীর্ণ স্থানে যেখানে সেখানে শব নিক্ষেপ করা হইতে পারে না। অতএব ইঁহাদের অন্ত্যেষ্টি জন্য নগরের বাহিরে পাহাড়ের উপরে একটি অতি উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মিত আছে। অট্টালিকা এত উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে যে, তাহাতে নিক্ষিপ্ত গলিত শবের পূতিগন্ধ নীচে না আইসে। এই অট্টালিকাকে "Tower of silence" অথবা "বিজন প্রাসাদ" কহে। এই বিজন প্রাসাদোপরি নগরবাসী পারসিকদিগের শব নিক্ষিপ্ত হয়। তথায় গৃধ্র, শকুনি প্রভৃতি পক্ষী কর্ত্তৃক ইহা ভক্ষিত হয়। পারসিকদিগের বিশ্বাস, এইরূপে শব ভক্ষিত হইলে আত্মা স্বর্গে যায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্র——

ঊষা।*

(কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত।)

বাণ-পুরাধিপ-বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা, কৃতাঞ্জলিপুটে, নমে তব পদে,
যদুবর!—পত্রবহ চিত্রলেখা সখী
(দেখা যদি দেহ দেব,) কহিবে বিরলে
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে।
অকূল পাথারে, নাথ, চিরদিন ভাসি,
পাইয়াছি কূল এবে! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিনু? ক্ষম প্রভু! বিবশা এ দাসী
হরষে! হরষে যথা হাসে কুমুদিনী
হেরিয়া আকাশদেশে সুধাংশু-নিধিরে
চিরবাঞ্ছা; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে;
তেমতি এ প্রাণ আজি নাচিছে পুলকে।
আনন্দ-জনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ, নাথ, সঙ্গিনীসমূহে,
গাইছে মধুর গীত মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র! ঊষার হৃদয়ে
আশা-লক্ষ্মী আজি ঊষারে পিবে কৌতুকে
শুন এবে কহি, দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

আয়ুর্ব্বেদ-সম্বন্ধে একটী গুরুতর আলোচনা।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রথম দিন হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত জ্বররোগকে তরুণ জ্বর বা নব জ্বর কহে। জ্বরের এই তরুণ অবস্থাতে জ্বরনাশার্থ সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনও প্রধান ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত কি না, তাহার নির্ণয় আয়ুর্ব্বেদের একটী অতি প্রধান তত্ত্ব।

বর্ত্তমান সময়ে বৈদ্যদিগের চিকিৎসা দুই প্রকার,—বৈদিক ও তান্ত্রিক। অধিকাংশ বটিকা ঔষধ, তান্ত্রিক মতে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়; আর উদ্ভিদ-ঘটিত ঔষধ অর্থাৎ বস্তুর রস, কল্ক (ছাল ইত্যাদি পেষিত করা), ক্বাথ (সচরাচর যাহাকে পাঁচন কহে), ইত্যাদি এবং তৈল, ঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সকল বৈদিক মতে অর্থাৎ সুশ্রুত-সংহিতা, চরক-সংহিতা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের মতানুসারে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে তান্ত্রিক ঔষধ সকল জ্বররোগের প্রথমাবস্থা হইতেই

---

* যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ পাঠ করিয়াছেন, বাণতনয়া ঊষার চরণবৃত্তান্ত তাঁহার নিকট অপরিচিত নহে। বঙ্গীয় কবিশিরোমণি, সেই মূল অবলম্বন করিয়া ঊষার পত্রিকা রচনারম্ভ করিয়াছিলেন। সম্পন্ন হইলে, তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের আর একটী মনোহর সর্গ বৃদ্ধি হইত।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

প্রয়োগের বিধান ও ব্যবহার আছে। কিন্তু বৈদিক ঔষধ সকল জ্বররোগের প্রথমাবধি প্রয়োগ করিবার বিধান নাই, বরং অনেক স্থলে নিষেধ আছে। এই জন্য দেশীয় বৈদ্যেরা তাহা প্রায়ই প্রয়োগ করিতে সক্ষম নহেন। এমন কি, সেই বৈদিক নিষেধের প্রবলতা ও অধিকতর প্রামাণিকতা লক্ষ্য করিয়া অনেক সময়ে তরুণ জ্বরে তান্ত্রিক ঔষধও প্রয়োগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং সেই অনিচ্ছার পোষকতাকে আয়ুর্ব্বেদীয় বচনগুলি আবৃত্তি করেন। তাঁ[illegible] ব্যবস্থা এই যে, জ্বররোগী [illegible] পর্য্যন্ত উপবাসাদি করিবে [illegible] রীতিমত ঔষধ প্রয়োগ [illegible]বে।

এই প্রথা এতদ্দেশে বহুকাল চলিয়া আসিতেছিল। পরে এলোপ্যাথী ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত হইবার সময় হইতে এ বিষয়ে এক প্রকার যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। জ্বররোগের ২।৩ দিনের মধ্যে কোনও ডাক্তারকে চিকিৎসার্থ আহ্বান করিলে, তিনি প্রায়ই প্রথমে জোলাপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া তৎপরেই কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ পূর্ব্বক ৫।৬ দিনে মধ্যে আরোগ্য দেখাইয়া দেন। এইরূপ বিসদৃশ ঘটনা দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হন এবং সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবস্থা ও তদ্ব্যবসায়ী বৈদ্যগণের প্রতি মনে মনে অশ্রদ্ধাও করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত কারণে আমরা প্রস্তাবিত বিষয়টীকে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় প্রধান তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় মূলগ্রন্থ ও সংগ্রহগ্রন্থ সকলের বিশেষ আলোচনা, প্রামাণিক টীকাকারদিগের ব্যাখ্যাদর্শন, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের সহিত যুক্তি এবং দেশ, কাল, পাত্রাদির অবস্থা পরিচিন্তন, এই গুলির বিশেষ আবশ্যকতা আছে। আমরা স্থূল বুদ্ধিতে যত দূর পারি, পুস্তকাদির চর্চ্চা করিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মত গ্রহণের প্রার্থনায় এবং নিজ সন্দেহ নিরাসার্থ ও এতদ্বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদীয় প্রকৃত মত, সাধারণকে অবগত করাইবার উদ্দেশে ইহা প্রচারিত করিতেছি। অদ্যকার বিবরণে আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় যে গ্রন্থ গুলি প্রচলিত, তাহার বিধান, তদ্বিষয়ে টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যাতে আমাদিগের যে যে আপত্তি বা সংশয় আছে, তাহাই লিখিব।

১। আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
[পৌষ্কলাবত সংহিতাবচন; চক্রদত্ত সংগ্রহ ৩৭ শ্লোক, জ্বররোগ।

২। সপ্তাহে নৈব পচ্যন্তে
সপ্তধা তু গতা মলাঃ।

* এই প্রস্তাবে অভয়ানন্দ গুপ্তের মুদ্রিত সটীক চক্রদত্ত, জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের মুদ্রিত চরক ও সুশ্রুত-সংহিতার উল্লেখ হইল।

নিরামশ্চাপ্যতঃ প্রোক্তো
জ্বরঃ প্রায়েহষ্টমেহহনি ॥
[মাধবনিদানের টীকাধৃত চরকবচন।

৩। অষ্টাহো নিরামজ্বরলক্ষণম।
[চরক, চিকিৎসিত স্থান; কিংবা মাধবনিদান, ২৭ পৃঃ ৩৪ শ্লোক।]

৪। ভেষজং হ্যামদোষস্য
ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরম্ ॥
[সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র, ৩৯ অ, ৯৯ পৃঃ ; * মাধবনিদান ২৭ পৃঃ, ৩৩ শ্লোক; অথবা চক্রদত্ত ১৩ পৃঃ ৪০ শ্লোক।]

৫। পাচনং শমনীয়ং বা
কষায়ং পায়য়েত্তু তম্।
জ্বরিতং ষড়হেহতীতে
লঘ্বন্নপ্রতিভোজিতম্ ॥
[চক্রদত্ত, জ্বর, ৩৮ ॥

৬। সপ্তাহাৎ পরতোহস্তব্ধে
সামে স্যাৎ পাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধে
সামে নৌষধমাচরেৎ ॥
[চক্রদত্ত, ৩৯।

অর্থ,—সাত দিন পর্য্যন্ত জ্বররোগকে তরুণ জ্বর বলে। রস রক্তাদি সপ্ত ধাতুতে যে বাত, পিত্ত ও কফ নামক দোষ সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাদিগের পাক ৭ দিনে হয়। সুতরাং ৮ম দিন প্রায়ই জ্বরের নিরামভাব কাল হয়। ফলতঃ অষ্টম দিনকে নিরাম জ্বরের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

আম দোষ থাকিতে থাকিতে ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর পুনরায় জ্বলিত হয়। অতএব জ্বররোগে ৬ দিনের পর সপ্তম দিনে রোগীকে লঘু আহার দিয়া ৮ম দিন হইতে পাচন কষায় অথবা শমনীয় কষায় প্রয়োগ করিবে।

ফলতঃ সপ্তাহের পর যদি প্রবল সামতা থাকে, তাব যাবৎ সেই অবস্থা থাকে, বিষম জ্বর উপস্থিত করে। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার, ঔষধ জ্বরকে জ্বলিত করে না, ইহা তাৎপর্য্য দ্বারাই বোধ হয়। ফলতঃ উভয় পক্ষেরই অনিষ্টকারিতা আছে। এই জন্য, উভয়ই নিষিদ্ধ হওয়া মন্দ নহে। কিন্তু গুলঞ্চ, নিম্ব, অথবা কুইনাইন সদৃশ ঔষধ প্রয়োগ করিলেও জ্বর ভাল না হইয়া প্রজ্বলিত হইবে, মূল সংহিতার এরূপ উদ্দেশ্য নহে। সংগ্রহগ্রন্থের শ্লোকার্দ্ধটী পাঠ করিলে একটী কুসংস্কার উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার্য্য।

---

* এই সুশ্রুত বচনের প্রথমার্দ্ধ যে দুই খানি সংগ্রহপুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে ইহার শেষার্দ্ধ এই ;—
"শোধনং শমনীয়ন্তু
করোতি বিষমজ্বরম্ ॥"
প্রথমার্দ্ধমাত্র গ্রহণ করিলে এই অর্থ হয় যে, আমদোষ বিদ্যমান থাকিতে জ্বররোগে যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে, জ্বর বাড়িবে। সমস্ত শ্লোক গ্রহণ করিলে এই অর্থ হয় যে,—সাম অবস্থায় শোধনীয় ঔষধ অর্থাৎ বমনকারক অথবা বিরেচকাদি ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর বাড়িবে। আর শমনীয় ঔষধ (যাহা বমন ইত্যাদি করায় না, যথা দশমূল পাচন ইত্যাদি) ঔষধ প্রয়োগ করিলে

তাবৎ কোনও ঔষধ দিবে না, তাহার পর কিঞ্চিৎ সামতা থাকিলে, আম রসের পাচক ঔষধ এবং নিরাম অবস্থায় শমনীয় ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

উপরিলিখিত সংস্কৃত শ্লোকগুলির স্থূল অর্থ লিখিত হইল। মাধবীয় নিদানের টীকাকার বিজয় রক্ষিত এবং চক্রদত্ত সংগ্রহের টীকাকার শিবদাস ঐ শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিবার সময় অন্যান্য গ্রন্থের বহুতর বচনের উদ্ধার এবং অনেক তর্ক বিতর্ক ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সে সমস্ত লিখিলে বাহুল্য হইবে, এই নিমিত্ত টীকাকারদিগের যে সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আমদোষ দুই প্রকার। যথা, বাত, পিত্ত ও কফরূপ দোষের সামতা এবং রসরূপ দূষ্যের সামতা।

প্রথম সিদ্ধান্ত।

১। সপ্তাহ না হইলে, সপ্তধাতুগত দোষের পাক হয় না। সুতরাং দোষদিগের তৎকৃতরূপ সামতা ৭ দিনে গত হয়; ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

(সটীক চক্রদত্ত ১৩ পৃঃ, ৩৮ শ্লোকের টীকা)

অতএব অষ্টাহই দোষ-নিরামতার কাল, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা খরনাদ প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের বচনের সহিত একবাক্যতা হইতেছে।

(চক্রদত্ত, ১২ পৃঃ টীকা)

২। রসের পক্ষে মুখের বিরসতা, তৃষ্ণা, অরোচক ইত্যাদিরূপ সামতা ৭ দিন পরেও থাকিতে পারে।

যথা,—যে ব্যক্তি শ্লেষ্মপ্রকৃতি, তাহার শ্লেষ্মজনিত জ্বর হইলে, যদি তাহাতে বমন দ্বারা শ্লেষ্মার বিনাশ বা অল্পতা না হয়, তবে তাদৃশ স্থলে ৭দিন পরেও রস-সামতা থাকিতে পারে।

(চক্রদত্ত ১৩ পৃঃ টীকা)

ঐ রস-সামতাও ৭ দিনের পর অধিকাংশ স্থলে উচ্চ সীমা ১০ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

(চক্রদত্ত, ১৩ পৃঃ টীকা)

বাতাদি দোষসকলের অল্পতা প্রযুক্ত ব্যক্তিবিশেষ রসের সামতা ৭ দিনেও গত হয়।

(ঐ ১৩ পৃঃ টীকা)

"মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে" ইত্যাদি সুশ্রুত-বচনে যে অল্পদিনের জ্বরেও, জ্বরের অল্পতা ও গাত্রের লঘুতা দর্শন করিলে ঔষধ প্রয়োগের বিধান আছে, তাহার এরূপ অর্থ নহে যে, ৭ দিনের সময় ঐ অবস্থা ঘটিলে ঔষধ দিতে হইবে। কারণ, ঐরূপ তাৎপর্য্য হইলে সুশ্রুতাচার্য্য "সপ্তাহাৎ পরতঃ কেচিৎ" এই শ্লোক লিখিতেন না।

৩। অতএব সপ্তাহমধ্যে দোষসকলের ও রসের সামতা প্রযুক্ত দোষসকলের সংশোধনীয় অথবা সংশমনীয় কিংবা আমরসের পাচক কোনরূপ মুখ্য ভেষজ (দ্রব্যের স্বরস কল্ক, ক্বাথ, শীতকষায়, ফাণ্ট, ক্ষীর, চূর্ণ) ঔষধের প্রয়োগ নিষেধ

নহে। কারণ, তাহাতে জ্বর আরও বাড়িবে।

তৎকালে আমরসের পাক ও অগ্নির সন্ধুক্ষণার্থ ঔষধ দ্বারা সিদ্ধ করা পেয়া (ঔষধ এবং তণ্ডুল দ্বারা সাধিত খাদ্য বিশেষ) এবং দোষের পাক, পিপাসা-নাশ ও আভ্যন্তরিক শিরা প্রভৃতির বদ্ধতা নিবারণার্থে ঔষধদ্বারা সিদ্ধ করা জলের প্রয়োগ হইবে।

৭ দিনের পর অষ্টম দিন হইতে রসের প্রবল সামতা থাকিলে, পূর্ব্বরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য। অল্প সামতা থাকিলে অগ্রে পাচন, পরে সংশমনীয় ভেষজ প্রয়োগ হইবে।

একেবারেই নিরামতা হইলে, সংশমনীয় ভেষজ প্রয়োগ হইবে।

(চক্রদত্ত, জ্বররোগ ১৫,১৬,৩৯,৪০ শ্লোক এবং ১২ পৃঃ টীকা)

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

১। অথবা পিত্তজ্বরের পক্ষে অল্প সামতা থাকিলে, সপ্তাহের মধ্যে যে কোনও দিনে পাঁচন কষায় মাত্র প্রয়োগ হইতে পারে।

(চক্রদত্ত, ১২ পৃঃ টীকা)

২। দোষসকলের সামতা অল্প থাকিলে, পিত্তজ্বর ব্যতিরিক্ত অন্যান্য জ্বরে ৭ম দিন হইতে ঔষধ প্রয়োগ হইতে পারে। ফলতঃ হারীত ও খরনাদ প্রভৃতির বচন এবং "মৃদুহে দেয়ং" ইত্যাদি বচন এই উদ্দেশেই লিখিত; অর্থাৎ ঐ সকল বচনের রচয়িতারা অল্প সামতাবস্থকেই ৭ম দিন হইতে ঔষধ প্রয়োগের বিধান করিয়াছেন।

(চক্রদত্ত, ১৬৬ শ্লোকের টীকা, ৪১ ৪২ পৃঃ)

আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহগ্রন্থগুলির বিবরণ এবং টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে লিখিত হইল। এক্ষণে এতদ্বিষয়ে বক্তব্য কথার উত্থাপন করা যাইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ অতি দুরূহ গ্রন্থ। ইহার বিধি-নিষেধের উপরি মনুষ্যের জীবন ও মরণ উভয়ই নির্ভর করে। সুতরাং এতাদৃশ বিষয়ে পুরাতন সংহিতাকর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের লিখনের উপরি কোনও রূপ স্বাধীন মত প্রয়োগ করা ধৃষ্টতার কার্য্য, বোধ হয়, এই বিবেচনাতে আমাদিগের উল্লিখিত টীকাকার মহাশয়েরা প্রস্তাবিত বিষয়ের সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থের বচন-রক্ষাতে তাঁহাদিগের যত যত্ন, প্রকৃত ঘটনাতে দৃষ্টিপাত এবং সম্ভব অসম্ভব বিচারে তাদৃশ মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে না। অপরন্তু আমাদিগের বোধে সিদ্ধান্তকারী মহাশয়েরা কোন কোন অংশে ভ্রমেও পতিত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত আমাদিগের বিবেচনায় এই সিদ্ধান্তের উপরি যে যে সন্দেহ বা আপত্তি আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

আপত্তি।

১। যেখানে বচন সকলের একবাক্যতা হয়, তথায় আর বিশেষ বিধান দ্বারা সাধারণ বিধানের সঙ্কোচ সাধন

সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা স্থির হয় নাই বলিতে হইবে। এ স্থলে যদি ৭ দিন না গেলে সপ্ত-ধাতুগত দোষের তরুণতা রূপ সামতার পরিপাক হয় না, এই তত্ত্বই স্থির হয়, তবে পিত্তজ্বরের পক্ষেও সেই কারণের বিদ্যমানতা সত্ত্বে পিত্তজ্বরে বিশেষ বিধান সঙ্গত হয় না। অপরন্তু, যদি পিত্তজ্বরের পক্ষে বিশেষ বিধান স্বীকার করা হয়, তবে পিত্ত-জ্বরাদি যাবতীয় জ্বরে ৭ দিন পর্য্যন্ত দোষসকলের সমতা থাকে, ইহা স্থির; এই বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন বচনের একবাক্যতা সম্পন্ন রূপ প্রথম পক্ষ সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইতেছে। প্রথম পক্ষে বিশ্বাস করিলে, পিত্তজ্বরী ব্যক্তিকে ৭ দিন মধ্যে মুখ্য ঔষধ দেওয়া হয় না; আর দ্বিতীয় পক্ষে বিশ্বাস করিলে, তাহাকে অবশ্যই ঔষধ দিতে হইবে। ইহার কোন্ পক্ষ মানিব?

২। অষ্টাহই দোষসকলের নিরামতার কাল; এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, কোন জ্বরই ৮ দিনের ন্যূন কালে শমিত হইতে পারে না,—এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হয়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তবিক।

৩। বাতাদি দোষ সকল সপ্ত ধাতুতেই গতাগতি করে, ইহা সত্য। কিন্তু জ্বরোৎপত্তি কালে প্রভাবাদি বশতঃ উহারা কখনও সপ্ত ধাতুর ১টী, ২টী বা অনেক গুলিতে প্রকোপের কার্য্য করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। নতুবা জ্বর মাত্রই সপ্ত ধাতু-গত বলিয়া গণ্য এবং সপ্তবিধ জ্বরের লক্ষণাক্রান্ত এবং শুক্র-ধাতুগত হওয়া প্রযুক্ত অসাধ্য হইত *। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব সকল জ্বরে নিয়মিত রূপে দোষপাকার্থে ৭ দিন অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা থাকিতেছে না; অনেক স্থলে দ্বিতীয় দিনেই নিরামতা সম্ভব হইতেছে †।

৪। অষ্টম দিবসকে দোষনিরামতার কাল বলিলেই যে, অন্যান্য সকল বচনের সহিত একবাক্যতা হইল, এরূপ বলা যাইতে পারে না। যথা,

বাতঃ পচতি সপ্তাহাৎ
পিত্তস্তু দশভির্দ্দিনৈঃ।
শ্লেষ্মা দ্বাদশভির্ঘস্রৈঃ
পচ্যতে বদতাংবর॥

[ভাবপ্রকাশধৃত সুশ্রুতবচন।]

সপ্তমী দ্বিগুণা চৈব,
নবম্যেকাদশী তথা।
এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা
মোক্ষায় চ বধায় চ॥

[মাধবনিদান, জ্বররোগ, ১১ শ্লোক অথবা হারীত বচন।]

বাত ৭দিনে, পিত্ত ১০দিনে এবং শ্লেষ্মা ১২ দিনে পাক প্রাপ্ত হয়। স্থলবিশেষে বাত ১৪ দিনে, পিত্ত ২০ দিনে এবং

* "অস্থিমজ্জাগতঃ কৃচ্ছ্রঃ শুক্রস্থো নৈব সিধ্যতি॥" (চরক)

† তবে, "সপ্তাহে নৈব পচ্যন্তে" এই শ্লোকের অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর স্থানান্তরে লিখিত হইবে।

শ্লেষ্মা ২৪ দিনে, হয় পক্কতা লাভ করে, নয় পীড়িত ব্যক্তিকে বধ করে; বাত, পিত্ত ও কফরূপ দোষসকলের পরিপাকের সীমা এইরূপ।

এই সকল বচনের সহিত একবাক্যতা সাধিত হয় নাই।

৫ "জ্বরঃ প্রায়োঽষ্টমেঽহনি" এ স্থলে "প্রায়ঃ" শব্দের অর্থ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং "অষ্টাহো নিরাম জ্বরলক্ষণম—" এই বচনের ব্যাখ্যাতে ভট্টারক হরিশ্চন্দ্র বলিয়াছেন যে—"অসত্যপ্যষ্টাহে ক্ষুদাদিভি র্নিরামত্বম *" অর্থাৎ ৮ দিন না হইলেও, ক্ষুধার উদ্রেকাদি দ্বারা নিরামতা বুঝিতে হইবে। এই ব্যাখ্যার সহিত একবাক্যতা করা হয় নাই। ইহাতে সিদ্ধান্তকর্ত্তাদিগের অনবধানতা প্রতীত হইতেছে।

যদি পিত্তজ্বর ভিন্ন অন্যান্য জ্বরের সাম অবস্থায় পাচন কষায় পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইল, তবে চক্রপাণিদত্ত মহাশয় নিজ সংগ্রহে কিরূপে বাত-কফ প্রধান জ্বরের সাম অবস্থায় পিপ্পল্যাদি ও হরীতক্যাদি কষায় * বিধান করিলেন? কিরূপেই বা শিবদাস মহাশয় বলিয়াছেন যে—নবজ্বরে কষায় রসের দ্রব্য সেবন করাই নিষিদ্ধ; নতুবা সরস, কল্ক, ক্বাথ প্রভৃতি পঞ্চবিধ কষায় নিষিদ্ধ নহে †।

বিষয়টী নিতান্ত গুরুতর বলিয়া আমরা সাধারণের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া আশা করি যে, পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বয়ং অথবা অন্যের দ্বারা এই অতি মহৎ বিষয়ে সন্দেহস্থলের মীমাংসা লিখিলে আমরা অতিশয় উপকৃত ও বাধিত হইব।

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলিকাতা, কুমারটুলী।

* মাধবনিদান, জ্বররোগ, ৩৪ শ্লোকের টীকা।

* চক্রদত্ত সংগ্রহ, জ্বররোগ, ১০৩। ১০৪ শ্লোক।

† চক্রদত্ত, জ্বররোগ, ৪ শ্লোকের টীকাতে এই কথা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কালাপাহাড়।

বাঙ্গালা ৯নয় শত সালের প্রথমে গৌড় নগরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে বিখ্যাতনামা কালাপাহাড়ের জন্ম হয়। হিন্দু অবস্থায় তাঁহার নাম কালাচাঁদ ছিল। তিনি বাল্যকালে অতিশয় নম্র; শান্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন, যৌবনের প্রথম অবস্থাতে ঘোড়া-সিদ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত সাহসী ও বহুভাষাজ্ঞ হইয়াছিলেন এবং দেখিতে অতিশয় সুন্দর ছিলেন বলিয়া প্রাক্তন কর্ম্মগতিকে গৌড়েশ্বর সলিমান বাদসাহের কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার

প্যাণিগ্রহণ করেন; পরে যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাদসাহের প্রধান সেনানায়ক হইয়াছিলেন।

কালাপাহাড় যখন হিন্দু ছিলেন, তখন হিন্দু ধর্ম্মের নিতান্তই বশম্বদ ছিলেন। উপনয়ন হওয়ার পর কোন সিদ্ধ পুরুষের নিকটে তান্ত্রিক শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিস্তর জপ, তপঃ ও পুরশ্চরণ করায় স্বীয় ইষ্টদেবতার যোঢ়ান্যাস সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যে ন্যাসের অন্তর্গত ছয় প্রকার ন্যাস আছে, তাহাকে যোঢ়ান্যাস বলা যায়। কালাপাহাড় দ্বিতীয়া মহাবিদ্যার সাধক ছিলেন, এইরূপ বোধ হয়। কারণ, এই বিদ্যার যোঢ়ান্যাসসিদ্ধ যোগীরা অত্যন্ত উকট ও নির্দ্দয় হয়। এবং যোঢ়াপ্রভাবে যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারে।

যোঢ়ান্যাসের মধ্যে রুদ্রন্যাস, গ্রহন্যাস, লোকপালন্যাস, শিবশক্তিন্যাস, দেবতান্যাস ও পীঠন্যাস এই ছয় প্রকার ন্যাস থাকায় এ ন্যাস সকল যোগাঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। অনেকে কেবল যোঢ়াসিদ্ধ হইয়া মহাসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

যিনি যোঢ়া সিদ্ধ, তাঁহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত হন; তন্ত্রশাস্ত্রে যোঢ়ান্যাসের এতাদৃশ মাহাত্ম্য প্রকাশ আছে। যোঢ়াসিদ্ধ যোগীদিগের ক্ষমতা এত অধিক যে, তাঁহারা যোঢ়ান্যাস করিয়া যে দেবতাকে প্রণাম করিতেন, তাঁহাতে যদি কোন দৈবী শক্তি না থাকিত, তৎক্ষণাৎ তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। আর যে সকল দেবপ্রতিমায় দেবত্ব জন্মে নাই, সে সকল দেবতাকে তাঁহারা প্রণাম করিলে তাঁহারা ভগ্ন হইয়া যাইতেন। আর যে সকল দেববিগ্রহ যোঢ়াসিদ্ধের প্রণামে ভগ্ন বা চূর্ণ না হইয়া শুদ্ধ ঘর্ম্মাক্ত হইতেন, তাহাতে দেবত্ব থাকা বোধে কালাপাহাড় তাঁহাদিগের সেবার্থ বাদসাহী হইতে বিশেষ সাহায্য দেওয়াইতেন। বঙ্গীয় শক্তি-প্রতিমার প্রতি কালাপাহাড় কোন অত্যাচার করেন নাই। তদ্ভিন্ন অন্য দেবমূর্ত্তির পরীক্ষা করিয়া যাহাতে দেবত্বের চিহ্ন পাইতেন, তাহার গায় হস্ত স্পর্শও করিতেন না। নচেৎ অস্ত্র দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেন। কালাপাহাড়ের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে এ দেশে শিবলিঙ্গ, শক্তি-প্রতিমা আর বাসুদেব বিগ্রহ ছিল। রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি তখনও প্রকাশ হয় নাই। মহাপ্রভু ও তৎসহচরেরাই প্রথমে দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ মূর্ত্তি, তৎপরে শ্রীরাধামূর্ত্তি প্রকাশ করেন। কালাপাহাড়ের জীবদ্দশায় এ মূর্ত্তি প্রকাশ পায় নাই। শ্রীবৃন্দাবন ধামে যে সকল কৃষ্ণ ও রাধিকা মূর্ত্তি অখণ্ডিত ও অভগ্ন দেখা যায়, তৎসমুদায়ই কালাপাহাড়ীয় দেববিপ্লবের পর প্রকাশিত হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয়। কালাপাহাড় এ সময় জীবিত থাকিলে, ঐ সকল দেবপ্রতিমার মধ্যে অনেকেই বিপন্ন হইতেন।

কালাপাহাড়ের জয় ঢাকের শব্দে অনেক দেবপ্রতিমার হাত, পা, খসিয়া পড়িয়াছিল। এখনও কেহ কেহ বলেন, শেষ দশাতে কালাপাহাড় শ্রীক্ষেত্র গিয়া তথাকার রাজা মুকুন্দ দেবের সহিত যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

এ সময়ের অব্যবহিত পরে নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য অভিরাম গোস্বামীও যে তন্ত্রসিদ্ধ যোগী ছিলেন। ইহাঁরও অনেক আশ্চর্য্য গল্প আছে।

কালাপাহাড়ের বংশ নাই। অনেকের বিশ্বাস কালাপাহাড় অকারণ হিন্দু দেবপ্রতিমা নষ্ট করিত। এ বিষয়ের মূল যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা লেখা গিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার [illegible] বাদশাহের হইবার বিশিষ্ট প্রমাণ। [illegible] ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীরূপ ও সনাতন ভ্রাতৃদ্বয় এই সময় গৌড়েশ্বরের উজীর ছিলেন। বোধ হয়, কালাপাহাড় ঐ উজীরদিগের কোন পরমাত্মীয় কুটুম্ব সন্তান হইবেন। তাহাদেরই বাদশাহের দরবারে ও অন্দরমহলে যাইতেন। গৌড় নগরের সর্ব্বোত্তর ভাগে রূপ ও সনাতনের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, শ্রীরামসীতামূর্ত্তি ও তাঁহার বাসগৃহ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই স্থলে শ্রীরামনবমী উপলক্ষে প্রতিবৎসর মেলা হয়। এ মেলায় নানা দেশবিদেশ হইতে দোকানি পসারি ও যাত্রী লোক অনেক আইসে। মেলা সপ্তাহ কাল থাকে। এ মেলায় অনেক নেড়া নেড়ী ও বৈষ্ণব [illegible] সকল আইসে। নেড়ী ও [illegible] ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহারা এ মেলা খ্যাতাপন্ন।

উত্তরে ইংরেজ বাজার, পূর্ব্বে মহানন্দা নদী, দক্ষিণে কানশাট, পশ্চিমে [illegible] এই চতুঃসীমার মধ্যে অনুমান ৫০ ক্রোশ জমি গৌড়-নগরের অন্তর্গত। [illegible] ক্রোশ ভূমিকাতে [illegible] রাজপথ, গলি, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, [illegible], হাট, বাজার, [illegible] ইত্যাদি যাহা ছিল, তাহা প্রায় সমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া [illegible] পড়িয়াছে। সাবেক [illegible] সাহদিগের [illegible], নূতন ও পুরাতন [illegible] চিহ্ন, আর ঐ রামসীতার [illegible] টি বৃহদাকার মসজীদ, বড় বড় দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী এবং রাজবংশের চিহ্ন সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এ সমুদায় অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। ইংরেজ বাজারে মেলা হওয়া অবধি গবর্ণমেণ্ট হইতে বন আবাদ হওয়ায় ইহার মধ্য দিয়া কষ্টে ও ভয়ের সহিত লোকের যাতায়াত হইতেছে।

বাদশাহের বাস মহল যে দিকে, সে দিক মহারণ্যে পরিপূর্ণ আছে। ব্যাঘ্র ভল্লুক শূকর ও শৃগাল সে স্থানের রাজা ও চৌকীদার। শিকারী সাহেবেরা বৎসর বৎসর ঐখানে শিকার করিতে আইসেন। একটুকু অসাবধান হইলেই

বিপদাক্রান্ত হইতে হয়। শুনা গিয়াছে, এ স্থানে অনেকে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভাগ্যবান্ হইয়াছেন। ইহার সত্যাসত্য আমরা জানি না।

গৌড়নগর অতি পুরাতন নগর। ভোজবংশের আদি রাজা ভোজ গৌড়নামা মহাত্মা কর্ত্তৃক ঐ নগর নির্ম্মিত হইয়া ক্রমান্বয়ে ৩৬ জন হিন্দু রাজায় ১৪৩০ চৌদ্দ শত ত্রিশ বৎসর, তৎপরে পাঠান জাতীয় বাদসাহ বক্তিয়ার খিলিজী হইতে সলিমানের পুত্র দাউদ খাঁ পর্য্যন্ত এক জন মুসলমান বাদসাহে ৩০০ শত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১৭।১৮ শত বৎসরের পুরাতন রাজধানী এক বৎসরের মধ্যে মহামারীতে জনশূন্য হইল। তৎপরে ৩।৪ বৎসর অরণ্যময় হওয়ায় হিংস্র জন্তুর বাসভূমি ও ক্রীড়ানিকেতন হইয়া পড়িল। জেলা রাজসাহীর অতীত জজ জি, সি, চিপ সাহেব ১৮৫৩ শালে শিকার করিতে গিয়া ঐ স্থান হইতে একটি গোবাঘ (অর্থাৎ বড় বাঘ ১২ হাত লম্বা) স্বীকার করিয়াছিলেন। এ কথা ঐ জজ নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাঘের দেহ ৮ হাত আর লাঙ্গুল ৪ হাত। এ ঘটনার সময় আমি জেলা রাজসাহীতে ছিলাম। কালাপাহাড়ের আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্যের গল্প শুনা গিয়াছে। গল্প বলিয়া তাহা এখানে লেখা গেল না।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

ওয়ালেস্।

একাদশ অধ্যায়।

১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্‌টোবর মাসে সংবাদ আসিল, এড্‌ওয়ার্ড কম্‌প্যাট্রিকের পরামর্শানুসারে স্কট্‌লণ্ডের দ্বিতীয় আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র ওয়ালেস্ সামন্তবর্গ ও অনুযাত্রিকবর্গের একটী সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে রস্‌লিন্ মুরে চল্লিশ সহস্র লোক সমবেত হইল। তিনি সামন্তবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—'এড্‌ওয়ার্ড স্কট্‌লণ্ডের পুনরাক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সুতরাং আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, দেহে প্রাণ থাকিতে আমি তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে দিব না।' সামন্তবর্গ একবাক্যে ও মহোৎসাহে তাঁহার সঙ্কল্পের সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইলেন। সমবেত চল্লিশ সহস্র হইতে তিনি বিংশ সহস্র লোক বাছিয়া লইলেন। যাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ও জাতীয় কার্য্যে গৃহীতব্রত, তিনি সেই সকল লোকই নির্ব্বাচিত করিলেন। অবশিষ্ট বিংশ সহস্র লোককে তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত করিলেন। নিরন্তর যুদ্ধঘটনায় দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই জন্য ওয়ালেস্ বলিলেন—'আর অধিক লোক লইয়া প্রয়োজন কি?'

সাগরগামিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায় সেই মহতী সেনা একপ্রাণে একমনে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে ইংলণ্ডাভিমুখিনী হইল। ওয়ালেসের সঙ্কল্প এড্ওয়ার্ডকে তিনি স্কটিশ ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে দিবেন না—এই জন্য তাঁহারা তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য ইংলণ্ডাভিমুখী হইলেন। এবার স্কটিশ অদৃষ্ট ইংলণ্ড-ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইবে। এবার তাঁহারা—'যুদ্ধে হয় জয়লাভ করিব, নয় প্রাণবিসর্জ্জন করিব'—এই সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইয়াছেন। সুতরাং ওয়ালেস্ এ অভিযানে দেশের বড় বড় জমিদারকে লইয়া যাইলেন না। কারণ যদি তাঁহারা আর ফিরিয়া আসিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই সামন্তবর্গ দ্বারাই স্কট্লণ্ডের রক্ষণকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে। আগ্রগতিপথে বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগের জন কয়েক মাত্রকে কেবল তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। ম্যাল্কম্, ক্যাম্বেল্, রাম্জে, গ্রেহাম, এডাম, বইড্, অচিংলেক্, লুণ্ডন, লডার, হে, ও সিটন্—সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে কেবল এই কয় জন তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। এই মহতী সেনা ব্রাউ-হিল্ ক্ষেত্রে গিয়া ছাউনী করিলেন। তথা হইতে চল্লিশ জন মাত্র অনুযাত্রিক সঙ্গে করিয়া তিনি রক্সবরো দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলেন," এবং দুর্গাধ্যক্ষ সার্ রাল্ফ গ্রেকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন যে—'তুমি প্রত্যাবর্ত্তনকালে দুর্গের চাবি সকল আমার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিও, অন্যথাচরণে তোমার দেহ আমি এই দুর্গ-প্রাচীরে লটকাইয়া রাখিব।' তিনি রাম্জে দ্বারা সেইরূপ আদেশ বার্উইক্ দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন।

অতঃপর আর বিলম্ব না করিয়া ওয়ালেস্ ও তদীয় সেনা টুইড নদী পার হইয়া নর্দ্দম্বর্লাণ্ড ও কম্বরল্যাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার সেনা এই দুই প্রদেশ আলোড়িত ও পদদলিত করিল। অগ্নি প্রদান করিয়া তাহারা ডার্হাম্ নগর ভস্মস্তূপে পরিণত করিল। ইয়র্কসায়ারেরও সেই দুর্দ্দশা ঘটিল। প্রতিহিংসা-প্রদীপ্ত সেই সেনা যেখানে যাইতে লাগিল, সেই খানেই অসি ও অগ্নি বিস্তার করিতে লাগিল। পোনর দিনের মধ্যেই এড্ওয়ার্ডের দূত আসিয়া ওয়ালেসের নিকট চল্লিশ দিনের শান্তি ভিক্ষা করিল, বলিল 'ইহার পরই এড্ওয়ার্ড রণক্ষেত্রে ওয়ালেসের সম্মুখীন হইবেন'। স্কট্লণ্ডের অদৃষ্টনায়ক এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং ইয়র্ক নগরে এক দিন অবস্থিতি করিয়া তিনি সসৈন্য নর্দ্দালারটন্ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। চল্লিশ দিনের সন্ধি সর্ব্বত্র

উদ্বোধিত হইল এবং ওয়ালেস লুণ্ঠিত দ্রব্য সকল ক্রয় করিবার জন্য সকলকেই আহ্বান করিলেন।

বিশ্বাসঘাতক এড্ওয়ার্ড সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সন্ধির ভিতরেই অতর্কিতভাবে ওয়ালেস্‌কে আক্রমণ করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্য সহ ম্যালটন নগরের কাপ্তেন সার্ রাল্ফ রেমণ্টকে পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাল্টন্ নগরের অদূরে কতকগুলি স্কচ্‌মেন্ বাস করিত। তাহারা এই সংবাদ স্কটিশ্ শিবিরে লইয়া গেল। ওয়ালেস্ এই সংবাদ পাইবামাত্র হিউ ও [illegible] রিচার্ডের অধিনেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। আদেশ করিলেন যে, তাহারা যেন পথিমধ্যে লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া আক্রমণকারী ইংরাজ সৈন্যকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে। সার্ রাল্ফ রেমণ্ড নয় হাজার সৈন্য লইয়া আসিতেছিলেন, সহসা তিন সহস্র স্কচ সৈন্য প্রচণ্ড বেগে ও ভীষণ রবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রচণ্ড অসি-প্রপাতে নিমেষমধ্যে তিন সহস্র ইংরাজ সৈন্য ভূপতিত হইল—অবশিষ্টেরা ভয়ে কে কোথায় পলায়ন করিল। সেনাপতি সার্ রাল্ফ স্বয়ং রণে হত হইলেন; ওয়ালেস্ অনতিবিলম্বেই সসৈন্য সেই পলায়মান ইংরাজ সেনার পশ্চাদ্গামী হইয়া ম্যাল্টন্ নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় অসংখ্য শত্রু নিপাত করিয়া নগর লুণ্ঠন করিলেন। তিনি দুই দিবস তথায় থাকিয়া নগরদুর্গ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিলেন; এবং পরে অসংখ্য শকটে লুণ্ঠিত রত্নরাজি ও দ্রব্যসামগ্রী লইয়া তিনি নিজ শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আপনাদিগকে হঠাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজ সেনানিবেশের চতুর্দ্দিকে প্রাকারাবলী নির্ম্মিত করিলেন।

ইহাতে এড্ওয়ার্ড স্পষ্ট বুঝিলেন যে ওয়ালেস্ শীঘ্র ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছুক নহেন। এড্ওয়ার্ডের মনে এখন ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি [illegible] নগরে পার্লেমেণ্ট সভা আহ্বান করিলেন; কিন্তু লর্ডেরা বলিলেন যে যতক্ষণ ওয়ালেস্ স্কট্লণ্ডের মুকুট পরিধান না করিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহারা ওয়ালেসের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে দিবেন না। পার্লেমেণ্টের এই মন্তব্য জানাইবার জন্য স্কটিশ শিবিরে দূত প্রেরিত হইল। এই বিষয়ের শেষ নিষ্পত্তির জন্য ক্যাম্বেল্-প্রমুখ স্কটিশ বীরবৃন্দ ওয়ালেসকে রাজমুকুট ধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অবশেষে আরল্ ম্যালকমের পরামর্শানুসারে এড্ওয়ার্ডের আপত্তি মিটাইবার নিমিত্ত এক দিনের জন্য আপনাকে স্কট্লণ্ডের রাজা বলিয়া ডাকিতে অনুমতি দিলেন। তথাপি ইংরাজেরা প্রকাশ্য যুদ্ধে ওয়ালেসের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। তাঁহারা

স্থির করিলেন যে দুর্গপরিরক্ষিত নগর গুলি রক্ষা করিবেন এবং সমস্ত বাজার বন্ধ করিয়া ওয়ালেসের সেনার রসদ বন্ধ করিবেন। তাঁহাদিগের এ চেষ্টা বিফল হইল। ওয়ালেস্ সন্ধির উত্তীর্ণ হওয়ার পরও পাঁচ দিন অপেক্ষা করিলেন, তথাপি ইংরাজ-সেনা দর্শন না পাইয়া নিজ পতাকা উড্ডীন করিলেন; এবং এডওয়ার্ডকে অবৈধ রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি এদিগের উত্তর নগর ধ্বংস করিয়া শস্যক্ষেত্র সকল নষ্ট করিতে করিতে ইয়র্ক সায়ারের ভিতর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনা ধর্ম্মালয় ও স্ত্রী বালক ব্যতীত আর কিছুই ছাড়িয়া যায় নাই।

ক্রমে তিনি দুর্গবেষ্টিত কার্লাইল নগরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ নগর দুর্গ দ্বারা দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত এবং অসংখ্য সেনা ইহার রক্ষণে নিযুক্ত। স্কটেরা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া চারি স্থানে এই দুর্গ আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণকারী সৈন্যের সহিত চারি সহস্র তিরন্দাজ ছিল। এদিকে নগর মধ্যেও চারি হাজার ধনুর্ধর ও বাণ চালাইবার জন্য সৈন্য ছিল। সুতরাং তাহারা সবিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত স্কচ্গণের আক্রমণ প্রতিহত করিল। স্কটেরা ভয়ে নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

এদিকে রজনী উপস্থিত হইল। স্কটেরা সমস্ত রাত্রি নগরের বাহিরে ছাউনী করিয়া রহিল। সমস্ত রাত্রি মশাল জ্বালিয়া তাহারা শত্রুগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। যদিও তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদিগের এক জনও রণে হত হয় নাই। এই জন্য স্কটেরা হারিয়াও ভগ্নোৎসাহ হয় নাই।

পর দিন সূর্য্যোদয়ে স্কটেরা নবীন উৎসাহে পূর্ব্ব দিনের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নগর আক্রমণ করিল। এ দিবসও তাহারা অগ্নি প্রক্ষেপ করিয়া ও অন্যান্য নানা প্রকারে নগরের সবিশেষ ক্ষতি করিল, কিন্তু নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। আবার রজনী আসিল, আবার স্কটেরা নগর-প্রাকারের বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিল। সকলে বিশ্রাম করিতে লাগিল, কিন্তু ওয়ালেসের নিদ্রা নাই। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিবিরের চতুর্দ্দিকে প্রহরীরা পাহারা দিতেছে কি না পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে সহসা অদূরে শত্রুসেনা দেখিতে পাইলেন। সার্ জন্ নটন্ ও সার্ উইলিয়ম লী পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া অতর্কিতভাবে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে, এই মানসে স্কটিশ শিবিরাভিমুখে আসিতেছিল। দেখিবামাত্র ওয়ালেস তাঁহার শৃঙ্গ বাজাইলেন, অমনি তাঁহার সদা-প্রস্তুত সৈন্যেরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইল। শত্রুগণ নগর-প্রাকার হইতে বাহির হইয়াই সর্ব্বপ্রথমে আর্ল্ ম্যাল্কমের সম্মুখীন হইল।

ওয়েলেস্ তাঁহাকে হঠকারী বলিয়া জানিতেন, এই জন্য স্বয়ং রণ-মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুই জনে অসংখ্য শক্রসৈন্যকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন।

অবশেষে সেনাপতি সার জন্ নটন ও দ্বাদশ শত সৈন্য হত হওয়ায়, ইংরাজেরা রণে ভঙ্গ দিয়া নগরমধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। স্কটেরা বিজয়োৎসাহে শিবিরে ফিরিয়া মনের সুখে রাত্রি যাপন করিল! প্রত্যূষে উঠিয়া আবার নগরাক্রমণ করিল। এইরূপে অনেক দিনের অবরোধের পর ইয়র্ক নগর সুবর্ণ দিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। ওয়ালেস এই নিয়মে তাহাতে সম্মত হইলেন যে, তাঁহারা নগর প্রাকারোপরি স্কটিশ পতাকা উড্ডীন করিতে দিবেন। ইয়র্ক ইহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। স্কটলণ্ডের পতাকা সগর্ব্বে ইয়র্ক নগরের প্রাচীরের উপর উড়িতে লাগিল। পাঁচ হাজার পাউণ্ড শুল্ক ও পর্য্যাপ্ত রুটি ও মদ ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী পাইয়া স্কটেরা বিশ দিনের অবরোধের পর নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গেল।

এপ্রেল মাস আসিল—এখনও ওয়লেস ও তাঁহার সৈন্য ইংলণ্ডে। খাদ্য দ্রব্য দুষ্প্রপ্য হওয়ায় অগত্যা তাঁহাদিগকে লুণ্ঠনের উপরই অধিক নির্ভর করিতে হইল। তাঁহারা বন্য হরিণ মারিয়া ও ক্ষেত্রের শস্য তুলিয়া কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে অগ্নি বিকিরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রাম নগর ভাঙ্গিয়া সেই অবধ্য সেনা লণ্ডনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তথাপি ইংরাজসেনা ওয়ালেসের সম্মুখীন হইতে সাহস করিল না। ইংরাজসেনা হটিতে হটিতে ক্রমে লণ্ডনে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল।

এদিকে খাদ্যদ্রব্যের অসদ্ভাবে ওয়ালেস আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। তাঁহার পতাকাধারী জপের পরামর্শানুসারে তিনি রিচমণ্ড যাত্রা করিলেন। সেখানে এখনও পর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী ছিল। তাঁহার সৈন্য সেই অপর্য্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রিচমণ্ডে অনেক স্কচ বন্দী বা শ্রমজীবী ছিল। নয় সহস্র স্কচ এখানে ওয়ালেসের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। এই মিলিত সেনা রিচমণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বামসওয়ার্থাভিমুখে গমন করিল।

স্কচেরা উক্ত নগর অস্পৃষ্ট রাখিয়া চলিয়া যাইবে সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু নগররক্ষক শত সৈন্য তাহাদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিল যে তাহারা নগরদুর্গ বেষ্টন করিয়া অগ্নি প্রদান করিল। দুর্গাধ্যক্ষ ফিহিউ দুর্গ হইতে যেমন বাহির হইতে চেষ্টা করিলেন, অমনি ওয়ালেসের শাণিত অসি দেহ হইতে তদীয় মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিল। স্কটেরা তাহার পর দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাল-

বৃদ্ধবনিতা ভিন্ন আর সকলকেই শমন-সদনে প্রেরণ করিল। তাহারা তথায় রজনী যাপন করিয়া প্রত্যূষে দুর্গের দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া প্রস্থান করিল। ওয়ালেস ফিছিউএর মস্তক সহ এড্ওয়ার্ড বা তদীয় মন্ত্রিসভার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে যদি তাঁহারা পূর্ব্ব প্রতি-শ্রুতি মত তাঁহাকে যুদ্ধ না দেন, তিনি একেবারে লণ্ডন তোরণ-দ্বারে গিয়া উপ-স্থিত হইবেন। মন্ত্রিসভা অদ্ভুত হইল, অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, কোন মূল্যে শান্তি ক্রয় করিতে হইবে। সঙ্কল্প স্থির হইল বটে, কিন্তু কেহই দৌত্য-কার্য্য-গ্রহণে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে এড্ওয়ার্ড-মহিষী স্বয়ং স্কটিশ শিবিরে যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ওয়ালেসের বীরোচিত অবদান-পরম্পরায় রাণী এত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে ওয়ালেসের প্রেমাভিলাষিণী হইয়া-ছিলেন। এদিকে স্কটেরা হার্টফোর্ড-সায়ারস্থিত সেণ্ট আল্বান্ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নগরের যাজক মদ্য-মাংসাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অতিথি-সৎকার করায় স্কটেরা নগরের কোন প্রকার অনিষ্ট করিল না। এখানে স্কটেরা রীতিমত শিবির সন্নিবেশ করিয়া ও চন্দ্রাতপ উত্তোলিত করিয়া রাজমহিষীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ওয়ালেস সেই শুভ দিনে—প্রত্যূষে উঠিয়া ভজনা শুনিয়া বীরবেশ পরিধান করিলেন। তাঁহার সুমার্জ্জিত কঞ্চুকের উপর প্রাতঃসূর্য্যের কিরণমালা পড়িয়া চতুর্দ্দিক ঝলসিত করিল। তাঁহার শাণিত অসি কোষমুক্ত হইয়া তাঁহার কটীদেশে বিলম্বিত হইল। তাঁহার উজ্জ্বল কটীবন্ধ যেন রবি-রশ্মিজাল টানিয়া লইতে লাগিল। হস্তে তিনি উৎকৃষ্ট ইস্পাত-নির্ম্মিত দণ্ড ধারণ করিলেন। দেখিয়া বোধ হইল, যেন ভীম আবার ধরাতলে অবতীর্ণ। ওয়ালেস চন্দ্রাতপতলে এইরূপ ভাবে রাজমহিষীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় রাজমহিষী, পঞ্চাশৎ সম্ভ্রান্ত রমণী, ও সপ্ত বৃদ্ধ যাজক পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে স্কটিশ শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেখানে সেই বীরকেশরী বসিয়া ছিলেন, তাহারা একেবারে সেই চন্দ্রাতপ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বীরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাণী অনতিবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়াই নতজানু হইয়া বীর পূজা করিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু আরল ম্যালকম তাঁহাকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। ওয়ালেস রাণীর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার মুকুট চুম্বন করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কথোপ-কথন হইল। মধ্যাহ্নভোজনের পর দর-বার হইল। রাণী ওয়ালেসকে কত প্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। অনুকূল সন্ধিপ্রাপ্তির

আশয়ে শেষে সুবর্ণের প্রলোভন পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইল, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ স্বজাতিপ্রেমিকের নিকট রমণীর ইন্দ্রজাল ও সুবর্ণমাণিকাদি দুইই নিষ্ফল হইয়া থাকে। ওয়ালেস্ স্ত্রীলোকের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে অস্বীকৃত করিলেন। তবে এই মাত্র স্বীকার করিলেন যে, এড্‌ওয়ার্ডের নিকট হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দূতগণ আসিলে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন এবং যদি সম্ভব হয়, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। এড্‌ওয়ার্ড এক্ষণে ফ্লাণ্ডার্সে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং রাণী অগত্যা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন।

সেণ্ট আল্‌বানের সন্ধি।—স্কটেরা সেণ্ট আল্‌বানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এড্‌ওয়ার্ডের দূতগণ সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসিল। সন্ধির নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইল। রক্‌সবরো ও বারউইক্ দুর্গ এবং ইংলণ্ডে কারারুদ্ধ বা অন্য কারণে অবস্থিত স্কচ্‌গণকে ওয়ালেসের হস্তে সমর্পণ করা হইল। যে সকল স্কচ্‌কে সমর্পণ করা হইল, তাহার মধ্যে রাণ্ডল্‌ফ্, আর্‌ল লোরন্, আর্‌ল্ বুকান, কিউমিন ও স্থলিস প্রধান। ওয়ালেস্ ব্রুস্ ও সার্ আমের্ ডি ভ্যালেন্‌সকে চাহিলেন কিন্তু এড্‌ওয়ার্ড জানাইলেন যে তাহারা পলায়ন করিয়াছে। কম্-

মাট্রিকও সমর্পিত হইলেন—ওয়ালেস্ তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ এক শত স্কচ্ লর্ড কারামুক্ত হইয়া এক শত উৎকৃষ্ট ঘোটক সহ ওয়ালেসের নিকট প্রেরিত হন। সন্ধির নিয়মানুসারে স্কটেরা নর্দ্দম্বারলণ্ডে যাইলে উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। যখন স্কটেরা বাম্বরো নগরে উপস্থিত হইল, তখন তাহাদিগের সংখ্যা দুইটি হাজারে পরিণত হইয়াছে। লামাসডেতে এই বিজয়ী সহস্রী সেনা 'কেরামমুরে' আসিয়া উপস্থিত হইল। এই স্থানে বারউইক ও রক্‌সবরো দুর্গের চাবি ওয়ালেসের হস্তে সমর্পিত হইল। এই সন্ধি পাঁচ বৎসরের জন্য হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ওয়ালেসের ফ্রান্স যাত্রা।

স্কট্‌লণ্ডে পঞ্চবর্ষব্যাপী সন্ধি স্থাপিত হইল। এক্ষণে ওয়ালেস্ এক বার ফ্রান্স দর্শনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইচ্ছা, ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া আসিয়া স্কট্‌লণ্ডের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চাশৎ মাত্র অনুযাত্রিক সমভিব্যাহারে ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল তারিখে ফ্রান্স যাত্রা করিলেন। পার্লেমেণ্টের নিকট অনুমতি চাহিলে পাছে আপত্তি উত্থাপিত হয়, এই জন্য তিনি পার্লেমেণ্টের অনুমতি না লইয়া গুপ্তভাবে প্রস্থান করিলেন। গুপ্তভাবে যাওয়ার

আর একটী কারণ এই যে, তিনি স্কটলণ্ডে নাই এ সংবাদ প্রচারিত হইলে, পাছে বিশ্বাসঘাতক এড্ওয়ার্ড সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্কট্লণ্ড আক্রমণ করেন। অথবা তাঁহার রণতরি পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে চেষ্টা করেন।

অনুকূল বায়ুভরে স্ফীতবক্ষ হইয়া জাহাজের পালগুলি যেন ছুটিতে লাগিল। এক দিন এক রাত্রি এই রূপে অতিবাহিত হইল, এমন সময় দূর হইতে ষোল খানি জাহাজ প্রবল বেগে তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছে, পরিদৃষ্ট হইল। ওয়ালেস তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গিগণকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। এই জাহাজগুলি ফ্রান্সের অন্তর্গত লণ্ডভিল নগরের টমাস নামক এক ব্যক্তির জাহাজ। টমাস কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ করায় ফ্রান্স হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। সেই অবধি সে সামুদ্রিক দস্যু বৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল। ওয়ালেসকেও নিজ-কবলস্থ করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহা ঘটিল না।

টমাস এই নূতন জীবনে নূতন নাম করিয়াছিল। সামুদ্রিক যাত্রীরা তাহাকে লোহিত রীভার নামে জানিত। লোহিত রীভার সবেগে জাহাজ চালাইয়া ওয়ালেসের জাহাজের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহাজ যেমন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, অমনি রীভার এক লম্ফে ওয়ালেসের জাহাজের উপর গিয়া পড়িল। ওয়ালেস দাঁড়াইয়া এই আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সুতরাং রীভার যেমন লম্ফ দিয়া পড়িল, অমনি তিনি তাহার গলদেশ ধরিয়া তাহাকে সবেগে এরূপ এক ধাক্কা মারিলেন যে, তাহার মুখ ও নাসিকা দিয়া বল বল করিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রীভারের ষোল খানি জাহাজ আসিয়া ওয়ালেসের জাহাজকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ওয়ালেসের পোতাধ্যক্ষ ক্রফোর্ড তৎক্ষণাৎ পাল ছাড়িয়া তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া চলিয়া গেল। সুতরাং রীভার এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া ওয়ালেসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ওয়ালেস ক্ষমা করিলেন বটে কিন্তু তাহার হস্তে যে অসি ও ছুরিকা ছিল, তাহা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নিরস্ত্র করিলেন; এবং তাহাকে শপথ করাইলেন, যে সে যেন কখন তাঁহার ক্ষতি করিতে চেষ্টা না করে। এদিকে রীভারের লোকেরা ক্রমাগত গুলিগোলা বর্ষণ করিতেছিল। ওয়ালেসের আদেশে রীভার তাহাদিগকে নিবারণ করিল। উভয় দলে এক্ষণে শান্তি বিরাজিত হইল। টমাস ওয়ালেসকে রচেল পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিতে চাহিল। ইংরাজদিগের আক্রমণভয়ে ওয়ালেস তাহাতে সম্মত হইলেন। পথিমধ্যে পরস্পরের আত্মপরিচয় হইল। টমাস আত্মপরিচয় দিয়া বলিল 'এ যাবৎ কাল আমায় কেহ পরাজয় করিতে পারে

নাই। আমার বিশ্বাস স্কটলণ্ডের উদ্ধার-কর্ত্তা ওয়ালেস আমার গ্রহীতা।' টমাস যখন জানিল যে তাহার বিশ্বাস সমূলক, তখন নতজানু হইয়া স্কটলণ্ড ও ওয়ালেসের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। ওয়ালেস তাহার হস্তধারণ করিয়া তুলিয়া ফরাশি-রাজের নিকট তাহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন।

লোহিত রীভারের নামে তৎকালে লোকে ভয়ে কম্পান্বিত হইত। যৎকালে সমবেত তরিরাজি রচেল বন্দরের সমীপবর্ত্তিনী হইল, তখন নগর-বাসীরা রীভারের জাহাজগুলি চিনিতে পারিয়া অতিশয় ভীত হইল এবং আক্রমণ প্রতিহত করিতে বা পলায়ন করিতে সকলকে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত রণবাদ্য বাজাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ওয়ালেস্ আদেশ করিলেন যে, তাঁহার জাহাজ ভিন্ন অন্য কোন জাহাজ বন্দরে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। ওয়ালেসের পতাকায় স্কটলণ্ডের লোহিত সিংহ, অঙ্কিত ছিল। সেই চিহ্ন দেখিয়া সকলেই অনুমান করিল, স্কটলণ্ডের লোক আসিয়াছে। ফ্রান্স তৎকালে স্কটলণ্ডের সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল, এই জন্য জাহাজের যাত্রিগণকে সাদরে গ্রহণ করিল। তাহারা জানিত না যে স্কটিশ গবর্ণর স্বয়ং ওয়ালেস্ তাহাদিগের অতিথি- তথাপি তাহাদিগের সৎকারের কোন ত্রুটি হয় নাই। ওয়ালেস্ টমাস্ ও অন্যান্য অনুযাত্রিকবর্গকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পারিস নগরীতে রাজা ও রাণী মহা-সমাদরে তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে গ্রহণ করিলেন। সকলেই স্কটিশ বীর-কেশরীকে উৎসুক নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। আহারাদির পর রাজা ও তাঁহার সভাসদগণ ওয়ালেসের সহিত মন্ত্রভবনে গমন করিলেন। বিবিধ বিষয়ে কথোপ-কথনের পর রাজা বিস্ময় প্রকাশ করিলেন —যে কিরূপে ওয়ালেস লোহিত রীভারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আসিয়াছেন। ওয়ালেস ফরাশিরাজের নিকট রীভারের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিলেন ও তাঁহার জন্য ক্ষমা চাহিলেন। ফরাশিরাজ ওয়ালেসের সম্মানার্থ রীভারকে ক্ষমা করিলেন এবং সেই স্থানেই তাঁহাকে নাইট উপাধি প্রদান করিলেন। তদবধি রীভার ও তদীয় দলস্থ সকলেই দস্যু-বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধু নাগরিক ভাবে ফ্রান্সে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ত্রিশ দিন রাজভোগে অতীত হইলে, ওয়ালেস নিষ্কর্ম্মতায় অধীর হইয়া উঠিলেন। ইংরাজেরা তৎকালে গাইন (Guienne) প্রদেশে রহিয়াছে শুনিয়া তিনি রাজার নিকট বিদায় লইয়া সেই দিকে ধাবিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক হইতে নয় শত স্কচ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। অষ্ট্রিয়ার দৌরাত্ম্যে ইতালীবাসীরা যেমন একদিন

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল,সেই রূপ ইংলণ্ডের দৌরাত্ম্যে সে সময় স্কটেরা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যেথানেই গ্যারীবল্ডী ইতালীর ত্রিবর্ণ (Tricolored) পতাকা উড্ডীন করিতেন, সেই থানেই অসংখ্য ইতালীয় তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইত। গ্যারিবল্ডীর ন্যায় ওয়ালেসেরও কথন লোকাভাব ঘটিত না। গ্যারিবলডীর ন্যায় তিনিও অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিপুল শত্রু-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইতেন, এবং প্রায় প্রতি বারই জয়-লাভ করিতেন। উভয়েই রণে অজেয় ছিলেন। আজ ওয়ালেস সেই নয় শত স্কচ্ সেনা লইয়া বিপুল ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। সিংহের পাল যেন মেষপালের উপর গিয়া পড়িল। অসংখ্য ইংরাজ তাঁহাদিগের শানিত অসিমুখে পড়িল। ইংরাজদিগের ভাল ভাল দুর্গ সকল তিনি দখল করিতে লাগিলেন। সে প্রদেশে ইংরাজ প্রভুতাব মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি সার টমাস লঙভিল্ ভিন্ন আর কোন ফরাশিকে সঙ্গে লয়েন নাই। কিন্তু ফরাশিরাজ তাঁহার কৃতকার্য্যতায় প্রোৎ-সাহিত হইয়া বিশ হাজার সৈন্য দিয়া ডিউক অব অরলিন্সকে তাঁহার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। তিনি ওয়ালেসের সহিত মিলিত হইবার জন্য গাইনপ্রদেশের মধ্য দিয়া দ্রুতগতিতে ধাবিত হইলেন।

এদিকে ক্যালে দুর্গাধ্যক্ষ আরল্ অব্ গ্লষ্টার স্কচ্ অধিনায়কের এই সকল কার্য্যের সংবাদ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। এড্ওয়ার্ড ক্রোধে অধীর হইয়া সন্ধি থাকিতেও ওয়ালেসের অনুপ-স্থিতি-কালে স্কটলণ্ড আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এড্ওয়ার্ডের যে সঙ্কল্প সেই কার্য্য। গ্লস্টর স্থল-সেনার অধিনায়ক হইয়া চলিলেন। সার জন্ সিউয়ার্ড জল-সেনার অধিনায়ক হইয়া জলপথে যাত্রা করিলেন। দেশশত্রু বিশ্বাসঘাতক সার্ আমের ডি ভালেন্স অশ্বপৃষ্ঠে স্থল-সেনার পথদর্শক হইয়া চলিল। স্কটেরা সন্ধিকালে বিশ্বস্ত ভাবে নির্ভয়ে কাল যাপন করিতেছিল। আক্র-মণকারিণী শত্রুসেনার আগমনবার্ত্তা শুনিতে না শুনিতেই অনেক গুলি দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইল। অধিকৃত দুর্গ সকল বথ্ওয়েলের হস্তে প্রত্যর্পিত হইল। উত্তরে ডণ্ডী ও সেণ্ট্ জনষ্টন্ ইংরাজ কবলে পতিত হইল। ফাইফ তাঁহাদিগের অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। সংক্ষেপতঃ চিভিয়ট্ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ ইংরাজদিগের অধীনে আসিল। পশ্চিমেও মুক্তি নাই। দক্ষিণ প্রদেশের অধীশ্বর ষ্টিউয়াটের মৃত্যু হওয়ায় তদীয় নাবালগ পুত্র ওয়াল্টর প্রাণভয়ে আরান্ নগরে পলায়ন করে। আত্মরক্ষার জন্য রিকার্টনের আডাম্ ক্রেগের লিণ্ডসে রচ্লীনে এবং সার্জন্ গ্রেহাম্ ক্লাইড ফংেষ্টে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রবার্ট বইড্ও আত্মরক্ষার জন্য গুপ্ত ভাবে রহিলেন। সিউয়ার্ড সার্ আমের ব্রাইনূকে ফাইফের সেরিফ্ পদে নিযুক্ত করায় লণ্ডিনের রিচার্ড বিশেষ বিপদে পড়িলেন। শত্রুদিগের সহিত সন্ধি করিতেও প্রস্তুত নহেন, অথচ টে পার হইয়াও যাইবার সুবিধা ছিল না। কারণ অপর পার ইংরাজেরা অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি গ্রেহামের সহিত মিলিত হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অষ্টাদশ মাত্র অনুযাত্রিক ও শিশুসন্তানকে সঙ্গে লইয়া রজনীযোগে ষ্টার্লিঙ্ সেতু পার হইয়া গ্রেহামের অনুসরণে ডণ্ডাফ-মুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং সার্ জনের গুপ্তাবাসের সন্ধান পাইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। সার জন্ গ্রেহামও তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইয়া গুপ্তাবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

তাঁহারা শুনিলেন যে, সার্ আমের্ ডি ভ্যালেন্স বথ্ওয়েল্ দুর্গ মদে ও খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা পঞ্চাশৎ মাত্র সৈন্য লইয়া সেই দুর্গ আক্রমণ করিলেন। দুর্গরক্ষার জন্য সার্ আমেরের অধীনে অশীতি জন মাত্র সৈন্য ছিল; স্কটেরা তাহার মধ্যে বাইট জনকে ধরাশায়ী করিয়া দুর্গের অর্থসামগ্রী লইয়া প্রস্থান করিল। স্কটেদের পাঁচ জন মাত্র সেই যুদ্ধে হত হয়। তাঁহারা আর তথায় থাকা শ্রেয়স্কর মনে না করিয়া রজনীযোগে আরল্ ম্যাল্কমের নিকট প্রস্থান করিলেন। ম্যাল্কম্ তাঁহাদিগের সাহায্যে লেনক্স দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে উদীচ্য সামন্তবর্গ আপনাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া ওয়ালেসের অনুসন্ধানে দূত প্রেরণ করিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে দূতবর সাগরপারে ফ্লাণ্ডার্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া শুনিলেন, ওয়ালেস্ গাইন্ প্রদেশে রহিয়াছেন। শ্রবণ মাত্র তিনি তথায় যাত্রা করিলেন, ও ওয়ালেসের সমীপে উপস্থিত হইয়া ইংরাজদিগের অত্যাচারের কাহিনী নিবেদন করিলেন। ওয়ালেস ইংরাজদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রোধোন্মত্ত হইলেন, এবং বিদায় লইবার জন্য ফরাশি-রাজসদনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ফরাশিরাজ বিদায় দিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু ওয়ালেস পুনরাগমনে স্বীকৃত হওয়ায় অগত্যা তাঁহাকে বিদায় দিলেন; বলিলেন যদি, ওয়ালেস কখন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফরাশি ক্ষেত্রে বাস করিতে চাহেন, তিনি ফরাশিরাজের নিকট যে কোন লর্ডশীপ্ পাইতে পারিবেন।

ওয়ালেস ফরাশিরাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ অনুযাত্রিকবর্গ ও সার

টমাস্ লঙ্ভিল্কে সঙ্গে লইয়া জলযান-যোগে মন্রোজ হেভেন্ নামক বন্দরে আসিয়া অবতরণ করিলেন। অচিরকাল-মধ্যে তাঁহার আগমনবার্ত্তা স্কট্লণ্ডের সর্ব্বত্র প্রসৃত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার সহ-সমরিগণ তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিলেন। সার জন্ রামজে, রুথ্ভেন্ বাক্লে প্রভৃতি সসৈন্য বার্ণেম্ অরণ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মিলিত সৈন্য তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিল।

১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এই মিলন সংঘটিত হয়। সর্ব্বপ্রথমে সেণ্ট জনষ্টন্ দুর্গ অধিকার করার প্রস্তাব হইল। রজনীযোগে তাঁহারা টের অভি-মুখে যাত্রা করিয়া পথের পার্শ্বে জঙ্গলে লুকাইয়া রহিলেন। ইংরাজভৃত্যেরা ঘাস আনিবার জন্য ছয় খানা শকট লইয়া যাইতেছে দেখিয়া ওয়ালেস্ কতিপয় মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে বন হইতে বহির্গত হইয়া শকটগুলি অধিকার করিলেন; ইংরাজভৃত্যগুলিকে বধ করিয়া তাহাদিগের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক ঘাস আনিতে চলিলেন; এবং ঘাস কাদিয়া শকট গুলির মধ্যে পঞ্চদশ সশস্ত্র পুরুষকে ঘাস চাপা দিয়া তাঁহারা দুর্গে প্রত্যাগত হইলেন। প্রহরীরা অসন্দিগ্ধচিত্তে ও অবাধে তাঁহা-দিগকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল। শকটগুলি দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সশস্ত্র পুরুষেরা ঘাসের মধ্য হইতে উঠিয়া লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইল। ওয়া-লেস্ সেই সকল] অস্ত্রধারী পুরুষ লইয়া দুর্গদ্বাররক্ষক প্রহরিগণকে আক্রমণ করিলেন। প্রহরীরা হত হইলে, দুর্গ দ্বার সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাদিগের হস্তগত হইল। ইত্যবসরে সার্ জন্ রাম্জে অবশিষ্ট স্কচ সৈন্য সঙ্গে লইয়া দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অচিরকাল মধ্যে দুর্গরক্ষক সমস্ত ইংরাজসৈন্য হত হইল, অথবা পলায়ন দ্বারা প্রাণ বাঁচাইল। কতকগুলি টে নদীর জলে গিয়া ঝাঁপ দিল। দুর্গাধ্যক্ষ সার্ জন্ সিউয়ার্ড অতি কষ্টে মেথ্ভেন্ অরণ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ চারি শত ইংরাজ হত হয়। সাত কুড়ি মাত্র পলা-ইয়া প্রাণ বাঁচায়। ওয়ালেস্ সার্ জন র‍্যাম্জেকে ক্যাপ্টেন্ ও রুথ্ভেন্কে সেরিফ নিযুক্ত করিয়া ফাইফ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন; বলিয়া গেলেন যে, যদি ইংরাজেরা ইতিমধ্যে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয়। স্কটেরা সেণ্ট জনষ্টনে যে প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী পাইয়া ছিলেন, তাহাতে কিছু কাল সুখে সচ্ছন্দে কাটাইতে লাগিলেন।

এদিকে ওয়ালেস ফাইফ-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া সিউ-য়ার্ড পঞ্চদশ শত সৈন্য লইয়া ব্ল্যাক-আয়রন সাইড নামক স্থানে তাঁহাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সৈন্যের সংখ্যা-বৈষম্যে স্কটেরা প্রথমে

অতিশয় ভীত হইলেন। তাঁহারা সেণ্ট জন্ষ্টনেও সংবাদ পাঠাইতে পারিলেন না—কারণ ইংরাজেরা পথ সংরক্ষণ করিতেছিলেন। এই অবস্থায় ওয়ালেস একটী সমর-সভা আহ্বান করিলেন। সভায় নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক হইল—অনেকে অনেক প্রকার মত বলিলেন, কিন্তু ওয়ালেস বলিলেন যে, প্রাণপণে যুদ্ধ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। অনেক বিতণ্ডার পর ওয়ালেসের মতই গৃহীত হইল। ওয়াল্লেসের সৎ সাহসে উদ্দীপিত হইয়া স্কটেরা যুদ্ধে জয় লাভ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকের বৃক্ষান্তরাল সকলে বৃক্ষশাখা পুতিয়া একটী সুদৃঢ় স্বাভাবিক দুর্গ করিয়া লইলেন। দুর্গ সমাপ্ত হইতে না হইতে সিউয়ার্ড সসৈন্য তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। ইংরাজ সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিল। সহস্র সৈন্য সিউয়ার্ডের অধীনে ও পঞ্চ শত সৈন্য সার আমের ডি ভ্যালেন্সের অধীনে ছিল। দুই দিক হইতেই আক্রমণ প্রতিহত হইল—এই আক্রমণে অসংখ্য ইংরাজসৈন্য ধরাশায়ী হইল। অবশেষে ইংরাজ সেনাপতি দুর্গ অবরোধ করিতে সঙ্কল্প করিয়া অষ্ট শত সৈন্য লইয়া সমস্ত বন ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং অবিরাম দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য সপ্ত শত সৈন্য সহ ভ্যালেনসকে রাখিয়া গেলেন। এবং আশা দিলেন যে, যদি তিনি ওয়ালসকে ধৃত করিতে পারেন, এডওয়ার্ড তাঁহাকে ফাইফের আর্‌ল করিবেন।

ইংরাজ সেনাপতিদ্বয়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ওয়ালেস ক্রফোর্ড ও লণ্ডভিলের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া ৪০ জন মাত্র সৈন্য দুর্গে রাখিয়া অবশিষ্ট ষাইট্‌জন সৈন্য লইয়া সিউয়ার্ডের সম্মুখীন হইতে চলিলেন। সিউয়ার্ড উপস্থিত হইতে না হইতেই তাঁহারা অগ্রে গিয়া একটী বাঁধের পার্শ্বে বড় বড় ঘাসের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। ইংরাজেরা তাহাদিগকে টের পাইয়া 'মার! মার!' শব্দে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িল। কিন্তু স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরের দেহ দেবদত্ত-কঞ্চুক-রক্ষিত। এই জন্য সেই অল্পসংখ্যক বীর সেই প্রচণ্ড ইংরাজ-বাহিনীর গতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেন। বজ্রমুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া স্কটেরা অসংখ্য ইংরাজকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। ইংরাজসেনা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না; স্তম্ভিত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সিউয়ার্ড এই অল্পসংখ্যক স্কট্‌ বীর কিরূপে অসংখ্য ইংরাজসৈন্যের গতি প্রতিহত করিল ভাবিয়া চমকিত হইলেন। তখন সিউয়ার্ড দুর্গ আক্রমণের শেষ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। তিনি সসৈন্য দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলে

স্কটেরা এরূপ প্রচণ্ড বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল যে তাহাকে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। সর্ব্বশুদ্ধ এক শত ত্রিশ জন ইংরাজ এই রণে হত হইল। সিউয়ার্ড স্যার্ আমেরকে পাঁচ শত সৈন্য সহ দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকিতে আদেশ দিলেন এবং ভয় দেখাইলেন যে, যদি তিনি সে আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে কল্য তাঁহাকে ফাঁশি-কাষ্ঠে বিলম্বিত করিবেন। সিডয়াড প্রস্থান করিলে, ওয়ালেস ভ্যালেনসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে এডওয়াডের দাসত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাতীয় দলে মিশিতে অনুরোধ করিলেন। ভ্যালেন্স সিইয়াডের আদেশ প্রতিপালনে পূর্ব্ব হইতেই অসম্মত ছিলেন এবং আদেশ লঙ্ঘনের পরিণামও জানিতেন; সুতরাং তিনি ওয়ালেসের প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

এই মিলিত সৈন্য সিউয়ার্ডের সৈন্যাভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে র‍্যাম্জে ও রুথ্ভেন ওয়ালেসের বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সসৈন্য দ্রুত পদে ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এই মিলিত সৈন্য অপেক্ষায় এখনও সিউয়ার্ডের সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল। সংখ্যাবাহুল্যের সাহসে নির্ভর করিয়া সিউয়াড নিজ সৈন্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ ধরিয়া সংগ্রাম চলিতে লাগিল। র‍্যাম্জে ও রুথ্ভেন্ তাঁহাদিগের তাজা সৈন্য লইয়া শত্রু হনন কার্য্যে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইতে লাগিলেন। স্বয়ং স্যার জন্ সিউয়ার্ড ওয়ালেসের শাণিত তরবারিতে ধরাশায়ী হইলেন। ইংরাজ সৈন্য সেনাপতির পতনে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

রণে জয় লাভ করিয়া রুথ্ভেন্, সেণ্ট জন্‌ষ্টনে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং র‍্যাম্জে কুপার দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কুপার দুর্গ বিনা যুদ্ধে তাঁহার হস্তে পতিত হইল। এদিকে ওয়ালেস ক্রফোর্ড, গুথ্রী রিচার্ড ওয়ালেস ও লণ্ডভিল্ অনবরত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া ভ্যালেনসের আবাসে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। ভ্যালেন্স চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা তাঁহাদিগের অতিথি সৎকার করিলেন।

প্রত্যূষে স্কটেরা সেণ্ট আণ্ড্রু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথাকার ইংরাজ বিসপ তাড়িত হইয়া সমুদ্র পথে ইংলণ্ডে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর তাঁহারা কুপার দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া দুর্গ উন্মূলিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ই জুন এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৮০ জন ইংরাজ হত হন। সার্ আল্ডোমর ও সার জন্ সিউয়ার্ড তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান।

এই ব্ল্যাক আয়রন্ সাইড্ যুদ্ধে স্কটেরা সবিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চারি, পাঁচ, গুণ ইংরাজ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়াও তাঁহারা বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হন নাই। বার বার ইংরাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন; বার বার তাঁহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের অতিমানুষ বীরত্বে বিগলিত হইয়া জয়লক্ষ্মী তাঁহাদিগের অঙ্কশায়িনী হইলেন। দুই জন স্কট্ সেনানায়ক এই যুদ্ধে হত হন। ফাইফের সেরিফ্, সার ডঙ্কান ব্যাল্‌ফোর্ ও সার্ ক্রাইষ্টোফর সীটন্ এবং সার্ জন্ গ্রেহাম্ আহত হন। এই যুদ্ধে র‍্যামজে, গুথরী ও বিসেট্ অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহা সামান্য আরণ্য সমর বটে, কিন্তু ইহাতে স্কট্ বীরগণের যশঃসৌরভ সর্ব্বত্র বিকিরিত হইল। সিউয়ার্ডের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া ফাইফ-স্থিত সমস্ত ইংরাজগণ ফাইফ্ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কেবল লক্‌লেভেনের বারিকে কতিপয়মাত্র ইংরাজ সৈন্য ছিল। সেই বারিক চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত বলিয়া তাহারা ভাবিয়াছিল, নিরাপদে থাকিতে পারিবে। কিন্তু অচিরকাল-মধ্যে তাহাদিগের সে ভ্রম বিদূরিত হইল। সমস্ত স্কট্ সৈন্য ক্যাবেলে সমবেত হইয়া তথা হইতে 'স্কটলণ্ডস ওয়েল' নামক স্থানে আসিয়া ছাউনী করিল। রজনীতে আহারান্তে ওয়ালেস অষ্টাদশ মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে অজ্ঞাত ভাবে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া লক্‌লেভেনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অপরপারস্থ বন্দরে উপস্থিত হইয়া তিনি সহচরবর্গকে তথায় রাখিয়া অপর পার হইতে নৌকা আনিবার জন্য স্বয়ং জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণকালে একটী সার্ট-মাত্র তাঁহার গায় ছিল, ও তাঁহার অসি তাঁহার গলদেশে বিলম্বিত ছিল। ওয়ালেস্ অতিবেগে হস্ত ফেলিতে ফেলিতে নিমেষমধ্যে অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বোটে লোক ছিল না সুতরাং তিনি অবাধে তাহা এ পারে আনিলেন। সকলে তাহার উপর চড়িয়া তাঁহারা নিশব্দে পার হইয়া ইংরাজদিগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত ইংরাজ তাঁহাদিগের অসিমুখে পতিত হইল। সেই ক্ষুদ্র দুর্গের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী এক্ষণে তাঁহাদিগের করতলস্থ হইল। রজনীতেই এই সংবাদ 'স্কটলণ্ডস ওয়েলে' প্রেরিত হইল। তথাকার স্কটগণ প্রত্যূষে আসিয়া বিজয়ী সহচর বৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। সেই ক্ষুদ্র স্কটসেনা বিজয়োল্লাসে উল্লাসিত হইয়া আট দিন ধরিয়া তথায় বিজয়োৎসব করিতে লাগিল।

আট দিন উৎসবের পর স্কটেরা দুর্গের যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া সেই বোটে করিয়া অপর পারে আনিয়া উপস্থিত হইলেন—আসিয়া বোট জ্বালাইয়া

চলিয়া গেলেন, ওয়ালেস সেণ্ট্ জনষ্টনে গমন করিলেন। তথায় বিসপ সিন্‌ক্লেয়ার তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ওয়ালেস উত্তর প্রদেশে যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু বিসপ্ তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। কারণ তখন শত্রুসেনা স্কট্‌লণ্ডের চতুর্দ্দিক্ বিলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছিল। যাহাতে উত্তরস্থিত জাতীয় সেনার সহিত ওয়ালেস্ মিলিত হইতে না পারেন, ইংরাজেরা সেই উদ্দেশে মধ্যপথ সংরক্ষণ করিতেছিল। এদিকে বুকানের আরল্ ওয়ালেসের নিকটে যাহাতে কোন প্রকার খাদ্যসামগ্রী যাইতে না পারে, কেবল তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন।

ইংরাজদিগের এই সকল চেষ্টা সত্ত্বেও চতুর্দ্দিক্ হইতে দরিদ্র লোক ওয়ালেসের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তরুণবয়স্ক র‍্যাণ্ডেল্‌ফ 'মরে' হইতে ওয়ালেসের সাহায্যার্থ অনেকগুলি লোক পাঠাইয়া দিলেন। ইত্যবসরে জপ্ ও ক্লেয়ার গুপ্তভাবে শত্রুসেনার আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়া আসিয়া ওয়ালেসকে বিদিত করিলেন। ওয়ালেস সেই সংবাদ পাইয়া জপ, ষ্টিফেন, ও কার্ল্ প্রভৃতি পঞ্চাশৎ সহচর সমভিব্যাহারে সেণ্ট জনষ্টন হইতে এয়ারেথ দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একটী বিধবা রমণী জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া সেই ক্ষুদ্র সেনার প্রয়োজনীয় যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী সংযোজনা করিয়াছিলেন। একটী ভালুক পথপ্রদর্শক হইয়া রাত্রি-যোগে এই ক্ষুদ্র সেনাকে সেই প্রাকার-পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ-সমীপে আনয়ন করিল। দুর্গের পশ্চাদ্‌ভাগে একটী ক্ষুদ্র গুপ্ত সেতু ছিল। স্কট বীরবৃন্দ সেই সেতু দিয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিল। রাত্রি তখন প্রায় সার্দ্ধ এক প্রহর। ইংরাজেরা নিরাপদে পানভোজনাদি করিতেছিল—এমন সময় ওয়ালেস সেই দালানের দ্বারে দেখা দিলেন। সকলে ভয়চকিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে ওয়ালেসের শাণিত তরবারি দুর্গাধ্যক্ষ টম্ লীনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। দুর্গাধিনায়কের পতনে ইংরাজেরা ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। একে একে দুর্গরক্ষক একশত ইংরাজ স্কট বীরবৃন্দের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে শমনসদনে প্রেরিত হইল। ওয়ালেস তাহার পর তাঁহার খুল্লতাতকে কারামুক্ত করিলেন। টম লীন ওয়ালেসের কিছু করিতে না পারিয়া তাঁহার খুল্লতাতকে ধরিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুরাত্মা সেই বৃদ্ধের হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া অন্ধতমোময় সজল গহ্বর-মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। বৃদ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বিজয়ী বীরবৃন্দ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সে রাত্রি তাঁহারা তথায় সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। পরদিনও তাঁহারা তথায় অবস্থিতি করিলেন।

মধ্যে মধ্যে কেবল ইংরাজ আক্রমণকারীরা আসিয়া তাঁহাদিগের বিশ্রাম সুখের ক্ষণিক ব্যাঘাত সম্পাদন করিতে লাগিল। স্কটেরা প্রতিবারই তাহাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিলেন। এইরূপভাবে তাঁহারা দ্বিতীয় রাত্রিও তথায় যাপন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে তাঁহারা তথা হইতে ডম্বার্টনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগরের অদূরবর্ত্তী টরউইড নামক স্থানে তাঁহারা সমস্ত দিবস যাপন করিয়া রজনী আগত হইলে গুপ্তভাবে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত ওয়ালেসের পূর্ব্বপরিচিত এক বিধবা রমণী বাস করিতেন। ওয়ালেস তাঁহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিধবা রমণী স্কটিশ বীরবৃন্দকে প্রাকারবেষ্টিত সমীপবর্ত্তিনী গোলাবাড়ীতে লইয়া গিয়া লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। এবং তথায় চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা তাঁহাদিগের অতিথিসৎকার করিলেন। তাঁহার নয় পুত্র ছিল। তিনি সকলকেই ওয়ালেসের ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য শপথ করাইলেন। বিধবা রমণী ইংরাজদিগকে কর প্রদান করিয়া সুখে ও স্বচ্ছন্দে নগরে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু জাতীয় দলের আগমনে সে শান্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া জাতীয় কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিলেন।

ওয়ালেস্ যে যে গৃহে ইংরাজেরা বাস করিতেছিলেন, বিধবা রমণীকে সেই গৃহে সঙ্কেতচিহ্ন দিয়া আসিতে আদেশ করেন। তাহা সম্পন্ন হইলে তিনি ও তদীয় সহচরবর্গ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নগরপথে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে একটী হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েক জন ইংরাজ তথায় পানভোজনাদি করিতেছিলেন। ওয়ালেসের প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে তাহারা অনেকেই ভূশায়িত হইলেন। তাঁহার সহচরবৃন্দ অবশিষ্ট ইংরাজগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। হোটেল-অধ্যক্ষ এই ঘটনায় আনন্দে আট খানা হইলেন এবং মদ্য মাংসাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অতিথিসৎকার করিলেন। তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক পানভোজনাদি করাইয়া হোটেল-স্বামী পথ-দর্শক হইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিহিংসার কার্য্যে লইয়া গেলেন। তিন শত ইংরাজ নগররক্ষার্থে নিয়োজিত ছিলেন; সেই রজনীতেই তাহারা একে একে সকলেই জাতীয় দলের হস্তে পতিত হইলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ওয়ালেস ও তদীয় দল নগরের অদূরবর্ত্তী গুহা-মধ্যে গিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে সে দিবস অতিবাহিত করিলেন। পান্থনিবাসের অধিস্বামী অপর্য্যাপ্ত মদ্যমাংস দ্বারা তথায়ও তাঁহাদিগের সবিশেষ পূজা বিধান করিলেন।

রজনীযোগে তাঁহারা রোজনীথগিরিদুর্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই দুর্গে অনেক ইংরাজ সৈন্য ছিল। একটী

ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর দুর্গটী অবস্থিত। স্কটেরা বনরাজির মধ্য দিয়া গুপ্ত ভাবে ধীরে ধীরে পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশে গমন করিলেন। দুর্গের অধিবাসীরা তৎকালে কোন বিবাহ উপলক্ষে গির্জ্জায় গমন করিয়াছিলেন, কয়েক জন মাত্র দাস দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং স্কটেরা অবাধে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ইংরাজেরা গির্জ্জা হইতে ফিরিয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সংখ্যায় অশীতি জন বা কিঞ্চিৎ অধিক ছিলেন। দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র স্কটেরা প্রচণ্ড বেগে তাঁহাদিগের উপর আসিয়া পড়িলেন। নিমেষ-মধ্যে সমস্ত ইংরাজ ভূতলশায়ী হইলেন। সাত দিন ধরিয়া স্কটেরা তথায় বিজয়োৎসব করিয়া, দুর্গের দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া ইহাতে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

এখান হইতে স্কটেরা ফ্লসন্ নামক স্থানে গমন করিলেন। তথায় আরল্ ম্যাল্কম বাস করিতেছিলেন। গ্রেহাম, বইড্, লুণ্ডিনের রিচার্ড, এডাম্ ওয়লেস ও বার্ক্লে প্রভৃতি ওয়ালেসের বন্ধুবর্গও ম্যাল্কমের আলয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাসমাদরে ওয়ালেস্কে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেস্ ক্রিস্মচ্ পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিলেন। এস্থানে অবস্থিতি-কালে তিনি জননীর মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। তদীয় জননী এলারস্লি হইতে তাড়িত হইয়া, ডন্‌ফার্লিন্ আবিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জননীর মৃত্যু-সংবাদে ওয়ালেস্ নিরতিশয় কাতর হইলেন; এবং নিজে তাঁহার সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিতে যাইতে সাহসী না হওয়ায় জপ্ ও বেল্লারকে মহাসম্মানের সহিত সে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। একদিন গ্যারিবল্ডীকেও এইরূপে প্রাণাধিক প্রিয়তমা ভার্য্যা আনিতার সমাধিকার্য্য সম্পাদন করিবার ভার আতিথেয় আশ্রয়দাতা কৃষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া পলায়ন দ্বারা অনুসরণকারী অষ্ট্রিয়গণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল।

ডগ্লাস্‌ডেলের সার উইলিয়ম্ ডগ্লাস, ওয়ালেস আবার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শুনিয়া জাতীয় ব্রত উদ্যাপনের অংশ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যদিও তিনি যৌবনে অগত্যা এড্ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, যদিও তিনি ইংরাজ-রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি জাতীয় ভাব তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তৎকালে তদীয় পত্নীর কোন আত্মীয় সাঙ্কুহার নামক দুর্গ অধিকার করিতেছিলেন। তিনি সেই দুর্গ ও ডগলাস্ ডেলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পূর্ণ ধ্বংস বিস্তার করিয়াছিলেন। ডগ্লাস্ সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ

লইবার জন্য আজ স্বয়ং সেই দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি টম্ ডিক্সন্ নামক একজন ভৃত্যকে অগ্রে তথায় প্রেরণ করিলেন*। পথিমধ্যে এণ্ডার্সন নামক এক জন দুর্গবাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ডিক্সন্ তাহার সহিত আপনার অশ্ব ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল; এবং সেই পরিচ্ছদ পরিয়া কাষ্ঠের বোঝা লইয়া প্রতূষে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে স্থির করিল। এণ্ডার্সনের নিকট অবগত হইল যে দুর্গ মধ্যে ৪০জন মাত্র অস্ত্রধারী পুরুষ আছে। টম্ ডিকসন সেই বেশে ও সেই অশ্বে দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিল; এ দিকে এণ্ডার্সনও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ডগ্লাস্‌কে লইয়া আবার দুর্গের দিকে ফিরিল। ডগ্লাস্ ও ডিকসনকে অদূরে লুক্কায়িত রাখিয়া এণ্ডার্সন্ একাকী দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এত প্রত্যূষে দ্বার খুলিতে হইল বলিয়া দ্বারী তাহাকে অতিশয় তিরস্কার করিল। দ্বার খুলিবামাত্র এণ্ডার্সন্ গুটি কতক ডাল কাটিয়া দ্বারে এরূপ ভাবে ফেলিল যে, দ্বার আর বন্ধ করা গেল না। সেই অবসরে এণ্ডার্সনের সঙ্কেতানুযায়ী ডগ্লাস নিজ দল-বল সহ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সর্ব্বপ্রথমে প্রহরী, ও তাহার পর একে একে সমস্ত ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। কেবল এক জন মাত্র ইংরাজ প্রাণ বাঁচাইয়া ডুরিস্‌ডিয়ারে গিয়া এই সংবাদ দিল। ডগ্লাস্‌কে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অচিরকালমধ্যে টাইবার্স্ মুরে একটী ইংরাজসেনা সমবেত হইল। ডগ্লাস ডিক্সন্ দ্বারা এই আসন্ন বিপদের বার্ত্তা ওয়ালেসের নিকট পাঠাইলেন। ওয়ালেস তৎকালে লেডেন গড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তিন শত মাত্র সৈন্য লইয়া উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে কিলসিথ্ দুর্গ অধিকার করিবেন সঙ্কল্প ছিল। তৎকালে র‍্যাভেনস্ ডেল্ এই দুর্গের অধিপতি ছিলেন। তিনি কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড কিউমিন্ তাঁহার অনুপস্থিতিকালে দুর্গে বাস করিতেছিলেন। ওয়ালেস্ দুর্গাবরোধের ভার ম্যালকমের হস্তে প্রদান করিয়া ডগ্লাসের সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে অভাবনীয় রূপে র‍্যাভেন্স-ডেলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। র‍্যাভেন্স ডেল পঞ্চাশৎ মাত্র সৈন্য সহ তদীয় দুর্গাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। মত্ত মাতঙ্গের উপর যেমন সিংহ লম্ফ প্রদান করে, সেই রূপ ওয়ালেস্ ও তাঁহার সৈন্যগণ সেই ক্ষুদ্র ইংরাজসেনার উপর প্রচণ্ডবেগে পতিত হইলেন। ঊর্দ্ধ শ্বাসে ইংরাজেরা পলাইয়া কিল্‌সিথ দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ম্যাল্কম দুই শত স্কটিশ সৈন্য লইয়া দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, সুতরাং ইংরাজেরা তথায় যাইবামাত্র অবরোধকারিণী ও অনুসরণকারিণী স্কটিশ সেনাদ্বয়ের মধ্যে

পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। ওয়ালেস লুণ্ঠন-ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া ডগ্‌লাসের সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন।

পথিমধ্যে লিন্‌লিথ্‌গো পীল্ ও ডনকীথ প্রভৃতি দুর্গ তাঁহার হস্তে পতিত হইল। এদিকে ওয়ালেসের উপর্য্যুপরি বিজয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া অনেক স্কটিশ বীর তাঁহার পতাকাচ্ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। লডার্, সীটন্, বাস্, হিউ দি হে প্রভৃতি আপন সৈন্য সহ ওয়ালেসের সহিত মিলিত হইলেন। এই মিলনে ওয়ালেস্ ও ম্যাল্‌কম্ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পীবল্‌সে আসিয়া ওয়ালেস্ ঘোষণা করিলেন—যাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত মিল করিবেন, তাঁহারা সবিশেষ পুরস্কৃত হইবেন। ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্যা ক্রমে ছয় শত হইয়া দাঁড়াইল। তিনি এই ক্ষুদ্র সেনা লইয়া ক্লাইডেস্‌ডেলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে ইংরাজেরা সাঙ্কুহার দুর্গে ডগলাসকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ওয়ালেস আসিতেছেন শুনিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে ইংলণ্ডাভিমুখে পলায়ন করিল। ওয়ালেস তৎকালে ক্রফোর্ড মুর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের পালয়ন-বার্ত্তা শুনিয়া ওয়ালেস ম্যালক্‌মের হস্তে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আসার ভার রাখিয়া স্বয়ং তিন শত মাত্র সশস্ত্র অশ্বারোহী বাছাই সৈন্য লইয়া শত্রুদিগের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। ক্রোজবরণে গিয়া শত্রুদিগকে ধরিলেন। পশ্চাদ্বর্ত্তী এক দলের সহিত তুমুল সংগ্রাম বাধিল। নিমেষমধ্যে প্রায় দেড় শত ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। অগ্রগামী সৈন্য এই সংবাদে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। এদিকে ম্যালকমের সৈন্যও ওয়ালসের সহিত আসিয়া মিলিত হইল। মিলিত স্কটিশ সৈন্য প্রচণ্ডবেগে মিলিত ইংরাজ সৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইল। সে প্রচণ্ডবেগ ইংরাজেরা সহিতে না পারিয়া আবার পলায়ন করিল। আবার স্কটেরা অনুসরণ করিল। ডাল্‌সুইঙ্‌টন পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পাঁচ শত ইংরাজ ধরাশায়ী হইল। তথাপি অনুসরণে বিরাম নাই। অশ্ব ক্লান্ত হওয়ায় ওয়ালেস ও গ্রেহাম পদব্রজে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে আডামকোরী জনষ্টন্, কার্ক প্যাট্রিক্ ও হ্যালিডে নব বল সহ ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ওয়ালেস্ মূল সেনা লইয়া আসিবার জন্য গ্রেহামকে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং এই নবাগত সৈন্য হইতে একটী অশ্ব লইয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক নব বল সমভিব্যাহারে অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পথে তাঁহারা ইংরাজ-মেধ যজ্ঞ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডুরিসডার, ইনক্, ও টাইবারমুরের দুর্গাধ্যক্ষগণ নিহত হইলেন। কক্‌পুল্ নামক সেতুর ধারে অসংখ্য ইংরাজ নিহত হইল। অনেকে নদী পার হইয়া যাইতে জলমগ্ন

হইল। এখানে কেয়ারলাভেরক স্থানের অধিপতি ম্যাক্‌সওয়েল ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। সে রাত্রি তাঁহারা কেয়ারলাভেরক্ স্থানে অবস্থিতি করিয়া পর দিন উঠিয়া ডম্‌ফ্রিজ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ঘোষণা করিতে করিতে যাইলেন যে,স্কটলণ্ড আবার জাতীয় দলের হস্তে পতিত হইয়াছে, সুতরাং আর ভয়ের কারণ নাই। ইংরাজেরা যে যেখানে ছিল স্থলপথে বা জলপথে ইংলণ্ডে পলায়ন করিল। কেবল এক-জন মাত্র ইংরাজ এখনও স্কটলণ্ডে প্রভুত্ব করিতেছিলেন। কেবল ডণ্ডীদুর্গ এখন মর্টন নামক ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিতেছিল। তদ্ভিন্ন সমস্ত স্কটলণ্ডে আবার জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল।

কিন্তু একটী বৈদেশিকের চরণ স্কটলণ্ড বক্ষে থাকিতে ওয়ালেসের শান্তি নাই। এইজন্য তিনি ডগ্‌লাসের হস্তে পুনরাধি-কৃত প্রদেশ-সমূহের রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া ডণ্ডী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়াই তিনি নগরাব-রোধে প্রবৃত্ত হইলেন। মর্টন প্রাণভিক্ষায় আত্মসমর্পণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু ওয়ালেস তাহাতেও সম্মত হইলেন না।

এই সময় এডওয়ার্ড সসৈন্য ফ্রান্সে অবস্থিতি করিতেছিলেন। স্কটলণ্ডের ইংরাজমেধ যজ্ঞের বার্ত্তা অবগত হইয়া এডওয়ার্ড মহতী সেনা সহ স্কটলণ্ড আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ওয়ালেস ডণ্ডীর অবরোধে নিযুক্ত রহিয়াছেন, এমন সময় এক দিন তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য জপ আসিয়া সংবাদ দিল যে, এডওয়ার্ড একলক্ষ সৈন্যসহ স্কটলণ্ডাভিমুখে আসিতে ছেন। এই সংবাদ পাইয়া ওয়ালেস, দুই হাজার সৈন্য সহ স্ক্রিমজিওরকে ডণ্ডীর অবরোধকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং আট হাজার সৈন্য লইয়া সেণ্ট জনষ্টনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে তিনি ইংরাজদিগের প্রতীক্ষা করিয়া কয় দিন রহিলেন। ইত্যবসরে ইংরাজ-সেনাপতি উডষ্টক দশ সহস্র সৈন্য সহ ষ্টার্লিঙ ব্রিজ নামক স্থানে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। যেন একখানি কাল মেঘ আসিয়া স্কটলণ্ডের সৌভাগ্য সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিল।

হিন্দুবিবাহ।

(বঙ্গদর্শনের প্রতিবাদ।)

বিগত চৈত্র মাসের বঙ্গদর্শনে *"বিবা-হের বয়স এবং উদ্দেশ্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। লেখক এত লিপিচাতুর্য্য সহকারে হিন্দুদিগের পূর্ব্ব-

* ১২৮৯ সালের চৈত্র মাসের ১০২ সংখ্যক বঙ্গদর্শন দেখ।

তন বিবাহপ্রণালী বিবৃত করিয়াছেন, যে, তাহাতে শুদ্ধ সেই বিবাহরীতি যথাযথ বর্ণন করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া প্রতীত হয় না; যাহাতে হিন্দু-বিবাহের সমস্ত দোষ বেশ আবৃত হইয়া, তাহা ইংরাজী বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায়, এমত প্রতিপন্ন করাও লেখকের সম্পূর্ণ অভিপ্রায়। অন্যদেশীয় রীতি নীতি অপেক্ষা আমাদের রীতি নীতি ভাল, এমত প্রতিপাদন করিতে একটু আনন্দ বোধ হয় সন্দেহ নাই। শুদ্ধ আনন্দ নয়, স্বদেশানুরাগও একটু পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু প্রকৃত স্বদেশানুরাগী শুদ্ধ স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি জন্য ব্যস্ত হইবেন এমত নহে, যাহাতে আবার স্বদেশের সমস্ত দোষ সংশোধন হয়, তাঁহার এমত চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। যে স্বদেশপ্রিয়তা স্বদেশের দোষ ঢাকিয়া রাখিতে যায়, সে স্বদেশপ্রিয়তা অত্যন্ত অন্ধ ও সঙ্কীর্ণ।

আমাদের বৈবাহিক ব্যবস্থাদি এবং স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থা যে একেবারে দোষশূন্য এমত নহে, সে সকল দোষ আবৃত করা এক্ষণে উচিত নহে। যাহাতে তাহা বাহির হয় এবং সেই সকল দোষ সংশোধন হয়, তাহার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। স্বদেশের রীতি নীতিতে যে যে দোষ আছে, তাহা সেই রীতি নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া বাহির করিতে হইবে। শুদ্ধ গুণকীর্ত্তন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। তুমি যদি গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হও, আমি দোষোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইব। তা না হইলে আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, বাহির হইবে কেন? এইরূপ সদভিপ্রায়ে চালিত হইয়া আমরা বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

লেখক পূর্ব্বতন হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য এইরূপ স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন "হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য এই যে, অসম্পূর্ণ পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি হইবেন। হিন্দুবিবাহ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সেই একত্ব সাধন। প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে এক হইবে। হিন্দুবিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া একত্ব সম্পাদিত হয়—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরে মিশিয়া যায়। * * * হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্যও মুক্তি। তাই হিন্দুবিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষ মিশিয়া একটি মুক্তি অথবা স্বয়ম্ভূর সৃষ্টি হয়।" লেখক হিন্দুবিবাহের এই-রূপ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া, কিরূপে সেই উদ্দেশ্য, সেই স্ত্রীপুরুষের একত্ব হিন্দুসমাজে সংসাধিত হয়, তাহা বর্ণন করিয়াছেন। এই একত্ব সংসাধন করিতে হইলে দুই জনকে এক করা চাই। দুই জনে এক হইতে গেলে এক জনকে লয় প্রাপ্ত হইতে হয়। হিন্দুমতে স্ত্রীকে বিলীন হইয়া পতিতে মিশিতে হইবে। সেই স্ত্রীর পৃথকত্ব যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়, এমত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য হিন্দুরীতি বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই

বাল্যবিবাহ রীত্যনুসারে স্ত্রীর পৃথক সত্তা কিরূপে বিনষ্ট হয় লেখক তাহা বর্ণন করিতেছেনঃ—

"ফলতঃ যাহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, যাহার কিছুই আপনা হইতে পৃথক থাকিবে না, তাহাকে গোড়া হইতেই আপনাতে মিশাইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা, এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আপনার অভিলাষানুযায়ী হওয়া আবশ্যক।"

পত্নীর যখন এইরূপ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া তিনি পতিতে মিশিয়া গেলেন, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে মিশিয়া গেলেন, যখন তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা কিছুই উপলব্ধি হয় না, তখন যাহাতে সেই পত্নী আবার চিরদিনের জন্য পতি-পার্শ্বে বাঁধা থাকেন তজ্জন্য হিন্দুশাস্ত্রকার ব্যবস্থা দিলেন। আমরা লেখকের কথায় তাহা ব্যক্ত করিলাম।

"হিন্দুশাস্ত্রকার পত্নীকে পতিতে এবং পতিকুলেতে বাঁধিয়া রাখিতে চান, এবং সেই জন্য তিনি পতিপত্নীর যোগকে চিরস্থায়ী যোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ঠিক সে মত এবং সে চেষ্টা নয়। তাঁহারা যে পতিপত্নীর সম্বন্ধ স্থায়ী করিতে অনিচ্ছুক, তা নয়। কিন্তু পতি এবং পত্নীর স্বাধীনতার দিকে এবং পৃথক পৃথক আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ এবং অভিরুচির দিকে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি, এবং সেই জন্য তাঁহারা পতি এবং পত্নীর বিবাহগ্রন্থি যাহাতে সহজে খোলা যায়, সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। * * * ইংরাজ বলেন,—পতি এবং পত্নী আজ পরস্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন, কিন্তু কাল তাঁহাদের মধ্যে অপ্রণয়ের কারণ জন্মিতে পারে, এবং যদি তাহাই হয়, তবে পরশ্বই তাঁহারা যাহাতে দাম্পত্য বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। হিন্দু, পতিপত্নীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি আঁটিয়া দিতে চান।"

লেখক প্রথমে হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য স্থির করিলেন, সেই উদ্দেশ্য কিরূপে সংসাধিত হয় তাহা তৎপরে দেখাইলেন এবং অবশেষে এই হিন্দু বিবাহ, ইংরাজী বিবাহ অপেক্ষা কি জন্য শ্রেষ্ঠ, তাহা প্রদর্শন করিলেন। আমরা দেখাইব, লেখক যাহা হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত কি না, এবং তাহা ইংরাজী বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না।

স্ত্রীপুরুষের একত্ব সাধন যেমন হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য বলিয়া লেখক স্থির করিয়াছেন, আমরা জানি, ইহা ইংরাজী বিবাহেরও উদ্দেশ্য। শুদ্ধ ইংরাজী কেন, অনেক দেশের অনেক জাতীয় বিবাহেরও এই সাধারণ উদ্দেশ্য। স্ত্রী-পুরুষকে এক করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিবাহের সৃষ্টি। সর্ব্বত্রই স্ত্রী-পুরুষকে এক করিয়া, উদ্বাহ কার্য্য একটি পরিবারের সৃষ্টি করে। এই একত্ব-সাধন-

জাত সন্তানাদির প্রতিপালন করা পারিবারিক নিয়ম। এ নিয়ম সর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে। বিবাহমাত্রেরই উদ্দেশ্য যখন স্ত্রীপুরুষকে একীকরণ, তখন হিন্দু বিবাহ অপর জাতির বিবাহ হইতে বিভিন্ন নহে।

হিন্দুবিবাহ ইংরাজী বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্টও নহে। হিন্দু বিবাহের উৎকৃষ্টতা প্রতিপাদনার্থ লেখক বলিয়াছেন যে, হিন্দু দম্পতীর একত্ব শিথিল হইবার যো নাই, কিন্তু ইংরাজীর যো আছে। এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ইংরাজী বিবাহ যেমন সেই বন্ধনকে চিরস্থায়ী করিতে অপারগ, হিন্দু বিবাহও তদ্রূপ। হিন্দুবিবাহের একত্ব চিরস্থায়ী হউক, এরূপ অভিপ্রায় হিন্দুবিবাহ-প্রণালী হইতে প্রতীত হয় না। হিন্দুবিবাহ সে রূপ স্থায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য করে নাই। যখন স্ত্রীপুরুষের যোগকে চিরস্থায়ী করা তাহার লক্ষ্য নহে, তখন ইংরাজী বিবাহ হইতে তাহার পৃথকত্ব কোথায়? হিন্দু বিবাহে এই একত্ব ও বন্ধন যেমন ভঙ্গপ্রবণ, ইংরাজী বিবাহেও তদ্রূপ। লেখকের মতে ইংরাজী বিবাহে উদ্বাহগ্রন্থি খুলিবার অস্ত্র Divorce আইন, হিন্দুবিবাহে সেই গ্রন্থি খুলিবার অস্ত্র অধিবেদন-প্রণালী। অধিবেদন যেমন শাস্ত্রবিধান, Divorce তেমনি ইংরাজী বিধান। হিন্দু শাস্ত্রে যখন এ বিধান বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন কিরূপে বলিব, হিন্দুদম্পতীর একত্বকে চিরস্থায়ী করা, এবং তাহাদের বন্ধনকে দৃঢ়ীভূত করা হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য?

ইংরাজীতে যদিও Divorce আইন আছে বটে, কিন্তু সে আইন কার্য্যে পরিণত করা সহজ কথা নহে। তাহা করিতে গেলে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। কিন্তু হিন্দু অধিবেদনে কিছুই নিন্দা নাই। ইংরাজেরা সহজে Divorce আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে না, হিন্দুরা সহজে ও সামান্য দোষে বহু বিবাহ করিয়া থাকে। ইংরাজদিগের বিবাহ-মিলন যখন কিছুতেই আর রক্ষা করিতে পারে না, দম্পতী-পার্থক্য যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠে, যখন তাহাদিগের আর অধিক একত্র সহবাস কোন অংশেই শ্রেয়স্কর নহে, বরং বিপদজনক, তখনই শেষ উপায় স্বরূপ, তাঁহারা বিবাহ বন্ধন ছেদন করিবার জন্য Divorce আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু হিন্দু বিবাহের বন্ধন-ছেদন এরূপে ঘটে না। পত্নী কখন বিনা অপরাধেও পরিত্যজ্যা হয়েন। ইংরাজী Divorce কখন, ও কোন কালে, এক আধটা ঘটে, কিন্তু হিন্দু অধিবেদন ও স্ত্রীপরিত্যাগ প্রায় সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বগৃহেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজভবন হইতে পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত কোথাও ইহার অসদ্ভাব নাই। মনু অধিবেদনের অনেকগুলি ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কৌলীন্য প্রথায় এই বহুবিবাহের ছড়াছড়ি করিয়া দিয়াছে। যে হিন্দুবিবাহের সর্ব্বাঙ্গে

Divorce সে হিন্দুবিবাহ যে কি জন্য ইংরাজী প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইল, আমারা বুঝিতে পারি না। সুতরাং লেখক যে বলিয়াছেন, "হিন্দু, পতি পত্নীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের দাম্পত্য-গ্রন্থি আঁটিয়া দিতে চান, ইংরাজ পতি পত্নীর বিরোধ বাড়াইয়া তাঁহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিতে চান"—এই কথা সত্য নহে। বরং আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুবিবাহে দাম্পত্যগ্রন্থি শীঘ্র এলাইয়া পড়িবার অনেক কারণ আছে, এবং বাস্তবিকই তাহা সচরাচর পড়িয়া থাকে। হিন্দু বিবাহের বিশেষ দোষ এই, দাম্পত্য গ্রন্থি শিথিল হইয়া না পড়িতে পড়িতে ছিন্ন হইয়া যায়। দম্পতী বজায় থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর গ্রন্থি নাই! তাহাদের একত্ব অধিবেদন ছেদন করিয়া দিয়াছে। পতি, পত্নীর হয় ত মুখ দর্শনও করেন না। হিন্দুবিবাহে যে গ্রন্থি ছিন্ন করিবার অনেক কারণ আছে, ইংরাজী বিবাহে বরং সে গ্রন্থি শিথিল করিবার অল্পই কারণ আছে। হিন্দু বিবাহের Divorce যত সচরাচর ঘটে, ইংরাজী বিবাহে সেরূপ নহে। হিন্দু বিবাহ-আবদ্ধা পরিত্যক্তা পত্নী চিরকাল দারুণ কষ্টভোগ করেন, তাহার যন্ত্রণার অবশেষ নাই; কিন্তু ইংরাজী বিবাহ সেই পত্নীর যন্ত্রণায় শান্তিবারি প্রদান করে—পরিত্যক্তা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ দেয়। অতএব কোন্ বিবাহ প্রণালী যে উৎকৃষ্ট, তাহা স্বতঃই প্রতীত হইতেছে।

হিন্দু বিবাহের একত্ব সম্বন্ধে লেখক একটী অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন। লেখক একস্থলে বলিয়াছেন যে, "হিন্দু বিবাহ-প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন আমরা দুইটি ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি। সে বিবাহ প্রক্রিয়া যখন সমাপ্ত হয়, তখন কেবল একটী ব্যক্তিকে দেখিতে পাই * * * অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখায় মিশিয়া যায়, আত্মা যেমন পরমাত্মায় মিশিয়া যায়, তখন পুরুষ তেমনি স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী তেমনি পুরুষে মিশিয়া গিয়াছে। এমনি মিশিয়া গিয়াছে যে ২, আর ২ নাই, ১ হইয়া গিয়াছে।"—লেখকের একথা সত্য নহে। কারণ, এই রূপ ২ যদি ১ হইয়াছে, তবে অধিবেদন কালে আবার পুরুষ স্বতন্ত্র হইয়া কোথা হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিল। হিন্দু পুরুষ যে হিন্দুপত্নীতে মিশিয়া যায়—এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। লেখকও নিজেই বাল্য বিবাহ সমর্থন কালে একথার অলীকত্ব আপনিই বলিয়াছেন। পতিই ত্রিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত হইয়া একটী সম্পূর্ণ মানুষ হইয়া তবে দার পরিগ্রহ করেন এবং তখন আপন জায়াকে আপনাতে মিশাইয়া লয়েন। পত্নীই, পতি-অনুযায়ী সৃষ্ট হন। পতি, পত্নীকে আপনাতে মিশাইয়া লয়েন, "যাহার কিছুই আপনা হইতে পৃথক থাকিবে না, তাহাকে গোড়া হইতে আপনাতে মিশাইতে আরম্ভ করেন, তাহার সমস্ত শিক্ষা,

সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা, এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আপনার অভিলাষানুযায়ী করিয়া লয়েন।" এই রূপ হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য এক স্থলে নয়, অনেক স্থলে লেখক প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, তখন তিনি কিরূপে বলিতে পারেন যে, হিন্দুপতি, পত্নীতে মিশিয়া যায়? আমরা কার্য্যতঃও দেখি, হিন্দু পতি কখন পত্নীতে মিশেন না, হিন্দু পত্নীই সম্পূর্ণ রূপে হিন্দু পতিতে মিশিয়া যান। হিন্দু পতির স্বতন্ত্র সত্তা বিলক্ষণ আছে, কিন্তু হিন্দুপত্নীর স্বতন্ত্র সত্তা কিছুই নাই।

আর একটি কথা। লেখক একটি কূট-তর্ক তুলিতে পারেন যে, তিনি বলিয়াছেন "হিন্দুশাস্ত্রকার পত্নীকে, পতিতে এবং পতিকুলেতে বাঁধিয়া রাখিতে চান" কিন্তু পতি যে বিবাহিতা পত্নীতে চিরদিন আবদ্ধ থাকিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের এমত মর্ম্ম নহে। এ কথা সত্য। হিন্দুশাস্ত্রের যদি এই রূপ অভিপ্রায় হয়, তবে আর লেখক বলিতে পারেন না যে, সেই হিন্দুশাস্ত্রমতে দুই এক হইয়া যায়। তাহা হইলে তিনি আর বলিতে পারেন না যে, "দুই জনে প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, মিশিয়া যায়।" তিনি তবে আর সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, "পতি পত্নীর এরূপ মিশ্রণ, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই।" তিনি আর বলিতে পারেন না যে, "হিন্দুবিবাহে স্ত্রী এবং পুরুষের পার্থক্য বিনষ্ট হইয়া একত্ব সম্পাদিত হয়,—স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরে মিশিয়া যায়।" কারণ, হিন্দু-শাস্ত্রমতে পুরুষ মিশে কই, স্ত্রীই মিশে। স্ত্রীও "মিশে" না, কেবল মাত্র "বাঁধা" থাকে। এক হইয়া যায় না, জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় মাত্র। এই জন্য লেখকও কৌশল করিয়া যোগ শব্দের পরিবর্ত্তে "বাঁধা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনিও নিশ্চয় জানেন যে, সামাজিক নিয়ম নিবন্ধন পত্নীর, পতিতে "বাঁধা' থাকা এক কথা, এবং পতির সহিত এক হইয়া যাওয়া, আর এক কথা। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের যোগ, একীকরণের যোগ নহে, চিরস্থায়ী একত্ব সাধন নহে, তাহা পত্নীকে চিরকাল একপক্ষে বাঁধিয়া রাখা মাত্র। সেই যোগে এবং সেই মিশ্রণে পতি মিশিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং এরূপ বিবাহকে একীকরণই বা কি রূপে বলি? এবং যদি বলি, তবে চিরস্থায়ী একীকরণ কোন মতে বলিতে পারি না। অতএব বলিতে হইবে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য, পার্থক্য বিনষ্ট করিয়া, লেখকের মতানুযায়ী বিশেষ প্রকার ও মচৎকার স্ত্রী পুরুষের একত্ব সম্পাদন নহে, তাহা কেবল পত্নীকে জোর করিয়া, পীড়ন করিয়া, চিরদিনের জন্য একজনের গলায়, হয় ত পীড়কের গলায়, বাঁধিয়া রাখা মাত্র।

বঙ্গদর্শন-প্রস্তাব লেখক আরও বলেন যে, ইংরাজী বিবাহের গ্রন্থি খুলিবার

কারণ ইংরাজী দম্পতীর স্বাধীনতাপ্রিয়তা; সে বিবাহে পরস্পর ব্যক্তিত্ব রক্ষিত হয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ইংরাজ বিবাহ-প্রণালীতে যে দম্পতীর পরস্পরের স্বাধীন ক্ষমতা ও অধিকার দিয়াছে, এমত নহে; ইংরাজ পত্নীও হিন্দুপত্নীর ন্যায় পতির সম্পূর্ণ অধীন, তাঁহার কোন সামাজিক স্বত্ব ও অধিকার নাই, তিনিও হিন্দুপত্নীর ন্যায় পতির অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া থাকেন, তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা কিছুই নাই। তিনিও পতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজী বিবাহ প্রণালীমতে ইংরাজীপত্নীর অবস্থা হিন্দুপত্নীর অবস্থা হইতে ভিন্ন নহে। আবার দেখুন, যে পরিবার ও সন্তানাদি লালন পালন জন্য হিন্দুদম্পতীর একত্ব সম্পন্ন হইয়াছে, যে সংসার রূপ মহা যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য হিন্দু দম্পতীর মিলন, ইংরাজী দম্পতিরও মিলন সেই জন্য। তাঁহারাও পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া সংসার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। হিন্দু বিবাহে যেমন হিন্দুপতি সমাজের জন্য, কিন্তু পত্নী শুদ্ধ পতির জন্য, তাহার সামাজিক কিছুমাত্র অধিকার নাই, ইংরাজী পতিও তদ্রূপ সমাজের কর্ত্তব্য সাধন জন্য এবং ইংরাজীপত্নী সেই পতির শুশ্রূষার্থ, তাহারও সামাজিক ক্ষমতা কিছু মাত্র নাই। সমাজ সম্বন্ধে কি হিন্দু কি ইংরাজ উভয় পত্নীই মৃত। উভয় সমাজেই রমণীর সহিত সমাজের কোন সম্পর্ক নাই। উভয় সমাজেই পতি সমাজের একজন, কিন্তু পত্নী সমাজের কেহই নন; তিনি শুদ্ধ পারিবারিক প্রাণী মাত্র। এসকল কথা যদি সত্য হয় তবে বিবাহের পর ইংরাজী পত্নীর স্বাধীনতা কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অথবা ইংরাজী পত্নীর অবস্থা হিন্দু পত্নীর অবস্থা হইতে বড় অধিক বিভিন্ন নহে। তবে ইংরাজী পত্নীর যদি কিছু মাত্র স্বাধীনতা থাকে, তাহা পতি ত্যাগ করিবার অধিকার। পতির অত্যন্ত গুরুতর দোষ না হইলে, পত্নী এ অধিকার প্রাপ্ত হয়েন না। তদ্রূপ পতিও পত্নীকে অত্যন্ত গুরুতর দোষ নহিলে ত্যাগ করিতে পারেন না। এই পর্য্যন্ত ইংরাজী দম্পতীর স্বাধীনতা। দম্পতীর একতরকে পরিত্যাগ করিবার অধিকার যদি ইংরাজী দম্পতীর থাকে, হিন্দুপতির স্বাধীনতা আবার এত অধিক যে, তাহা একপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতায় আসিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুপত্নী অতি সামান্য দোষে পরিত্যক্ত হয়েন, এমত কি তাহাকে পরিত্যক্ত করিয়া রাখিবার অধিকার পতির কর্ত্তৃপক্ষগণেরও পর্য্যন্ত আছে। বিনা অপরাধে ঐ কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে ত্যাজ্যা করিয়া দিতে পারেন। বালিকা কিছু জানে না, কিন্তু সে ত্যাজ্যা হইয়া পড়িল! একটি কথার ছল ধরিয়াও হিন্দুপতি, পত্নীকে ত্যাগ করিয়া রাখিতে পারেন, এবং অনেক স্থলে রাখিয়া থাকেন। কর্ত্তৃপক্ষকর্ত্তৃক বিবাহিতা পত্নী যে পতির মনোমত হয় নাই, তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া

অনাপত্নীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব পত্নীকে চিরদিনের জন্য ভাসাইয়া দেন। হিন্দু দম্পতীর মধ্যে পতির এতদূর স্বাধীনতা—স্বাধীনতা না স্বেচ্ছাচারিতা! হিন্দুপতির যে প্রকার স্বাধীনতা, তিনি যেন পত্নীর স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া সমুদয়ই আপনি গ্রহণ করিয়াছেন। দুই জনের স্বাধীনতা যেন একজনে ন্যস্ত হইয়াছে। এরূপ, অযথা স্বাধীনতা, স্বাধীনতা কি?—স্বেচ্ছাচারিতার দমন হওয়া কি আবশ্যক নহে? কে বলে তবে হিন্দু দম্পতী মধ্যে স্বাধীনতা নাই, আত্মপ্রিয়তা নাই, ব্যক্তিত্ব নাই? ইংরাজ দম্পতী মধ্যে যাহা উভয়েরই আছে হিন্দু দম্পতী মধ্যে একতরের তাহা দ্বিগুণ পরিমাণে আছে। এক্ষণে কথা এই, এতদূর স্বেচ্ছাচারিতা রাখা উচিত কি না? তবে কি প্রতীত হইতেছে না যে, ইংরাজী বিবাহে পরিণয়-গ্রন্থি শিথিল করিবার যেমন ব্যবস্থা আছে, হিন্দু-বিবাহে সে ব্যবস্থার অসদ্ভাব নাই? বরং হিন্দু পত্নী একাকিনী চির জীবন পরিত্যক্তা থাকিবার ব্যবস্থা থাকাতে সেই ব্যবস্থা অধিকতর নির্দ্দয় ও অসভ্যোচিত হইয়াছে। কারণ, নির্দ্দয়তা অসভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ।

এই নির্দ্দয়তা পরিহারার্থ আমরা ইংরাজী সমাজনীতির পক্ষপাতী। নহিলে আমরা হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিবাহ প্রণালীর পক্ষপাতী হইব কেন? আমরা মানব জাতির দুঃখে দুঃখী। যে প্রণালী এই দুঃখের কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারে, সে প্রণালীকে অবশ্য আমরা উৎকৃষ্ট বলিব, তাহা আমাদিগের হউক, আর পরেরই হউক। হিন্দু রমণীর যে দুঃখ সে দুঃখ আমাদের দুঃখ; তাহা ত পরের নয়। সে দুঃখকে ঢাকিয়া রাখিয়া আমরা স্বদেশপ্রিয় হইতে চাহি না। আমরা এ প্রকার স্বদেশপক্ষপাতিতাকে অন্যায় বলি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং আবার বলি, স্বদেশপ্রিয়তা যদি নিজ দেশের দোষ দেখিয়া তাহার অপনয়নার্থ যত্নবান না হয়, তবে সেরূপ স্বদেশ-প্রিয়তা অত্যন্ত অন্ধ। আমরা কোন বিশেষ জাতীয় নিয়মাদির পক্ষপাতী হইতে চাহি না। যে সমস্ত নিয়ম ও আচার ব্যবহারে মানবের দুঃখ-স্রোত প্রবর্দ্ধমান করিয়াছে, আমরা বলি সে সমস্ত নিয়মাদি পরিত্যাজ্য। সুখ লাভ করা যদি মানব জীবনের উদ্দেশ্য হয়, সে সুখ শুদ্ধ পরলোকে কেন, ইহলোকেও লাভ করিতে যত্নবান হইব। পারলৌকিক সুখপ্রার্থী যেরূপ আত্মপ্রিয় এবং স্বার্থপর লোক, ঐহিক সুখপ্রার্থীও তদ্রূপ। পারলৌকিক সুখ-প্রার্থী বোধ হয় কিছু অধিক স্বার্থপর। বরং যিনি ঐহিক সুখপ্রার্থী নহেন, যিনি ঐহিক দুঃখে জীবনকে নিপীড়িত করিয়া শীঘ্র আয়ুঃশেষ করিতে যান, তিনি আত্মঘাতী। আমরা এরূপ আত্মঘাতীর স্বার্থপরতার অধিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি না। সে যাহা হউক,

এক্ষণে পৃথিবীতে স্ত্রীজাতি যেরূপ নিপীড়িত হইতেছে, তাহাই আমাদের দুঃখের কারণ। আমরা দেখিয়াছি পুরুষজাতির অযথা প্রভুত্ব এই দুঃখরাশির কারণ। হিন্দু সমাজে এবং হিন্দু বিবাহ প্রণালীতে এই প্রভুত্ব কিছু অধিকতর। আপনাদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব স্থাপন করিতে গিয়া পুরুষজাতি অযথারূপে যথেচ্ছাচারী হইয়া অধীনা স্ত্রীজাতির অনেক দুঃখ রাশির কারণ হইয়াছে। স্ত্রী জাতি সম্পর্কীয় যত নিয়মাদি স্থাপিত আছে, সে সমুদায়ই পুরুষের সুখের জন্য, তাহাতে স্ত্রী জাতির দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া পুরুষের সুখ বৃদ্ধি করিয়াছে। আমরা এরূপ পক্ষপাতী নিয়মের বিরোধী। সমাজ মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান সুখে থাকেন, এরূপ নিয়ম ও ব্যবস্থাদি প্রণয়নের এখন আবশ্যকতা হইয়াছে। এক জাতি নির্দ্দয়রূপে নিপীড়িত হইলে অন্য জাতিও সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারে না। পুরুষ জাতীয় নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যক্তিগণ স্ত্রী জাতির ঘোর দুঃখ ঢাকিয়া রাখিতে চান। কিন্তু তাহাতে সহৃদয় জনগণ কথনই সুখী হইতে পারেন না। তাঁহাদের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। তাঁহারা স্ত্রীজাতির দুঃখে কাতর হইয়া আপনাদের স্বার্থপর সুখেও সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারেন না। বঙ্গ সমাজে এইরূপ ক্রন্দনের কারণ কিছু অধিকতর। কারণ, বঙ্গ সমাজে স্ত্রী জাতির দুঃখ কিছু অধিকতর। এই দুঃখ নিবারণ করা তাঁহারা আবশ্যক জ্ঞান করেন। স্ত্রী জাতির সুখ যদি পুরুষ জাতির সুখের কারণ হয়, তবে অবশ্য স্ত্রী জাতির সুখ বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। আমরা এই আবশ্যকতা বুঝাইতে চাহি। আমরা ইংরাজের ন্যায় কোন বিশেষ জাতীয় নিয়মাদির পক্ষপাতী নহি।

লেখক বলেন "যদি (রুচি এবং মনোবৃত্তির) স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে গেলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা না যায়, তাহা হইলে শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লইয়া কি হইবে?" এ কথার উত্তরে আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এমন কি জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য আছে, যাহা মনোবৃত্তির স্বাধীন স্ফূর্ত্তি হইলে সাধন করা না যায়? তবে লেখক হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রী জাতির যেরূপ জীবন-উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন, তাহা যদি মহৎ হয়, তবেই বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইলে সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী লেখকের মতে কেবল পতিশুশ্রূষাই স্ত্রীর একমাত্র জীবনোদ্দেশ্য। তাঁহার মতে স্ত্রীজাতি কেবল পুরুষ জাতির সেবা ও দাসত্বের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। পুরুষ, ঈশ্বর সেবার জন্য, কিন্তু নারী পুরুষের সেবার জন্য। নারীর স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই। নারীকে ঈশ্বর ও ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে পুরুষের দাসত্ব ও সেবা করিতে হইবে। নারীর ধর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, ঈশ্বর, স্বর্গ, ব্রত সমুদায়ই

পুরুষ। পুরুষ-শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে স্বর্গে উঠিতে হইবে। তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন কেবল পুরুষের সেবা করিতে। এই তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য শুদ্ধ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী নহে, ইংরাজী কবি মিল্টনও পত্নীর এইরূপ জীবনোদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন। অবশ্য এ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে আপনাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হয়। বিশেষতঃ নির্দ্দয় ও আত্মসুখ-পরায়ণ এবং পরসুখে উদাসীন যে পুরুষজাতি নারী জাতির ঈশ্বর, নারীজাতিকে সেরূপ ঈশ্বর শুশ্রূষার্থ আত্মবলি না দিলে তাহাদের ধর্ম্মলাভ হয় কই! হাঃ স্বার্থপরতা! তুমি কি এইরূপে মহৎ হইতে চাও! নারী জাতির এইরূপ জীবন উদ্দেশ্য স্থির করিয়া না দিলে পুরুষ জাতির সুখ হয় কই!

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য লেখক বলেন স্ত্রীকে আত্মবলি দিতে হইবে। দিতে হইবে কেন, দেওয়া উচিত। এই ঔচিত্য লেখক চমৎকার যুক্তি প্রভাবে সমর্থন করিয়াছেন। সে যুক্তি এই, "যদি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বাধীনতা এবং স্ফূর্ত্তির পরিমাণ কম করিতে হয়, তাহাও কি করা উচিত নয়? এবং মানুষ কি তাহা করে না? সামাজিক জীবনের অর্থই ত এই।" সামাজিক জীবনের অর্থ এই বটে। কিন্তু নারীর কি সামাজিক জীবন আছে? কোন সামাজিক ও সাধারণ মঙ্গলার্থ সকলই আপন আপন স্বাধীনতা ও স্বার্থ কিছু কিছু বিসর্জ্জন দেয় সত্য, কিন্তু এ কথা বামাগণের পক্ষে খাটে কই? বামাগণ কর্ত্তৃক কি সাধারণ ও সামাজিক ইষ্ট সাধন হইতেছে? আর যদি সাধন হইয়া থাকে তবে নারীজাতি আপনাদিগের স্বাধীনতার কিয়ৎ পরিমাণই বিসর্জ্জন দিতে পারেন। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সমুদায়ই বিসর্জ্জন দিবেন কেন? আবার দেখুন, যদি স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য হয়, তবে শুদ্ধ নারীপক্ষে হইবে কেন? পুরুষপক্ষেও হওয়া উচিত। কিন্তু পুরুষপক্ষে কি তিলার্দ্ধ স্বাধীনতা গিয়াছে? শুদ্ধ নারীর স্বাধীনতা বিসর্জ্জনের জন্য আমরা নানা যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করি। আরও দেখুন, পত্নীর যদি সমুদায় স্বাধীনতা বিসর্জ্জিত হয় তবে তাহার কর্ত্তৃত্ব কোথায়? যাহার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহা দ্বারা কোন্ কর্ম্ম কৃত হয়? যাহার স্বাধীনতা আছে তাহারই কর্ত্তৃত্ব আছে। যাহার কিছুই স্বাধীনতা নাই, তাহা দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধন কিরূপে হইতে পারে? স্বাধীনতার কিয়ৎ পরিমাণ বিসর্জ্জন দেওয়া, আর তাহা একেবারে সমুদায় বিসর্জ্জন দেওয়া কি সমান হইল? একে ত নারীজাতির জীবন উদ্দেশ্য যাহা স্থির করা হইয়াছে তাহা অন্যায়। সুতারং যাহা অন্যায় তাহার জন্য আত্মবিসর্জ্জনও অন্যায়। তাহার পর দেখুন, এই জীবন-

উদ্দেশ্য কোন সামাজিক ও সাধারণ হিতানুষ্ঠান নহে। তবে কেন নারীজাতি আপনাদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবে? যদি দেয়, কিয়ৎ পরিমাণ না দিয়া সমুদায় বিসর্জ্জন দিবে কেন? এবং পুরুষজাতি অটুট থাকিবে কেন? স্বাধীনতার কিয়ৎ পরিমাণ বিসর্জ্জন উচিত হইলে, কখনই তাহার সমুদায় বিসর্জ্জন উচিত হইতে পারে না। নারীর সমুদায় ব্যক্তিত্ব নষ্ট করিয়া পুরুষের ব্যক্তিত্বের সহিত মিশিয়া যাওয়া কোন্ যুক্তি অনুসারে সিদ্ধ হয়, তাহা আমরা জানি না। অথবা যে যুক্তি অনুসারে নারীর পুরুষের সহিত মিশিয়া যাওয়া উচিত, সেই যুক্তি অনুসারে পুরুষকে নারীর সহিত মিশিয়া গিয়া একজন সম্পূর্ণ নারী হওয়া উচিত নহে কেন? পতি পত্নী মিশিয়া একজন সম্পূর্ণ পুরুষ হইল কেন, আর একজন নারীই বা না হইল কেন? যদি বল, পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ইহার কারণ। তবে কি সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ পুরুষের আসুরিক বলকেই প্রধান বলিতে হইবে না? অন্য কি বিষয়ে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব আছে? বুদ্ধিবলে কি নারী, পুরুষ অপেক্ষা হীন? মানব জাতি মধ্যে আসুরিক বলকে শ্রেষ্ঠ রাখা উচিত, না বুদ্ধি ও সামাজিক অথবা নৈতিক বলকে প্রধানত্ব দেওয়া উচিত? যদি সামাজিক বল প্রধান হওয়া উচিত হয়, তবে কি দৃষ্ট হইবে না যে, পুরুষজাতির সামাজিক বল ন্যায্য স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারিতায় আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিতে হইলে কি স্ত্রীজাতীয় স্বাধীনতা সমুদ্ধার করা উচিত নহে? পুরুষজাতি যথেচ্ছাচারী হইয়া নারীজাতির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এক জনের স্বাধীনতা যখন অপরের অনিষ্ট সাধন করে, তখন কি সেই স্বাধীনতার ন্যায্য সীমা অতিক্রান্ত হইয়া তাহা যথেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইল না? পুরুষজাতির প্রাবল্য কি এইরূপ যথেচ্ছাচারিতায় আসিয়া পড়ে নাই? এক পক্ষে শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকিলে অন্য পক্ষে যথেচ্ছাচারিতার ঔচিত্য প্রতিপাদিত হইতে পারে না। তাহা যদি হয়, তবে, পৃথিবীতে সকল নির্দ্দয় ব্যবহার, সকল অত্যাচারই অনুমোদনীয়, ন্যায্য এবং ধর্ম্মসঙ্গত। তবে সামাজিক শাসন, অধর্ম্ম ও অন্যায় হইয়া পড়ে।

আমরা কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে বোধ হয় প্রতিপন্ন হইতেছে, মানব জাতির যে দুই অঙ্গ, সেই পুরুষ ও নারী উভয়েরই ব্যক্তিত্ব রক্ষা করা উচিত। এক জনকে একেবারে মারিয়া ফেলিলে কি লাভ হইবে? উভয়ের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়া উভয়কেই সামাজিক জীবনে আনয়ন করা উচিত। বর্ত্তমান মানবসমাজে পুরুষ একাকী কৃতী ও কর্ম্মশীল, নারী মৃত-প্রায়। নারীর সামাজিক

জীবন কিছুই নাই। উভয়ই সামাজিক জীবনে আনীত হইলে, সমাজের কি অধিকতর মঙ্গল সাধন হইবে না? শুদ্ধ পুরুষের কর্ত্তৃত্বে এক্ষণে সমাজ যে অবস্থায় আসিয়াছে, নারীর সহায়তা পাইলে কি ততোধিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই? শুদ্ধ পুরুষের বুদ্ধিবলে সমাজের যে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীজাতির বুদ্ধিবল যোগ দিলে কি সেই উন্নতি আরও বর্দ্ধিত হইবে না? শুদ্ধ পুরুষের প্রভুত্বে এক্ষণে সমাজ মধ্যে যে প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়ন বর্ত্তমান রহিয়াছে, নারীজাতির স্বাধীনতা, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব হইলে কি সেই প্রভুত্বের অনেক পরিমাণে শাসন হইয়া অত্যাচার ও পীড়ন নিবারিত হইবে না? যদি হয়, তবে স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দেওয়া এবং সেই ব্যক্তিত্ব রক্ষা করা একান্ত উচিত।—

কিন্তু বঙ্গদর্শন প্রবন্ধ-লেখক স্বীকার করেন না যে, হিন্দু সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার ও পীড়ন হইয়া থাকে। তিনি বলেন, "ইংরাজের স্বাধীনতার ধূয়া কি জন্য? না, অপরের দ্বারা স্বাধীনতা অপহৃত হয় বলিয়া, অপরে অত্যাচার করিয়া স্বার্থসাধনার্থ স্বাধীনতা বিনষ্ট করে বলিয়া। কিন্তু জগতের এবং মনুষ্য-জীবনের মহৎ কার্য্য সাধনার্থ স্ত্রীপুরুষের যে মিলন এবং মিশ্রণ হয়, তাহাতে অত্যাচারই বা কোথায়, স্বার্থসাধনাভিপ্রায়ই বা কোথায়? তাহাতে যদি স্বাধীনতার বিলোপ হয়, সেত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মহৎকার্য্য সাধনার্থ হইবে।"—এস্থলে আমরা জগতের এবং মনুষ্য-জীবনের এমত কি মহৎ কার্য্য আছে বুঝিতে পারিলাম না, যে জন্য কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়েরই স্বাধীনতা বিসর্জ্জিত হয়। হিন্দুসমাজে যে পুরুষজাতি আপনাদের স্বাধীনতার ক্রান্তিমাত্র বিসর্জ্জন করিয়াছেন, এমত প্রতীত হয় না। স্বাধীনতা বিসর্জ্জন যাইবার যা গিয়াছে, স্ত্রীজাতির। বরং স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া পুরুষ জাতি নিজ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতায় লইয়া গিয়াছেন। লেখক বলেন হিন্দুবিবাহে যে মিলন হয় তাহাতে অত্যাচারই বা কোথায়, স্বার্থসাধনই বা কোথায়? তবে স্ত্রীজাতির প্রতি যে সকল অত্যাচার বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা কি হিন্দু বিবাহ প্রণালী অনুমত নহে? যদি না হয়, সে সকল অত্যাচার কিসের ফল? আমরা শিশুকন্যাকে যখন তাহার পিতামাতার কোমল অঙ্ক হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া তাহার শ্বশুর কুলের ১০ জনের কঠোর সেবায় নিযুক্ত করি, যখন সেই বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে, অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে, সেই শুশ্রূষা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন কি তাহার প্রতি অত্যাচার হইতেছে না? যখন আমরা স্বচ্ছন্দে তদ্রূপ বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পত্নীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে চিরদুঃখে নিমগ্ন করিয়া

রাখি, তখন কি তাহার প্রতি অত্যাচার করি না? যখন দুই সপত্নীর মধ্যে এক জন রাজরাণী এবং অন্য জন গোয়াল-কুড়ানী হইয়া থাকেন, তখন কি সেই দোরাণীর প্রতি অত্যাচার করা হয় নাই? যখন বিধবাগণ মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া পিত্রালয়ে মলিন বদনে ও মলিন বসনে সকলের তিরস্কারের পাত্রী হইয়া আপনাদের দিনপাতের জন্য অশ্রুমোচন করিতে করিতে সকলের শুশ্রূষার্থ নিযুক্ত দেখি, তখন কি হিন্দু সমাজের ঘোর অত্যাচার উপলব্ধি করি না? যখন মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, ভার্য্যা একটু অপ্রিয়বাদিনী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু স্বামী অতি অশ্রদ্ধেয় পাত্র হইলেও পত্নী তাহাকে দেবোপম পূজা করিবেন, তখন কি সে ব্যবস্থার মূলে স্বার্থপরতা নাই? আমরা যখন অধীনা ও নিরুপায় বিধবাগণকে আইন মতে তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া কেবল সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করি, তখন সেই বিধবাগণকে কি নিপীড়ন করি না? অধীনা রমণীগণের যখন স্বামীর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন উপায় নাই, তখন কি তাহাদের সেই অবস্থাকে স্বাধীনতা-বিরহিত বলিব না? আমাদের রমণীগণ কি এই প্রকার স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া ঘোর সামাজিক নির্যাতনে কালাতিপাত করেন না? লেখক যখন উদ্ধৃতাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কি তিনি হিন্দুসমাজের অন্তঃপুর-উত্থিত ঘোর ক্রন্দন-রোলে বধির হইয়া লেখনীচালনা করিয়াছিলেন? অথবা তিনি এই সকল সামাজিক নির্যাতনকে কি অত্যাচার বলেন না? যদি না বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কাহাকে অত্যাচার, পীড়ন ও স্বার্থসাধন বলেন?

জগতের এবং মনুষ্যজীবনের মহৎ কার্য্যের অর্থে লেখক যদি অতিথিসেবাকে বলিয়া থাকেন, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করিব, তাহা কি সংসারের এক মাত্র মহৎ কার্য্য, এবং শুদ্ধ সেই জন্যই কি ব্রহ্মচারী দারপরিগ্রহ করিতেন? আমরা ত জানি অতিথিসেবা সংসার-ধর্ম্মের একটী সামান্য আনুষঙ্গিক কর্ত্তব্য। মনুও তাহাই বলিয়াছেন:—

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য
পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ
প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি
শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ
পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥

৯ অ। ২৭।২৮। শ্লোক।

কল্লূকভট্টকৃত টীকানুযায়ী ভরত শিরোমণি মহাশয় উক্ত শ্লোকদ্বয়ের এই রূপ অর্থ করেন:—

"অপত্যের উৎপাদন ও জাত অপত্যের পরিপালন এবং প্রতিদিন অতিথিসেবা, ভিক্ষাদান প্রভৃতি যে সকল গৃহস্থের

কর্ত্তব্য কার্য্য, স্ত্রীরা তাহার প্রত্যক্ষ কারণ হয়। অপত্যের উৎপাদন, অগ্নি-হোত্রাদি যাগ যজ্ঞ, এবং আত্ম শুশ্রূষা উত্তম রতি, এবং পিতৃগণের ও আত্মার সন্তান দ্বারা স্বর্গলাভ, এসকল কার্য্য, পত্নী দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়।" এস্থলে দারপরিগ্রহের যে সকল উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ হিন্দু কেন, সকল জাতীয় গৃহস্থেরই দারপরিগ্রহের এই উদ্দেশ্য। এখানে দৃষ্ট হইবে যে, অতিথি-সেবা একটী অন্যতম কর্ত্তব্য। এই অতিথিসেবার কর্ত্তব্যতা সকল ধর্ম্মেই নিয়োজিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে যেমন, অন্যান্য ধর্ম্মেও ইহার ফলাদি বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। বরং মনুর অতিথিসেবার অর্থ যাহা, তাহা কিছু সঙ্কীর্ণ ভাবে পরিপূর্ণ। কারণ, তাঁহার মতে সকলেই অতিথি নহে। মনুর মতে অতিথির অর্থ এই:—

একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
অনিত্যং হি স্থিতো
যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে॥
নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং
সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ভার্য্যা
যত্রাগ্নয়োঽপি বা॥

৩ অধ্যায় ১০২.১০৩ শ্লোক।

এই প্রকার অতিথি সেবা, ভিক্ষাদান, যাগযজ্ঞাদি প্রভৃতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য সাধনের ফল এই রূপ উক্ত হইয়াছে:—

স সন্ধার্য্য প্রযত্নেন
স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽ
ধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥

মনুসংহিতা। ৩ অধ্যায়। ৭৯ শ্লোক।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই:—

"যিনি পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ এবং ইহলোকে স্বাদু অন্নাদি ভোজন সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি প্রযত্ন সহকারে সতত সেই গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না।"

এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করিয়া পূর্ব্বকালের হিন্দু গৃহী জগতের এবং মনুষ্য জীবনের কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতেন। গৃহী এই সকল অনুষ্ঠান, পরলোকে অক্ষয় স্বর্গলাভের জন্য এবং ইহলোকের সুখের জন্য কি সম্পন্ন করিতেন না? তিনি ত নিজ প্রয়োজন সাধনেই ব্যস্ত ছিলেন। জগতের কি মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহা দ্বারা সাধিত হইত? তাঁহার স্বার্থ সাধন কার্য্য দ্বারা ভিক্ষুকেরা কিছু উপকার প্রাপ্ত হইত, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ভিক্ষাদান সকল জাতীয় গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান আছে। কি মুসলমান, কি খৃষ্টান কি বৌদ্ধ, কি শিখ, কাহার ধর্ম্মে ভিক্ষাদানের ফল নির্দ্দিষ্ট হয় নাই? ভিক্ষাদান কি সংসার ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য? কেবল সেই জন্যই যে গৃহী দারপরিগ্রহ করেন এমত নহে। ভিক্ষাদান সংসারীর একটি আনুষঙ্গিক

কার্য্য মাত্র। এই ভিক্ষারও আবার পাত্রাপাত্র বিচার আছে। ভিক্ষাদানে সমাজের অল্পই উপকার লাভ হইয়া থাকে। বরং অপাত্রে ভিক্ষা পড়িলে সমাজের অনিষ্ট-হেতু আলস্য প্রশ্রয় পাইয়া সেই ভিক্ষা সমাজিক পাপেরই কারণ হইয়া থাকে। হিন্দু ধর্ম্মে অপাত্রে দান নিষিদ্ধ। ভিক্ষাদানের তবে নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। গৃহী সদাব্রত ভিক্ষাদান করিতে পারেন না। তাহার ভিক্ষাদানের যেমন সীমা আছে, অতিথিসেবার ও তদ্রূপ সীমা আছে। মনু এই সীমা তাঁহার সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে বিশিষ্ট রূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং গৃহী শুদ্ধ অতিথিসেবায় সর্ব্বদা ব্যস্ত নহেন। তাঁহার অন্যান্য কর্ত্তব্যও আছে। অতিথিসেবা ও ভিক্ষাদান আনুষঙ্গিক কার্য্য মাত্র।

গৃহীর যে সকল কর্ত্তব্য, তাহা আমরা বিবৃত করিয়াছি। সন্তানাদি প্রতিপালন এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি হিন্দুমতে গৃহীর যে সকল অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অপরাপর সকল জাতীয় গৃহীরও তাহাই কর্ত্তব্য। কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ সকলেরই পারিবারিক কর্ত্তব্য একরূপ। তবে যে বঙ্গদর্শন-প্রবন্ধ-লেখকের মতে হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য কিসে গরীয়ান হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। তিনি যে বলিয়াছেন "ইংরাজ আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত, হিন্দু জগৎকে লইয়াই ব্যস্ত। ইংরাজ আপনার জন্য সমাজে থাকেন, হিন্দু সমাজের জন্য সমাজে থাকেন।" লেখকের এ কথাগুলি সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। আমরা জানি, বিবাহ করিয়া ইংরাজ যেমন গৃহী হয়েন, হিন্দুও তদ্রূপ গৃহী হয়েন, এবং ইংরাজ যদি আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন, হিন্দুও তদ্রূপ, আর হিন্দু যদি সমাজের জন্য সমাজে থাকেন, ইংরাজ বরং বেশী সমাজের জন্য সমাজে থাকেন।

হিন্দু গৃহীর কর্ত্তব্যাদি যদি ইংরাজ গৃহীর কর্ত্তব্যাদির সহিত সমান হইল, তবে হিন্দু দম্পতীর অবস্থা কেন ইংরাজ দম্পতীর অবস্থা হইতে বিভিন্ন হওয়া উচিত, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। হিন্দু গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য যাহা, ইংরাজ গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য যদি তাহাই হয়, তবে হিন্দু পতি পত্নীর জীবনোদ্দেশ্য সাধন জন্য যে স্বাধীনতার বিসর্জ্জন অধিকতর হওয়া উচিত কেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। লেখকেরমতেইংরাজগৃহিণী আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া যদি গৃহকার্য্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তবে হিন্দুগৃহিণীও তদ্রূপ অবশ্য করিতে পারিবেন না কেন? তাহাকে পতি অপেক্ষা বেশী স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে কেন? পতির যে পরিমাণে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত, পত্নীরও সেই পরিমাণে দেওয়া উচিত। ইংরাজ গৃহিণী যদি স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন

করিতে পারেন, হিন্দুপত্নীও তদ্রূপ করিতে না পারেন কেন? উদ্দেশ্য ত দুইজনের পক্ষেই সমান, তবে একজন কেন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবে, অন্যজন কিছু মাত্র দিবে না? দুই জনেরই কি সমান দেওয়া উচিত নহে?

লেখক যদি একথা বলেন যে, আমি ত এমত কথা বলি নাই যে শুদ্ধ পত্নীর স্বাধীনতার বিসর্জ্জন হইবে, পতির হইবে না। গৃহস্থাশ্রমের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য উভয়েরই স্বাধীনতার কিয়দংশ বিসর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক,—তিনি ইহাই বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পত্নীর স্বাধীনতার অবশিষ্ট ংশ কই যে সেই স্বাধীনতার কিয়দংশ বিসর্জ্জিত হইয়াছে বলিব? পতি বটে আপন স্বেচ্ছাচারিতার বিসর্জ্জন দিয়া গৃহকার্য্যে মন দিতে পারেন; কিন্তু হিন্দু পত্নীর ত কোন প্রকার স্বাধীনতা অবশিষ্ট নাই যে, বলিব তিনি তাহার কিয়দংশ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। লেখক অন্যস্থলে তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—

"কিন্তু বোধ হয়, পতির সহিত হিন্দু পত্নীর সম্বন্ধ যে প্রকৃতির, অন্য কোন দেশীয় পত্নীর সে প্রকৃতির নয়। অন্য দেশে পত্নী, পতির সমান। সেই সমানত্বে যতই কেন নৈকট্যের ভাব থাকুক না, তাহাতে পার্থক্যের ভাব এককালীন বিলুপ্ত নয়। ফলতঃ পার্থক্য ব্যতীত সমানত্ব অসম্ভব। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে লোকসাধারণ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী উভয়েই পতি এবং পত্নীর সমানত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের পার্থক্যমূলক পৃথক পৃথক স্বত্ব কল্পনা করিতে ও সেই সকল স্বত্ব রক্ষা করিতেই বিশেষ উৎসুক ও যত্নবান হইয়া থাকেন। ইংরাজপতি এবং পত্নীর প্রত্যেক কার্য্যে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। * *। কিন্তু এদেশের লোকের সংস্কার সে রকম নয়। এদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী পতি এবং পত্নীকে একটী ব্যক্তি মনে করেন। তাঁহাদের মতে বিবাহের উদ্দেশ্য এই যে, অসম্পূর্ণ পুরুষ স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি হইবেন। * *। প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্ম্মে চর্ম্মে এক হইবে।"

এই একত্বসাধন পক্ষে কে কাহাতে লয় প্রাপ্ত হইতেছে। পতি মিশিয়া পত্নীতে লয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু পত্নী মিশিয়া পতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। পত্নীর আর স্বাতন্ত্র্য থাকে না। পত্নী ও পতি মিশিয়া এক পুরুষ প্রস্তুত হয় সত্য, কিন্তু এ পুরুষে কাহার পুরুষত্ব, পত্নী না পতির? নিশ্চয় বলিতে হইবে পতির। এই পুরুষে পতিরই সম্পূর্ণ প্রাবল্য। পত্নী কেহ নয় বলিলেই হয়। সুতরাং হিন্দু দম্পতী মধ্যে পত্নীর স্বাধীনতা কিছু মাত্র নাই। পত্নীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া তাহা পতির স্বাধীনতা বর্দ্ধিত করিয়াছে, এবং এই রূপ বর্দ্ধিত স্বাধীনতায় যে পুরুষ তৈয়ারি হইয়াছে, লেখক অবশ্য সেই পুরুষেরই কথা বলিয়াছেন।

তবেই বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, হিন্দু দম্পতী মধ্যে পত্নীর স্বাধীনতা কিছু মাত্র অবশিষ্ট নাই। যখন তাহার স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই, তখন তিনি কিয়দংশ কিরূপে বিসর্জ্জন দিয়াছেন? হিন্দু সমাজের রীত্যনুসারে এবং আমাদের বৈবাহিক নিয়মাধীন হইয়া হিন্দু পত্নী তাহার নিজ স্বাধীনতার সমুদায়ে বঞ্চিত হইয়া স্বামীর একান্ত বশবর্ত্তিনী ও অধীনা হইয়া থাকেন। পত্নীর স্বাধীনতার কিয়দংশ কিরূপে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, আমরা বুঝিতে পারি না। লেখকের এই কথা বুঝিতে পারিব না বলিয়াই বুঝি লেখক সেই কথা বলিয়াই তৎপরে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি হিন্দু পত্নীর এক প্রকার স্বাধীনতা বাহির করিয়াছেন। সকল স্বাধীনতা বিসর্জ্জিত হইয়া হিন্দু পত্নীর যে পরিমাণ স্বাধীনতা অবশিষ্ট আছে, লেখক তাহা এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন।

"স্ত্রী ও পুরুষ মিশিয়া এক হইলে দুই জনের যে সকল পৃথক পৃথক রুচি ও মনোবৃত্তি আছে তাহার স্বাধীন ও সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না, একথার কোন অর্থ নাই। প্রগাঢ় প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পতি এবং পত্নী একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু যিনি সেই কার্য্যটি যে রকমে করিতে সক্ষম, তাঁহার তাহা সেই রকমে করিবার কোন বাধা নাই। পতি এবং পত্নী উভয়েই অতিথি সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু পতি কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়া অতিথি সেবার জন্য দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়া দিতেছেন। পত্নী স্বহস্তে সেই সকল দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানকে যেমন যত্ন করিয়া স্বয়ং ভোজন করাইয়া থাকেন, অতিথিকে তেমনি স্বয়ং ভোজন করাইতেছেন। একই কর্ম্ম দুই জনে দুই রকমে করিতেছেন। শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থাও তাই। পতি প্রাত্যহিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, পত্নী সেই যজ্ঞের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবেন।"—হিন্দু পত্নীর রুচি ও মনোবৃত্তির চমৎকার স্বাধীন স্ফূর্ত্তি! লেখক যে প্রগাঢ় প্রণয়ে মুগ্ধ হইবার কথা বলিয়াছেন আমরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা এ স্থলে বলিতে চাহি না। হিন্দু পত্নীর প্রগাঢ় প্রণয় কতদূর জন্মিতে পারে, তাহা আমরা বারান্তরে যখন লেখকের প্রবন্ধের অপরাংশ বাল্যবিবাহের সমালোচনা করিব, তখন সে কথার বিচার করিব। লেখক আরও বলেন "শাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থাও তাই"—তাই বটে কিন্তু শাস্ত্রকারেরা হিন্দু পত্নীকে সেবিকা ও পাচিকা হইবার ব্যবস্থা দিয়া লেখকের মত তাঁহারা সেই পত্নীর মনোবৃত্তির স্বাধীন স্ফূর্ত্তি হয় এমত কথা বলেন নাই। হিন্দু পত্নীর যে প্রকার সামাজিক অবস্থা, তাহাতে তাহার মনোবৃত্তির স্বাধীন স্ফূর্ত্তির কথা শুনিয়া আমাদের হাসি পায়।

তবে হাঁ, আমরা লেখকের সহিত যোগ দিয়াও বলিতে পারি, তাহার মনোবৃত্তির কিছু কিছু স্বাধীন স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। গৃহধামের পিঞ্জরের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। লেখক আপনিই বলিয়াছেন, গৃহকর্ত্তা ভিক্ষা দিবার চাউল কিনিয়া আনিয়া রাখিলে, মাধব চাকর যেমন সেই চাউল পরম ভক্তি সহকারে, যে ভিক্ষুককে ইচ্ছা, দিতে পারেন, আমাদের গৃহিণীরও সেইরূপ অধিকার আছে। আমরা আরও স্বীকার করি, তিনি বাড়ীর উঠানের দক্ষিণ দিক দিয়াও হাঁটিতে পারেন, বাম দিক দিয়াও হাঁটিতে পারেন; তিনি ব্যঞ্জনাদিতে বেশী লবণ দিতে পারেন, কম লবণও দিতে পারেন; তিনি কালাপেড়ে কাপড় পরিতে পারেন, লাল পেড়ে কাপড়ও পরিতে পারেন; তিনি এক হাত ঘোমটা দিতে পারেন, চারি অঙ্গুলিও দিতে পারেন। আমরা এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারি এই। প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বাস্তবিক লেখক প্রতিপন্ন করিতে পারেন যে, হিন্দু পত্নীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে; এবং এই সকল কার্য্যে তাহার রুচি ও মনোবৃত্তির বিলক্ষণ স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। লেখকের এই কথাতে আমাদের বাড়ীর পিঞ্জরবদ্ধ পাখীটির কথা স্মরণ হইল। সেই পাখীটাকেও আমরা দেখি, সে পিঞ্জর মধ্যে কখন দাঁড়ে বসিতেছে, কখন নামিতেছে, কখন মুখ নাড়িতেছে, কখন গা ফুলাইতেছে, কখন ডাকিতেছে, কখন চুপ করিয়া আছে, কখন হাসিতেছে, কখন কাঁদিতেছে। আর একবার আমরা তাহার মনোবৃত্তির বিলক্ষণ স্বাধীন স্ফূর্ত্তির প্রমাণ পাইয়াছিলাম। পাখীটি দেখিয়াছিল, তাহার উচ্ছিষ্ট ভূপতিত অন্ন একটী কপোতিনী আসিয়া আহার করিতেছে, তাই দেখিয়া পাখীটীর মনে দয়ার সঞ্চার হইল, পাখীটী যেন ভাবে গদগদ হইয়া তাহার সমুদায় আহার সামগ্রী ফেলিয়া দিল। কপোতিনী আহ্লাদ সহকারে তাড়াতাড়ি সমুদায় আহার করিয়া উড়িয়া গেল। পাখীটি গা ফুলাইয়া সেই কপোতিনীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। একজন হিন্দু গৃহিণীর সহিত হরির মার বড় কোঁন্দল ছিল। সেই হিন্দু গৃহিণী হরির নাম শুনিলেই জলিয়া যাইত। যে যে বৈষ্ণব হরি নাম করিয়া আসিত, তাহাদের পর্য্যন্ত ভিক্ষা দিত না। কিন্তু একজন চতুরা বৈষ্ণবী আসিয়া গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দিদি, তোমার বাপের বাড়ীর অমুককে এই মাত্র পথে দেখিয়া আসিলাম, আর তোমার খুড়ী তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। এ সকল কথায় গৃহিণী পরিতুষ্টা হইয়া বৈষ্ণবীকে সাতিশয় আদর করিয়া বসিতে বলিলেন, এবং একটী বৃহৎ সিদা দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া আপনার স্বাধীনতার বিলক্ষণ পরিচয় দিলেন।

অতএব কে বলে হিন্দু রমণীর স্বাধীনতা নাই? গৃহধামের গণ্ডীর মধ্যে তাহার হাত পা নাড়িবার বিলক্ষণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত; সে গণ্ডীর বাহিরে, বৃহৎ সমাজ সম্বন্ধে তাহার কোন স্বাধীনতা নাই। তাঁহার উপর এই সমাজের প্রভুত্ব এত অধিক

যে, তিনি সে প্রভুত্বের বিপক্ষে কিছুই করিতে পারেন না। সমাজ তাঁহাকে যাহা নিয়োগ করিতেছেন, তিনি অবনম্র ভাবে তাহা পালন করিতেছেন। আজি সমাজ যদি এক জন দ্বিতীয় মনুর মুখ দিয়া আদেশ করেন যে, পত্নীর শাসন জন্য স্বামীর কর্ত্তব্য, পত্নীকে প্রতিদিন দশবার কশাঘাত করেন, এবং সেই পত্নীই যথার্থ সতী ও পতিব্রতা, যিনি হাসিতে হাসিতে সেই কশাঘাত বহন করিয়া বলিবেন, স্বামিন্, তুমি বেশ করিতেছ, তোমার মত স্বামী যেন আমি জন্ম জন্মান্তরে পাই। এইরূপ আদেশ হইলে হিন্দু পত্নীকে তাই সহ্য করিতে হইবে। শুদ্ধ তাই নয়, মনুতে বিধান আছে হিন্দু পত্নীকে কায়মনো-বাক্যে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে, স্বামী হাজার মন্দ হউক, তবু হিন্দু পত্নীর কর্ত্তব্যতার অন্যথা হইবে না। তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে স্বামীর সেবা করিতে হইবেই হইবে। উল্লিখিত রূপ বেত্রাঘাত প্রতিদিন খাইয়া যদি শরীরে বেদনা হয়, তথাপিও তাহাকে পাঁচ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া আনিয়া স্বামীর ভোজনের সময় বাতাস দিতে হইবে। এই ত গেল কায়িক সেবা। আবার সেই স্বামীকে বাক্যেও তুষিতে হইবে। বলিতে হইবে স্বামিন্, আহা! তোমার কি চোক, মুখ, নাক, কাণ, তুমি কেমন সুন্দর পুরুষ; আমি তোমায় কত ভালবাসি; তোমার বেত্রাঘাতে আমার শরীর ক্রমে সুস্থ হইয়া আসিতেছে, তোমার মত স্বামী এ জগতে কি কাহার আছে! এই খানেই শেষ নহে, পত্নীকে মন দিয়া আবার পূজা করিতে হইবে। স্বামী যদি গঁজাখোর হন; তাহা হইলে পত্নীকে ভাবিতে হইবে, তিনি মহাদেব তুল্য লোক। পতি যদি চোর ও লম্পট হন, তবে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। তিনি যদি লাটিয়াল হন, তবে তাঁহাকে বজ্রধারী ইন্দ্রতুল্য মানিয়া ভক্তি করিতে হইবে। তিনি যদি সর্ব্বভুক হন, তবে তাহাকে স্বয়ং ব্রহ্মা রূপে দেখিতে হইবে। এই প্রকার না ভাবিতে পারিলে তিনি প্রতিব্রতা ও শাস্ত্রোক্ত সুশীলা পত্নী নহেন। তাঁহাকে নরকগামিনী হইতে হয়। কিন্তু যে হিন্দুরমণী শাস্ত্র মতে পতিব্রতা, লক্ষ্মীরূপা হইতে পারেন, তিনি স্বামীকে নরক হইতেও উদ্ধার করেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে এই দেখুন লেখকও বলিতে-ছেন, "স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গ গামিনী হয়েন এবং স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন। সুতরাং যিনি শাস্ত্র মুযায়ী ভাগ্যক্রমে লক্ষ্মীরূপা ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন, উপবাস প্রভৃতি দারুণ কষ্টভোগ করিয়া এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযম করিয়া তাহাকে কেন সুকৃতি লাভ করিতে হইবে? তিনি যখন পত্নীর পুণ্যবলে, সাধ্বীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্য বলে স্বর্গলাভ করিতে পারেন, তখন তিনি কেন না পৃথ্বীবাসে পাপ পথের সুখভাগী হইবেন? তাহার পক্ষে ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ। তিনি ঘোর পাপাচারী হইয়াও পুণ্যবানের ন্যায় স্বর্গের অধিকারী! হা হিন্দুধর্ম্ম, তোমার অপার মহিমা! হা হিন্দুশাস্ত্র, তোমার চমৎকার ব্যবস্থা। তোমাদের এই মহিমা এবং এই ব্যবস্থা আজি বঙ্গ দর্শন প্রবন্ধ লেখক প্রচার করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন!

শ্রীশ———

জাতীয় বিদ্বেষ।

দেখিতে দেখিতে শ্বেতকৃষ্ণ বর্ণভেদ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিল। ইল্‌বার্টের বিলের পরিণাম আর কিছু হউক বা না হউক ইহা নিশ্চয় যে শ্বেত কৃষ্ণে মিলন আর সম্ভব নহে। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া তুমি যেখানে যাইবে দেখিতে পাইবে যে দেশীয় ও বৈদেশিকে বিদ্বেষভাব বর্দ্ধমান। এক দিকে জেতা ইংরাজ নবীভূত জয় গর্ব্বে উদ্দীপিত হইয়া শৃগাল কুকুরের ন্যায় দেশীয়দিগকে ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন; অন্য দিকে অসহায় দেশীয়গণ দলিত অভিমান ভরে ভারতীয় ইংরাজদিগের প্রতি শাপাদি প্রয়োগ করিতেছেন। গর্ব্বিত ভারতীয় ইংরাজের ইচ্ছা চিরদিন তাঁহাদিগকে দলিত করিয়া রাখেন, অপমানিত ও অবহেলিত দেশীয়গণের ইচ্ছা শীঘ্র তাঁহাদিগের অপহৃত স্বত্ব সকল পুনরাধিকৃত করেন। দেশীয়গণ যত বিদ্যা বুদ্ধি ও যোগ্যতায় উন্নত হইতেছেন, ততই ভারতীয় শ্বেতপুরুষেরা তাহাদিগের প্রতি দাসোচিত ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হওয়া উচিত ঠিক তাহার বিপরীত হইতেছে। যদি নিজের মান নিজে চাও তবে পরের মান অগ্রে রক্ষা কর। দেশীয়গণকে সম্মান কর, দেখিবে তাঁহারাও তোমার পূজা করিবেন। তাঁহাদিগকে পদে পদে অপমানিত ও পদদলিত করিবে ত তাঁহারাও তোমায় অপমানিত ও পদদলিত করিবার জন্য সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইবেন। সুবিধা আজ না আসিতে পারে, কালও না আসিতে পারে, কিন্তু পরশ্ব যে আসিবে না কে বলিতে পারে? 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখনি চ।'—সুখদুঃখ নিরন্তর চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ তোমার সুখ ও আমার দুঃখ দেখিতেছ, কিন্তু কাল হয়ত তোমার সুখের অবসানে আমার সুখের উদয় হইবে। নদীর এক দিক্ ভাঙ্গে, আর একদিকে চড়া পড়ে। যে পাড় ভাঙ্গিতেছে, সেই পাড়ের লোকের দুঃখ দেখিয়া হাসিবার প্রয়োজন নাই। কারণ আবার ওপারও ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইবে। একদিন ভারতীয় আর্য্যেরা উন্নতিশৈলের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন—তখন ইংরাজসিংহ গর্ত্তে বাস করিতেন। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই আমরা নামিয়া পড়িয়া ছিলাম। কিন্তু আবার আমরা উঠিতেছি, তোমরা নামিতে আরম্ভ করিয়াছ। দিন আসিবে, যখন তোমরা নিম্নে নামিবে, আমরা উচ্চে উঠিব। যদি সে সময় হাসির জ্বালা সহিতে প্রস্তুত না থাক ত আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিও না। কারণ হাসিলে

দ্বিগুণিত হাসির জ্বালা সহিতে হইবে। ঘৃণার মর্ম্মন্তুদ আঘাত সহিতে যদি প্রস্তুত না থাক, ত ঘৃণা করিও না। আধুনিক হইয়া অনেক কালের বনেদী ঘরের প্রতি পরিহাসোক্তি করিও না। জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, অভ্যুদয় হইলেই পতন আছে। সেইরূপ বিপরীত হইতে বিপরীত নিশ্চয় আসিবে। গ্রীস পড়িয়াছিল, আবার উঠিয়াছে। ইতালী দুই বার পড়িয়া দুই বার উঠিয়াছে। ভারত পড়িয়া আর কতদিন রবে? তুমিই বা উঠিয়া কতদিন থাকিবে? যে চক্রের উপরে তুমি রহিয়াছ, সেই চক্রের নিম্নে ভারত রহিয়াছে। সুতরাং ভারত উঠিলে তুমি নামিবে। তুমি নামিলে ভারত উঠিবে। উচ্চতমশিখরে তুমি উঠিয়াছ, নিম্নতম তলে ভারত রহিয়াছে। তোমার উন্নতির চরম হইয়াছে, ভারতের অধোগতিরও শেষ হইয়াছে। এখন দশা পরিবর্ত্তনের সময়। অবিরাম ভ্রাম্যমাণ চক্রের গতি রোধ করে কাহার সাধ্য?

পতন যে আরম্ভ হইয়াছে ইলবর্ট বিলের আন্দোলনে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতিমানে চ কৌরবাঃ—অতি দর্পে সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল; অতি অভিমানে কুরুকুলধ্বংস হইয়াছিল। আদর্শ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত দুই প্রকাণ্ড ঘটনা দ্বারা জগৎকে এই মহানীতি শিক্ষা দিয়াছে যে, অতি অভিমান ও অতি দর্প মৃত্যুর অপরিহার্য্য কারণ। অত্যাচারী দশানন বিজয়দর্পে অন্ধিতমতি হইয়া জগৎকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যখন পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন দর্পহারী রামচন্দ্রের শাণিত শরে তাঁহার দশ মুণ্ড ধরাশায়ী হইল। মূর্ত্তিমান অভিমান কুরু-কুল-কলঙ্ক দুর্য্যোধন অভিমানে অন্ধ হইয়া ধর্ম্মের পদে পদাঘাত করিলেন, অমনি দর্পহারী নারায়ণের ষড়যন্ত্রে কুরুকুল ধ্বংস হইল। ভারতীয় শ্বেতপুরুষগণের দর্প ও অভিমান দুইই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাই অনুমান হয় পতন অদূরবর্ত্তী।

ইলবার্ট বিলের বাধা প্রদান এই দর্প ও অভিমানের একটী বাহ্য বিস্ফুরণ মাত্র। ১৮৩৩ সালের চার্টার বিধিতে ব্রিটিস পার্লেমেন্ট ভারতশাসননীতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে—ভারতবাসী যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয় সমস্ত উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইতে পারিবে। অধিক কি গবর্ণর-জেনেরেল ও প্রধান সেনাপতির পদ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিবে। ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের এই উদারনীতি খ্যাপিত হইল মাত্র, কিন্তু একদিনও কার্য্যে পরিণত হইল না। কত কত বৎসর অতীত হইল তথাপি তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কোনও চিহ্ন উপলক্ষিত হইল

না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্যানির একমাত্র লক্ষ্য অর্থ সংগ্রহ, তাঁহারা কেবল দুই হ'তে সেই অর্থ সংগ্রহই করিতে লাগিলেন। ইংরাজজাতিসাধারণ তৎকালে ভারত বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এই জন্য শ্বেতবণিক-সম্প্রদায় ভারতে কি করিতেছেন না করিতেছেন তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধানও করিতেন না। বহুদিন তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।১৮৫৭—৫৮সালের সিপাই বিদ্রোহ তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। পদদলিত ফণীর ভীষণ গর্জ্জনে ব্রিটিশসিংহের হৃদয়ও ভয়ে বিকম্পিত হইল। ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ-শাসন-সৌধ নিমেষমধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য একেবারে বিদূরিত হইল। ইংরাজ তখন দেখিলেন প্রজার হৃদয়ে পদাঘাত করিয়া রাজত্ব করা অসম্ভব। যিনি প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তিনিই রাজা। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"—প্রকৃতিরঞ্জন গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই রাজপদ বাচ্য। যিনি প্রজারঞ্জনে অক্ষম, তাঁহার রাজসিংহাসনে আরোহণ বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাকে জীবন রক্ষার জন্য সর্ব্বদা রক্ষি-পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। আর্য্যরাজবৃন্দ প্রজার হৃদয় দ্বারা পরিরক্ষিত হইতেন। দেহরক্ষক সৈন্য (Body guard) তাঁহাদিগের প্রয়োজন হইত না। রাজা দিলীপ যৎকালে সপত্নীক বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করেন, তখন সারথিমাত্র সঙ্গে করিয়া গমন করিয়াছিলেন। প্রজারা পথে ক্ষীর সর নবনীত লইয়া সারি গাঁথিয়া তাঁহার রথের গমনপথের দুই ধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। এ দৃশ্যের নিকট রুসীয় সম্রাটের গমনপথের দৃশ্য তুলনা কর। দুই দিকে ক্রমাগত সৈন্য-শ্রেণী বন্দুকে গুলি পুরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ভিতর দিয়া সম্রাট্ যাইতেছেন, তথাপি দেহরক্ষক সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া যাইতে হইতেছে। তাহাতেও নিস্তার নাই। মধ্যে মধ্যে পাতাল ভেদ করিয়া আগ্নেয় অস্ত্রের উদ্গীরণ। নিদ্রা নাই, শান্তি নাই। এরূপ সম্রাটের জীবন অপেক্ষা দাসের জীবনও অধিকতর সুখময়। ভারতেও ইংরাজগণের প্রায় তদ্রূপ অবস্থা। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই অবস্থার চরমা কাষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত ড্যালহাউসী ভারতীয় সামন্তগণের বক্ষে পদাঘাত করিয়া ও প্রজাসাধারণের ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া বলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সামন্তবর্গে ও প্রজাগণের অন্তরে অসন্তোষ বহ্নিপ্রধূমিত হইতে লাগিল। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে, সেই বহ্নি টোটারূপ সামান্য বায়ুর সংযোগে জলজ্জাল হইয়া অসংখ্য শ্বেত দেহকে ভস্মীভূত করে। দয়াময়ী মহারাণী আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভারতের রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট

যে উদারনীতি উদ্ঘোষিত করেন, বিশদরূপে সেই নীতি আবার উদ্ঘোষিত করিলেন। সেই ঘোষণাপত্রই ভারতের মাগনাচার্টা। সেই ঘোষণা পত্রে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ভেদ ভুলিয়া কেবল যোগ্যতানুসারে ভারতের যাবতীয় উচ্চ পদ পরিপূরিত করিবেন। জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম ভেদে পদের ক্ষমতার তারতম্য করিবেন না। আজ মহামতি লর্ড রীপণ মহারাণীর বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইলবার্ট বিল অবতারিত করিয়াছেন। ইলবার্ট বিল পাশ হইলে আপাততঃ অল্প সংখ্যক মাত্র দেশীয় জজ ও মাজিষ্ট্রেট ইয়ুরোপীয়গণের উপর বিচারাধিকার পাইবেন। ভারতীয় ইংরাজগণের তাহাও অসহনীয়। প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারী ও অ-কর্ম্মচারী ইংরাজ একবাক্যে এই বিলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। দেশীয়গণকে তাঁহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব হইতে চিরদিন বঞ্চিত রাখিবার জন্য ভারতীয় ইংরাজেরা দলবদ্ধ হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। তাঁহারা এই ধনভাণ্ডারের নাম আত্মরক্ষক ধনভাণ্ডার রাখিয়াছেন। অর্থাৎ এদেশে তাঁহাদিগের আধিপত্য চিরদিন রাখিবার জন্য যত কিছু ব্যয় সম্ভব, তাঁহারা এই ধনভাণ্ডার হইতে তাহার সরবরাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা পার্লেমেণ্টের, মহারাণীর, ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের উদারনীতি বিফল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাঁরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, 'আমরা বলে ভারত জয় করিয়াছি, বলেই চিরদিন ভারতে রাজত্ব করিব—পরাজিত দাস জাতিকে কখন সমান অধিকার দিব না। কখন তাহাদিগের বিচারাধীনে আসিব না।' এই যুদ্ধখ্যাপনে ভারতের অধিবাসি বৃন্দের হৃদয় বিকম্পিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে চিরলালিত আশালতা অঙ্কুরে বিদলিত হইয়াছে। ইলবর্ট বিল তাঁহাদিগের অদৃষ্ট পরীক্ষার নিকষ স্বরূপ। যদি ইলবার্ট বিল পাশ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন যে তাঁহাদিগের সুখের দিন অদূরবর্ত্তী। যদি পাশ না হয় তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন যে তাঁহাদিগের অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে; বুঝিবেন মহারাণীর ঘোষণার ও পার্লেমেণ্টের বিধির কোনও মূল্য নাই;—বুঝিবেন ভারত গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে বিষশূন্য ফণী; বুঝিবেন ভারতের প্রকৃত রাজা এক্ষণে ভারতীয় কর্ম্মচারী ও অ-কর্ম্মচারী ইংরাজ; বুঝিবেন ইংলণ্ডের উদারনীতিক মন্ত্রিগণের এক্ষণে কোনও ক্ষমতা নাই; বুঝিবেন নিরস্ত্র ভারতের অধিবাসিবৃন্দকে এখন হইতে সশস্ত্র ভারতীয় ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পদদলিত ও অপমানিত হইয়া অতিকষ্টে দুর্ভর জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে; বুঝিবেন সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে সমবেত চেষ্টা ভিন্ন তাঁহাদিগের আর গত্যন্তর নাই।

ইলবার্ট বিলের পরিণাম যাহাই হউক, ইহা স্থির যে ভারতীয় ইংরাজেরা দেশীয়গণের প্রতি অধিকতর বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহার সমস্ত ইংলণ্ডের উদারনীতিক দল অবগত হইতে পারেন না, কারণ সমস্ত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। মফঃস্বলের অধিবাসিবৃন্দ ও কর্ম্মচারিগণ ভয়ে সকল কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সুতরাং প্রতিদিন মফঃস্বলে যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় তাহার শতাংশও বাহিরে যাইতে পারে না। বিশেষতঃ কর্ম্মচারিবর্গের উপর তাঁহাদিগের দুর্ব্ব্যবহার অতিশয় বাড়িয়াছে। এরূপ হইয়াছে যে যাঁহার হৃদয়ে কণামাত্র আত্মাভিমান ও জাতীয়াভিমান আছে, তাঁহার বিনা অশ্রুপাতে দিন যাওয়া ভার। অথচ অনেকে হয়ত এরূপ সংসারজালে জড়িত যে সহসা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যে রাজার রাজ্যে প্রজার অশ্রুজল প্রতিনিয়ত পড়ে সে রাজার রাজ্যে কয় দিন বাস করা যাইতে পারে? এরূপ ঘৃণীভূত জাতীয় বিদ্বেষ সত্ত্বে, দুই জাতির সহবসতি কয় দিন সম্ভবপর?

যদি প্রজাবৎসলা জাতীয় বিদ্বেষ-শূন্যা স্নেহময়ী ভারতেশ্বরীর উপর ভারতীয় অধিবাসি-বৃন্দের প্রগাঢ় রাজ-ভক্তি না থাকিত, যদি পার্লেমেণ্টের উচ্চ মহৎ আশয়ের উপর ভারতীয় প্রজার অবিচলিত বিশ্বাস না থাকিত, যদি মন্ত্রিপ্রবর মহামতি গ্লাড্‌-ষ্টোন্ ও তদীয় উদারনীতিক সহচর-বৃন্দের উপর ভারতবাসীর অচলা শ্রদ্ধা না থাকিত, যদি ইংরাজজাতিসাধারণের ন্যায়পরতার উপর ভারতবাসীর অটল বিশ্বাস না থাকিত, এবং শেষতঃ যদি ভারতবন্ধু ধার্ম্মিকপ্রবর লর্ড রিপণের ও লর্ড কিম্বারলের কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপর ভারতবাসীর অচলা আস্থা না থাকিত, তাহা হইলে ইলবার্ট বিলের আন্দোলন-জনিত অত্যাচারে এত দিন ভারত অগ্নিময় হইয়া উঠিত। ভারতবাসী অসহ্য গালি সহ্য করিতেছেন, পদে পদে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতেছেন, অপমানের মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইতেছেন, তথাপি হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আছেন। বিশ্বাস, ন্যায় বিচার হইবেই হইবে। মানুষের হাতে না হয়, ভগবানের হাতে হইবে; বিশ্বাস অধর্ম্মের জয় চিরদিন হইতে পারে না। বিশ্বাস—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—যে দিকে ধর্ম্ম, সেই দিকেরই পরিণামে জয় হইবে। দুর্ব্বল ভারতবাসীর মনকে প্রবোধ দিবার এতদ্ভিন্ন আর কি আছে?*

শ্রীকরুণা—

* প্রস্তাবটি কিছু দিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল, স্থানাভাব বশতঃ পূর্ব্বসংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই।—সং

শিবগান।

১

শিব সদাশয় শঙ্কটে অভয়,
এই লোকমন্ত্র প্রচার তাই।
ভীম ভোলানাথ, ভূতপ্রেতনাথ,
এ কথাও যেন ভুলনা ভাই!

২

ওহে সদাশিব কৈলাস ত্রিদিব
ছাড়িয়া কেন এ শ্মশান স্থানে?
ওহে আশুতোষ সুধার কি দোষ?
গরলখাই' তাই জ্বলিছ প্রাণে?

৩

ওহে পশুপতি পশু প্রতি প্রীতি,
দেবতার প্রতি এমতি কেন?
ওহে ভূতনাথ ভূত প্রেত সাথ,
কি জানি কি যোগে বিহ্বোল যেন?

৪

তুমিহে প্রসন্ন, শান্তিজ্ঞানপূর্ণ,
অষ্ট যোগসিদ্ধি সোপান শুনি,
শুনে থাকি তুমি ষড়ৈশ্বর্য্য স্বামী,
নির্ম্মল নিষ্কামী মুনীন্দ্র মুনি!

৫

শুনিয়াছি নাথ তুমি হে সাক্ষাৎ
বিজ্ঞানাবতার এ লোক মাঝে।
প্রভো! তুমি নাকি ন্যায়ের বিবেকী?
স্বার্থের চালাকী জান না কাযে?

৬

ওহে মহাপ্রাণ, পুরুষপ্রধান,
ধন মান জ্ঞান থাকিতে হেন,
থাকিতে সম্ভ্রম বংশের মর্য্যাদা,
বিবাহ করিলে জড়ের দুহিতা,
তাইতে পাষাণী তোমার বনিতা,
দুখের বেদনা বুঝে না যেন।

৭

মায়া বশে নিত্য নূতন প্রকৃতি,
দেখে ভয় হয় ভীমার মূরতি,
শক্তি বলি তাঁরে অপার শকতি,
দিয়াছ হে শিব, ভূতপ্রেতপতি,
বিবেকের রীতি ইহাত নয়!
হেতু আছে তার, আমি মূঢ়মতি—
ভুলেছিনু তত্ত্ব ওহে পশুপতি,
আর এক তব আছে গুণবতী—
জানে না পার্ব্বতী গোপনীয়া অতি—
সুন্দরী সরলা সকলে কয়!

৮

গঙ্গানাম শ্যামসলিলকান্তি—
হেরিলে তোমার থাকেনা শান্তি,
বিজ্ঞান বিবেকে ঘটায় ভ্রান্তি,
সর্ব্বত্যাগী কিহে তাহারি তরে?
সুখদা, মোক্ষদা, অধমতারিণী
পচা গলা মড়া হৃদয়ে ধারিণী
অপবিত্র জনে পবিত্রকারিণী
যদৃচ্ছাচারিণী প্রীতির ভরে?

৯

প্রধানার কাছে, লুকাবার তরে,
রাখিয়াছ তারে মাথার ভিতরে

জানিয়া পার্ব্বতী অতি ক্রোধভরে
বিপরীত কাণ্ড ঘটায় পাছে;
এই ভয়ে বুঝি হয়ে মহাভীত
সৃষ্টি স্থিতি লয় যে শক্তি সম্ভূত,
সেই মহাশক্তি দিয়া ওহে পিতঃ
পাহাড়ে মেয়েকে তুলেছ গাছে?

১০

যার তরে তুমি এতই ব্যাকুল,
সেত কদাচই নহে অনুকূল,
কখনো যদ্যপি খুল জটাচুল,
বাহির হইয়া পলাবে বেগে।
অভিমান ভরে করি গরো গরো
ছুটিবে যে দিকে প্রীতি পারাবারো,
ছুটিবে যে দিকে পাইবে সুন্দর
ছিছি হর! যোগী তাহারি লেগে?

১১

আর এক কথা ওহে ভূতনাথ,
ভূত প্রেত গুলি কেন তব সাথ?
কত দক্ষ যজ্ঞ করেছ নিপাত!
আবার কি তাহে বাসনা আছে?
ওহে পিণাকিন্! কিসের লাগিয়া,
রতন কাঞ্চন ভূষণ ত্যাগিয়া,
কালান্তক ফণী পোষি দুধ দিয়া,
পরেছ ভূষণ ভীষণ সাজে!

১২

গাঁজা সিদ্ধি সুরা ধুতরা গরল,
খেয়ে দিবা নিশি নেশায় পাগল
তমোগুণে মাতি কর গণ্ডগোল,
প্রচণ্ড প্রমত্ত প্রমথ পতি!
বিনাশের প্রভু নাশিতে সংসার,
ধ'রেছ করেতে শূল খরধার।
প্রজা নাশ মাত্র কর্ত্তব্য তোমার।
হে জল্লাদ ব্যাধ! এ কোন রীতি?

১৩

যাহা হোক প্রভো! আমি অতি দীন।
চিরদনি আমি তব প্রেমাধীন,
করিয়া কটাক্ষ নাশহে দুর্দ্দিন,
শঙ্কটে সহায় তুমি হে হর।
ভুলিয়া আসিয়া পড়েছি শ্মশানে,
ধ'রেছে তোমার ভূতপ্রেতগণে,
করিছে লাঞ্ছনা বিবিধ বিধানে।
ত্রাহি ত্রাহি হর! নিস্তার কর।

১৪

না কর নিস্তার ওহে পিণাকিন!
ভূতপ্রেত হাতে ক'র না শ্রীহীন,
দৈত্য দানা গুলা কাণ্ডাকাণ্ডহীন,
তাদের চীৎকারী সহে না প্রাণে!
সংহারক মূর্ত্তি কালান্তের কাল,
আপনিই কেন ধরি মহাকাল,
মারিয়া ত্রিশূল ঘুচাও জঞ্জাল।
একেবারে নাশ করনাকে ক্যানে!?

শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গীত যোগ।

প্রকৃত পবনাভ্যাসসাধক সঙ্গীত যোগে যেমন অধিকারী তদ্রূপ অন্য কোন ব্যক্তি হইতে পারেন না। অন্যান্য ব্যক্তির যদি প্রাণবায়ু বশীভূত হয় তাহাহইলে তিনি সঙ্গীত যোগসাধনার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারেন। যিনি যে প্রকারে হউক প্রাণস্পন্দ নিরোধ করিতে ক্ষমবান্ তিনি সর্ব্ব-যোগফলপ্রসবিনী কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইতে ক্ষমবান্। যিনি কুলকুণ্ডলিনী তিনি বাগ্বাদিনী সরস্বতী। তিনিই অক্ষরাত্মিকা। তিনি স্বর ব্যঞ্জন রূপিণী। তিনি ব্যক্তাব্যক্ত বর্ণরূপা। তিনি বৈখরী। তিনি পরা। তিনি ওঁকাররূপা। তিনিই সপ্তস্বররূপিণী। তিনিই সপ্তরাগ। সপ্ত গীত ও সপ্ত মূর্চ্ছনা। তাললয়স্বরূপা সঙ্গীতের মূল সংক্ষেপে লেখা হইল। অতঃপর সঙ্গীতসাধনার ইতিকর্ত্তব্য কিছু লেখা যাউক। আহার ব্যবহার সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য। যাহা পবনাভ্যাস যোগসাধনায় কর্ত্তব্য তাহা ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিতে হয়। বিন্দুধারণ ও পরিমিত শরীরাবিরোধি আয়ুষ্কর দ্রব্য পান ভোজন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অপবিত্র পাপাত্মার এ যোগ সাধনা বিফল। শীত প্রারম্ভে সঙ্গীতসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এ যোগ সাধনায় সঙ্গীতবিৎ যোগী গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ যোগসাধনায় হঠ যোগান্তর্গত নেতি, ধৌতি, আর বস্তিকরণ করিতে হয়। নেতি ক্রিয়া করিলে কফ জন্য ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। ধৌতি ক্রিয়ায় পিত্ত দোষ দমন হয়। বস্তি ক্রিয়ায় আম ও বদ্ধ মল নির্গত হওয়ায় বায়ুধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। তানপুরা যন্ত্র যেমন জোয়াড়ি ছাপ থাকিলে বিশুদ্ধ আওয়াজ দেয়, তদ্রূপ নেতি প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়া করিলে অক্লেশে সুর সকল বাহির হইয়া থাকে। যাঁহার শ্লেষ্মাধিক্য ধাতু তিনি ক্রমাগত এক বৎসরকাল পঞ্চকোল পাঁচন অর্দ্ধপোয়া করিয়া প্রাতে সেবন করিবেন। সঙ্গীতের প্রধান প্রতিবন্ধক অবৈধ বীর্য্যপাত আর শ্লেষ্মা কারক দ্রব্য সেবন।

ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া মল্য মূত্র পরিত্যাগ ও হস্ত পাদ ও মুখ প্রক্ষালন করত নির্দ্দোষ স্থানে বসিয়া সযত্ন সুর সাধনা দ্বারা ভগবতী বাগ্বাদিনী সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিবে। বিনা যন্ত্রে সুর সাধনা করিতে নাই। যন্ত্রের মধ্যে তানপুরা প্রধান যন্ত্র।

স্বর সপ্ত প্রকার। যথা। নিষাদ।১। গান্ধার।২। মধ্যম।৩। পঞ্চম।৪। ঋষভ।৫ ষড়জ।৬। ধৈবত।৭। হস্তী স্বরকে নিষাদ। ছাগলের ডাককে গান্ধার। বকের স্বরকে

মধ্যম। মত্ত কোকিলের ডাককে পঞ্চম। গোরুর ডাককে ঋষভ। ময়ূরধ্বনিকে ষড়্জ। হয়রবকে ধৈবত বলে। সদ্‌-গুরুর নিকটে উক্ত সপ্ত স্বর উত্তমরূপে সাধিত হইলে ছয় রাগ আর ছত্রিশটি রাগিনীর সাধনা করিতে হয়। ছয় রাগ যথা,—ভৈরব, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘ, কর্ণাট। এক্ষণে সময়-গতিকে কৌশিক রাগ সাধনা করা দুর্ঘট হেতু উক্ত ছয়টি রাগের সাধনা করা হয়। প্রত্যেক রাগের ছয়টি করিয়া নির্দ্দিষ্ট শক্তি আছে। সেই শক্তিগুলি রাগ সকলের পত্নী। এতদ্ভিন্ন গীত সপ্ত প্রকার। যথা,—মন্ত্রগীত, গাত্রগীত, নিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ, শুদ্ধ, শালগ, সংকীর্ণ, এই সাত প্রকার। ভরতাদি সঙ্গীত-বিশারদ আচার্য্যদিগের মতে এই সাত প্রকার গীতের কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহা অতি প্রাচীন মার্কণ্ড মুনির মত।

সঙ্গীতশাস্ত্রে বলে প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীর তিনটী করিয়া গ্রাম আছে। সেই গ্রাম তিনটির নাম ষড়জ, মধ্যম, গান্ধার। আবার প্রত্যেক গ্রামের সাতটি করিয়া মূর্চ্ছনা আছে। মূর্চ্ছনা সকলের নাম যথা—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরী, ষণ্ডমধ্যা, এই কয়টি ষড়জ গ্রামের মূর্চ্ছনা। পঞ্চমা, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধা, অন্তা, কলাবতী, তীব্রা এই কয়টি মধ্যমের মূর্চ্ছনা। রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেদরী, সুরা, নাদাবতী, বিশালা এই সাতটি গান্ধারের মূর্চ্ছনা। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক গানে ও পদ্যে চারিটি করিয়া পদ, তিন তিন প্রকার তাল, তিন তিন প্রকার লয়, তিন তিন প্রকার যতি ও চারি প্রকার তোদ্য আছে। ইহাদিগের নাম। তালের নাম যথা—অৰ্দ্ধমাত্র দ্রুত, একমাত্র লঘু, দ্বিমাত্র গুরু, ত্রিমাত্র প্লুত অর্থাৎ পূর্ণ, খণ্ড, সম, বিষম। লয়ের নাম যথা—হৃদয়ে স্থিতি, কণ্ঠে স্থিতি, কপালে স্থিতি। তোদ্যের নাম যথা—ছন্দের শেষ, পদের শেষ, পদমধ্যে অবস্থিতি।

যাবতীয় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ উল্লিখিত সঙ্গীত, শ্লোক ও বাক্যের অন্তর্গত হেতু বর্ণই ব্রহ্ম পদার্থ। এতদ্ভিন্ন বর্ণ সকল মন্ত্র মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় দেব ও পিতৃলোকের আত্মা স্বরূপ। বেদ ও ঈশ্বর কেবল বর্ণময়। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রত্যেক বর্ণের আকৃতি ও রূপ এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্ণীত আছে। উহা সঙ্গীত-যোগিদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া তাহা এখানে লেখা যাইতেছে।

সাধক মাত্রেরই বর্ণধ্যান ও বর্ণজ্ঞান হওয়া চাই। বর্ণজ্ঞানশূন্য মনুষ্য পশু তুল্য। বিদ্যারম্ভের সময়, বালক বালিকাদিগকে যথাবিধি বর্ণজ্ঞানোপদেশ দিতে হয়। বর্ণজ্ঞান হইলে শব্দজ্ঞান, শব্দজ্ঞানের পর পদপদার্থজ্ঞান, পদ-পদার্থজ্ঞানে জন্মিলে পর বাক্যজ্ঞান, বাক্যজ্ঞান হইলে শব্দশাস্ত্রে অধিকার জন্মে। শব্দশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা জন্মিলে অপরাপর শাস্ত্রে অধিকার ও বাক্য-

বিন্যাসে ও সঙ্গীতাদি যোগসাধনায় ক্ষমতা জন্মে।

কামধেনু তন্ত্রমতে পঞ্চাশৎ বর্ণ বৃত্তান্ত যথা—অকার পঞ্চকোণময় অতি নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট। ত্রিশক্তি সংযুক্ত পঞ্চদেবময়। নির্গুণ অথচ ত্রিগুণাত্মক হেতু সাক্ষাৎ কৈবল্যরূপ। বিন্দুতত্ত্বময় অথচ প্রকৃতিরূপিণী। শ্বেতবর্ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র স্বরূপ।১। আকার পঞ্চপ্রাণময় স্বয়ং কুণ্ডলিনী।২। ইকার হরিদ্বর্ণ শক্তিদেবতা।৩। ঈকার পীতবর্ণ, পঞ্চদেবময় কুণ্ডলিনী।৪। উকার, পীতচম্পকবর্ণ, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চপ্রাণ স্বরূপ।৫। ঊকার শঙ্খকুন্দ সম উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ পঞ্চ প্রাণময় ও পঞ্চদেবতাত্মক, ত্রিগুণযুক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাতা।৬। ঋকারের বর্ণ রক্তাবযুক্ততার ন্যায়। ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সদাশিব বিরাজ করেন। ইনি সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী। ইহাতে পঞ্চপ্রাণ ও ঈশ্বর বিদ্যমান। ৠকারের বর্ণ পীত বিদ্যুল্লতার ন্যায়। সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী। আর পঞ্চদেব ও চতুজ্ঞানময় ও পঞ্চপ্রাণযুক্ত। ঌকারকে তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলিনী ও পর দেবতা বলেন। ইহার বর্ণ পীত বিদ্যুল্লতার ন্যায়। ইহাতে পঞ্চদেব, পঞ্চপ্রাণ ও চতুর্জ্ঞান ত্রিগুণ নিত্যই বিরাজ করে। ৯। ইনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হন। ইহাঁতে পঞ্চদেব পঞ্চপ্রাণ গুণত্রয় ও বিন্দুত্রয় আছে। ইনি সাধককে চতুর্বর্গ ফল দান করিয়া থাকেন।

একার। ইহাঁর বর্ণ বাঁধুলি ফুলের ন্যায় লাল। ইনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক। পঞ্চদেব ও পঞ্চপ্রাণময়। আর ত্রিবিন্দু বিশিষ্ট। চতুবর্গফলপ্রদ।

ঐকার। ইনি মহা কুণ্ডলিনী স্বরূপ। ইহাঁর জ্যোতিঃ কোটী চন্দ্র তুল্য। ইনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সদাশিব ও পঞ্চপ্রাণ ময়। এবং ত্রিবিন্দু সমন্বিত।

ওকার। রক্ত বিদ্যুল্লতাকার। ইনি পঞ্চদেব আর পঞ্চপ্রাণময়। ত্রিগুণাত্মা, ঈশ্বর ও বেদমাতা।

ঔকার। রক্তবিদ্যুল্লতাকার ও ঔকারে ব্রহ্মাদি দেবগণ সতত বাস করেন। ইনিই কুণ্ডলিনী। ইহাতে পঞ্চ প্রাণ, ঈশ্বর ও সদাশিব অবস্থিতি করেন। ইনি অনায়াসে চতুবর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

অংকার পীত বিদ্যুল্লতার ন্যায়, পঞ্চ প্রাণাত্মক, ব্রহ্মাদি দেবতা ময় এবং সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান ও বিন্দুত্রয়যুক্ত। ইনি ত্রিশক্তি কুণ্ডলিনী।

অঃকার। রক্ত বিদ্যুদ্বর্ণ পঞ্চ দেবতা ও পঞ্চ প্রাণ ও সর্ব্বজ্ঞান ময়। বিন্দুত্রয় ও শক্তিত্রয় ময়। ইহাঁরা সকলেই কিশোরবয়সা গীতবাদ্যাদিতে তৎপরা। ইহাঁরা তাবতেই শিবের যুবতী, মূর্ত্তিমতী কুণ্ডলিনী। এই সকল স্বর বর্ণের বাল্যকাল হইতে আরাধনা করিতে হয়।

যথারীতি এই ষোড়শ স্বরবর্ণ সাধনা করিলে সঙ্গীতযোগে কৃতকার্য্য হইতে

পায়া যায়। ইহা হইতে সারি, গামা, সাধনার সৃষ্টি হইয়াছে। সারি গামা সাধনায় আধ্যাত্মিক ফল দর্শে না। কেবল গলা সাধা হয় মাত্র।

কোন যুক্তি আশ্রয় করিয়া বর্ণ সকলকে পরব্রহ্ম বা দেবতা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রে অক্ষর বা বর্ণ সকলকে ঈশ্বর ও দেবতা বলিয়া স্বীকার করার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এসম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট যুক্তি দেখা যায় না। ইহার হেতু এইমাত্র বোধ হয়। যাহার কস্মিনকালে ক্ষয় নাই তাহাকেই অক্ষর বলে। বর্ণের অর্থাৎ অক্ষরের আর আত্মার কস্মিনকালে ক্ষর অর্থাৎ পতন হয় না। যাহা অচ্যুত তাহাই অক্ষয়। এতাবৎ জগতে অচ্যুত কেহই নহে কেবল অক্ষর আর আত্মাই অচ্যুত, তদ্ভিন্ন আর তাবতই চ্যুত অর্থাৎ ক্ষয়শীল। বর্ণ ব্রহ্মের দ্বিতীয় যুক্তি এই শব্দকে চিরস্থায়ী করিতে কেবল বর্ণই ক্ষমবান। যেহেতু প্রথম ক্ষণে কণ্ঠতাম্বাদ্যভিঘাতে শব্দের উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী। তৃতীয় ক্ষণে তাহার ধ্বংস। এমত অবস্থায় শব্দকে বর্ণ ব্যতীত কে চিরস্থায়ী করিতে পারে? এজন্য পণ্ডিতেরা বর্ণকে অক্ষর বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। বর্ণকে ঈশ্বর বলিবার তৃতীয় কারণ এই ঈশ্বর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় কার্য্য যেমন নিজ অভ্রান্ত জ্ঞান দ্বারা করিতেছেন, মনুষ্যও তদ্রূপ অক্ষররূপ অভ্রান্ত জ্ঞান দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, রাজকার্য্যাদি সাংসারিক কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন উত্তমরূপে করিতেন।

যেখানে নিরক্ষর প্রাণী সেখানে তাহারা প্রকৃতরূপে সাংসারিক সুখে বঞ্চিত। এতদ্ভিন্ন আধ্যাত্মিক জ্ঞানজ সুখ যে কিরূপ তাহাও তাহারা জানিতে পারে না।

বর্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করার চতুর্থ যুক্তি এই, ঈশ্বর শক্তিমূল প্রকৃতি, নির্গুণ নিরাকার পরমাত্মাকে যেমন নিজ গুণে জগদাকারে পরিণত করিয়া আত্মশক্তির পরিচয় দিতেছেন, কুণ্ডলিনীও তদ্রূপ শব্দব্রহ্মকে বর্ণ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ঘট-পটাদিরূপে পরিণত করিয়া জাগতিক কার্য্য সমুদায় চালাইতেছেন। প্রকৃতি-দেবী মানবদেহকে কুণ্ডলিনী দেবীর উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্র করিয়া দিয়াছেন। এ বাদ্যযন্ত্রের অষ্ট স্থান হইতে বোল নির্গত হয়। মাতৃকাবর্ণই এ যন্ত্রের বোল। অষ্ট স্থান যথা পাণিনী—

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানাং শিরঃকণ্ঠউরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠঞ্চ তালু চ॥

কুণ্ডলিনী যে কেবল পাঞ্চভৌতিক মানবীয় স্থূল দেহেই বাদ্য বাজান তাহা বোধ হয় না। তিনি মানবের সূক্ষ্ম দেহেও বাদ্য বাজাইয়া থাকেন।

জ্ঞানসাগর মহাযোগী দেবদেব মহাদেবের বর্ণবিষয়ক প্রমাণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত অজ্ঞানী সামান্য মানবের যুক্তি সাধারণ

মনুষ্য সমাজে উপহাসাস্পদ হয়। দেখ আপ্ত বা সিদ্ধযোগীদিগের ধর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে যত কথা পাওয়া গিয়াছে তাহাঃ কোন কথারই যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই বলিয়া কি মহাজন সমাজে তাহা অনাদৃত হইয়া আছে? বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম ও জ্ঞান শাস্ত্রের কোন স্থানইত যুক্তিযুক্ত হয় নাই বলিয়া, কি তাহা অচল হইয়া রহিয়াছে?

অযোগী ভোগী ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রমাণবাক্যে যুক্তি অপেক্ষা করে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণাদি শাস্ত্র অভ্রান্ত পূর্ণজ্ঞানী যোগীদিগের বাক্য। তাহা ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ শূন্য। তার প্রমাণই যুক্তি। আমরা অল্পজ্ঞানী বলিয়া ঐ সকল বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না; সুতরাং উহার যুক্তি অনুসন্ধান করি। এটি মহদ্দোষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা।

ব্রজাঙ্গনা *

দ্বিতীয় সর্গ।

(বিহার)

১

সাজ, সাজ, ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি!—
মণি মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে;
বাঁধলো নূপুর পায়ে, কুসুমে কবরী!
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী!

---

* ব্রজাঙ্গনা-কাব্য বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারের নূতন সামগ্রী। বঙ্গকবি-কুল-কেশরী মাইকেল মধুসূদন দত্তজ, পদাঙ্কদূতের প্রথম শ্লোকের অংশবিশেষ স্বকীয় কাব্যের শিরোভূষণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে ব্রজাঙ্গনা কাব্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা পদাঙ্কদূত অপেক্ষা অধিক রসভাবশালিনী! দত্তজর ব্রজাঙ্গনা কাব্যের ছন্দোবন্ধও নূতনবিধ। অনেক স্থানে ছন্দোগুণে আমরা বিরহবিধুরা ব্রজনারীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকি।

কবি-কুলগৌরব মাইকেল মধুসূদন, ব্রজাঙ্গনার দ্বিতীয় সর্গ রচনারম্ভ করিয়াছিলেন। শেষ হইলে, তদীয় অদ্বিতীয় কবিত্বের আর একটী স্মৃতিস্তম্ভ সাহিত্য-জগতে রহিয়া যাইত।

খুলনার নৈহাটী। শ্রীকৈলাসচন্দ্রবসু।

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে ;—
শিখণ্ড-মণ্ডিত শির, ধীরে ধীরে শ্যাম ধীব,
দুলিছে লো বরগুঞ্জমালা বরগলে !
মেঘ সনে সৌদামিনী, সমরূপে লো কামিনি,
ঝলে পীত ধড়া পিঠে ঝল ঝল ঝলে !

৩

হ্রদে কুমুদিনী এবে প্রফুল্লবদনে !
তব আশা-শশী আসি, শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেন মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে।
দেব দৈত্য মিলি বলে, মথিলা সাগরজলে, *
যে সুধার লোভে তাহা লভিবে সুন্দরি ;—
সুধা মাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি তুমি অবিলম্বে বনে।

ভারতের জাতীয় ভাষা।

আমরা অনেক বার লিখিয়াছি ও এখনও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে জাতীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। জাতীয় শিক্ষা দ্বারা আমরা জাতীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা—এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত এমন দৃষ্টান্ত দেখায় নাই, যেথানে বৈদেশিক ভাষা দ্বারা একটী জাতি সংগঠিত হইয়াছে। বৈদেশিক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দুই চারি জন পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু একটী সমগ্র জাতি কথন বৈদেশিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে না। সমস্ত ইউরোপ গ্রীক ও লাটিন ভাষা হইতে অনন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপের জনসাধারণ কথনই রোমীয় বা গ্রীসীয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করে নাই। ইউরোপের প্রত্যেক দেশের উন্নতি নিজ নিজ মাতৃভাষার আলোচনায় হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ নিজ মাতৃ-ভাষাকে রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষাভাণ্ডার

* কবি স্বয়ং "not good" বলিয়া" দেবদৈত্য মিলি বলে ইত্যাদি" কবিতাংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু, ঐ পরিত্যক্ত কবিতাতেও মধুর প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়।
প্রকাশক।

হইতে রত্নরাজি লইয়া অবিরাম ভূষিত করিয়াছেন কিন্তু কখন রোমীয় বা গ্রীসীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন নাই। অথচ রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষার সহিত সমস্ত ইউরোপীয় ভাষার মূলগত ঐক্য আছে। সংস্কৃতের সহিত ভারতীয় ভাষা-নিচয়ের যে সম্বন্ধ, রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষার সঙ্গেও ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সেই সম্বন্ধ। আমরা যেমন সংস্কৃতকে ভারতের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করি না, সেইরূপ ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষাকে ইউরোপের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। যে ভাষার সঙ্গে মৌলিক একতা আছে সে ভাষা যখন আমরা আমা-দের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করি না, তখন মূলগত-সাদৃশ্য-বিরহিত বৈদেশিক ভাষাকে জাতীয় চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা অধিকতর বিড়-ম্বনা আর নাই। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বৈদেশিক ভাষায় স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা কথোপকথনে, পত্রলেখনে ও বক্তৃতায় ভুলিয়াও মাতৃভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন বঙ্গভাষা অপুষ্ট, সুতরাং তাহাতে সমস্ত ভাব ব্যক্ত করা যায় না, বিশেষতঃ ভারতবাসী সকলে বাঙ্গালা ভাষা বুঝে না, সুতরাং অগত্যা ইংরাজী ব্যবহার করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা অপুষ্ট ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে ভাবব্যঞ্জনে বিরত থাকিলে কোন কালেই ইহার পরিপুষ্টি হইবে না। কারণ অভাবের মোচন না হইলে, চিরকালই সে অভাব থাকিয়া যাইবে। কোন্ স্থানে ভাষার অভাব আছে—সে ভাষায় কথোপকথন, সে ভাষায় চিঠি পত্র লিখন, ও সে ভাষায় হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন না করিলে তাহা কখনই উপলব্ধি হইবে না। প্রকৃতির স্রোত বন্ধ না করিলে, জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষা আপনিই উন্নত হইতে থাকিবে। অন্তরে ভাবান্তরাদি রহিলে সেই ভাবোচ্ছ্বাসের অনুরূপ ভাষা আপনা হইতেই বাহির হইবে। নিষাদকে মৈথুনাসক্ত ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্যতরকে বধ করিতে দেখিয়া বাল্মীকির হৃদয়ে যে কারুণ্য রসের আবির্ভাব হয়,

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ
শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম-
মোহিতম্॥"

এই শ্লোক তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই উচ্ছ্বাসময় ছন্দোবন্ধন সংস্কৃত ভাষার প্রথম শ্লোক। হৃদ্‌গত ভাবের প্রতিবিম্ব ভাষারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হইবেই হইবে। মুখ ও দর্পণের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে যেমন দর্পণে মুখের

ছবি প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ হৃদগত ভাব ও জাতীয় ভাষার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে হৃদগত ভাব জাতীয় ভাষায় প্রতিবিম্বিত হয় না। ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে সেই ব্যবধানের কার্য্য করিতেছে। এই মৃণ্ময় দেউলে আমাদের হৃদগত ভাব পতিত হইয়া প্রতিহত হয়, তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় না। "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদগ্রাহে ন মৃদাং চয়ঃ" দর্পণই বিম্বোদগ্রাহে সমর্থ, মৃতপিণ্ড বিম্বগ্রহণে সমর্থ নহে।

রূপক পরিত্যাগ করিয়া সহজ কথায় বলি। ভাবস্ফূর্ত্তির সহিত ভাষাস্ফূর্ত্তি আপনিই হইয়া থাকে। ভাষা ভাবব্যক্তির সঙ্কেত মাত্র। ভাবের আবির্ভাব হইলে সঙ্কেতের অভাব হয় না। নূতন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে, তদ্বোধক নূতন সঙ্কেতের অবতারণায় কোন বাধা নাই। যদি সেই সঙ্কেত জাতিসাধারণ গ্রহণ করিলেন; তাহা হইলে তাহা জাতীয় ভাষার অঙ্গীভূত হইল। যদি কেহ সেই সঙ্কেতের পরিবর্ত্তে আরও ভাল সঙ্কেত ব্যবহার করেন, তাহা হইলে প্রথমটী পরিত্যক্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দ্বিতীয়টী ব্যবহৃত হইবে। যদি দুইটীই ভাল সঙ্কেত হয়, তাহা হইলে হয়ত দুইটীই পরস্পরের প্রতিবাক্যরূপে ব্যবহৃত হইবে। দুই কিম্বা ততোধিক সঙ্কেতও পরস্পরের প্রতিবাক্য হইতে পারে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। একটী অশ্বাকৃতিবিশিষ্ট জন্তুকে দেখিয়া আমি বলিলাম এই অশ্ব। আর এক জন অন্য সময় বলিল এই ঘোটক। তৃতীয় ব্যক্তি আর এক সময় বলিল এই হয়। তিন ব্যক্তির শব্দই জাতি গ্রহণ করিল। সেই অবধি অশ্ব, ঘোটক, হয় পরস্পরের প্রতিবাক্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত ভাষায় যে অসংখ্য প্রতিরূপ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছে। সাঙ্কেতিক শব্দে যেরূপ দেখাইলাম, যৌগিক শব্দেও সেইরূপ। যিনি যে ভাব বা পদার্থ বুঝাইবার জন্য যে সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন ভারতীয় আর্য্যেরা যত্নপূর্ব্বক তাহাকে ভাষায় স্থান দিয়াছেন। এই জন্যই সংস্কৃত ভাষা এত পরিপুষ্ট, এত সুমধুর, ও এত বৈচিত্র্যপূর্ণ। এরূপ অল্পভাব আছে, ও এরূপ অল্প পদার্থ আছে, যাহা সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইয়া ব্যক্ত করা যায় না। বঙ্গ ভাষা সেই সংস্কৃত ভাষারূপ অপূর্ব্ব অলঙ্কারের মধ্যমণি। ইংরাজী ভাষায় এমন অল্প ভাব প্রতিবিম্বিত আছে, যাহা সংস্কৃতের আশ্রয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিবিম্বিত করা যাইতে না পারে। হয়ত আজ সেই নব শব্দের অনুরূপ ভাব জাতিসাধারণের মনে উদ্ভূত হইবে না। কিন্তু যখন সে ভাবোদয় হইবে, তখন সে ভাবের অনুরূপ সঙ্কেত ভাষায় রহিয়াছে দেখিয়া জাতীয় হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। যাঁহারা সময়ের কিঞ্চিৎ অগ্রে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় হয়ত

তাঁহারা প্রত্যাখাত হইবেন। কিন্তু কাল আসিবেই, যখন তাঁহাদিগের হৃদয়-ভাব-দ্যোতক ভাষা জাতিসাধারণ আদর করিয়া লইবে।

কিন্তু তুমি যদি সে পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া তোমার হৃদয়ের ভাব কর-প্রাপ্ত বৈদেশিক সঙ্কেত দ্বারা ব্যক্ত করিয়া চলিলে, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ের ছবি তোমার জাতিতে রাখিয়া গেলে না। বৈদেশিকেরা তোমার হৃদয়ের চিত্র কখন সাদরে বক্ষে ধারণ করিবে না। সুতরাং সে ছবি অচিরে কাল-সাগরে বিলীন হইবে। কিন্তু তুমি যদি একটী নূতন ভাব নূতন সঙ্কেত দ্বারা তোমার জাতীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া যাও, তোমার জাতি মৃত বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাহা অনন্তকাল বক্ষে ধারণ করিবে।

তবে কেন ভাই এ বিড়ম্বনা? কেন দুই জনে একত্র হইলে জাতীয় সঙ্কেতে উভয়ের মনের দ্বার উভয়ের নিকট উদ্ঘাটন কর না? কেন ভাবব্যক্তির অস্ফুটতা লুকাইবার জন্য বৈদেশিক ভাষায় কথা কহিয়া বা লিখিয়া পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টা কর? কেন কাকাতুয়ার মত পরের বুলি মুখস্থ করিয়া আওড়াইয়া পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টা কর?

এ জীবন-মরণ-সংগ্রামের সময়। পরস্পরকে ঠকাইবার সময় নহে। এ দুর্দ্দিনে পরস্পরের অভাব পরস্পরকে জানাইয়া পরস্পরের সাহায্যে সে অভাব মোচন করিয়া লইতে হইবে। জাতীয় দুর্গের যেখানে যে ভাঙ্গা আছে পরস্পর পড়িয়া তাহা সারিয়া লইতে হইবে। পত্রাবরণে সে ভগ্ন স্থান লুকাইলে চলিবে না। ভাষার অভাব থাকে পূরণ করিয়া লও। ভাবের অভাব থাকে ত ভাবিতে আরম্ভ কর। বলের অভাব থাকে ত বলোপচয় কর। পরের বলে, পরের ভাবে, ও পরের ভাষায় মুগ্ধ হইয়া আপনার জাতীয় ভবিষ্যৎ নষ্ট করিও না।

আর যাহারা সুনিপুণ ভাবে বাঙ্গালা ভাষার গতি নিরীক্ষণ করিবেন তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে বাঙ্গালাভাষার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। ভারতবর্ষের এমন স্থান নাই—যেখানে বাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষাও তথায় যায় নাই। যেন ভবিষ্য ভারতীয় ভাষার যোগ্য হইবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা ধীরে ধীরে স্ফীতা-বয়ব হইতেছে। সংস্কৃতের পর প্রাকৃত, প্রাকৃতের পর পালী, পালীর পর মাগধী, মাগধীর পর মৈথিলী, মৈথিলীর পর বাঙ্গালা। সংস্কৃত ভাষা ক্রমিক আব-র্ত্তনে এই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। হিমালয় হইতে যেন গঙ্গা বাহির হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। এক দিকে অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী হিমাচল—অন্য দিকে অনন্ত ও অসীম সাগর। সেইরূপ এক দিকে অত্যুচ্চ সংস্কৃত—

অন্য দিকে অনন্ত উন্নতিসহ বাঙ্গালা। কারণের অনুরূপ কার্য্য।

সেই অনন্ত-উন্নতি-সহ জাতীয় ভাষাকে পদদলিত ও অবহেলিত করিয়া যাহারা পরভাষাকে মস্তকে লইয়া আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে আমি 'জাত দাস' ভিন্ন অন্য লঘুতর বাক্যে অভিহিত করিতে পারি না।

আমরা ইতিহাস হইতে দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে ভাষা-বৈষম্য বিদূরিত হওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই দেশে জাতীয় একতা সম্পন্ন হয় নাই। ব্রিটনে প্রথমে অনেকগুলি ভাষা ছিল। সে সময় বিভিন্ন-ভাষা-কথন-শীল জাতি-নিচয়ের মধ্যে ঘোর বৈরভাব ছিল। ব্রিটনের প্রধান অঙ্গ ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলস, ও আয়র্লণ্ডে ত চারিটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিলই, তদ্ভিন্নও ভাষাগত অনেক অবান্তর ভেদ ছিল। বৈদেশিকের পদার্পণের পূর্ব্বে ব্রিটিন্ জাতির একটী ভাষা ছিল। তাহার পর রোমাণেরা আসিয়া সমস্ত আদালতে লাটীন ভাষা প্রচলিত করিলেন। রোমাণ-দিগের পর সাকসেনেরা আসিয়া সাক-সন ভাষা আদালত ও বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত করিলেন। তাহার পর নর্ম্মাণেরা আসিলেন—আসিয়া তাঁহারাও সমস্ত আদালতে ও বিদ্যালয়ে নর্ম্মান ভাষা প্রচলিত করিলেন। যতদিন এই ভাষাগত পার্থক্য ছিল, তত দিন এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে গাঢ়তর বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান ছিল। তখন ব্রিটনকে কে চিনিত? পরস্পরের বল পরস্পরের উপর ক্ষয়িত করিয়া ব্রিটিন্ জাতি তখন জাতিগণনায় নগণ্য ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা নিজ নিজ ভুল বুঝিয়া এই সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ ভাষা-বৈষম্য পরিহার করিতে লাগিলেন। টিউডার রাজবংশের সময় এই ভাষা-বৈষম্য অপনীত হইতে আরম্ভ হয়—তাই অষ্টম হেনরী ও এলিজেবেথের সময় এত এত বড় বড় গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। মিলনের বলের মধুময় ফল সেক্‌সপীয়র, বেকন প্রভৃতি প্রতিভা-শালী গ্রন্থকারগণ। প্রথম জেমসের সময় স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড মিলিত হয়। সেই মিলনের অমৃতময় ফল অতুলনীয় মিলটন্ ও আধুনিক যাবতীয় কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, পুরাবিৎ ও বৈজ্ঞানিকগণ। সেই ভাষাগত মিলনের অপূর্ব্ব পরিণাম ব্রিটনের বর্ত্তমান সৌভাগ্য। ব্রিটন এখন অদ্যাপি-পরিজ্ঞাত জগতের সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্যূন এক চতুর্থাংশে এখন ইংরাজী ভাষা কিছু না কিছু পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আজ যদি ইংলণ্ডে সেই ভাষাগত বৈষম্য থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের কখন এরূপ সৌভাগ্য হইত না।

একবার চল প্রাচীন রোমের সৌভা-গ্যের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখি।

লাটিন ভাষা প্রথমে ইতালীর একটী ক্ষুদ্র প্রদেশে কথিত হইত। তখন ইতালী অন্তর্বিচ্ছিন্ন, ও প্রাদেশিক বিদ্বেষা-নলে জ্বলিত। সে সময় ইতালীর নাম আল্পসের বাহিরে যায় নাই, ভূমধ্য সাগর পার হইয়া দেশ দেশান্তরেও প্রতিধ্বনিত হয় নাই, কিন্তু যখন লাটীন-ভাষা-কথন-শীল রোমীয় জাতির বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইতালীতে লাটীন ভাষা প্রচলিত হইল, তখন রোম ভুবনেশ্বরী হইয়া উঠিল। লাটীন ভাষা তখন জগতে আদৃত হইল। তখন অসংখ্য পদ্য ও গদ্য লেখক—অসংখ্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ, এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও বাগ্মিক ইতালীক্ষেত্রে আবিভূ‌ত হইলেন। তাঁহাদিগের প্রতিভা-বলে নূতন ইয়ুরোপ সৃষ্ট হইল। ইয়ু-রোপের বর্ত্তমান উন্নতির একটী প্রধান কারণ লাটীন ভাষা। ইয়ুরোপীয় অধিকাংশ দেশেই লাটীন গ্রন্থসকল অনুদিত বা অনুকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় জাতিনিচয়ে লাটীন ভাষা-রূপ ফটোগ্রাফ যন্ত্রে সেই প্রাচীন রোমীয় জাতির ছবি পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—তাই আজ ইয়ুরোপের এত সমৃদ্ধি! তাই আজ ইয়ুরোপের এত প্রতাপ।

একবার ভারতের পূর্ব্বাবস্থা আলোচনা করি। যখন আর্য্যেরা প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন সংস্কৃত তাঁহাদিগের কথিত ভাষা ছিল। আর্য্যঋষিগণের জলন্ত হৃদয়ভাব ঋগ্বেদে প্রতিবিম্বিত। ঋষিরা বেদিতে বসিয়া সেই জ্বালাময়ী ভাষায় হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া সম্মিলিত ঔপনিবেশিকগণের মনে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা বীরবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিতেন। তাঁহাদিগের সেই উন্মাদনী ভাষায় উত্তেজিত হইয়া কতিপয় মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অমানুষ অবদান-পরম্পরা সম্পাদন করিয়াছিল। ভাষা-গত সাম্য সেই আর্য্যজাতিকে অচিরকাল মধ্যে অদ্বিতীয় শক্তি করিয়া তুলে। যতদিন তাঁহারা সারস্বত প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা এই ভাষাগত সাম্যে নিবিড়রূপে ঘনীভূত ছিলেন। তখন তাঁহাদিগের উন্নতির সীমা ছিল না—সৌভাগ্যেরও সীমা ছিল না। ক্রমে বিজয়মার্গে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা পরস্পর হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। আদিম জাতির সহিত সংমিশ্রণে তাঁহাদিগের পবিত্র দেবভাষা ক্রমে অসংখ্য প্রাকৃত ভাষায় (Dialects) পরিণত হইল। গৌড়ী, সৌরসেনী, মাগধী, মৈথিলী, পালী প্রভৃতি অসংখ্য প্রাকৃত ভাষা আর্য্য জাতির বিস্তৃতি ও আদিম জাতিনিচয়ের সহিত সংমিশ্রণের ফল। অসংখ্য প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যজাতির অন্তর্বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। ভাষাবৈষম্যের বিষময় ফল প্রাদেশিক বিদ্বেষ। সেই প্রাদেশিক বিদ্বেষ হইতেই ভারতের জাতীয় পতন সংঘটিত হই-য়াছে। পরস্পর-ঘনীভূত একভাষা-

কথন-শীল আর্য্যজাতি ক্রমে পরস্পর-মমতাশূন্য বিভিন্ন ভাষা-কথন শীল অসংখ্য জাতিতে পরিণত হইয়া পরস্পরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। বর্গী আসিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল। জয়চন্দ্র দিল্লীর সিংহাসন যবনকে বিক্রয় করিল—অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তর্জাতীয় উপদ্রব ত গণনা করিয়া উঠা দায়। এখনও ভাষাগত বৈষম্যে ভারতের অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত। ভাষা-বৈষম্যে ভারতের পতন হইয়াছে—ভাষা-জনিত সাম্য ব্যতীত ভারত সঞ্জীবিত হইতে পারে না।

ভাষাসাম্য যে জাতীয় একতার অপরিহার্য্য উপাদান তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তবে কোন্ ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ বর্ত্তমান। কেহ সংস্কৃত, কেহ হিন্দী, কেহ উর্দ্দূ, কেহ বা ইংরাজীকে ভারতের ভবিষ্য জাতীয় ভাষা বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু আমার ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে বাঙ্গালা ভাষাই ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। যাঁহারা নিপুণ চিত্তে ভারতীয় ভাষানিচয়ের সহিত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার তুলনা করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, লিখিত বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা, সংস্কৃতের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। সুতরাং অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও ভাবব্যঞ্জক। সংস্কৃত অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ ভাষা আজও পৃথিবীতে জন্মে নাই। যে ভাষা সেই ভাষার অধিকতর অনুগামী, তাহা জগতের বর্ত্তমান ভাষা মাত্রেরই উপর যে অচিরাৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে তদ্বিষয়ে সংশয় অল্প। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্যান্য ভাষার শুদ্ধ যে ধাতু বিকৃত হইয়াছে এরূপ নহে, অনেক শব্দও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় শব্দের বিকার হয় নাই। যিনি সংস্কৃত জানেন, তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা অতি সহজ। যিনি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন যে কোন ভাষা পড়িয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও বাঙ্গালা সহজবোধ্য। কারণ উভয় ভাষার শব্দগত অনেক সাদৃশ্য আছে। দুরধিগম্য সংস্কৃত ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। উর্দ্দূতে অনেক পারস্য ও আরবী কথা থাকায় তাহা হিন্দুবহুল ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। বৈদেশিক ভাষা জাতীয় হৃদয়ের অন্তস্তল কখন স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং ইংরাজীরও কখন ভারতের জাতীয় ভাষা হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে রহিল বাঙ্গালা ও হিন্দি—ভারতের ইংরাজী ও ফরাসী। আমরা একবার বলিয়াছি এতদুভয়ের মধ্যে বাঙ্গালা অধিকতর পরিমার্জ্জিত, অধিকতর পরিপুষ্ট, সুতরাং অধিকতর ভাবব্যঞ্জক; আবার সেই বাক্য পুনরুক্ত করিলাম। অধিকতর পরিপুষ্ট ও অধিকতর ভাবব্যঞ্জক বলিয়াই বাঙ্গালা-ভাষা ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইতেছে।

কি গদ্য, কি পদ্য, কি ইতিহাস, কি পুরাবৃত্ত, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, সকল বিষয়েই বঙ্গভাষায় ভূরি ভূরি পুস্তক লিখিত হইতেছে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সময় হইতে আধুনিক বাঙ্গালার সূত্রপাত। তখনও ইহা মৈথিলীগন্ধবিশিষ্ট ছিল। চৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচারের সময় ইহা অধিকতর পরিপুষ্ট হয়। চৈতন্যের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ইহার কিঞ্চিৎ গতিমান্দ্য উপলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই ইহা বেগবতী হইতে আরম্ভ হয়। রামমোহন রায়ের সময় এই বেগ খরতর হইয়া উঠে। সেই অবধিই বাঙ্গালা ভাষা প্রচণ্ড স্রোতস্বিনীর ন্যায় উন্নতি-সাগরাভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হইয়াছে। সে আজ অর্দ্ধ শতাব্দী মাত্র হইবে—ইহার মধ্যে অসংখ্য প্রতিভাশালী লেখক বাঙ্গালা ভাষাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখক মণ্ডলীর আবির্ভাব এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই। যেরূপ ত্বরিতগতিতে বাঙ্গালা অগ্রসর হইতেছে ইহাতে আর কোন ভারতীয় ভাষার বাঙ্গালার সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি উৎসাহ পায়, যদি গৃহমধ্য হইতেই বাধা না পায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা অচিরকাল মধ্যে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে কুক্ষিগত করিতে পারে—জাতীয় সম্মিলনের প্রধান অন্তরায় ভাষাবৈষম্যকে বিদূরীত করিয়া অপূর্ব্ব ভারতীয় জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে। বাঙ্গালা বহিশ্চর ও আভ্যন্তরীণ অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ক্রমিক অগ্রসর হইতেছে। বহিশ্চর বাধার উপর আমাদের কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাধা আমরা ইচ্ছা করিলেই অপনীত করিতে পারি। উপরে যে বৈদেশিক ভাষার উল্লেখ করিলাম, তাহা বৈদেশিক-শাসন-জনিত। বৈদেশিক রাজার স্বার্থ জাতীয় ভাষার ধ্বংসে বৈদেশিক ভাষার বহুল প্রচার। বৈদেশিক রাজার স্বার্থ ভাষাবৈষম্য চিরস্থায়ী করা। কারণ বিভিন্ন ভাষা স্বত্বে ঘনীভূত মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতের অপরিপুষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে অতি যত্নে পরিরক্ষিত করিতেছেন। আসামী ও উড়িয়া ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য। গবর্ণমেণ্টের বিপরীত চেষ্টা সত্ত্বেও আসামী ক্রমে বাঙ্গালার কুক্ষিগত হইতেছে। উড়িয়াও এতদিন কুক্ষিগত হইত, কিন্তু বর্ণমালার আকারগত বৈষম্য নিবন্ধন তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে মাত্র। বাঙ্গালার অতি সরল ও সুন্দর বর্ণমালা একদিন নিশ্চয়ই জটিল ও কদাকার উড়িয়া বর্ণমালাকে পর্য্যুদস্ত করিবে। দেবনাগর বর্ণমালা অপেক্ষাও বাঙ্গালা বর্ণমালা অধিকতর সরল, অথচ সমানই সুন্দর। সুতরাং হিন্দীর দেবনাগর বর্ণমালাও Survival of the

fittest মতানুসারে কালে বাঙ্গালা বর্ণমালায় বিলীন হইয়া যাইবে। যেমন ওল্ড ইংলিস বর্ণমালা অধিকতর ornamental বলিয়া রোমীয় বর্ণমালা দ্বারা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, সেই রূপ অধিকতর অলঙ্কৃত দেবনাগর বর্ণমালা সরলতর বাঙ্গালা বর্ণমালা দ্বারা একদিন নিশ্চয়ই বিতাড়িত হইবে। বৈদেশিক রাজার কৌশলে এ শুভদিন আসিতে বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু এরূপ দিন যে আসিবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার জাতীয় ভাষা হওয়ার অনুকূলে আর একটী যুক্তি এই যে বাঙ্গালা ভারতের রাজধানীর ভাষা। রাজধানীর ভাষাই সকলকালে সকল দেশেই জাতীয় ভাষারূপে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় পালি ভাষা রাজধানীর ভাষা ছিল, সুতরাং পালি তৎকালে সর্ব্বতঃ-প্রসারী হইয়া উঠিয়াছিল। সেইরূপ মাগধী, মৈথিলী, ও গৌড় প্রভৃতি ভাষাও যখন যখন রাজধানীর ভাষা হইয়াছিল, তখনই সেই সেই রাজধানীর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের ভাষারূপে পরিণত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বৈকেন্দ্রিক নীতি (Decentralization policy) অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার বিস্তৃতি দূর-বিলম্বিত করিতে পারেন বটে কিন্তু এ গতি একেবারে রোধ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। ভারতের রাজধানীর ভাষা বাঙ্গালা একদিন ভারতের জাতীয় ভাষা হইবেই হইবে। ইংরাজী ভাষা ও ইতালীয় ভাষা এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্ব নিদর্শন। আইস ভাই! আমরা আভ্যন্তরীণ অন্তরায়গুলি বিদূরিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সেই সৌভাগ্যের দিন শীঘ্র আনয়ন করি। আইস ভাই! আমরা মাতৃভাষাকে পূজা করিয়া জগৎকে সেই ভাষার পূজা করিতে শিখাই। ভারতীয় আর্য্যেরা সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন, তাই সংস্কৃত আজও ভাষাজগতের শীর্ষস্থানীয় রহিয়াছে। সেই সংস্কৃতের খাতিরে আজও আমরা সভ্য জগতের গৌরবভাজন। সেই সংস্কৃতের খাতিরে আজও আমরা বিজেত্রী জাতির আদর-ভাজন। সংস্কৃত ভাষার পুণ্যবল না থাকিলে এতদিন হয়ত আমরা আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের দশা প্রাপ্ত হইতাম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে আর কিছুই দিয়া যান নাই, কেবল অনন্ত-রত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমি ও অনন্ত-রত্ন-গর্ভ সংস্কৃত ভাষা রাখিয়া গিয়াছেন। এই দুইএর কর্ষণ ও মন্থনে আমাদের সমস্ত জাতীয় অভাব বিদূরিত হইবে। আইস আমরা সেই অনন্ত রত্নাকর হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া মাতৃভাষার অঙ্গ ভূষিত করি। কত কত গভীর চিন্তা সংস্কৃত ভাষার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া আছে, আমরা আজও তাহার সহস্রাংশও মাতৃভাষায় প্রতিফলিত করিতে পারি নাই। পারি নাই তাহার কারণ মাতৃভাষার অনাদর। যিনি সে কার্য্যে ব্রতী হইবেন তিনিই

অনাহারে মরিবেন। কারণ বাঙ্গালী আজও বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক কিনিতে শিখে নাই। শুদ্ধ যে আমরা উচ্চ সাহিত্যের লেখকগণকে অনাহারে মারি তাহা নহে, আমরা অনেক সময় তাঁহাদিগের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকি। যিনি বাঙ্গালানবিশ বঙ্গসমাজে তাঁহার বড় অনাদর। বাঙ্গালানবিশ বঙ্গসমাজে অবজ্ঞাসূচক উপাধি। যিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, ও ইংরাজীতে লিখেন, তাঁহার সমাজে অধিকতর সম্মান। যেন ভাবের কোন মাহাত্ম্য নাই, ভাষারই মাহাত্ম্য। যেন কোন মহান্ ভাব জাতীয় ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাহার মাহাত্ম্য কমিয়া যায়! যেন কোন ভাব অধিক লোকে বুঝিলে ভাবপ্রকাশকের গৌরব কমিয়া যায়! যেন মনে মনে শঙ্কা পাছে দাসজাতির ভাষা ব্যবহার করিতে দেখিলে বৈদেশিকেরা আমাদিগকে দাস বলিয়া ঘৃণা করিবে। কিন্তু দাস! কতকাল এরূপ ময়ূরপুচ্ছে নিজ কাকত্ব লুকাইবে? কতকাল পরের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আপনাকে সুন্দর দেখাইতে চেষ্টা করিবে? যাহা তোমার নয়, কখন তোমার হইবে না ও হইতেও পারে না, তাহার গর্ব্বে অভিভূত হইয়া নিজের কাপুরুষত্ব আর কত কাল দেখাইবে? তাই বলিতেছি আইস, ভাই! আমরা আপন জিনিসকে আদের করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা অনাদর করিলে, জগৎ অনাদর করিবে, সে মাতৃভাষার গৌরব বর্দ্ধন করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা সুশোভিত না করিলে আর কেহ সুশোভিত করিবে না, নানা দেশ হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া তাহাকে সাজাই। নানা ভাষার মুকুটমণি আনিয়া সেই অনাদৃতা মাতৃভাষার শিরোভূষণ করি। যে চিত্রকর তাহাকে ভাল বর্ণে ফলিত করিতে পারিবেন, যে শিল্পকর তাহাকে বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে পারিবেন, ও যে উপাসক সেই উজ্জ্বল-বিচিত্রালঙ্কার-ভূষিত প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, আইস ভাই! আমরা তাঁহাদিগের পূজা করিতে শিখি। যদি সেই প্রতিমাকে জগন্মনোমোহিনী ও উদ্দীপনাময়ী করিতে চাও, তবে সেই প্রতিমার নির্ম্মাতাগণকে পর্য্যাপ্ত আহার প্রদান কর। যাহাতে তাঁহারা অনন্যমনে সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন তাহার উপায় করিয়া দেও। অনাহারে যাহার নিজের প্রাণ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, সে কখন অপরের প্রাণসঞ্চার করিতে পারে না। দিবারাত্র যাহার অন্নচিন্তায় অতিবাহিত হয়, সে কিরূপে এ কঠোর শবসাধনায় সিদ্ধ হইবে? অন্য কার্য্যে যাহার জীবনী শক্তি ক্ষয়িত হইতেছে, তাহার ক্ষীণ স্বরে বহুদিনের পতিত জাতি কি উঠিতে পারে? যাহার মস্তিষ্ক লেখনীশলাকায় অবিরাম বিদ্যুৎ উদ্গীরণ করে, ভারতে এরূপ লোকের এক্ষণে

বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সে তাড়িত-প্রবাহ অন্য দিকে ব্যয়িত হইলে ভারতের সুখের দিন আসিবার অনেক বিলম্ব পড়িয়া যাইবে। তাই বলিতেছি আইস ভাই! আমরা এখন হইতে জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা করি। ওহাবীরা ধর্ম্মার্থে প্রতি গৃহস্থ প্রতিদিন এক মুষ্টি করিয়া চাউল রাখিয়া দেয়। সেই রূপ আইস আমরা এখন হইতে জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনার্থ প্রত্যেকে মুষ্টিপরিমিত চাউল সঞ্চিত করি। আইস আমরা এইরূপে সঞ্চিত চাউল বিক্রয় করিয়া প্রতিগৃহে একটী করিয়া পুস্তকালয় সংস্থাপিত করি। কেহ টের পাইবে না, অথচ অচিরকাল মধ্যে প্রতিগৃহ অচিরাৎ পুস্তকরাশিতে পরিপূরিত হইবে। চতুর্দ্দিক্ হইতে তখন উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিবে। অন্তর্নিগূঢ়িত জাতীয় প্রতিভা তখন দ্বাদশরুদ্রের উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবে। সেই তাড়িত যন্ত্রের (Battery) অবিরাম প্রয়োগে অচেতন ভারত পুনর্জীবিত হইবে। বিধাতঃ! ভারতের ভাগ্যে তুমি কি এ সৌভাগ্য লেখ নাই। না! তা ভাবিতে পারি না। যে বিধাতা ভারতকে একদিন জগতের অধীশ্বরী করিয়াছিলেন, যে বিধাতা ভারতের পূর্ব্ব ভাষাকে দেবভাষায় পরিণত করিয়াছেন, যে বিধাতা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে আজও ভারতকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছেন, সে বিধাতা যে ভারতকে আর উঠিতে দিবেন না—তাহা কখন বোধ হয় না। না—কখনই নহে। ভারত আবার উঠিবে—আবার জাতি-গণনায় অগ্রণী হইবে—আবার সভ্যতা-লোকে জগৎ ঝলসিত করিবে—আবার তাহার জাতীয় ভাষা যুগপৎ অমৃতবর্ষণ ও বিদ্যুদ্‌দ্গীরণ করিবে! সে জাতীয় ভাষা বাঙ্গালা হইবে কি না, তাহা সম্পূর্ণ রূপে বঙ্গবাসীর করায়ত্ত!

—•—

বঙ্গীয় কবির করুণ রস।

আজ কাল বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রতিদিন যে সকল অগণ্য নাটক, কবিতা ও উপ-ন্যাস প্রসব করিতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই করুণরসাত্মক বলিয়া অনু-মিত ও উল্লিখিত হয়। নূতন পুস্তক হাতে পড়িলেই দেখিতে পাই হয় সে খানি বিয়োগান্ত নাটক, না হয় করুণ-রসাত্মক উপন্যাস, অন্ততঃ বিলাপপূর্ণ কবিতা। কিন্তু আজি পর্য্যন্ত কয়খানি করুণরসাত্মক কাব্য পড়িয়া পাঠকের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছে, কয়খানি বিয়ো-গান্ত নাটক শরীর রোমাঞ্চিত করিয়াছে?

বিয়োগ-বিধুরা প্রণয়িনীর বিলাপ, বিচ্ছেদ-সন্তপ্তা যুবতী নায়িকার মনস্তাপ, ভগ্ন-হৃদয় যুবা নায়কের প্রলাপ, নিরাশ প্রেমিকের অপলাপ, উন্মত্ত প্রণয়ীর মস্তিষ্কের খেলাপ, এ সকলের কিছুরই অপ্রতুল নাই! প্রেমমুগ্ধ নায়কের নৈরাশ, প্রেম-ভিখারিণী নায়িকার সর্ব্বনাশ, পতিসোহাগিনী সুন্দরীর বনবাস, শয্যাশায়িনী বিরহিণীর এপাশ ওপাশ, এ সকলের কিছুরই অভাব নাই! রঙ্গভূমে অভিনয় দেখিতে যাই, কুরুপাণ্ডবের হাহাকার, রামসীতার উচ্চ চীৎকার, ভূতপ্রেতের মার মার, রঙ্গস্থলের ছারখার, এ সকলের কিছুরই অপ্রতুল দেখি না! কিন্তু এ করুণরসে তো হৃদয় আর্দ্র হয় না, শরীর কণ্টকিত হয় না! ইহা তো হৃদয় স্পর্শ করে না, অন্তরের ভিতর তো ইহার ছায়া পড়ে না! বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা করুণরসের অবতারণার সময় লোককে কাঁদাইবার জন্য আভিধানিক শব্দপূর্ণ তিন পৃষ্ঠা বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, অভিনেতার গলা ভাঙ্গিয়া স্বর বিকৃত হইয়া উঠিল, দর্শকবৃন্দের নাসিকা-ধ্বনি হইতে লাগিল, তথাপিও বক্তৃতার শেষ হয় না! দর্শকগণের মধ্যে অনেকের প্রতীতি জন্মিল যে, এ অভিনেত্রী নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে পার্লিয়ামেণ্টের বর্ক অথবা সেরিডান ছিলেন, শাপভ্রষ্ট বঙ্গীয় কবির বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন!

বোধ হয় যেন সচরাচর বঙ্গীয় কবি মনে করেন যে অধিকক্ষণ কাঁদিতে পারিলে, অধিক শব্দযোজনা করিতে পারিলে, করুণ রসেরও আধিক্য হইবে! করুণরস হৃদয়ে, রসনায় নহে। আমাদের বিশ্বাস যে অধিক শব্দ যোজনায়, অধিক বাক্যাড়ম্বরে করুণরসের সম্পূর্ণ ব্যভিচার ঘটে! যে কবি অধিক শব্দযোজনায় করুণরসের অবতারণায় প্রয়াস পান, তিনি করুণরসের মহত্ত্ব বুঝেন না। কবি বায়রন (Byrŏn) যথার্থ বলিয়াছেন যে শব্দাড়ম্বর করুণরসের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

"Truth denies all eloquence to woe." ইংরাজী ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের চিত্রসমূহ বায়রণের এ কথার সারবত্তার পরিচয় দিতেছে। জগতের অগ্রগণ্য বিয়োগান্ত নাটক হ্যামলেটের (Hamlet) ওফিলিয়া চরিত্র(Ophelia) এ কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। ওফিলিয়া বঙ্গীয় নাটকের নায়িকার ন্যায় কোথাও উচ্চৈঃস্বরে আক্ষেপ করে নাই; সুদীর্ঘ বক্তৃতা করে নাই; চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া মূর্চ্ছিত হয় নাই; কিন্তু সেক্‌সপীয়র ওফিলিয়া চরিত্রে করুণরসের কি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন! হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য দেবতা প্রণয়ী হ্যামলেটের অমৃতময় প্রেমে সহসা বঞ্চিত হইয়া ওফিলিয়া বাঙ্গালা নাটকের প্রণয়িনীর মত কোথাও "হা হতোস্মি, হা দগ্ধোস্মি" প্রভৃতি কথায় রোদন করে নাই; পিতৃ-

তন্ত্রা প্রবাস-গত পতিকে উদ্দেশে সম্ভাষণ করিয়া কোথাও নানা ছন্দে আক্ষেপ করে নাই, কিন্তু যখন ওফিলিয়া উন্মাদিনী বেশে, উন্মাদিনী বালিকার ন্যায় লতা পুষ্পে দেহ সাজাইয়া, উন্মাদিনী বালিকার গীত গাইতে গাইতে অকস্মাৎ রঙ্গস্থলে দেখা দিল, পাঠকের হৃদয় গলিয়া গেল। আমরা কবির অযানুষিক চিত্র-নৈপুণ্যে মোহিত ও বিস্মিত হইলাম। থ্যাকারের ভ্যানিটী ফেয়ার করুণরসাত্মক কাব্য নহে, করুণ রসের চিত্র অতি অল্প স্থানেই আছে! সাত শত পৃষ্ঠার মধ্যে আট দশ পৃষ্ঠা মাত্র! অন্যান্য চরিত্রের নিকট এমিলিয়া চরিত্র অতি সামান্য! কিন্তু যে যে স্থানে কবি করুণ রস চিত্রিত করিবার জন্য তুলিকাস্পর্শ করিয়াছেন তাহা কি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে! বঙ্কিম বাবুর বিয়োগান্ত উপন্যাস কপালকুণ্ডলায় যখন সন্দেহ-সন্তপ্ত, উন্মত্তপ্রায় নবকুমার মৃণ্ময়ীকে বক্ষে ধরিয়া, পূর্ব্ব সংকল্প হারাইয়া, কাপালিকের আদেশ বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বল, মৃণ্ময়ি! একবার বল তুমি অবিশ্বাসিনী নও," মৃণ্ময়ী উত্তর করিল "তুমি তো জিজ্ঞাসা কর নাই" ইহা করুণ রসের কি সুন্দর দৃশ্য! দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষার শেষ অভিনয় বিষময় অঙ্গুরীয় দুর্গ পরিখার জলে নিক্ষেপ করুণ রসের উচ্চ আদর্শ। অন্য কোন বঙ্গীয় লেখক করুণ রসের অবতারণায় এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আমরা জানি না। অনর্থক শব্দপ্রয়োগের আড়ম্বর নাই বলিয়াই হেম বাবুর দশমহাবিদ্যার প্রথম কবিতা দুইটি এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কবির প্রধান লক্ষ্য, যেরূপ ভাব প্রকাশ করিতে চাহিবেন, শব্দযোজনাও তাহার উপযোগী হইবে। ভাব-বৈচিত্রের সঙ্গে ভাষা-বৈচিত্রের ঐক্য না থাকিলে কাব্য হয় না।

"Sound must seem an Echo to
the sense."

সেকসপিয়রের কিং জন নাটকে কনষ্ট্যানসের বিলাপ দীর্ঘ বটে কিন্তু কবি শব্দযোজনায় কি অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন! শকুন্তলায় কণ্বমুনির আশ্রম হইতে শকুন্তলার বিদায়-গ্রহণ ও রাজসভায় দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যানের দৃশ্যে কোন্ সহৃদয় পাঠক না মুগ্ধ হইয়াছেন? কবিবর মাইকেল মধুসূদন স্থানে স্থানে করুণ রসের সুন্দর আদর্শ দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কাব্য সকল পড়িলে বোধ হয় যেন করুণ রসের অবতারণা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যেন যেখানে নিতান্ত নহিলে নয়, যেন চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যেখানে নিতান্ত আবশ্যক, সেই খানেই করুণ রসের অবতারণার চেষ্টা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি করুণরসের সঙ্গে অন্যভাব মিশাইয়া করুণরসের চরিত্রকে অস্ফুট রাখিয়া গিয়াছেন অথবা অতিরঞ্জিত

করিয়া তুলিয়াছেন। অপর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি করুণরসাত্মক কবিতা এই রূপে আরম্ভ করিয়াছেন।

"কাঁদিছে জননী নিমাই নিমাই,
প্রতিধ্বনি বলে নাই, নাই, নাই !!!"
ইত্যাদি।

দীনবন্ধু বাবুর 'নীলদর্পণ' বঙ্গভাষায় একখানি উচ্চদরের করুণরসাত্মক নাটক, ইহার চরিত্র সকল সাধারণতঃ সুসংস্থানে পরিপূর্ণ, কিন্তু দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সুকবিও সকল স্থানে যেন বঙ্গীয় নাটককারের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করেন নাই। নীলদর্পণের শেষ অঙ্কে বিন্দুমাধব সরলার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া গদ্যে রোদন করিয়া নিরস্ত হইলেন না, যেন কালেজের অভ্যাসদোষেই আবার আভিধানিক শব্দপূর্ণ ছন্দময় কবিতা আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন।

নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ।
ইত্যাদি।

লীলাবতী নাটকে দীনবন্ধু বাবু যেন বাঙ্গালীর কৌলিক প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া, যেন দেশাচারের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া নায়ক নায়িকাকে নানা কথায় নানা ছন্দে কথা কহাইয়াছেন। ললিত মোহন গদ্যে নানাবিধ আক্ষেপ করিয়া, নানা প্রকার চিন্তা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না; শেষে ছন্দোময় কবিতায় আক্ষেপ আরম্ভ করিলেন, তাহার পর লীলাবতী আসিয়া যোগ দিল। উভয়ে নির্জ্জনে বসিয়া মনের দুঃখে নানাবিধ ছন্দে আক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মাইকেল ও দীনবন্ধু বাবু বাঙ্গালাভাষায় সুকবি বলিয়াই আমরা তাঁহাদের কাব্যের উল্লেখ করিলাম। যে সকল রাশি রাশি কবিতা, উপন্যাস ও নাটক দুর্ভাগা বঙ্গদেশে প্রতিদিন পঠিত, সমালোচিত ও অভিনীত হইতেছে তাহাদের উল্লেখ করিবার আবশ্যক করে না। আমরা একবার একটী প্রসিদ্ধ রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। নাটকের নায়িকা বঙ্গীয় কুলবধূ ও পতিপ্রাণা অভিনয় কালে তাঁহার নিজমুখে একথা শুনিলাম। তিনি প্রবাসগত, নিরুদ্দেশ পতির জন্য আপন সখীর নিকট বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। তাঁহার সমাস-সঙ্কুল ও সংস্কৃত-শব্দময় রোদন শুনিয়া আমাদের সন্দেহ হইল যে, কুলটা রমণী লোকাপবাদ ভয়ে, না কাঁদিলে ভাল দেখায় না তাই কাঁদিতেছে। কি বলিয়া কাঁদিতে হইবে যেন সে তাহা কোন বঙ্গীয় নাটককারের নিকট হইতে গোপনে লিখাইয়া লইয়া অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছে। বাস্তবিক যখন আমরা শুনিতে পাই যে মোহন্ত-নাটকের অভিনয় রাত্রে বঙ্গীয় রঙ্গভূমি লোকাকীর্ণ হইয়াছে আর "মৃণালিনী" অভিনয়ের দিন রঙ্গভূমির অধ্যক্ষকে দর্শক অভাবে অভিনয় বন্ধ রাখিতে

হইল, যখন দেখি "এলোকেশী নাটক" ও "তীর্থকাক নাটকের" দুই বৎসরে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, আর মায়াকাননের প্রথম মুদ্রাঙ্কণের এক হাজার পুস্তক সাতবৎসরে বিক্রীত হইল না, যখন দেখি "তিশ্যাক ভিশ্চুলা" সম্বাদ পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়গণ মাইকেলের আসনে নিধিরাম কবিকে বসাইবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন ও তাঁহার করুণরসে মুগ্ধ হইয়া সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন তখন আমরা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হই, বঙ্গভাষার অদৃষ্টে আরও কি আছে ভাবিয়া চিন্তিত ও ভীত হই।

আমরা এরূপ বলিতেছি না যে বঙ্গভাষায় কেবলমাত্র করুণরসেরই অপ্রতুল। কিন্তু আজি হৃত-সর্ব্বস্ব, অপনীত-গৌরব পরপদানত ভারতভূমির সন্তানগণের রোদন বই আর কি আছে? আজি এই শত শত বৎসর নীরবে অশেষ যাতনা সহিয়া, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়া, শত শত বৎসরের পর প্রথম মুখ ফুটিল! আর কিছু হউক না হউক আমরা আশা করিয়াছিলাম ক্রন্দন স্বাভাবিক হইবে, হৃদয়গ্রাহী হইবে। কিন্তু এতদুঃখে আজও বাঙ্গালার প্রপীড়িত জর্জ্জরিত হৃদয় কাঁদিতে শিখিল না, আজি ভারতবাসীর পরভুক্তাবশেষ-পোষিত মস্তিষ্ক করুণরসের সৃষ্টি করিয়া পাঠককে হাসাইল। জানি না হতভাগ্য ভারতের অদৃষ্টে আরও কি আছে।

পরিব্রাজক।

ওয়ালেস্।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সেরিফ মুইয়ারের যুদ্ধ—ফলকার্কের যুদ্ধ—সার্জন্ গ্রেহামের মৃত্যু—ব্রুসের সহিত ওয়ালেসের সাক্ষাৎ—লিঙ্‌লিথ্ গাউএ ইংরাজেরা সহসা আক্রান্ত—ডণ্ডী অধিকৃত—ওয়ালেসের পদত্যাগ—ফ্রান্সে গমন—লিনের জল যুদ্ধ—ফরাসিরাজ কর্ত্তৃক মহা সমাদরে ওয়ালেসের গ্রহণ।

ডণ্ডীর অবরোধ উত্তোলিত করাই উডষ্টকের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশে টে নদীতে রণতরি সকলও প্রেরিত হইল। মহতী সেনার অধিনায়ক হইয়া আসায় তাঁহার অন্তরে কষ্ট-ভীতি উদিত হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সুদক্ষ পথপ্রদর্শকেরা তাঁহাকে সম্মুখবর্ত্তী উপত্যকা প্রদেশ পরিহার পূর্ব্বক সেণ্ট

অনুষ্টনের দিক দিয়া লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছিল। উক্ত উপত্যকা প্রদেশে ওয়ালেস সসৈন্য শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উড্‌হক্ অধিত্যকা প্রদেশ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন স্কট্ সৈন্যের সংখ্যা তাঁহার সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা অল্প। দেখিয়া যুদ্ধার্থী হইয়া অতর্কিত ভাবে সেই উপত্যকা প্রদেশে নামিলেন। ইংরাজ সৈন্য এরূপ ধীরভাবে চলিতেছিল যে সার্ জন্ গ্রামজে তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে দেখিয়া আরল্ ম্যাল্‌কমের লোক জন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ওয়ালেসের সুতীক্ষ্ণ চক্ষু নিমেষমধ্যে আগন্তুকগণের স্বরূপ বুঝিতে পারিল। অমনি তিনি তাঁহার সৈন্যগণকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেল্কিক্ মুইয়ার ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। ইংরাজেরা প্রচণ্ডবেগে সেই শ্রেণীবদ্ধ ইংরাজসৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। বসুন্ধরা রুধির কর্দ্দমিত হইয়া উঠিলেন। স্কট্ বীরবৃন্দের অতিমানুষ রণনৈপুণ্যে সমস্ত ইংরাজসৈন্য সেনাপতি সহ রণে নিহত হইল। ইংরাজসেনার নিধনে বহুমূল্য দ্রব্যজাত স্কটগণের হস্তগত হইল।

ওয়ালেস্ দ্রুতগতিতে ষ্টার্লিং সেতুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইয়া তিনি সেতু ভাঙ্গিয়া দিলেন, এবং নদী গর্ভে অসংখ্য খোঁটা পোতাইলেন—যেন সেনাগণ কোনমতে নদী উত্তরণ করিয়া আসিতে না পারে। অদূরে নদীবক্ষে ইংরাজ রণতরি সকল বিপৎকালে ইংরাজগণকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য সজ্জিত ছিল। তিনি লডার নামক সহচরকে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। লডার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া অবিলম্বেই তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এদিকে সীটন্, আরল্ ম্যাল্‌কম, সার্‌জন্ গ্রেহাম্ প্রভৃতিও আপন আপন অনুযাত্রিকবর্গ সহ তথায় আসিয়া ওয়ালেসের সৈন্যসংখ্যা স্ফীত করিলেন।

অবশেষে সংবাদ আসিল এড্‌ওয়ার্ড অগণ্য অনীকিনী সহ টর্পিচেনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এড্‌ওয়ার্ড মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিক আলোড়ন করিয়া আসিতেছিলেন—অধিক কি সেণ্ট জন্‌ষ্টনের নাইট্‌গণের সম্পত্তিও তিনি পরিহার করেন নাই। এদিকে জয়কেতে বুটের ষ্টীয়ার্ট দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া এবং কিউমিন্ বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া ফলকার্ক রণক্ষেত্রের অদূরে রণের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস্ দশ সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া সেই অগণ্য ইংরাজ অক্ষৌহিণীর সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার পক্ষে আরল্ ম্যাল্‌কম্, সার্‌জন গ্রেহাম্, রাম্‌জে, সীটন্, লডর্, লণ্ডিন্, এবং আডাম ওয়ালেস্ এই কয় জন সেনাপতি ছিলেন। এড্‌ওয়ার্ড এক লক্ষ সৈন্য লইয়া সাগর-

গামিনী উত্তালতরঙ্গিণী স্রোতস্বিনীর ন্যায় টর্পিচেন্ হইতে স্লামন্ মুর কেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগা সহজ নহে। স্কটলণ্ডের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মুমূর্ষু সময়ে স্কটিশ সৈনামধ্যে অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। স্বজাতিবিশ্বাসঘাতক কিউমিন্ ওয়ালেসের প্রতি বিদ্বেষ-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহার সৈন্যমধ্যে ভেদ উৎপাদন করিল। কে সেনাপতি হইবে ইহা লইয়া দারুণ মতভেদ উপস্থিত হইল। কিউমিন্ আপত্তি তুলিল যে ষ্টুয়ার্ট উপস্থিত থাকিতে ওয়ালেসের সৈনাপত্য গ্রহণে কোন অধিকার নাই—আর ষ্টুয়ার্টেরও ইহাতে সম্মত হওয়া উচিত নহে। কিউমিন যেরূপ আশা করিয়াছিল তহাই ঘটিল। ওয়ালেস্ এরূপ সঙ্কটকালে সেনাপত্য পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। যখন সমস্ত জাতি একবাক্যে তাঁহাকে জাতীয় শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করিয়াছে, তখন ব্যক্তিবিশেষের কথায় তিনি এরূপ মুমূর্ষু সময়ে কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি জাতীয় স্বাধীনতা সমরে আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র সহায়তা করে নাই, জাতীয় অধিনায়কত্ব গ্রহণে তাহার কি অধিকার আছে? ওয়ালেস্ এরূপ প্রস্তাবে অপমান মনে করিলেন। বিশেষতঃ ষ্টুয়ার্টের বাক্যে তিনি ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। ষ্টুয়ার্ট অন্য পক্ষীর পুচ্ছে শোভিত পেচকের সহিত তাঁহার তুলনা করিলেন এবং বলিলেন যে যদি তাহাদিগের সৈন্য লইয়া তাঁহারা চলিয়া যান, তাহা হইলে ওয়ালেস্ কেমন করিয়া যুদ্ধ জয়ী হন দেখা যাইবে। ওয়ালেস আর সহিতে পারিলেন না—বুঝিলেন স্কট্লণ্ডের সুখসূর্য্য উদিত হইবার অনেক বিলম্ব আছে—বুঝিলেন স্কট্লণ্ডের অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে—বুঝিলেন এরূপ গৃহশত্রু থাকিতে বিজয়ের আশা সুদূরপরাহত। বুঝিয়া তিনি আপনার দশ সহস্র সৈন্য লইয়া ফলকার্ক রণক্ষেত্রের পূর্ব্বস্থ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ষ্টুয়ার্ট আপনার ভ্রম এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন। বুঝিলেন তিনি বিশ্বাসঘাতক কিউমিনের কুহকে পড়িয়া স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিলেন—বুঝিলেন এ বিষম সমরের একমাত্র যোগ্য নেতা ওয়ালেস—বুঝিলেন এ সাধের মুকুট তাঁহার মস্তকে সাজিতেছে না—বুঝিলেন বিধাতা তাঁহাকে জাতীয় সেনাপতি করিয়া পাঠান নাই—বুঝিয়া তিনি বিষাদে নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত স্কটীশ শিবির বিষাদ-মেঘে আবৃত হইল।

সুচতুর এড্ওয়ার্ড এই অন্তর্বিচ্ছেদের সংবাদ পাইলেন—পাইয়াই আরল্ হার্টফোর্ডকে ত্রিশ সহস্র সৈন্য সহ অবিলম্বে ষ্টুয়ার্টের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ষ্টুয়ার্ট তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হইলেন। কিছু কাল উভয় পক্ষে অতি ঘোরতর রণ হইতে লাগিল। অবশেষে

ইংরাজেরা রণে ভঙ্গ দিয়া ইংরাজ সেনা-নিবেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিশ সহস্র ইংরাজ এই রণে হত হয়। ওয়ালেস দূর হইতে ষ্টুয়ার্টের বীরত্ব দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হইলেন—এবং বার বার হস্তকম্পন দ্বারা ষ্টুয়ার্টের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এডওয়ার্ড সংকল্প হইতে বিচলিত হইবার নহেন। তিনি আবার চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়া ক্রস্ ও বিসপ্ বেক্‌কে স্কটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবার ওয়ালেসের মন কাতর হইল—ভাবী জাতীয় অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত দোলায়মান হইল। একবার ইচ্ছা করিলেন অভিমানকে পদদলিত করিয়া জাতীয় কার্য্যে আত্মাহুতি প্রদান করেন, কিন্তু এবার অভিমান স্বদেশানুরাগকে পরাজিত করিল। তিনি গ্যারিবলডীর ন্যায় বলিতে পারিলেন না যে সামান্য পদাতিকরূপেও যদি জাতীয় কার্য্য করিতে পারি তাহা হইলেও আপনার জীবন সার্থক মনে করিব। এস্থলে গ্যারি-বলডীর সহিত ওয়ালেসের তুলনা হয় না। তিনি কোন্ প্রাণে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার ভার বিলাস-লালিত অদূরদর্শী ষ্টুয়ার্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া সাংখ্যপুরুষের ন্যায় উদাসীনভাবে দূরে দাঁড়াইয়া জাতীয় বলক্ষয় দেখিতে লাগিলেন? না ওয়ালেস্! তোমার জীবনের সমস্ত কার্য্যের সহিত আজিকার ব্যবহারের সঙ্গতি নাই। তুমি যে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আজীবন সর্ব্বসুখে স্বেচ্ছাবঞ্চিত, আজ তার অভিমানের দাস হইয়া সেই জাতীয় স্বাধীনতারত্নকে করে পাইয়াও মত্তমাতঙ্গের পদতলে প্রক্ষেপ করিলে? অথবা তোমার কি দোষ! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে?

ক্রস্ ও বেকের আগমনে কাপুরুষ কিউমিন্ সর্ব্বাগ্রেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু বীরবর ষ্টুয়ার্ট ও তদীয় বীরসৈন্যদল দেহে প্রাণ থাকিতে রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। ষ্টুয়ার্ট নিজের রক্তে ও নিজ সৈন্যগণের রক্তে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সেই বীরবৃন্দের দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া, গেল তথাপি পদস্খলন হইল না। ক্ষত্রিয় সেনার ন্যায় তাহারা অটল ভাবে দাঁড়াইয়া বীরোচিত মৃত্যুকে অলিঙ্গন করিলেন, একবারও পশ্চাৎপদ হইলেন না। সাধু ষ্টুয়ার্ট, ধন্য তোমার বীরত্ব! অদ্ভুত তোমার প্রায়শ্চিত্ত!

পলাইয়া অদূরবর্ত্তী টর্‌উড্ অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা ভিন্ন ওয়ালেস্ ও তৎসৈন্যদলের এখন আর উপায়ান্তর রহিল না। ভাবিবার চিন্তিবার আর সময় নাই। ওয়ালেস্ নিমেষমধ্যে সসৈন্যে তীরবেগে এডওয়ার্ডের সৈন্য ভেদ করিয়া টর্‌উড্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এত দ্রুত এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে ওয়ালেস্ ব্যূহ ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর

এড্ওয়ার্ড সবিশেষ জানিতে পারিলেন। অশ্বখুরোত্থিত ধূলিরাশিতে চতুর্দ্দিক্ এরূপ অন্ধকারচ্ছন্ন হইয়াছিল যে ওয়ালেসের সমস্ত সৈন্য চলিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে প্রকৃত ঘটনা কেহই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যেমন একটি দুর্জ্জয় ঘূর্ণবায়ু সম্মুখবর্ত্তী জড় অজড় সমস্ত পদার্থকে উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ওয়ালেস্ ও তদীয় সেনা প্রতিকূলবর্ত্তিনী বিপক্ষসেনাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। ওয়ালেস্ গ্রেহাম্ এবং লডর্ তিনশত বাছাই সৈন্য লইয়া অনুসরণকারী শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে করিতে অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ক্রস্ বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া পলায়মান স্বদেশীয়গণের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। ওয়ালেস্ আপনার বাছাই সৈন্যকে প্রধান সেনার সহিত মিলিত হইবার আদেশ দিয়া গ্রেহাম ও লডার্ মাত্রকে সহায় করিয়া শত্রুদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিলেন—যে তাঁহার প্রচণ্ড খড়্গের পরিসরের মধ্যে আসিতে লাগিল, সেই শমন-সদনে প্রেরিত হইল। অবশেষে ক্রস্ স্বয়ং ওয়ালেসের গলদেশ লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। ওয়ালেস্ ক্ষত স্থান হইতে বর্শা উত্তোলিত করিয়া তাহাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিলেন—এদিকে গ্রেহাম্ ও লডর্ অদ্ভুত বীরত্ব সহকারে শত্রুগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস্ অনতিবিলম্বেই তিনশত সৈন্য লইয়া গ্রেহাম্ ও লডরের সাহায্যে আসিলেন। এদিকে বিসপবেক্ তাঁহার সৈন্য সহ ক্রসের সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্রস্ আবার ওয়ালেসের বিরুদ্ধে বর্শা প্রক্ষেপ করিলেন—কিন্তু এবার তাঁহার লক্ষ্য ব্যর্থ হইল। ওয়ালেস্ ক্রোধে অন্ধ হইয়া প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে ক্রস্‌কে ভূপাতিত করিলেন। ক্রসের সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিত করিল। ওয়ালেস্ দৃপ্তসিংহের ন্যায় একাকী সেই রণমুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন। গ্রেহাম্ অচিরকালমধ্যে তাঁহার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই তিনি প্রচণ্ড-অসি-প্রহারে ক্রসের সম্মুখবর্ত্তী ইংরাজকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ইহা দেখিয়া আর এক জন ইংরাজ নাইট্ বেগে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বেগে বর্শা নিক্ষেপ করিল। গ্রেহাম্ পদদলিত ফণীর ন্যায় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া খড়্গের একাঘাতে তাহার দেহ দ্বিধা বিখণ্ডিত করিলেন। কিন্তু এই তাঁহার শেষ প্রহার। নিয়তি সম্মুখবর্ত্তিনী দেখিয়া তিনি প্রধান সেনার সহিত মিলিত হইবার জন্যে তদভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই তাহার অশ্ব হত, ও মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। স্কট্‌লণ্ডের পূর্ণশশধর রাহুগ্রস্ত হইল।

ওয়ালেস শোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তিনি শত্রু-

সৈন্যবল আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যাহাকে সম্মুখে পাইলেন তাহাকেই হত্যা করিতে লাগিলেন। গ্রেহামের মৃত দেহের উপর তাঁহার অগ্নি-উদ্গারী নয়ন পড়িতে লাগিল—আর বৈদ্যুতিক বেগে তাঁহার শিরায় শিরায় রক্ত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। ব্রূস ওয়ালেসের এই শোকান্ধতার সুবিধা লইবার জন্য তাঁহার বর্ষাধারী সৈন্যগণকে ওয়ালেসের অশ্ব লক্ষ্য করিয়া বর্ষা প্রক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। তাহাদের বর্ষাঘাতে তাঁহার অশ্ব আহত হইল। তখন ওয়ালেসের চৈতন্য হইল। তিনি অশ্বের বল থাকিতে থাকিতে তাহাকে বেগে চালাইয়া নিজসৈন্য মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। তাহারা ক্যারন নদীর তীরে দাঁড়াইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। ওয়ালেস আসিয়াই তাহাদিগকে নদী পার হইতে আদেশ দিলেন; স্বয়ং সর্ব্বপশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। প্রভুপরায়ণ অশ্ব প্রভুকে অপর পারে আনিয়া দিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। যে পড়িল, সেই মরিল। তৎক্ষণাৎ কার্লে তাঁহার জন্য আর একটী ঘোটক আনিয়া দিল। ওয়ালেস তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজসৈন্য মধ্যে আসিয়া মিলিত হইলেন। এই ফলকার্ক-কুরুক্ষেত্রে ত্রিশ সহস্র ইংরাজ সৈন্য নিহত হয়। অন্য দিকে সার জন্ গ্রেহাম ও পঞ্চদশ জন মাত্র স্কট পদাতিক বীর হত হয়েন। ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অসংখ্য ইংরাজ পরিবারে ভীষণ শোকধ্বনি উঠিল।

ওয়ালেসের সৈন্যগণ টরউড অরণ্যে গমন করিল, কিন্তু তিনি ও কার্লে ক্যারন্ নদীর তীরে কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন; ওপারে ফলকার্ক-ক্ষেত্রে প্রিয়বন্ধু গ্রেহামের শব পতিত রহিয়াছে বলিয়া ওয়ালেসের হৃদয় দূরে যাইতে ব্যথিত হইতে লাগিল। এদিকে ফল্‌কার্ক যুদ্ধে জয়লাভের পর ব্রূসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি দেখিলেন নিজের পদে নিজে কুঠারাঘাত করিয়াছেন—তখন বুঝিলেন ইংরাজগণের সহিত যোগ দিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। অনুশোচনায় এখন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন নদীর ওপার হইতে ওয়ালস্‌কে বন্ধুভাবে আহ্বান করিলেন। উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন রাজসিংহাসনে তাঁহার স্পৃহা নাই। তিনি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য এতদিন যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন; স্কট্‌লণ্ডের প্রকৃত রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে তিনি সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু রাজা হইয়া প্রজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা ব্রূসের পক্ষে অক্ষমণীয় অপরাধ হইয়াছে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করিলেন না। ব্রূসের হৃদয় ওয়ালেসের বাক্যে বিচলিত হইল। অবশেষে তাঁহারা পর দিন প্রত্যূষে ডনিডেসের গির্জ্জায়

মিলিত হইবেন বলিয়া পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া সে দিন আপন আপন শিবিরে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রত্যুষে ব্রুস দ্বাদশ জন স্কট্ সঙ্গে করিয়া ও ওয়ালেস দশ জন মাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবেন এরূপ অঙ্গীকার করিয়া গেলেন। ব্রুস ওয়ালেসের নিকট বিদায় লইয়া শশব্যস্তে এডওয়ার্ড-শিবিরে প্রস্থান করিলেন। তথায় রুধিরাক্ত হস্তেই সকলের সঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। একজন ইংরাজ পরিহাস করিয়া তাঁহাকে বলিল, "তোমরা—স্কটগণ—আপনার রক্ত আপনি খাও।" এই কথা তাঁহার হৃদয়ে শেল স্বরূপ বাজিল। তাহারা তাঁহাকে বার বার হস্তপ্রক্ষালন করিতে বলিল; কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন যে, "এ নিজের রক্ত, ধুইয়া ফেলিবার নহে"। সেই দিন হইতে ব্রুসের অসি স্কট্‌লণ্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয় নাই।

এদিকে ওয়ালেস্ টর্‌উড্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহার সৈন্যেরা আহারবিহারাদি করিয়া নিদ্রা গেল—তিনিও নিদ্রার্থী হইয়া শয্যায় গমন করিলেন। কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আসিল না—সহসা উঠিয়া বসিলেন। প্রিয়বন্ধু ও স্কটিশ বীরবৃন্দের মৃত দেহ ফল্‌কার্ক-রণক্ষেত্রে পড়িয়া আছে—এখনও সমাধি-নিহিত হয় নাই, এই মর্ম্মভেদী চিন্তা তাঁহাকে আকুলিত করিল। তিনি আরল্ ম্যাল্‌কম্, লণ্ডিন্, র‍্যাম্‌জে,লডর্, সীটন্, ও রিকার্টনের আডাম্, এই কয়-জনকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চ সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য সহ সেই রাত্রিতেই রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। পুঞ্জীকৃত শবরাশির মধ্যে হইতে বাছিয়া বাছিয়া স্কটিশ হত-বীরবৃন্দের দেহ বাহির করিলেন। যখন প্রিয়বন্ধু গ্রেহামের দেহ পাওয়া গেল, তখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সেই শব কোলে লইয়া কাঁদিতে ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে ও বিলাপে সকলেই কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে সকলে তাঁহার ক্রোড় হইতে সেই শব লইয়া ফল্‌কার্কের গির্জ্জায় সমাধি-নিহিত করিলেন।

প্রিয় বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হইলে পর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত দশজনমাত্র লোক সমভিব্যাহারে ডুনিপেসের গির্জ্জায় ব্রুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাকে তিনি ফল্‌কার্ক-ক্ষেত্রেই অবস্থিতি করিতে বলিলেন। ব্রুস যথাসময়েই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গ্রেহামের শোকে অভিভূত থাকায় ওয়ালেস্ ব্রুসের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী কর্কশ বাক্যে ব্রুসের হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন—"ওয়ালেস্! আর অধিক আমায় তিরস্কার করিও না, আমি আপনার কার্য্যেই আপনি দগ্ধ হইতেছি।" ব্রুসের এই আত্মদোষ স্বীকারে ওয়ালেসের অন্তরে তৎক্ষণাৎ ভাব-পরিবর্ত্তন হইল। ক্রোধ অপনীত হইয়া সহসা অন্তরে

ভক্তিভাবের উদয় হইল। সেই ক্ষণিক হৃদয়োচ্ছ্বাসে তিনি ব্রুসের পদতলে পতিত হইলেন। ব্রুস হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইলেন। ব্রুস বেদিসম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর তিনি স্বদেশীয়ের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিবেন না এবং এড্ওয়ার্ডের নিকট যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ আছেন, সেই প্রতিজ্ঞাকাল অতীত হইলেই তিনি ওয়ালেসের সহিত আসিয়া মিলিত হইবেন। পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া, ব্রুস এড্ওয়ার্ড-শিবিরে প্রস্থান করিলেন এবং ওয়ালেস্ নিজ সেনাসমীপে গমন করিলেন। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই ফল্কার্কের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ওয়ালেসের রণবিষয়িণী প্রতিভা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তিনি প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ না লইয়া সমরাঙ্গন হইতে অবসৃত হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। ফলকার্ক রণে জয়লাভ করিয়া এড্ওয়ার্ড সসৈন্য লিন্লিথ্গাউ নামক নগরে বিজয়োৎসব করিতেছিলেন। ওয়ালেস্ তাঁহার সৈন্যকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একদলের অধিনায়কত্বে ম্যাল্কমকে নিযুক্ত করিলেন, আর একদলের অধিনায়কত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। দুই জন দুই দল সৈন্য লইয়া দুই দিক্ হইতে সহসা ইংরাজ-শিবির আক্রমণ করিলেন। ইংরাজেরা এরূপ আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং অনেক ইংরাজ প্রথম আক্রমণেই শমনসদনে প্রেরিত হইল। ব্রুস আপনার সৈন্য লইয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন। এড্ওয়ার্ড বীরোচিত বিক্রমের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ওয়ালেস্ তাঁহার পতাকাধারীকে এক খড়্গাঘাতে ভূপাতিত করিলেন। পতাকা পতিত দেখিয়া ইংরাজসেনা ভয়ে পলায়ন করিল। এড্ওয়ার্ড স্বয়ং অগত্যা সেই পলায়মান সেনার সহিত যোগ দিলেন। একাদশ সহস্র ইংরাজদেহ লিন্লিথ্গাউ রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল। স্কটেরা তথাপি ক্ষান্ত নহে। সমস্ত স্কট্সেনা পলায়মান ইংরাজসেনার পশ্চাদ্গামী হইল। তাঁহাদিগের প্রচণ্ড অসিপ্রহারে চল্লিশ সহস্র ইংরাজসৈন্য পলায়নপথে নিহত হইল। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া এড্ওয়ার্ড সল্ওয়ে উত্তরণপূর্ব্বক ইংলণ্ডে গিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

ওয়ালেস্ অনুসরণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আনাম্ দিয়া এডিন্বরায় আসিলেন; আসিয়া ক্রফোর্ডকে আবার ইহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ইংরাজ আক্রমণের পূর্ব্বে যিনি যে পদে নিযুক্ত ছিলেন, জীবিত ব্যক্তিমাত্রকেই সেই সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। সমস্ত স্কট্লণ্ডে আবার বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। ডণ্ডীদুর্গ স্ক্রিমজওর কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইল।

অবসর বুঝিয়া ওয়ালেস্ সেণ্ট জন্‌ষ্টন নগরে একটী পার্লেমেণ্ট আহ্বান

করিলেন। পার্লেমেণ্টের সভাগণ স্ব স্ব আসনে সমাসীন হইলে ওয়ালেস্ সর্ব্ব-সমক্ষে নিজের গবর্ণরত্ব পদ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, জমিদারশ্রেণী তাঁহার প্রতি যখন অসূয়া-পরবশ, তখন তিনি আর সে পদে থাকিতে ইচ্ছা করেন না। বলিলেন তিনি ফল্‌কার্ক-রণক্ষেত্রে যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছেন—দেশের জন্য যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার বিনিময়ে যথেষ্ট অপমান ও তিরস্কার প্রতিদান পাইয়াছেন। এক্ষণে তিনি স্কট্‌লণ্ডকে আবার শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এইবার তিনি জন্মভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ফ্রান্স যাত্রা করিবেন। তথায় গিয়া যেরূপে হউক জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইবেন। বৃথা পার্লেমেণ্ট তাঁহাকে এ উদ্যম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন। ওয়ালেসের সঙ্কল্প বিচলিত হইবার নহে। ওয়ালেস্ দেখিলেন যত দিন স্কট্‌লণ্ডের রাজসিংহাসন লইয়া সামন্তবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিবে, যতদিন স্বার্থান্ধ সঙ্কীর্ণচেতা জমিদারেরা তাঁহার প্রতি অসূয়া-পরতন্ত্র থাকিবেন, যতদিন স্কট্‌লণ্ডের প্রকৃত রাজা ব্রুশ আত্মখ্যাপন না করিবেন, ততদিন স্কট্‌লণ্ডকে চিরস্থায়িরূপে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করা অসম্ভব। সুতরাং তিনি স্বদেশে থাকিয়া স্বদেশের বার বার অধঃপতন দেখিতে অক্ষম। যদি কখন দিন আইসে, আবার স্বদেশের উদ্ধারের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিবেন। এই বলিয়া তিনি পার্লেমেণ্টের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সাশ্রুলোচনে অষ্টাদশমাত্র সহচর সমভিব্যাহারে ফ্রান্স যাত্রা করিলেন। স্কটলণ্ডের সুখসূর্য্য কিছুকালের জন্য অস্তমিত হইল!

যে অষ্টাদশ জন লোক ওয়ালেসের সঙ্গে গমন করিলেন-তাঁহাদের মধ্যে লণ্ড্‌ ডিল্, সাইমন্, রিচার্ড ওয়ালেস্, সার্ টমাস্ গ্রে, এড্‌ওয়ার্ড লিটল্, জপ্, ও ক্রেয়ার্ প্রধান। এই স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত বীরদল কতিপয় বণিক সমভিব্যাহারে ডণ্ডীবন্দরে জাহাজে উঠিলেন। জাহাজ ইংলণ্ডের উপকূল বহিয়া চলিতে লাগিল। অদূরে লোহিত-পালরাজি-বিরাজিত ব্যাঘ্রধ্বজ একখানি জাহাজ সহসা দৃষ্টিগোচর হইল। বণিকগণ জানিত এ কাহার জাহাজ। তাহারা ওয়ালেস্‌কে বলিল যে এ লীনের জনের জাহাজ। এই দুর্দান্ত ইংরাজসৈন্য স্কটলণ্ডবাসীকে বধ করা পুণ্য বলিয়া মনে করিত। দেখিতে দেখিতে জন্ ওয়ালেসের জাহাজের পার্শ্ববর্ত্তী হইল। আসিয়াই সে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া স্কট্‌গণকে যুদ্ধার্থ অহ্বান করিল। সেই আহ্বানের প্রত্যুত্তরে ক্রেয়ারের ধনু হইতে তিন শর প্রক্ষিপ্ত হইল। এক এক শরে এক এক জন ইংরাজ নিহত হইল। ইংরাজেরা ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া একঘণ্টাকাল অবিরাম গোলা ও তীরবর্ষণ করিতে লাগিল। শেষে উভয়দলে হস্তাহস্তি ও ধড়্‌পাকড়্‌ গি

হইতে লাগিল। ক্রমে ষাইট জন ইংরাজ স্কটগণের হস্তে পতিত হইল। জন্ পলাইবার উপক্রম করিতেছিল দেখিয়া ক্রফোর্ড তাহার মাস্তুলে অগ্নিপ্রদান করিলেন, এবং ওয়ালেস্ লঙ্‌ভিল্ ও ক্রেয়ার্ তাহাকে ধরিয়া আপনাদিগের জাহাজে তুলিলেন। ওয়ালেসের এক খড়্গাঘাতে সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে অগ্নানলও নির্ব্বাপিত হইল। সংবাদ দিবার জন্য একজনও নাবিক দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিল না। তখন স্কটেরা দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থজাত পরিপূর্ণ সেই জাহাজখানি সঙ্গে লইয়া ফ্রান্সের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রুইস বন্দরে উপনীত হইয়া ওয়ালেস্ দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থজাত লইয়া জাহাজখানি সঙ্গী বণিক্‌গণকে প্রদান করিলেন। ওয়ালেস তৎপরে ফ্লাণ্ডার্সের মধ্য দিয়া ফ্রান্সে গমন করিলেন। পারিস রাজধানীতে ফরাশি-রাজ মহাসমাদরে ওয়ালেস্‌কে গ্রহণ করিলেন।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

প্রতিবাদ।

গত ফাল্গুন মাসে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্ত্তী "বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া শ্রীশ—স্বাক্ষরকারী মহাশয় গত আশ্বিন মাসে "বঙ্গ বামার (প্রতিবাদ)" শীর্ষক একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আমরা তদ্বিরুদ্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ভাল করিয়া উহার প্রতিবাদ করিতে হইলে অত্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং তাহার তত আবশ্যকতাও নাই, এই জন্য আমরা স্থূল স্থূল কয়েকটী কথার মাত্র আলোচনা করিব। লক্ষ্মী নারায়ণ বাবু লিখিয়াছিলেন যে "স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না. কিন্তু তাহাদিগকে শিক্ষা দান করা উচিত এবং বাল্যবিবাহ রহিত ও বিধবাবিবাহ প্রচলন করা উচিত। প্রতিবাদকারী এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন "আমরা জানি প্রকৃত উদার শিক্ষার সহিত অধীনতার সামঞ্জস্য নাই।" "স্ত্রীজাতির অধীনতা সত্ত্বে এবং পুরুষজাতির যথেচ্ছাচারিতা সত্ত্বে বিধবাবিবাহ প্রচলন হওয়া দুঃসাধ্য। বিধবাগণ হাজার যন্ত্রণা পাউক, লেখকের মতে বাল্যবিবাহ বহু দোষের আকর হউক, কিন্তু যথেচ্ছাচারী পুরুষজাতি তাহা দেখিবে না। পুরুষজাতি আপনাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রবলা রাখিতে চাহেন এবং স্ত্রীজাতির অধীনতা বজায় রাখিতে

চাহেন।” প্রতিবাদকারীর এই কথাগুলি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে, প্রতিবাদকারের নিজের মতেরও বিপরীত হইয়াছে। শিক্ষার সহিত অধীনতার সামঞ্জস্য নাই—তবে শিক্ষা পাইলে কি মানব গোঁয়ার হয়? যে শিক্ষা পায়, সে যদি জানে, যে, ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের অধীন না থাকিলে আমার অস্তিত্ব থাকিবে না, অর্থাৎ আমি বাস্তবিক দুর্ব্বল, আমি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না, বরং তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে, এমন কি হয়ত তাহাতে আমার অস্তিত্বের লোপও হইতে পারে; তাহা হইলে সে কি অধীন থাকিতে স্বীকার করিবে না? তাহা যদি না করে, তবে সে কিছুই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। বাস্তবিক আমরা দেখিতেছি মানব শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সময় বিশেষে শান্ত-ভাবে অধীন থাকিতে স্বীকার করে। কেননা শিক্ষাবলে আমরা আত্মবল বুঝিতে পারি, যাহার অধীনে আছি তাহার বল বুঝিতে পারি এবং উভয় বলের তুলনা করিতে পারি। তাহাতে যদি বুঝিতে পারি যে আত্মবল বিরুদ্ধ বল অপেক্ষা অনেক অল্প, তথন শান্ত ভাবে অধীনতা স্বীকার করি। তবে অবশ্য বলবৃদ্ধির চেষ্টা পাই। নব্য বঙ্গবাসী প্রধানতঃ ঐ কারণে ইংরাজের অধীন রহিয়াছে, এবং উহা বুঝিতে পারে নাই বলিয়া নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে জনকয়েক সামান্য হীনজাতি মুসলমান জুটিয়া বেড়া দিয়া কেল্লা প্রস্তুত করিয়া ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং ফাঁকা তোপের আওয়াজ, শুনিয়াই “গুলি খাডালা” বলিয়াছিল। যদি তাহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে কখনই এরূপ ভাবে এরূপ বৃহৎ বলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। আমাদের বোধ হয় প্রতিবাদ-কার শিক্ষা কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের বোধ হয় এক্ষণে নব্য যুবকেরা যাহাকে শিক্ষা বলেন, অর্থাৎ ২।৪ খানি ইংরাজি পুস্তক পড়িয়া বিনা বিচারে ইংরাজি রীতি নীতির পক্ষপাতী হওয়াকে প্রতিবাদ-কার শিক্ষা বলিয়াছেন। তাহা যদি হয় তবে আমরা একবার নহে, সহস্র বার বলিব স্ত্রীজাতির শিক্ষা নিতান্ত অবিধেয়। ঐ জন্য মানবতত্ত্বে এক্ষণে স্ত্রী-জাতির শিক্ষার প্রতি উদাসীন ভাব দেখান হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক উহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে না। সত্য জ্ঞাত হওয়ার নাম প্রকৃত শিক্ষা। ঐ শিক্ষা-বলে যদি নারী সত্যজ্ঞ হয় অর্থাৎ তাহারা যদি জানে যে তাহারা প্রাকৃতিক দুর্ব্বল ও প্রাকৃতিক অধীন, তবে কেন তাহারা অধীন থাকিতে স্বীকার করিবে না? তবে যদি তাহারা জানে যে তাহারা স্বাভাবিক দুর্ব্বল ও স্বাভাবিক অধীন নহে, তাহা হইলে তাহারা অবশ্য অধীন থাকিতে স্বীকার

করিবে না। কিন্তু প্রতিবাদকার তাহা বলিতেছেন না। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার মর্ম্ম এই যে ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক, শিক্ষা পাইলেই সে স্বাধীন হইবে। আমরা তাহার মর্ম্মবোধে অক্ষম। তিনি আবার বলিতেছেন "স্ত্রী-জাতির অধীনতা ইত্যাদি" অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন স্ত্রীজাতি হাজার কষ্ট পাউক, যতদিন তাহারা পুরুষের অধীন থাকিবে ততদিন কখনই পুরুষ স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়িবে না; অতএব স্ত্রীর স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এ কথার অর্থ আমরা আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। কেননা পুরুষ যখন স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হইবে না, তখন সে তাহাকে স্বাধীনতা দিবে কেন? আমি ভিক্ষুককে যখন যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে পারি না, তখন সর্ব্বস্ব দান করিতে পারি? যে পুরুষ স্ত্রীর কিঞ্চিৎ দুঃখ দূর করিতে চাহে না, সে সমস্ত দূর করিবে? প্রতিবাদকারের যদি প্রকৃতই এরূপ বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে পুরুষ সমাজে এ কথা উল্লেখ করাই নিতান্ত অযৌক্তিক। তিনি এ কথা স্ত্রীদিগকে বলিতে পারেন। তিনি বলুন, হে স্ত্রীগণ তোমরা যতদিন পুরুষের অধীন থাকিবে, ততদিন তোমাদের সুখের আশা নাই; অতএব তোমরা আত্মবলে ঐ অধীনতা-বন্ধন ছেদন করিতে যত্নবান হও। পুরুষের কিঞ্চিৎ সাহায্য পাওয়ার আশাও ইহাতে সম্ভব নহে। কিন্তু প্রতিবাদকার কি ইহা সম্ভব মনে করেন? এই পৃথিবীতে যে স্ত্রী স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে, তাহা কে তুলিয়াছে? পুরুষে তুলিয়াছে, না স্ত্রী তুলিয়াছে? অবশ্য বলিতে হইবে ইহার প্রথম ও অধিক চেষ্টা পুরুষের দ্বারাই হইয়াছে। অবশ্য পুরুষের নিকট শিক্ষা করিয়া স্ত্রী পরে ইহার সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু পুরুষ যদি চেষ্টা না করিত, তাহা হইলে কখনই স্ত্রী ইহার চেষ্টা করিতে পারিত না। যখন পুরুষ পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছে, তখন সামান্য অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিবে না তাহার অর্থ কি? যদি না করে তবে কোন চেষ্টাই পুরুষে করিবে না—স্ত্রীকে একাকী তাহা করিতে হইবে। যখন তাহারা নিজ চেষ্টায় স্বাধীন হইবে, তখন আপনা হইতেই পুরুষের প্রভুতা দূরীকৃত হইবে। তজ্জন্য প্রতিবাদকারের বা কাহারও অনুরোধ বক্তৃতা বা প্রবন্ধ লিখিতে হইবে না। লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন "পুরুষের আকৃতি প্রকৃতি স্ত্রীজাতির আকৃতি প্রকৃতি হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতাই স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থার তারতম্যের কারণ।" ইহার উত্তরে প্রতিবাদকার লিখিয়াছেন "এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, কে কাহার কারণ? স্ত্রী-জাতির আকৃতি প্রকৃতি সামাজিক বিভিন্নতার কারণ, না সামাজিক

বিভিন্নতা আকৃতি প্রকৃতির বিভিন্নতার কারণ?" প্রতিবাদকারের এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। কেননা তিনি বিবেচনা করিয়াছেন সামাজিক বিভিন্নতাই আকৃতি প্রকৃতি ভেদের কারণ? যে গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব জন্য স্ত্রীজাতি দুর্ব্বলা, যে সন্তান প্রসব ও সন্তানদিগকে স্তন্য দান জন্য স্ত্রীজাতি দুর্ব্বলা, তাহা কি পুরুষের সামাজিক বিভিন্নতা হইতে উৎপন্ন? স্ত্রীজাতির কোমল দেহ ও কোমল মন এবং দেহের খর্ব্বতা কি সামাজিক অত্যাচার হইতে হইয়াছে? স্ত্রীজাতির স্নেহ ও লজ্জা কি সামাজিক বিভিন্নতা হইতে উৎপন্ন? যদি পুরুষের ন্যায় স্ত্রীকে সকল প্রকার কার্য্য করিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে কি স্ত্রীজাতি গর্ভধারণাদি করিত না? তাহা হইলে কি তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি সমস্ত পুরুষের ন্যায় হইত? যদি প্রতিবাদকারী এরূপ ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা বোধ করি তাহার উত্তর দিতে হইবে না। ইহা প্রমাণের ভার তাঁহার উপর। কোমৎ যেরূপ বলিয়াছেন যে, কালে সন্তান লাভ করিবার জন্য আর স্ত্রী পুরুষের সংমিলন আবশ্যক করিবে না, সেইরূপ প্রতিবাদকারী যদি বুঝাইয়া দিতে পারেন যে কেবল পুরুষের চেষ্টা হইতেই স্ত্রীজাতির গর্ভধারণাদি শক্তি জন্মিয়াছে, তাহা হইলে অবশ্য নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু এ কথাও তাঁহার বলিবার যো নাই। কেননা তিনি নিজে লিখিতেছেন "স্ত্রীজাতির শারীরিক অসমর্থতা পুরুষ অপেক্ষা ন্যূনতর। সেই জন্যই বোধ হয় সকল সমাজের আদিকাল হইতে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন হইয়া পড়িয়াছে।" লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন ইনিও তাহাই বলিলেন। যে কথার প্রতিবাদের জন্য এত প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা আপনিই বলিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কি বলা হইল না যে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কিন্তু বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণ সত্য? লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন "যে কারণে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন হইতে হইয়াছে, সেই কারণেই তাহাদিগকে চিরদিন পুরুষের অধীন থাকিতে হইবে।" অর্থাৎ যে প্রাকৃতিক বিভিন্নতা হেতু স্ত্রী আদিম কাল হইতে পুরুষের অধীনত্ব স্বীকার করিয়াছে, সেই প্রাকৃতিক বিভিন্নতা যখন চিরকাল থাকিবে তখন তাহাকে চিরকালই পুরুষের অধীন থাকিতে হইবে। ইহার উত্তরে প্রতিবাদকারী বলিয়াছেন "ইটালী এক কালে অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল, গ্রীসও এক কালে তুর্কির অধীন ছিল। কেহ কি বলিয়াছিল, যে কারণে তাহাদিগকে অধীন হইতে হইয়াছিল, সেই কারণে তাহাদিগকে অধীন থাকিতে হইবে?" আমরা বুঝিতে পারিলাম না যে প্রতিবাদকারী কি ভাবিয়া এই তুলনা

দিলেন। তিনি কি জানেন না যে ইতালী ও গ্রীশ একদিন পৃথিবীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিল? স্ত্রীজাতি কি কখনও সেরূপ ছিল? অবশ্য বলিবেন—না। বলিবেন কেন—বলিয়াছেন, স্পষ্টই বলিয়াছেন, আদিম কাল হইতে স্ত্রী পুরুষের অধীন। তবে ইতালী গ্রীসের সহিত তাহার তুলনা দিলেন কেন? ইতালী গ্রীশ বড় ছিল, বিশেষ কারণ বশতঃ ছোট হইয়াছিল; যেমন সে কারণ গত হইল অমনি সে বড় হইল। যে কারণে তাহারা অধীন হইয়াছিল সেই কারণ যদি চির কাল বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে তাহাদিগকেও চিরকাল অধীন থাকিতে হইত। তাহা না হইলেও স্ত্রীজাতির সহিত তাহাদের তুলনা খাটে না, কেননা তাহারা চিরকাল অধীন। যে কারণে অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিভিন্নতা অথবা প্রতিবাদকারীর মতে শারীরিক অসমর্থতা হেতু তাহারা অধীন হইয়াছে, সে কারণ যখন চিরদিন থাকিবে, তখন অবশ্যই স্ত্রীজাতি চিরকাল পুরুষের অধীন থাকিবে। প্রতিবাদকারী এই স্থলে একটী মজার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যদি বল স্ত্রীজাতি স্বভাবিক দুর্ব্বলা, তবে কথা এই, আমরা স্বভাবিক যাহাকে যেরূপ পাই তাহাকে সেই রূপ রাখাই কি উচিত?" ইহার মর্ম্ম এই যে যখন আমরা স্বাভাবিক সমস্ত পদার্থেরই উন্নতি সাধন করিতেছি, তখন স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিব না কেন? তাহা যদি করা হইল তবে স্ত্রীজাতির স্বভাবিক যে হীনতা ছিল তাহা দূর হইল। তখন অবশ্য স্ত্রী স্বাধীন হইবে, তখন স্ত্রী অবশ্য পুরুষের সমান হইবে। আমরা বোধ করি প্রতিবাদকার যখন ইহা লিখিয়াছিলেন তখন পৃথিবী স্ত্রীময়ী দেখিয়াছিলেন—পুরুষের সত্তা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। নচেৎ এরূপ লিখিবেন কেন? অবশ্য আমরা স্বীকার করি আমরা পদার্থসকলকে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে উন্নত করি, কিন্তু যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ পারি না। যে পদার্থ যেরূপ হইতে পারে তাহাকে ততদূর করিতে পারি—যাহা অসম্ভব তাহা পারি না। সে কথা দূরে যাউক। আদিম কালে স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ছিল এক্ষণে তাহা অপেক্ষা উন্নতি হইয়াছে—ক্রমে আরও উন্নতি হইবে। সেই উন্নতিতে কি পুরুষের সহিত সমান হইবে? প্রতিবাদকার কি পুরুষকে সর্ষপ তৈল নাসিকায় প্রদান করিয়া গাঢ় নিদ্রা যাইতে পরামর্শ দিতেছেন? তাহা না হইলে স্ত্রী কি প্রকারে পুরুষের সমান হইবে? পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা যখন অধিক শক্তিমান, আর যখন উভয়েরই উন্নতি হওয়া আবশ্যক, তখন যেমন স্ত্রী উন্নত হইবে, তেমনি পুরুষও উন্নত হইতে থাকিবে। আদিম বিভিন্নতা কিরূপে দূর হইবে? তবে যদি পুরুষ নিশ্চেষ্ট থাকে ও স্ত্রী উন্নতি করিতে থাকে তাহা হইলে স্ত্রী পুরুষের সমান হইতে পারে এবং ক্রমে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা প্রবল

হইবে, প্রতিবাদকারের কি এই অভিপ্রায়? আমাদের বোধ হয় প্রতিবাদকারী ভাবিয়াছেন, যেমন দেখা যাইতেছে হস্তী, সিংহ প্রভৃতি ইতর প্রাণী মনুষ্য অপেক্ষা অত্যন্ত বলবান, আদিমকালে মানব উহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। কিন্তু এক্ষণে মানব উন্নত হইয়া বুদ্ধিবলে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অধীন করিয়াছে। সেইরূপ পুরুষজাতি স্ত্রীজাতি অপেক্ষা বলবান হইলেও সমধিক বুদ্ধিবলে স্ত্রীজাতি পুরুষকে পরাস্ত করিবে। কেননা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে পুরুষ কেবল শারীরিক বলেই স্ত্রী অপেক্ষা প্রধান, মানসিক বলে নহে। তবে কি প্রতিবাদকারী মনে করিয়াছেন মানব ও ইতর জন্তুতে যে প্রভেদ স্ত্রী ও পুরুষে সেইরূপ প্রভেদ? অথবা পুরুষ যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করিবে স্ত্রী তাহা অপেক্ষা অধিক উন্নত হইবে? তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীনতাবাদ থাকিল কৈ? কেননা তাহা হইলে স্ত্রী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে যেমন পুরুষের সমান হইবে তেমনি কালে আবার পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। তখন পুরুষকে স্ত্রীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ তাহা যদি সত্য হয় তবে পুরুষ অপেক্ষা যে স্ত্রীজাতির বুদ্ধি সমধিক তীক্ষ্ণ তাহা তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা তিনি পারেন নাই, পারিবেনও যে না তাহা তাঁহার লেখা দেখিয়া বুঝা যাইতেছে। কেননা তিনি বলিয়াছেন "আমরা জিজ্ঞাসা করি স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি কি পুরুষের মানসিক শক্তি অপেক্ষা হীনতর? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা এক্ষণে দুরূহ।" ইহা দ্বারা তাঁহার ইহা বলা হইল যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর মানসিক শক্তি দুর্ব্বল নহে। আমরা তর্ক জন্য স্বীকার করিলাম মানসিক শক্তিতে উভয়ে সমান। কিন্তু তিনি যখন নিজে বলিয়াছেন স্ত্রীর শারীরিক শক্তি পুরুষ অপেক্ষা হীনতর, তখন সে হীনতা কি প্রকারে অপনীত হইবে? শারীরিক ও মানসিক ভেদে দুই প্রকার শক্তি। তন্মধ্যে এক শক্তি উভয়ের সমান ও অপর শক্তি একের অধিক ও অন্যের অল্প। এস্থলে কাহার সাহায্যে অল্প শক্তি অধিক শক্তির তুল্য হইবে এবং যে এক বিষয়ে হীন সে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কেন না হইবে?

পরিশেষে প্রতিবাদকারী বলিতেছেন "শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অসমর্থতা থাকিলেই যে সেই জাতিকে অধীনস্থ করা উচিত, একথা কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না।" কেন যে স্বীকার করা যাইতে পারে না তাহা কিছু বলেন নাই এবং উচিত অনুচিত কাহাকে বলে তাহারও কোন লক্ষণ করেন নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমরাও কিছু বলিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিব, উচিত হউক বা অনুচিত হউক বলিতে পারি না, সর্ব্বত্র এই দেখা যাইতেছে যে, অধিক শক্তিমানেরই সর্ব্বত্র জয়। আজি কালি

যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে যাহার শক্তি অল্প সে জীবন ধারণোপযোগী অন্নমাত্রের জন্য লালায়িত স্বাধীনতা ত দূরের কথা। তিনি উদাহরণের স্বরূপে বলিয়াছেন বল থাকিলেই যদি দুর্ব্বলকে অধীন হইতে হয় তবে পঞ্জাবী বাঙ্গালীকে অধীন করিত এবং বলবান ছোট ভাই দুর্ব্বল দাদাকে অধীন করিত। তাহা কি করে না? যদি না করে তবে ইটালী গ্রীস পরাধীন হইল কেন? যবন ও ইংরাজ ভারতবাসীকে অধীন করিল কেন? যেথানে বড় দাদা কার্য্যে অপটু বা অক্ষম সেথানে ছোট ভাই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করে কেন? তবে তিনি বলিবেন যথন গ্রীস ইটালী পরাধীন হইয়াছিল তথন তাহারা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিল কেন? অবশ্য আমরা বলিব যে তাহারা জানে যে তাহারা স্বাভাবিক অকর্ম্মণ্য নহে, এককালে বড় ছিল। পুনবায় চেষ্টা করিলে বড় হইতে পারিবে। অনুচিত বলিয়া কোন প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে অধীন করিতে ছাড়ে না। প্রতিবাদকারী হিতোপদেশ দিয়া কি ইংরাজকে স্বদেশে পাঠাইতে পারেন? এ সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে উচিত অনুচিত, সম্ভব অসম্ভবের উপর নির্ভর করে। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে পুরুষ স্ত্রীজাতির উপর অত্যাচার করিবে। আমরা বলিতেছি স্ত্রী স্বাধীন হইতে পারে না। অর্থাৎ স্ত্রীজাতির পুরুষের মত বিরুদ্ধ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন "স্ত্রী পুরুষ মিশ্রণ কদাচ কল্যাণকর নহে।" তাহার উত্তরে প্রতিবাদকারী বলিয়াছেন "সমাজের সমধিক বল থাকিলে কি স্ত্রী পুরুষ সংমিশ্রণে অকল্যান ঘটে?" একথায় তাঁহার স্বাধীনতাবাদ কি রূপ রক্ষিত হইল বুঝিতে পারিলাম না কেননা তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার অর্থ এই যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত স্ত্রী পুরুষ স্বাভাবিক প্রকৃতি প্রেরিত হইয়া যে ক্ষতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে সমাজ দৃঢ়শাসনে তাহা নিবারিত করিয়া তাহাদিগকে শাসন করিবেন। তাহা হইলে স্বাধীনতা থাকিল কোথায়? যে স্বাধীনতার জন্য এত প্রয়াস তাহা থাকিল কৈ? সমাজের শাসন ভয়ে বা দৌরাত্ম্যে যথন প্রত্যেক নর নারীকে ঈপ্সিত কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে হইল তথন আর স্বাধীনতা থাকিল কি প্রকারে? লাভে হইতে মানব সমাজের কষ্টের সীমা থাকিবে না। কেননা কেহ যদি নিতান্ত লোভনীয় পদার্থ সকল তোমার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলে যে সাবধান এই পদার্থ কেহ লইওনা যদি লও তবে লগুড়প্রহারে তোমার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিব। তোমার মন ঐ সকল মনোমুগ্ধকর পদার্থের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিয়ত তৎগ্রহণে লোলুপ, কেবল প্রহারভয়ে নিরস্ত রহিয়াছে, দুই একবার অদম্য প্রবৃত্তির উত্তেজনায় অগ্রসর হইতেছে আবার প্রহারভয়ে পশ্চাৎপদ

হইতেছে। এরূপ অব্যস্থা কি বিষম যন্ত্রণা- দায়ক নহে? ঐ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া হয়ত ঐ পদার্থ গ্রহণ করিলে ও প্রহারজ্বালায় জর্জ্জরিত হইলে। এই বিষম অবস্থা ভাল কি ঐ পদার্থ আদৌ না দেখিতে পাওয়া ভাল? সামান্য স্বাধীনতা প্রদান করিয়া সমধিক স্বাধীনতা হরণ করা অপেক্ষা সে স্বাধীনতা না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর এক কথা এই যে এরূপ অবস্থায় সমাজের সমধিক বল হইতে পারে কি না? কেননা সমাজত মনুষ্যসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নয়? যখন অধিকাংশ মনুষ্যই কোন না কোন সময়ে ঐরূপ দৃঢ় শাসনের কষ্ট একবার না একবার বুঝিতে পারিবে তখন মানব এরূপ দৃঢ় শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবে কেন? প্রতিবাদকার আরও বলেন যখন স্ত্রীস্বাধীন সমাজে স্ত্রীজাতি অধিকতর বলবতী ও সাহসিনী হইবে তখন স্ত্রী কি পুরুষ মিশ্রণ অকল্যাণ- কর হইবে?" আমাদের বোধ হয় প্রতি- বাদকারী ভাবিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষ মিশ্রণ হইলে কেবল পুরুষের অত্যাচার দ্বারাই অমঙ্গল হইবে, স্ত্রীজাতির কোন অত্যাচার বা কোন দোষ সম্ভাবিতে পারেনা। তিনি কি ভাবিয়াছেন স্ত্রীজাতির ইন্দ্রিয় বা কিছু নাই। তাহা যদি না থাকে তবে বিধবা বিবাহ দেওয়ার এত চেষ্টা কেন? তাঁহার লেখা দেখিলে এক এক বার ঐরূপই বোধ হয়, কেন না তিনি বরাবরই পুরুষের বেলা যথেচ্ছা- চার ও স্ত্রীর বেলা স্বাধীনতা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি কি মনে করিয়াছেন পুরুষ যেমন স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া যথেচ্ছাচারী হইয়াছে স্ত্রী কি সেই রূপ স্বাধীনতা পাইলে যথেচ্ছাচারিণী হইবে না? যদি এরূপ ভাবিয়া থাকেন তাহা হইলে "স্বাধীনতা" ও "যথেচ্ছা- চারের" কি বিভিন্নতা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন "অধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারিতার সামঞ্জস্য আছে স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারিতার সামঞ্জস্য হইতে পারে না।" আমরা ইহার অর্থ আদৌ বুঝিতে পরিলাম না, আমরা জানি স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতার কোনও ভেদ নাই। কেন না শব্দের বুৎপত্তি ধরিলেও উহার অর্থ এক হয় এবং প্রচলিত ব্যবহার ধরিলেও অর্থ এক হয়। কেননা এক্ষণকার লোকেরা বলেন অন্যায় ইচ্ছা করাকে যথেচ্ছাচার ও ন্যায্য ইচ্ছা চরিতার্থ করাকে স্বাধীনতা বলে। কিন্তু ন্যায় অন্যায় কাহাকে বলে তাহার যখন স্থিরতা নাই, আমার ইচ্ছা অন্যায় হইলেও যখন আমার নিকট ন্যায় বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন তদনুসারে কার্য্য করিলে অবশ্য আমার স্বাধীনতা হইবে। আবার উহা যাঁহারা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করেন তাঁহাদের নিকট উহা যথেচ্ছাচার বলিয়া প্রতীত হইবে। যখন এক্ষণকার বিধান এই যে যাহা ন্যায্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মবে

তাহা সাধন করিতে পৃথিবী রসাতলে যাউক না কেন তাহা দেখার আবশ্যক করে না, কেন না সকলেরই স্বাধীনতা আছে, তখন স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারে প্রভেদ কি থাকিল? যদি বল উহা স্বাধীনতা নহে, যাহা প্রকৃত ন্যায্য তাহা সম্পন্ন করিবার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে, তাহা হইলে প্রকৃত ন্যায্যের লক্ষণ কি বলিয়া দেও। এবং তাহা হইলে আর স্বাধীনতা থাকিল কৈ, তাহা হইলেত সকলকেই ঐ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে বাধ্য করা হইল। অতএব অগ্রে স্বাধীনতা ও যথেচ্ছারিতার প্রভেদ স্থির হউক তবে পুরুষদিগের যথেচ্ছাচারিতা ও স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা প্রদান চেষ্টা করিবেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন "রমণীগণ পুরুষবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রা হইলে পদে পদে তাহাদের বিপদ ঘটিবে।" তাহার উত্তরে প্রতিবাদকারী বলিয়াছেন "স্ত্রীজাতি স্বাধীন হইলেই যে পুরুষাবলম্বন পরিত্যক্ত হইবে, এরূপ অসম্ভব; যেহেতু স্ত্রীর সহিত পুরুষের কতকগুলি প্রাকৃতিক সম্বন্ধ আছে।" আমরা বোধ করি এ উত্তর সঙ্গত হয় নাই। কেননা প্রাকৃতিক সম্বন্ধ পরস্পরের সহিত পরস্পরের আছে। তবে কিজন্য পুরুষ স্ত্রীর ভরণপোষণ করিবে? কি জন্য পুরুষ স্ত্রীর অঙ্গজাত সন্তানের জন্য চিন্তিত হইবে? প্রাকৃতিক যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে পুরুষের স্ত্রী যেরূপ প্রয়োজন স্ত্রীরও পুরুষের সেইরূপ প্রয়োজন। তাহাতে একজন অধিক দায়গ্রস্থ হইবে কেন? পুরুষকে বড় আঁটিয়া ধর, না হয় সে নিজ ঔরসজাত সন্তানের ভরণপোষণের অর্দ্ধেক দিবে; বাকি অর্দ্ধেক ন্যায়ানুসারে স্ত্রীকেই দিতে হইবে। তাহা যদি হইল তবে আর স্ত্রীর পুরুষাবলম্বন থাকিল কৈ?

প্রতিবাদকারী কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "আপনাদিগের সহযোগিনী মহিলাগণকে পশুবৎ অধীনস্থ রাখিয়া তাহাদিগের আন্তরিক সৌন্দর্য্যের সুখসম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকা আপনাদিগেরই অসুখের কারণ বলিতে হইবে।" একথা লেখার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুত বলেন নাই, যে স্ত্রীজাতির উন্নতির চেষ্টা করিও না; বরং তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যাহাতে মহিলাদের উন্নতি হয় তাহা কর, তজ্জন্য তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। সুতরাং একথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বা বিরুদ্ধ। তিনি আর এক অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিয়া প্রবন্ধের বৃথা আকার বৃদ্ধি করিয়াছেন বা চাকচিক্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে সমাজ চিরকাল একভাবে থাকে না—চিরকাল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হউক তাহাতে সমাজের কিছু ক্ষতি

হয় না। স্ত্রীজাতি স্বাধীন হইলে সমাজের যে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই। একথা বলার কোন কারণ নাই, কেননা লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু কোন স্থলেই বলেন নাই যে সমাজের বিশৃঙ্খলা হইবে বলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। প্রতিবাদকারীর উক্ত সকল কথা সত্য কিনা তাহা আমরা এক্ষণে বলিব না। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এক্ষণে একাকী পুরুষ আপনার ও স্ত্রীর জীবিকা অর্জ্জন করেন, স্ত্রী স্বাধীন হইলে স্ত্রী উপার্জ্জন করিবে সুতরাং "পুরুষজাতির শ্রমের অনেক লাঘব হইবে।" একথাও অপ্রাসঙ্গিক; কেননা যদি স্ত্রী স্বাধীন হইতে না পারে তবে উক্ত উপকার কি প্রকারে হইবে? তবে যদি পুরুষকে প্রলোভন দেখান হয়, অর্থাৎ 'হে পুরুষ তুমি স্ত্রীকে স্বাধীন কর, তোমার শ্রমের অনেক লাঘব হইবে' সে ভিন্ন কথা। কিন্তু তিনি কি জানেন না যে পুরুষ ঐ শ্রমমূল্যে স্ত্রীর স্বাধীনতা ক্রয় করিয়াছে? যে স্ত্রী ঐ শ্রমমূল্য না লয় সে এখনও স্বাধীন। আমরা ভিন্ন প্রবন্ধে এ বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিব। "মানব তত্ত্বে" তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আছে। তিনি আবার বলিয়াছেন বাল্য-বিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি যখন পুরুষদিগকেও অসুখী করিতেছে তখন স্ত্রীস্বাধীনতার চেষ্টা না হয় কেন? একথা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক, কেননা লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু ঐ সকলের জন্য চেষ্টা করিতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। তবে প্রতিবাদকারী বলেন স্ত্রী স্বাধীন না হইলে উক্ত দোষ শোধিত হইবে না। তাহার উত্তর আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। প্রতিবাদকারী আর একটি পরস্পরবিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন "নারী-জাতির প্রকৃতির মধ্যে দেবভাব নিহিত আছে; মানব প্রকৃতির যে মহত্ত্ব প্রোথিত আছে স্বাধীনতা না হইলে কি তন্মধ্যস্থ দেবভাব স্ফুরিত হয়?' তিনি একবার বলিতেছেন প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রীড়া আবশ্যক আবার বলিতেছেন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা আবশ্যক। পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্য কি প্রকারে স্থান পায়, বুঝিতে পারি না। যখন বলিলেন পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী স্বাভাবিক দুর্ব্বল তখন বলা হইল স্বাভাবিকতা পরিহার কর, আবার বলিতেছেন প্রাকৃতিক অবস্থায় না থাকিলে দেবভাব স্ফুরণ হয় না। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? আমরা আর একটি বিষয় দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলাম। প্রতিবাদকারী যে কথা নিজে স্বীকার করিয়াছেন তাহাই আবার অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন "স্ত্রীজাতির শারীরিক অসমর্থতা পুরুষ অপেক্ষা ন্যূনতর।" (আর্য্যদর্শন, আশ্বিন ৮০ পৃষ্ঠা ২৪ পংক্তি দেখ) আবার বলিতেছেন "যদি বল স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক দুর্ব্বলা" (৭৯ পৃঃ ১০ পংক্তি) "স্ত্রীজাতি

স্বাভাবিক দুর্ব্বলা একথা স্বীকার করিয়া লইলেও" ইত্যাদি, একবার বলিতেছেন স্ত্রী নিশ্চয় দুর্ব্বলা আবার বলিতেছেন তোমাদের কথায় স্ত্রীজাতিকে দুর্ব্বলা স্বীকার করিলেও অর্থাৎ স্ত্রীদুর্ব্বল নহে।

আমাদিগের প্রতিবাদ ক্রমে দীর্ঘ হইয়া গেল কিন্তু আর একটি কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ হয় প্রতিবাদকারী যুক্তির দিকে তত দৃষ্টি করেন নাই যত তিনি নিজ সংস্কার বা বিশ্বাসের অধীন হইয়াছেন। কেননা আমরা দেখাইলাম তাঁহার সমস্ত যুক্তিই তাঁহার নিজ যুক্তির সহিত বিরুদ্ধ; বিশেষতঃ তিনি বলিয়াছেন "তিনি (লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু) এই (স্ত্রীর) অধীনতা সমর্থনার্থ কতকগুলি মিথ্যা হেতুর কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। যাহা প্রধান হেতু তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। বোধ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা হইয়াছে। আমরা কি সেটী বলিয়া দিব? ইত্যাদি ইত্যাদি"। প্রতিবাদকার, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুকে আপনার বিশ্বাসের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া এরূপ রাগের অধীন হইয়াছিলেন যে সে সময়ে তিনি জ্ঞানশূন্য প্রায় হইয়াছিলেন বোধ হয়, নচেৎ তিনি একজন পরিচিত ভদ্রলোক বন্ধুকে কপটী ও মিথ্যাবাদী বলিবেন কেন? তিনি কি বরাবর জানেন না যে লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু একজন বিচক্ষণ ও সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তি? বিরুদ্ধ কথা বলিলেই যে প্রকৃত হেতু ঢাকিয়া মিথ্যা হেতুর কল্পনার কথা বুঝায় এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। তাহা যদি হয় তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে প্রতিবাদকার স্ত্রী স্বাধীনতার ভাণ করিয়া নিজের ইন্দ্রিয় সুখ চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেননা তিনি জানেন যে ইংলণ্ডে যৎকিঞ্চিৎ স্ত্রীস্বাধীনতা আছে, তাহাতেই তথায় যে কোন পুরুষ যে কোন যুবতীর সহিত একত্র নৃত্য করিতে পারে, নির্জ্জনে মধুরালাপ করিতে ও ক্রীড়া করিয়া বিবিধ আমোদ সম্ভোগ করিতে পারে, এবং যুবতীর হস্ত বগলে পুরিয়া একাঙ্গ হইয়া যথা তথা ভ্রমণ করিতে পারে ইত্যাদি ২। আর যদি স্ত্রীজাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে না জানি ইন্দ্রিয় সুখের কত বৃদ্ধি হইল! সেই সুখের আশায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন ও সে কথা বলিতে লজ্জা হয় এইজন্য তাহা গোপন করিয়া স্ত্রীস্বাধীনতার ভাণ করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে এরূপ বলিতেছি না, কেননা আমরা জানি প্রতিবাদকারী এরূপ কপটাচারী নহেন। তবে এইজন্য ও কথার উল্লেখ করিলাম যে তিনি যেন এরূপ গোঁড়া বিশ্বাস আর না করেন তিনি যেন বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিশ্বতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। তাহাহইলে আর তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর সম্বন্ধে এরূপ অন্যায় ভ্রম হইবে না। এই জন্য আমরা তাঁহার প্রতিবাদ সকল সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম, এ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষীয় যে সকল যুক্তি আছে তাহা আমরা

এক্ষণে দেখাইতে পারিলাম না—প্রস্তাবান্তরে চেষ্টা করিব। আমরা কেবল ইহাই দেখাইলাম যে তাঁহার কথা গুলি নিজের কথারই বিরোধী।

প্রতিবাদকারী সর্ব্বশেষে "বলিয়াছেন আমরা ঐ প্রস্তাবে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহার অধিকাংশই "বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থা" নামক প্রবন্ধলেখকের প্রতি প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছি বটে, কিন্তু আমাদের কথাগুলি "মানবতত্ত্ব" লেখকের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে পারে; কারণ শেষোক্ত লেখক স্ত্রীজাতির অধীনতা সমর্থনার্থ যে সকল হেতু দিয়াছেন প্রথোমক্ত লেখকও তাহার অধিকাংশ দিয়াছেন।"

প্রতিবাদকারী যখন নিজে স্বীকার করিতেছেন যে "মানবতত্ত্বে" আরও অতিরিক্ত হেতু আছে ও যখন তাহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই তখন আমাদেরও নিরস্ত থাকিতে হইল। তিনি "মানবতত্ত্বের" অন্তঃপুর সম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াছেন। অন্তঃপুর সম্বন্ধে "মানবতত্ত্বে" অনেকগুলি যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রতিবাদকার সে সকলের নামও করেন নাই, যুক্তির উদাহরণ দেখাইবার জন্য মানবতত্ত্বে ইউরোপ ও ভারতে তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে যে ভারত অপেক্ষা ইউরোপে ব্যভিচার অধিক। তাহার উত্তরে প্রতিবাদকারী লিখিয়াছেন "ব্যভিচার কোথায় অধিক তাহা তুলনা করিবার যো নাই, কারণ তাহা গোপনীয় বিষয়।" গোপনীয় বিষয় হইলে যদি তাহার বিষয় জানা না যায়, তবে যদি কেহ বলেন ইংলণ্ডে ভারত অপেক্ষা ধন অধিক, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে তাহা বলিতে পার না—কেন না ধন সমস্ত লোহার সিন্দুক মধ্যে অতি গোপনে থাকে; তুমি তাহার তুলনা করিবে কি প্রকারে? যাহা হউক প্রতিবাদকারীর একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে যখন এ বিষয় স্থির জানা নাই তখন ইহার দ্বারা সত্য নিরূপিত হইতে পারে না। আমরা তর্ক জন্য তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু উহা ছাড়া মানবতত্ত্বে কি অন্তঃপুর সম্বন্ধে অন্য কোনও যুক্তি নাই? প্রতিবাদকার সে যুক্তির কথা না বলিয়া কিজন্য এরূপ অসার কথা বলিলেন? তিনি যদি অগ্রে বুঝাইয়া দিতেন যে সে সকল যুক্তি অকিঞ্চিৎকর ও পরে এই উদাহারণের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইয়া দিতেন তাহা হইলেই প্রকৃত প্রতিবাদ করা হইত। তাহা যখন হয় নাই আমরাও তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। প্রতিবাদকার মানবতত্ত্বের অন্যান্য সামাজিক প্রবন্ধগুলির ও প্রতিবাদ করিবেন বলিয়াছেন। আমরা অনুরোধ করি মানবতত্ত্বখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া যেন প্রতিবাদ করেন।

শ্রী বীরেশ্বর পাঁড়ে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

নিবাতকবচ-বধ। মহাকাব্য। শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১॥০। নিবাতকবচ বধ সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুকরণে রচিত। কাব্যের বিষয় মহাভারতবর্ণিত অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সাগরবাসী মায়াচারী দেবদ্বেষী রাক্ষসনিবাতকবচগণের নিধন। এই গ্রন্থের পূর্ব্বাপর সংস্কৃত ছন্দে লিখিত। সংস্কৃত ছন্দে ও সংস্কৃতের অনুকরণে লিখিত কাব্যের মধ্যে বাবু বলদেব পালিত রচিত কর্ণার্জ্জুন ও সমালোচ্য কাব্য এই দুই খানি আমাদের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বঙ্গভাষার এক্ষণে শৈশবাবস্থা। এক দিকে ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ক্ষেত্র ও অপর দিকে সংস্কৃত সাহিত্য ক্ষেত্র। এই উভয় ক্ষেত্রে হইতে শস্য আহরণ করিয়া ইহার অঙ্গ পুষ্ট করিতে হইবে। সমালোচ্য কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারাহৃত একটি উৎকৃষ্ট সামগ্রী; ইহাতে প্রতিভা ও কল্পনা কিছু না থাকুক গুণপণা অনেক আছে। যে যে গুণ থাকিলে উচ্চদরের মহাকাব্য বলা যায় তাহা না থাকিলেও ইহাকে কাব্যাংশে নিতান্ত নিকৃষ্ট বলা যায় না। ইহার স্থানে স্থানে বর্ণনা অতি সুন্দর। বীররৌদ্রাদি রসের অবতারণাও সুন্দর হইয়াছে। এই কাব্যের রুচি গর্হিত নহে। বঙ্গদেশে ইহার আদর দেখিলে বিশেষ সুখী হইব।

জীবন-সঞ্চার। শ্রী যোগেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥৵০ দশ আনা। সন্তানোৎপাদিকা বৃত্তি সম্বন্ধে মনুষ্যের কর্ত্তব্যবিষয়ক আলোচনা করা পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার পুস্তকের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন "সন্তানোৎপাদন কার্য্য হইতে রহস্যাবরণ তুলিয়া লও; ভোজন, শয়ন, নিদ্রা যেমন রহস্যময় নহে, এ কার্য্যটীকে সেই প্রকার করিয়া দাও, তখন আর ইহাতে কৌতুহলের কিছু থাকিবে না, নূতনত্ব থাকিবে না, তখন জগতের অনেক পাপ অনেক রোগভোগ কমিবে।" আমরা এ কথার অনুমোদন করি। পুস্তকের লেখা সরল এবং আলোচ্য বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতম্। শ্রীরামনারায়ণ-বিদ্যারত্ন-কৃতানুবাদ-সমেতম্—ত্রীপুরাধীশ্বর-শ্রীমন্মহারাজবীরচন্দ্রবর্ম্মমাণিক্যস্য সম্পূর্ণসাহায্যেন মূল্যং বিনা বিতরিতব্যম্। শুভক্ষণে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দেশীয় ধনীবৃন্দ যে সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের অক্ষয় রত্ন সমুদায় দীন বঙ্গবাসীকে অকাতরে দান করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ। সমালোচ্য গ্রন্থ খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। ইহাতে মূল, টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। আমরা আশা করি, এই গ্রন্থের সংস্কারকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে।

বোম্বাইয়ের পারসী সম্প্রদায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পারসিকগণ সকল বিষয়েই অগ্রগামী, ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদবন্ধন তাদৃশ নাই; ইহাদের সমাজবন্ধনও তাদৃশ কঠিন নহে। এজন্য সকল সময়ে সকল অবস্থাকেই ইহারা আপনাদিগের উপযোগী করিয়া লয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে কিরূপ স্বল্পায়াসে ইহারা হিন্দু আচার ব্যবহার ভাষা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। অধুনাতন কালেও ইহারা ইংরাজ জাতির যতদূর অনুকরণ করিয়াছে এবং করিতে সক্ষম হইয়াছে, ভারতবর্ষের অপর কোন জাতি সেরূপ পারে নাই। পূর্ব্বে পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই পারসিকগণ হিন্দুদিগের অনুরূপ ছিল, এক্ষণে তৎসমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া ইয়ুরোপীয় আকার ধারণ করিয়াছে। গৃহসজ্জায় গদি তাকিয়া মছলন্দের পরিবর্ত্তে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি বিলাতী আসবাব তাহাদিগের স্থানাধিকার করিয়াছে। পিত্তল, কাংস, রৌপ্য প্রভৃতি তৈজসপাত্রের পরিবর্ত্তে গ্লাস, চীনের বাসন প্রভৃতি তাহাদের স্থানাধিকার করিয়াছে; ভাত, ডাল, তরকারী, রুটির পরিবর্ত্তে এক্ষণে লোফ, মাংস, চা প্রভৃতি বিলাতী খাদ্য তাহাদিগের স্থানাধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ স্বতন্ত্র আহার করিতেন, এক্ষণে উভয়ে ইংরাজী প্রথানুসারে একত্রে ভোজন করিয়া থাকেন। কিন্তু অদ্যাপি সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে এই বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করে নাই; এবং স্বজাতি ভিন্ন প্রায় কেহ অপরের সঙ্গে একত্র আহার করিতে সাহসী হয় না। পাচক নিয়োগ সম্বন্ধেও ঐরূপ দেখা যায়, স্বজাতীয় ভিন্ন অপর পাচক নিয়োগের নিয়ম অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

নব্য পারসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোর্টশিপ প্রথা প্রবেশ করিয়াছে। এই বিজাতীয় প্রথার প্রবর্ত্তনে অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বয়োজ্যেষ্ঠ পারসিকগণ একথা বলেন। কোর্টশিপ প্রথা সর্ব্বথা নিরাপদ নহে; অতএব তাঁহাদের এ কথা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ নাই।

শিক্ষা বিষয়ে পারসিকদিগের বিশেষ উদ্যোগ এবং যত্ন দেখা যায়। ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতিই ইহাদিগের ন্যায় বিদ্যাশিক্ষায় উদ্যোগী নহে। পারসীদিগের মধ্যে বোধ হয় বালক মাত্রেই কিছু না কিছু বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে। ইহাদিগের শিক্ষার্থ যে সমুদায় বিদ্যালয় আছে তাহা প্রায়ই পারসীদিগের নিজ ব্যয়ে এবং নিজ উদ্যোগে স্থাপিত। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়েও ইহারা পশ্চাৎপদ নহে। বালকদিগের ন্যায়

ইহারা বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়েও বিশেষ যত্নবান্। বোম্বাই নগরে ৩৭টী বালিকাবিদ্যালয় আছে এবং তাহাতে সর্ব্বসমেত প্রায় ৩০০০ বালিকা শিক্ষা লাভ করে। বালিকাগণের অধিকাংশ মাতৃভাষা গুজরাটীতেই শিক্ষা পাইয়া থাকে কিন্তু অনেক বালিকা ইংরাজীতেও উচ্চশিক্ষা পাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার জন্য এলেকজান্দ্রা স্কুল (Alexandra School) নামে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। প্রায় সকল বালিকাবিদ্যালয়েই সূচিকার্য্য এবং সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান কালের স্ত্রীগণের যেরূপ অপবাদ উঠিয়াছে যে তাঁহারা গৃহকার্য্যে নিপুণা এবং অনুরক্তা নহেন পারসিক শিক্ষিতা স্ত্রীগণের সম্বন্ধেও সেইরূপ অপবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

পারসিকদিগের মধ্যে অন্তঃপুর-অবরোধ-প্রথা প্রচলিত নাই। কেবল পারসিক কেন, বোম্বাই অঞ্চলের মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যেও অবরোধ-প্রথা চলিত নাই। পঞ্জাবেও উহা নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও বাঙ্গালা এই দুই স্থানেই অবরোধ-প্রথার বিশেষ আঁটাআঁটী। অবরোধ-প্রথা মুসলমানপ্রবর্ত্তিত রীতি। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে অবরোধপ্রথা ছিল না, প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমানদিগের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল; মুসলমানজন্মের সঙ্গে ঐ প্রথা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। অনেকে বলেন মুসলমানরাজত্বকালে মুসলমানদিগের অত্যাচারে কুলকামিনীগণ কুলমান রক্ষার জন্য অন্তঃপুর আশ্রয় করেন এবং সেই পর্য্যন্তই স্ত্রীস্বাধীনতা লোপ পাইয়া অবরোধপ্রথা ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের এই প্রথিত অত্যাচারের কথা কতদূর সত্য বলিতে পারি না কিন্তু ইহা নিশ্চয় বটে, যে মুসলমানদিগের নিকট হইতেই এই রীতিটি ভারতবাসী অনুকরণ করিয়াছে। যে যে প্রদেশে মুসলমান সংস্রব অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল, ভারতবর্ষের সেই সেই প্রদেশ এ প্রথা অনুকরণ করে নাই; তাই ভারতবর্ষের পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে স্ত্রীস্বাধীনতা আজিও বর্ত্তমান। পারসী স্ত্রীগণ পূর্ব্বে কখন "পর্দ্দানসীন" হয়েন নাই; এখনও তাঁহারা স্বেচ্ছামতে সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে গতায়াত করেন। আত্মীয়বর্গের সহিত সাক্ষাৎ, বিপণিতে দ্রব্যক্রয়, প্রাতে এবং সায়াহ্নে বায়ুসেবন, রেলওয়ে ভ্রমণ ইত্যাদি নানা কার্য্যে পারসীক স্ত্রীগণকে একাকিনী দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার "ইডেন উদ্যানের" ন্যায় বোম্বায়ে সমুদ্রতীরে একটী উদ্যান আছে। "ইডেন উদ্যানে" গৌরাঙ্গিনীগণ যেরূপ স্বচ্ছন্দে, ভ্রমণ এবং বায়ু সেবন করিয়া বেড়ান, বোম্বায়ে পারসীক রমণীগণও সেইরূপ কেহ যানারোহণে, কেহ পদব্রজে, কেহ স্বামীর

সঙ্গে, কেহ বা একাকিনী, বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। তাহাদিগের উজ্জ্বল পরিচ্ছদসমূহের ছটায় এবং রূপলাবণ্য-প্রভায় সে স্থান এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হয়।

স্ত্রীস্বাধীনতা প্রযুক্ত পারসিকদিগের গৃহসুখও আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। কোন অভ্যাগত ব্যক্তিকে সমাদর করিতে হইলে পুরুষগণের সহিত গৃহিণীও কন্যাগণ সঙ্গে লইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। স্ত্রী ও পুরুষের এইরূপ একত্র সম্মিলনে, একত্র আলাপনে যে কতদূর বিমল আনন্দ উপচিত হয় তাহা যাঁহারা উহা উপভোগ করেন নাই তাঁহারা কখনই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না। স্ত্রীপুরুষের একত্র সংমিশ্রণে যে একটু বিশুদ্ধ স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হয়, যে একটু নৈতিক উন্নতির প্রবণতা হয়, তাহা অনভিজ্ঞ লোকের বোধগম্য নহে। আমরা নিজের অভিজ্ঞতায় যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে স্বাধীনভাবে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর আলাপে কোন জঘন্য বা নীচ ভাব কোন মতেই মনে আসিতে পারে না, প্রত্যুত উহাতে মনে উন্নত ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে। স্ত্রী-স্বাধীনতার এই সুধাময় ফল পারসিকগণ উপভোগ করিতে পান; তাহার উপর স্ত্রীগণের গীত বাদ্যে নিপুণতা-প্রযুক্ত পারসিক গৃহ আরও সুখময় হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের ন্যায় পারসীগণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ আস্থাবান্। তিথি নক্ষত্রের শুভাশুভ ফল, গ্রহগণের প্রকোপ বা প্রসন্নতা ইত্যাদিতে পারসীদিগের বিশেষ বিশ্বাস। ইহারা নিজ দৈবজ্ঞগণের গণনাতেই সন্তুষ্ট নহে; হিন্দু গণকগণের নিকটও ইহারা বাহুল্য রূপে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে পারসিকদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বিবরণ দেওয়া গিয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে পারসিকদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস হিন্দুদিগের সহিত অনেক বিষয়ে তুল্য; অনেক দেবদেবীও হিন্দু এবং পারসিক এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরসাধারণ। পার্ব্বণ ও উৎসব বিষয়েও হিন্দুদিগের সহিত পারসিকদিগের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন উৎসব পারসিকগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু তাহাদিগের নিজেরও অনেকগুলি উৎসব আছে। এ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের বিশেষ প্রভেদ এই যে, অনেক পর্ব্বোপলক্ষে হিন্দুগণ উপবাসাদি কৃচ্ছ্র ব্রতের ব্যবস্থা দিয়াছে কিন্তু পারসিকগণ কৃচ্ছ্র ব্রতের ব্যবস্থা দেন না। শরীরকে কষ্ট দেওয়া পারসিকদিগের মতে পাপজনক; অতএব উহাদিগের পর্ব্বসমূহে আমোদ এবং উৎসবের লহরীই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পারসীকদিগের প্রধান উৎসবের দিন বৎসরের প্রথম দিবস। আশ্বিন মাসের

প্রারম্ভেই ঐ দিন পড়িয়া থাকে; উহা পারস্যের সাসানবংশীয় শেষ রাজা য়েজ্‌জর্দ্দের সিংহাসনারোহণের সাম্বৎসরিক দিবস। ঐ দিন পারসিকেরা পরস্পর আত্মীয়কুটুম্বগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে; অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা এবং কারাবাসীর কারামোচন করিয়া থাকে; প্রতি গৃহে বাদ্যোদ্যম এবং ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। সেদিন কাহাকেও বিষণ্ণ থাকিতে নাই। প্রাতঃকালে গৃহস্থের বাটীতেই হউক বা সাধারণ উপাসনালয়েই হউক বিশেষ পূজা হইয়া থাকে এবং সে দিন উপঢৌকন আদান প্রদান হইয়া থাকে।

ঐ মাসের ১৯এ তারিখে পারসিকগণ পিতৃলোকের উদ্দেশে পূজা এবং পিণ্ডদান করিয়া থাকে। "বিজন প্রাসাদে" ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যাঁহারা দূরদেশে বা অজ্ঞাত প্রদেশে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশে ময়দার পিষ্টক এবং ফল মূল প্রদত্ত হয়। পারসী "পিতর" শব্দ সংস্কৃত "পিতৃ" শব্দের প্রতিরূপ মাত্র।

"জরথুস্তের" মৃত্যুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এবং সূর্য্য, মিত্র, ও "অমস্পান্দ" নামক দেবগণের উদ্দেশে পারসিকগণ অনেকগুলি উৎসব করে। মকরসংক্রান্তিতেও ইহাদিগের প্রধান উৎসব হইয়া থাকে।

(সমাপ্ত) শ্রীযোগেন্দ্র——

তত্ত্ববিদ্যায় নাস্তিকতা।

সূর্য্যে ছায়া আছে, আলোকে অন্ধকার আছে, তাপে শৈত্য আছে, ধর্ম্মে অধর্ম্ম আছে, সত্যে মিথ্যা আছে, হাঁতে না আছে, সুতরাং আস্তিকতায় নাস্তিকতা না থাকিবে কেন? থাকাই অবশ্যম্ভাবী; না থাকা অসম্ভব, আশ্চর্য্যের বিষয় ও অস্বাভাবিক। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বমণ্ডলে, কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, উভয় জগতেই, চিৎ এবং অচিৎ বা সৎ এবং অসৎ, এই দ্বিবিধ গুণের নিরন্তর বিদ্যমানতা। অসৎ সতের বিরোধী এবং নিত্য বৈপরীত্যসাধনকারী; যেখানে ঈশ্বর স্বর্গ রচনা করিয়া থাকেন, শয়তান তথায় নরকের আবির্ভাব করিয়া থাকে; অহুরমজদ যথায় সুখরাশি বিতরণ করিয়া থাকেন, আঙ্গ্রমইন্যু তথায় অসুখের ছড়াছড়ি করিয়া থাকে। মূর্খ বাঙ্গারাম, এ বড় ঠিক কথা, ইহাই নিত্য হইয়া আসিতেছে, ইহাই নিত্য হইতে থাকিবে। কিন্তু জ্ঞান, সেই অন্ধকারে আলোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই অসতে সতের প্রভা বৃদ্ধি হয়; মেঘমুক্ত দিবাকরের কিরণমালা উজ্জ্বলতায় ও তেজে বড় খরতর! যে আজীবন সম্পন্নাবস্থায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছে, সে

সম্পন্নাবস্থার মূল্য কি তাহা জানে না; সে মূল্য জানিতে হইলে ক্ষণিক অভাব ভোগের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ সংসারে, যথায় বিনা মূল্যে বিষ পর্য্যন্ত মিলে না, তথায় মূল্য জানাটাও নিতান্ত এবং আগে আবশ্যক। অতএব যদি আর কিছুরই জন্য না হয়, অন্ততঃ মূল্য জানার জন্যও, অসতের অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিনা বৈপরীত্যে কোন বস্তুর রূপ, প্রভা বা মূল্য প্রকটিত হয় না।

অতএব সতের পার্শ্বে অসতের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক, সুতরাং স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে অসৎ সর্ব্বদাই সতের অনুসরণ করিয়া থাকে। যে জাতীয় সৎ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অসৎও সেই জাতীয় এবং সমশ্রেণীর, নতুবা বৈপরীত্য সাধনে পারক হইবে কিরূপে? সৎ-পদার্থ শ্রী, অসৎ পদার্থ বিকার। অসৎ, বিকার বা বৈপরীত্য সাধনে, সতের অগ্রবর্ত্তী পর্ব্ববিশেষস্থ শ্রীবর্দ্ধন করিয়া, আপনি বিলোপ হইয়া যায়; সৎ পুনর্ব্বার নূতন অসতের সহযোগে নূতন শ্রী ধারণে অগ্রসর হয়। সতের অস্তিত্ব এবং গতি নিত্য, অসতের অস্তিত্ব এবং গতি ক্ষণস্থায়ী—প্রতিপদে সৎকে অগ্রসারিত, প্রকটিত বা তাহার নব শ্রী বর্দ্ধন করিয়া, প্রতিপদে অসতের ধ্বংস। সৎ পদার্থই এ বিশ্বের পরিমাণ, অসৎ পদার্থ তাহার ক্ষণিক ব্যতিক্রম। সাময়িক কাল, অজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানবিৎ সকল লোকেরই নিকট, সর্ব্বদা দুঃখসঙ্কুল এবং অসুখময়—মূর্ত্তিমান কলির রাজত্ব; তাহার কারণ, তাহার সৎভাব ও অসৎভাব উভয়ই আমরা চোখের উপর দেদীপ্যমান দেখিতে পাই বলিয়া। কিন্তু গতকাল? সর্ব্বদাই মনোরম, সর্ব্বদাই পূজনীয়, সর্ব্বদাই তাহাকে দেববৎ দেখিয়া থাকি; গতকালের নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা যে, সেও শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্র হইয়া থাকে। তাহার কারণ, কাল সহ তাহার অসৎ-ভাব বিলয় হইয়া গিয়াছে; নিত্যস্থায়ী একমাত্র সৎ-ভাব কেবল এখন নয়নপথে উদিত হইতেছে,—সৎভাব কবে কাহার না পূজনীয়, কবে কাহার না ভাল লাগিয়া থাকে? অসৎ পদার্থ অনিত্য এবং মিথ্যা; প্রতি কালপরিবর্ত্তনে আবশ্যকতার সহ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই অসৎ পদার্থ, মানবীয় বিভিন্ন ধারণা শক্তির তারতম্য অনুসারে, জরথুস্ত্রের নিকট আহ্রমইন্থু, মুসা ও মহম্মদের নিকট শয়তান, বৈদান্তিকের নিকট অবিদ্যা, ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে।

জ্ঞান ধর্ম্মাদি পর্ব্বে আস্তিকতা সেই সৎ, নাস্তিকতা সেই অসৎ; সুতরাং নাস্তিকতা না থাকিলে চলে কই? জ্ঞান-সংসার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আস্তিকতা আধ্যাত্মিক গুণময়ী বটে, কিন্তু উহাও, শরীরী আত্মার অবলম্বনভূত হওয়ায়, ভাব প্রকরণাদিতে জাগতিক

প্রারম্ভেই ঐ দিন পড়িয়া থাকে; উহা পারস্যের সাসানবংশীয় শেষ রাজা য়েজ্‌জর্দ্দের সিংহাসনারোহণের সাম্বৎসরিক দিবস। ঐ দিন পারসিকেরা পরস্পর আত্মীয়বন্ধুবর্গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে; অপরাধীর অপরাধ মার্জ্জনা এবং কারাবাসীর বন্ধনমোচন করিয়া থাকে; প্রতি গৃহে বাদ্যোদ্যম এবং ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। সেদিন কাহাকেও বিষন্ন থাকিতে নাই। প্রাতঃকালে গৃহস্থের বাটীতেই হউক বা সাধারণ উপাসনালয়েই হউক বিশেষ পূজা হইয়া থাকে এবং সে দিন উপঢৌকন আদান প্রদান হইয়া থাকে।

ঐ মাসের ১৯এ তারিখে পারসিকগণ পিতৃলোকের উদ্দেশে পূজা এবং পিণ্ডদান করিয়া থাকে। "বিজন প্রাসাদে" ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যাঁহারা দূরদেশে বা অজ্ঞাত প্রদেশে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশে ময়দার পিষ্টক এবং ফল মূল প্রদত্ত হয়। পারসী "পিতর" শব্দ সংস্কৃত "পিতৃ" শব্দের প্রতিরূপ মাত্র।

"জরতুস্তের" মৃত্যুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এবং সূর্য্য, মিত্র, ও "অমস্পন্দ" নামক দেবগণের উদ্দেশে পারসিকগণ অনেকগুলি উৎসব করে। মকরসংক্রান্তিতেও ইহাদিগের প্রধান উৎসব হইয়া থাকে।

(সমাপ্ত) শ্রীযোগেন্দ্র——

তত্ত্ববিদ্যায় নাস্তিকতা।

সূর্য্যে ছায়া আছে, আলোকে অন্ধকার আছে, তাপে শৈত্য আছে, ধর্ম্মে অধর্ম্ম আছে, সত্যে মিথ্যা আছে, হাঁতে না আছে, সুতরাং আস্তিকতায় নাস্তিকতা না থাকিবে কেন? থাকাই অবশ্যম্ভাবী; না থাকা অসম্ভব, আশ্চর্য্যের বিষয় ও অস্বাভাবিক। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বমণ্ডলে, কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, উভয় জগতেই, চিৎ এবং অচিৎ বা সৎ এবং অসৎ, এই দ্বিবিধ গুণের নিরন্তর বিদ্যমানতা। অসৎ সতের বিরোধী এবং নিত্য বৈপরীত্যসাধনকারী; যেখানে ঈশ্বর স্বর্গ রচনা করিয়া থাকেন, শয়তান তথায় নরকের আবির্ভাব করিয়া থাকে; অহুরমজদ যথায় সুখরাশি বিকরণ করিয়া থাকেন, আহ্রমইন্যু তথায় অসুখের ছড়াছড়ি করিয়া থাকে। মূর্খ বাঞ্ছারাম, এ বড় ঠিক কথা, ইহাই নিত্য হইয়া আসিতেছে, ইহাই নিত্য হইতে থাকিবে। কিন্তু জান, সেই অন্ধকারে আলোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই অসতে সতের প্রভা বৃদ্ধি হয়; মেঘমুক্ত দিবাকরের কিরণমালা উজ্জ্বলতায় ও তেজে বড় খরতর! যে আজীবন সম্পন্নাবস্থায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছে, সে

সম্পন্নাবস্থার মূল্য কি তাহা জানে না; সে মূল্য জানিতে হইলে ক্ষণিক অভাব ভোগের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ সংসারে, যথায় বিনা মূল্যে বিষ পর্য্যন্ত মিলে না, তথায় মূল্য জানাটাও নিতান্ত এবং আগে আবশ্যক। অতএব যদি আর কিছুরই জন্য না হয়, অন্ততঃ মূল্য জানার জন্যও, অসতের অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিনা বৈপরীত্যে কোন বস্তুর রূপ, প্রভা বা মূল্য প্রকটিত হয় না।

অতএব সতের পার্শ্বে অসতের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক, সুতরাং স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে অসৎ সর্ব্বদাই সতের অনুসরণ করিয়া থাকে। যে জাতীয় সৎ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অসৎও সেই জাতীয় এবং সমশ্রেণীর, নতুবা বৈপরীত্য সাধনে পারক হইবে কিরূপে? সৎ-পদার্থ শ্রী, অসৎ পদার্থ বিকার। অসৎ, বিকার বা বৈপরীত্য সাধনে, সতের অগ্রবর্ত্তী পর্ব্ববিশেষস্থ শ্রীবর্দ্ধন করিয়া, আপনি বিলোপ হইয়া যায়; সৎ পুনর্ব্বার নূতন অসতের সহযোগে নূতন শ্রী ধারণে অগ্রসর হয়। সতের অস্তিত্ব এবং গতি নিত্য, অসতের অস্তিত্ব এবং গতি ক্ষণস্থায়ী—প্রতিপদে সৎকে অগ্রসারিত, প্রকটিত বা তাহার নব শ্রী বর্দ্ধন করিয়া, প্রতিপদে অসতের ধ্বংস। সৎ পদার্থ ই এ বিশ্বের পরিমাণ, অসৎ পদার্থ তাহার ক্ষণিক ব্যতিক্রম। সাময়িক কাল, অজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানবিৎ সকল লোকেরই নিকট, সর্ব্বদা দুঃখসঙ্কুল এবং অসুখময়—মূর্ত্তিমান কলির রাজত্ব; তাহার কারণ, তাহার সৎভাব ও অসৎভাব উভয়ই আমরা চোখের উপর দেদীপ্যমান দেখিতে পাই বলিয়া। কিন্তু গতকাল? সর্ব্বদাই মনোরম, সর্ব্বদাই পূজনীয়, সর্ব্বদাই তাহাকে দেববৎ দেখিয়া থাকি; গতকালের নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা যে, সেও শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্র হইয়া থাকে। তাহার কারণ, কাল সহ তাহার অসৎ-ভাব বিলয় হইয়া গিয়াছে; নিত্যস্থায়ী একমাত্র সৎ-ভাব কেবল এখন নয়নপথে উদিত হইতেছে,—সৎভাব কবে কাহার না পূজনীয়, কবে কাহার না ভাল লাগিয়া থাকে? অসৎ পদার্থ অনিত্য এবং মিথ্যা; প্রতি কালপরিবর্ত্তনে আবশ্যকতার সহ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই অসৎ পদার্থ, মানবীয় বিভিন্ন ধারণা শক্তির তারতম্য অনুসারে, জর্থুস্ত্রর নিকট আঙ্গ্রমইনু, মুসা ও মহম্মদের নিকট শয়তান, বৈদান্তিকের নিকট অবিদ্যা, ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে।

জ্ঞান ধর্ম্মাদি পর্ব্বে আস্তিকতা সেই সৎ, নাস্তিকতা সেই অসৎ; সুতরাং নাস্তিকতা না থাকিলে চলে কই? জ্ঞানসংসার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আস্তিকতা আধ্যাত্মিক গুণময়ী বটে, কিন্তু উহাও, শরীরী আত্মার অবলম্বনভূত হওয়ায়, ভাব প্রকরণাদিতে জাগতিক

পদার্থ, অপরাপর পদার্থ বা মানবীয় চিত্তের অপরাপর গুণ পদার্থের ন্যায়, উহাও শক্তিবশে গতিশীলতা, অগ্রগমন, এবং শ্রীর বিষয়ীভূত। অতএব উহার বৈপরীত্যসাধক নাস্তিকতা না থাকিলে, সেই সেই অগ্রগমন বা শ্রীধারণ প্রভৃতি সম্পন্ন হইতে পারিত না। মানবীয় অপরাপর গুণ ও জ্ঞানের ন্যায় আস্তিকতারও পর পর উৎকর্ষ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু এ সকল প্রয়োজনীয়তা—এ সকল নষ্টামির মূল, দৃষ্টিরোধক কাল; কালের ধ্বংসে সমগ্র সৎ পদার্থ দৃষ্টিপথে জাজ্বল্যমান হইলে, আর অসৎ পদার্থের প্রয়োজন হয় না। যতক্ষণ কালবক্ষে স্থিতি, ততক্ষণ অসতের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। বাঞ্ছারাম, তুমি বলিবে সতের পার্শ্বে অসতের যদি এতই অবশ্যক, আস্তিকতার পার্শ্বে নাস্তিকতার যদি এতই প্রয়োজন, তবে তুমি কেন অজস্র এত বকাবকি করিয়া মাথা ধরাইতে বসিয়াছ, কেনই বা নাস্তিকতার প্রতি এতটা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া থাক?

সকল সৃষ্টির আদি প্রবর্ত্তক, আদিকর্ত্তা জ্ঞান। মানবে সেই জ্ঞান অংশত প্রদত্ত হইয়াছে; এজন্য মানব স্বয়ং সৃষ্ট এবং সৃষ্টিমধ্যে থাকিয়াও, নিজে সৃষ্টিক্ষম। এই কারণে যে সকল কার্য্য অন্যত্র প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া যায়, মানুষের মধ্যে সচরাচর তাহা হয় না। মানব কিয়দংশে স্বয়ং-ক্ষম বলিয়া, প্রকৃতি তাহাদের প্রতি সেই পরিমাণে শিথিল-যত্ন বলিলে অপ্রযুক্ত হয় না। অন্যত্র সৎ এবং অসতের উপর 'স্বয়ং ক্ষম' ভাবের অভাব হেতু, প্রকৃতি তথায় স্বয়ং যথাবিধানে কার্য্য করিয়া থাকেন; কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতিতে সেরূপ নহে। মনুষ্য স্বয়ং-ক্ষম ভাব হেতু, স্বেচ্ছামত সৎ বা অসতের অপরিমিত সংগ্রহে পটু। বলা বাহুল্য যে, সৎসংগ্রহই উদ্দেশ, অসৎসংগ্রহ উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং অধিক অসৎ সংগ্রহ অর্থাৎ সতের উপার্জ্জন অল্প হইতে দেখিলে কাজেই গালিগালাজ করিতে হয়। অনুমান হয়, আমরা কেবল শুদ্ধ আত্মিক স্বেচ্ছাশক্তি চালনা করিতে পাইলে, হয়ত নিরবচ্ছিন্ন সৎ বা নিরবচ্ছিন্ন অসতের উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। কিন্তু ভৌতিক শরীরী হওয়াতে, প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তিতে জড়িত এবং আধ্যাত্মিক সদসৎ ও আধিভৌতিক সদসৎ মিলিত হইয়া যাওয়ায়; এবং প্রাকৃতিক শক্তি ও তদনুগামী সদসৎ স্বেচ্ছাশক্তির অতীত ভাবে কার্য্যশীল হওয়ায়; শুদ্ধ আত্মিক স্বেচ্ছাশক্তির চালনা অথবা একেবারে শুদ্ধ অসৎ বা একেবারে শুদ্ধ সতের উচ্ছেদ বা উপার্জ্জনে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তাই বলিয়া যথাসাধ্য সৎসাধন জন্য আমাদিগকে প্রদত্ত শক্তির সম্যক সঞ্চালনে বিমুখ হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহা হইলে ব্যতিক্রম হেতু

আত্মিক অসতের সঞ্চার বা পাপের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আলোক হইতে অন্ধকার ছাড়াইবার সাধ্য নাই। সূর্য্যের আলোকে এবং প্রদীপের আলোকে তফাত কেন, যেহেতু প্রদীপের আলোকে অধিক পরিমাণে অন্ধকার মিশ্রিত থাকায়, তাহা সূর্য্যালোক অপেক্ষা মলিন। এখন জিজ্ঞাসা করি, আলোক প্রাপ্তিই যথায় উদ্দেশ্য, তথায় আলোকের উপর যদি আরও অপরিমিত অন্ধকার মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি সে আলোকের শ্রীবর্দ্ধন বা উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে? যদি তাহা না হয়, তবে এখন কর্ত্তব্য এই যে সেই আলোক হইতে অন্ধকার যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন করিয়া যথাসাধ্য সেই আলোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা। এতদর্থে দুইটি পরিমাণের আবশ্যক, প্রথম কোন্ পরিমাণে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন হইলে আলোক শ্রেষ্ঠতম রূপে লোভনীয় হইতে পারে তাহার আদর্শ; অপর যখন আলোক এবং অন্ধকার অবিচ্ছিন্ন, তখন কত পরিমাণে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিব বা না করিব বা করিতে পারি তাহার পরিমাণ। আদর্শ, তত্ত্ব এবং কাব্যের বিষয়ীভূত পদার্থ; আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সতের পরিবর্দ্ধন হেতু তন্মুখে প্রধাবিত হইব; এবং অসতের দূরীকরণে, প্রকৃতি আমাদিগকে যতদূর যাইতে দেয়, ততদূর যাইব। মানব স্বয়ং প্রকৃতিমান্ হইলেও সে মহাপ্রকৃতির অঙ্কশয়নশায়ী, সুতরাং এখানেও সে প্রকৃতির শাসনবহির্ভূত নহে; মানবকে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া প্রকৃতি একেবারে তাহাদের সম্বন্ধে কার্য্যবিরত ও ছেদসম্বন্ধ হয়েন নাই; সুতরাং এ মুখে তাঁহার শাসনসীমা পর্য্যন্ত আসাই চূড়ান্ত, যেহেতু তদতিরিক্তে মানবীয় গতিচালনের চেষ্টা কেবল অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

সকল জ্ঞানের আদি সন্দেহের উৎপত্তি। সেই সন্দেহ পরিপক্ক হইলে, নাস্তিকতার আকার ধারণ করিয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসু গুণের চালনে সন্দেহের উৎপত্তি হয়, পুনশ্চ সেই অনুসন্ধিৎসু গুণের চালনেই আবার তাহার নিবৃত্তি। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু শক্তি উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া আসিয়া, গূঢ় গুহ্য ভেদের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন গূঢ় গুহ্যের সম্মুখীন হইবায়, ঘোর অন্ধকারে পতিতবৎ সহসা পথ না পাইয়া ব্যাকুলিত হইতে থাকে; এবং সেই ব্যাকুলতা হইতে চিত্ত শ্রমক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখনই যে চিত্ত ক্ষীণ সে সেই ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে, শ্রান্তি, তাপ ও বৈক্লব্যে দিশাহারা হইয়া ক্ষিপ্ত-উন্মাদবৎ, যেন আস্তিকতার উপর প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ লইবার জন্য, জেদ করিয়া নাস্তিকতাকে গতির সীমা জ্ঞানে তদবলম্বনে শান্তি পাইবার আশা করিয়া থাকে। যাহারা এই মধ্যপথে ভগ্নগতি হয়, তাহারাই এ জগতে নাস্তিক বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু

যাহাতে বিষ তাহাতেই নির্ব্বিষ, এবং একদেশের চরম সীমায় উঠিলেই, ঠিক তথা হইতে অপর দেশের স্থত্রপাত হইয়া থাকে। যে অনুসন্ধিৎসু শক্তির চালনে নাস্তিকতারূপ সীমায় উপস্থিত হইয়াছ, সেই অনুসন্ধিৎসু শক্তিকে তদতিক্রমী চালনা করিলেই আবার সেই সীমা ছাড়াইয়া, আস্তিকতারূপী নূতন দেশের শোভনতম মোহিনী মূর্ত্তি পুরোভাগে দৃষ্টি করিতে পারিবে। তথায় বিচরণ কর, দেখিবে তাহা অপূর্ব্ব সুখের আকর; সন্দেহের পূর্ব্বগত আস্তিকতা অপেক্ষা তোমার এ আস্তিকতা অপরিসীম, উজ্জ্বল ও চিত্তশান্তিকর,—তাহার কারণ ইহা বৈপরীত্য সমাবেশে উৎপন্ন। এজগতে সকল বস্তুরই সার্থকতা আছে, সুতরাং নাস্তিকতারও সার্থকতা আছে, এবং সে সার্থকতা এইরূপে। কিন্তু নাস্তিকতা যখন আপন অধিকার-সীমা অতিক্রম করিয়া আপনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়ায় তখনই তাহাকে শয়তানের প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি বলা গিয়া থাকে।

আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, এ জগতে যত প্রকার জীবসৃষ্টি আছে, তাহার মধ্যে বদ্ধমূল নাস্তিকের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান্ জীব আর কেহই নাই। আজীবন শ্রম করিয়া, আজীবন মাথা ঘুরাইয়া, আজীবন তর্ক কাটাকাটি করিয়া, শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন কি, এ জগতের স্রষ্টা বা শাসনকর্ত্তা নাই এবং আমিও কেহ নহি, এ জগতও কিছুই নহে এবং আমতও কিছুই নহি। এক মাত্র 'না' জানিতে 'হাঁ' প্রতিরূপ সমস্ত জীবন যে স্বচ্ছন্দে বিসর্জ্জন করিতে পারে, অজ্ঞানকে স্থাপিত করিবার নিমিত্ত জ্ঞানকে যে বহু যত্নে হাড়িকাঠে ফেলিয়া বলিদান দেয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান নরকানুগৃহীত জীব আর কে হইতে পারে? নাস্তিক-শিরোমণিগণ, 'ঘট পট' 'ষত্ব ণত্ব' 'ব্যাপ্য ব্যাপক' 'প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ' 'কার্য্য কারণ' ইত্যাদি দুরুচ্চার্য্য দেড় গজি শব্দ খেলা, তর্ক বিতর্ক, কার্য্য কারণ আলোড়ন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে এ জগতে নাস্তিকতাই সৎ, আর সমস্ত অসৎ। অপূর্ব্ব বুদ্ধি। অপূর্ব্ব বুদ্ধি!! তর্কজালে সমস্তই আবদ্ধ করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত, ঋষি অগস্ত্য অপেক্ষাও অদ্ভুতকর্ম্মা! মূর্খ বাপুরাম, কত দিক ধরিয়া তর্ক করিয়া শেষ করিবে? এই বিশ্ব সাক্ষাৎ অনন্তরূপী, যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই প্রতি অনন্তপথও বিস্তৃত ও তোমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। শক্তির অনন্ত মহিমা বারেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? সামান্য সীমানিবদ্ধ ক্ষুদ্রাবয়বময় একই অক্ষর কোটি বিভিন্ন হস্তে কোটি বিভিন্ন আকারে প্রসবিত হইয়া থাকে; পুনঃ একই হস্তে কোটীবার প্রসবিত হইলেও কোটিবার বিভিন্ন আকারের হয়; এক এবং অসংখ্য পর্ব্ব পর্য্যায় ও শ্রেণীতে, অসংখ্য পদার্থ নিত্য উৎপাদিত হইতেছে; অথচ সকলেই অসংখ্য রকমের পৃথক পৃথক,

কেহ কাহারও সঙ্গে এক নহে। তবে যে আমরা এখানে সেখানে সীমা দেখিয়া থাকি সে সীমা অনন্তের নহে, তাহা আমাদের যথা আবশ্যক ধারণা ও অবলম্বন হেতু আমরা দিয়াছি; মুছিয়া ফেল মানদণ্ডস্বরূপ তোমার চন্দ্র সূর্য্য ও তারকানিকর, এখনই দেখিবে তোমার এক মুহূর্ত্ত ও শত বৎসর কেমন সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব অনন্তের মহিমা এবং তাহার অপার রচনা ও বিসারণ শক্তি কি অভাবনীয় ও কি অচিন্তনীয়। পুনশ্চ ইহা একদেশব্যাপিনী নহে। ঊর্দ্ধে অধে পার্শ্বে সর্ব্ব দিকে, ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া, সমান অভিনীত। তুমি কি মনে করিয়াছ যে তোমার অন্তময় তর্ক-রজ্জুতে সেই অনন্ত রাশি বাঁধিয়া আপন আয়ত্তে আনিবে? ভ্রান্ত, এ অসম্ভবে সম্ভববুদ্ধি তোমাকে কে দিয়াছে? তোমার চারিদিকে নিবিড় অনন্তরাশি বিস্তৃত, চারিদিকে তোমার নিবিড় অন্ধকারময় গূঢ় গুহ্য পরিবেষ্টন করিয়া অনন্তের রত্নভাণ্ডারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; মধ্যস্থলে জীবিকাহেতু সেই রত্নপ্রার্থী তুমি, এবং তুমি চৈতন্যরূপিণী বিন্দুমাত্র আলোককণা। সেই কণা মাত্র আলোকে কণামাত্র স্থান আলোকিত দেখিতে পাইয়া ভ্রান্ত মনে ভাবিতেছ সকল পদার্থই তাহাতে পরিসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, হাত বাড়াইলেই তাহা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হও। তুমি ক্রমাগত তর্কসূত্র প্রসার করিয়া, কেবল উর্ণ-পোকার ন্যায় আপনার জালে আপনি আবদ্ধ হইয়া ভাবিতেছ যে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরও তোমার তর্কের সীমায় সমাপ্ত। [illegible], তাহা নহে। তাহে আবদ্ধ হইলে বা জাল [illegible] হও, নিবিড় গূঢ় গুহা ভেদ করিয়া সঞ্চরণ করিতে না, অবিজ্ঞেয় অথচ অনুভবনীয় ঐশ্বরিক সত্তার সম্পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হও না; অন্য প্রতিবন্ধ থাকিয়া [illegible] শতানী পোষকের অক্রমশায়িতা, হত ও পর্য্যবসিত হইবে ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অসীম পদার্থ তোমার জন্য সসীমের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু সে কেবল তোমার কণ্যেক ক্ষুদ্র আবশ্যকে পরিমাণ অনুরূপ অবলম্বন পদার্থ দিবার জন্য; সে আবশ্যকের অতীতে আর সে সম্বন্ধ নাই—তোমার দোষ যে তুমি তথায়ও সসীমতা দেখিতে ব্যগ্র হও।

কেবল তর্কে এ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হয় না। যে কোন তর্ক যে কোন পদার্থকে স্বীয় ব্যুৎপত্তিবাদের ভিতরে সসীম করিয়া না আনিতে পারিলে, অগ্রসর হইতে অক্ষম; পাক তর্কে প্রমাণের আবশ্যক, কিন্তু এই বিশ্বের কোন বিষয়টি এ পর্য্যন্ত জানিয়া শেষ করিতে পারিয়াছ যে তাহাতে পূর্ণ ব্যুৎপন্ন, এবং তাহাকে সন্দেহহর স্থির প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হও? আকাশ জল যাহার অবলম্বন, সে স্থলের

অস্তিত্ব বুঝে না, অথচ মৃত্তিকাই জলের আধার। বাঞ্ছারাম, তাহার পর তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ! কুকুরেরা মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব জানিতে পারে নাই, অথচ ঐ দেখ কেমন উর্দ্ধলাঙ্গুল চারি পায়ের উপর ভর দিয়া মনের আনন্দে দৌড়িতেছে, বলা বাহুল্য যে কুকুরবুদ্ধির নিকট মাধ্যাকর্ষণের কথা নিতান্তই হাস্যাস্পদ! যে তর্কের উপর একটা সামান্য প্রাত্যহিক ব্যাপার মীমাংসা করিতে পাঁচটা এড়াইয়া যায়, তখন এ গুরুতমেরও গুরু বিষয় সম্বন্ধে, চিত্ত বুদ্ধি শ্রদ্ধা প্রভৃতি আর সমস্ত নিরূপক শক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, একমাত্র যুক্তিশক্তির উপর ইহকাল পরকাল স্থাপন পূর্ব্বক যাহারা শান্ত হইবার প্রত্যাশা করে তাহারা কি ভ্রান্ত! ফলতঃ বাঞ্ছারাম, নাস্তিকের নিকট যে ঈশ্বর অস্তিত্বশূন্য একথা ঠিক নহে; প্রকৃত পক্ষ নাস্তিকই ঈশ্বরের নিকট শূন্য হইয়া থাকে।

বল তবে সত্য সত্য এবং নিতান্তই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ভিন্ন তোমার মন উঠে না এবং মনে প্রত্যয় মানে না? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন প্রত্যক্ষে এ পর্য্যন্ত তোমার মন উঠিতে পারিয়াছে এবং কিসেইবা এখনও উঠাইতে পারে? বলিতে কি মানব, বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত মানব, এমনই অসাবাস্ত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত জানোয়ার যে, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, কিছুতেই সে চিত্তকে সাব্যস্ত ভাবে সমাহিত করিয়া তৃপ্ত এবং স্থির থাকিতে পারে না। ভাল, তুমি কিরূপ প্রত্যক্ষের প্রার্থী? যদি কৃতকার্য্য দ্বারা কর্ত্তাপক্ষে প্রমাণ প্রার্থী হইয়া বল, কোন অদ্ভুত কাণ্ড দেখিব, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই বিশ্বমণ্ডল, এই পৃথিবী, এই সৃষ্টিমধ্যে যে সকল কাণ্ড প্রতিনিয়ত অভিনীত হইয়া যাইতেছে, তাহারা সকলেইত অদ্ভুত, তাহাদের অপেক্ষা আবার অদ্ভুত বা আশ্চর্য্য কাণ্ড কি আছে? যদি বল তাহা নয়, পূর্ব্বে যাহা কখন দেখা যায় নাই এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখিব, আমি বলি তবে তুমি অন্ধ! এ সৃষ্টিতে কোন্ দ্রব্যটী হইতে দেখিয়াছ যাহা পূর্ব্বগত পদার্থসমূহ সহ সর্ব্বপ্রকারে একমূর্ত্তি এবং পৃথকত্ব-পরিশূন্য? সকলেই স্বতন্ত্র, সকলেই নূতন নূতন—এক গাছের দুই ফল, এক ঘাসের দুই পাতা, তাহাও পৃথক্ পৃথক্; ইহার পর দেশ এবং কালগত পার্থক্য ও নূতনতার ত কথাই নাই! যদি বল, এ গুলি নিয়মে সম্পন্ন হইতেছে, অপরিচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ যোগে যাহা অবশ্য হইবার তাহাই হইতেছে; অতএব যাহা সেরূপ নিয়মের অতীত, তাহাই দেখিব। ইহার উত্তরে তোমাকে এই বলি যে, এমন কোন কার্য্যই হইতে পারে না যাহার মূলে নিয়মের অভাব; অনিয়মে নিয়মের উদয়ের নামই কার্য্য, অতএব নিয়মশূন্য কার্য্য দেখা আর চাঁদকে উদিত হইতে না দিয়া চাঁদ দেখা, এ উভয়ই সমান। আজন্মপঙ্গুকে যিশুখৃষ্ট

স্পর্শমাত্র সুস্থশরীর করিয়া ছিলেন, এখানেও যে কিছু অনিয়মের কার্য্য হইল তাহা নহে, এখানেও নিয়ম অনুসারেই কার্য্য হইয়াছে; তবে যে তুমি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মানিতেছ, তাহা অনিয়ম-সম্ভব বলিয়া নহে, নিয়মের বোধ পক্ষে তোমার জ্ঞানের অভাব হেতু,—যেরূপ আদিম আমেরিকগণ বারুদ ও বন্দুক দেখিয়া বিদ্যুৎ ও বজ্র এবং তাহাদের ধারককে দেবতা জ্ঞান করিয়া ছিল! যদি যিশুখৃষ্টের পঙ্গুকে ভাল করাই আশ্চর্য্য কার্য্য বল, তবে তেমন এবং তাহা অপেক্ষা অপার গুণে গুরুতম কার্য্য সকল নিত্যই ত প্রকৃতিহস্ত দিয়া সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। বাপু, 'আশ্চর্য্য' অর্থে হাতিও নহে, ঘোড়াও নহে; যাহার নিয়ম এবং কার্য্য কারণ এখনও আমাদিগের নিকট অজ্ঞাত, তাহাই 'আশ্চর্য্য'।

স্থূলশরীরী এই সৃষ্টি, ইহাই যখন তোমার অভ্রমদৃষ্টি এবং আয়ত্ত করিবার শক্তি নাই, তখন সূক্ষ্ম বা অশরীরী এই সৃষ্টির সৃষ্টিপতিকে কেমন করিয়া দৃষ্টি এবং আয়ত্ত করিতে সাহসী হও? শরীরী শরীরী পদার্থই কত কত যখন দেখিতে পায় না, তখন আর সূক্ষ্ম অশরীরী পদার্থের কথা কেন বল। কৈ, মানব অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মশরীর গ্যাস দেখিতে পায় না ত, অনুভব করিতেও পারে না, কেবল কার্য্য বা ফল দৃষ্টে বুঝিতে পারে এইটী এই গ্যাস। ভাল কথা, কার্য্য দৃষ্টে গ্যাসের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পার, এবং ইহাও মনে হয় যে হয়ত ইহার ভিতর আরও কত গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে; কিন্তু কার্য্য দৃষ্টে ঈশ্বরে[র অ]স্তিত্ব অনুভব করিতে পার না কেন; এবং যে স্থানে অপরে 'গূঢ় তত্ত্ব 'নহিত,' বলিয়া মনে সন্দেহ হয়, এখানে সে স্থানে নাস্তিকতার উপস্থিতি করিয়া থাকই বা কি জন্য? একটা সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে মন বুঝাইতে পার কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে মন বুঝাইতে পারে না? গ্যাসের কার্য্য কেবল রাসায়নিকক্রিয়া যোগে দৃষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য অবিচ্ছিন্ন প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষবৎ, তথাপি সেই ঈশ্বরের নাম হইলেই অমনি সেখানে ঘট পট, যন্ত্র তন্ত্রের ঝাঁকা নামাইয়া বসো,—তোমা অপেক্ষা আর মূর্খ কোথায়! গ্যাসের সত্তা আর ঐশ্বরিক সত্তা এতদুভয়ের উপলব্ধিতে একই বৈজ্ঞানিক প্রকরণ প্রযুক্ত হইতে পারে; তবে একটু প্রভেদ এই, গ্যাসের সত্তাকে ইচ্ছামত খাটাইতে পার, ঐশ্বরিক সত্তাকে তাহা পার না। চাকর যখন মুনিবকে খাটাইতে পারে না, তখন সৃষ্ট এবং সৃষ্টিকর্ত্তার কথা ত অনেক দূরে। তবে চাকরও কখন কখন মুনিবকে যে একেবারে খাটাইতে না পারিবে এমন নহে, কিন্তু সে কেবল সুচাকরত্ব, ভক্তি এবং উপাসনা দ্বারা। চাকর মুনিবে এই সম্বন্ধ, কিন্তু যখন সৃষ্ট এবং সৃষ্টিকর্ত্তা লইয়া কথা, তখন জিজ্ঞাসা করি সেই সুচাকরত্ব, ভক্তি এবং

উপাসনার কতখানি আবশ্যক হওয়া উচিত?

এখন একবার তুমি কেমন অব্যবস্থিত-চিত্ত জানোয়ার, তাহা দেখা যাউক। সূক্ষ্ম বা অশরীরীর কথা ত গেল, এখন যদি বলি যে ঈশ্বর তোমাকে দেখা দিবার জন্য স্থূল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি বিশ্বাস করিবে? তাহা যদি করিতে তবে যিশুখৃষ্ট, দশ অবতার, এসকল তোমার নিকট উপহাসের পদার্থ কি জন্য? যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানবের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন এরূপ বর্ণিত হইলে বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বাইবেল আদিতে সেরূপ ত প্রভূত রূপেই বর্ণিত হইয়াছে; সাক্ষাৎ দর্শনের কথা-প্রমাণও তাহাতে অনেক আছে, কই তথাপি ত তাহা বিশ্বাস করিতে চাহ না? তাহাতে বিশ্বাস থাকিলেও ত অনেক কাজ হইত, যেহেতু একবারে বিশ্বাসশূন্যতা অপেক্ষা সদ্বুদ্ধিযুক্ত যে কোন সাত্ত্বিক বিশ্বাস থাকিলে, তাহাতেও অনেক সুফল ফলিয়া থাকে। মনে কর, তোমাদের প্রত্যয়ের জন্য যদি ঈশ্বর ঘোষণা করেন, "অমুক তিথিতে আমি দ্বিতীয় সূর্য্য-মূর্ত্তিতে আকাশে উদয় হইব"; এবং হইলেনও সেইরূপ এবং তুমিও তাহা দেখিলে, হয়ত সেই মুহূর্ত্তের নিমিত্ত প্রত্যয়ও করিলে, কিন্তু পরক্ষণে? অসাব্যস্তচিত্ত জানোয়ার! পরক্ষণে তোমার আর সে প্রত্যয় থাকিবে না। কেহ তাহা নিরাকরণ করিতে বিজ্ঞান খুলিয়া বসিবে, কেহ বলিবে দৃষ্টিভ্রম, কেহ বলিবে একটা নক্ষত্র জ্বলিয়া ছিল; আবার উত্তর পুরুষেরা বলিবে, সকলেই সেই দিন উন্মত্ত হইয়াছিল, নতুবা এমন অদ্ভুত কথা রটাইয়া রাখিবে কেন? অথবা যদি সেই সূর্য্যমূর্ত্তি, সকল কালের সকল লোককেই প্রবোধ দিবার জন্য সর্ব্বদেশব্যাপী ও সর্ব্বকালীন হইয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা নিস্তার কই? হয়ত লোকে দুই দিনের জন্য বিশ্বাস করিবে, কিন্তু তৃতীয় দিন হইতেই বুদ্ধিমান হইয়া বলিতে থাকিবে,—'ইহা আর একটী সূর্য্য, পূর্ব্বে লোকে কুসংস্কার-বিষ্ট হইয়া ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিত।' আমি কিছু এ সকল অত্যুক্তি করিতেছি না, তুমি ত নিত্যই এরূপ নানা বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাক। অতএব বাপু বাবু, আমি বুঝিতে পারি না, ঈশ্বর কিরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণযুক্ত হইলে তবে তোমার এবং তোমার বংশাবলীর বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন। এমন অসাব্যস্ত চিত্তের কোন্ বস্তুতে প্রত্যয় সম্ভব? প্রত্যয় প্রাপ্তি হয় তাহাদের, যাহারা স্বয়ং প্রত্যয় প্রতিরূপ। কিন্তু তুমি? তুমি অপ্রত্যয়ের পুঞ্জ এবং রাশি, তোমার আবার প্রত্যয়?

স্বয়ং যাহারা প্রত্যয়-প্রতিরূপ, চিত্ত যাহাদের সাব্যস্ত, চেষ্টা যাহাদের সাত্ত্বিক, তাহারা সেই ঈশ্বরকে সহজেই অনুভব করিয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিবে,

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা কঠিন নহে; কঠিন প্রত্যয়-প্রতিরূপ, সাব্যস্ত-চিত্ত, সাত্বিক চেষ্টা, ইত্যাদি সাধন দ্বারা তদর্থে প্রস্তুত হওয়া। সেরূপ প্রস্তুত না হইয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে যাওয়া, আর অক্ষরশূন্যের কালিদাসের কাব্য পাঠ করিতে অগ্রসর হওয়া উভয়ই সমান। অক্ষরশূন্য ব্যক্তি ভাবে, কথা ত এই 'খাই, যাই, নাই' ইত্যাদি, ইহার মধ্যে আবার কালিদাস কি? 'কালিদাস, 'কালিদাস' যাহারা করে তাহারা খেপিয়াছে। সকল বিষয়েরই জন্য প্রস্তুত এবং অধিকারী হওয়া এবং সকল বিষয়েরই জন্য আয়োজন আবশ্যক; এ পৃথিবীতে এই দুই ভিন্ন কোন পদার্থই উপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই। বিষয় যতই উচ্চ উচ্চ, ততই ক্লেশকর চেষ্টা, দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তি এবং অপরিমিত অধ্যবসায়ের আবশ্যক হইয়া থাকে; ইহাতে যে ফল এবং লাভ তাহা তোমার নিজেরই, অন্যের নহে। 'প্রত্যক্ষ' 'অপূর্ব্ব' 'অদ্ভুত" সকলেই তোমার পার্শ্বে রহিয়াছে, তুমিই কেবল তাহা, নিত্যদর্শন হেতু, অনুভব করিতে পারিতেছ না। ইহাতে দোষ 'প্রত্যক্ষ' 'অদ্ভুত' বা 'অপূর্ব্বের' নহে; দোষ তোমার নিজের। তুমি অনাস্থাযুক্তচিত্ত, এ বয়স ধরিয়া রথ দেখিয়া আসিতেছ, তোমার আর রথ দেখায় কৌতূহল জন্মে না। কিন্তু বালক, যে কখনও তাহা দেখে নাই, তাহার তাহা দেখিতে কৌতূহল কত! অতএব অদ্ভুত অপূর্ব্বাদির অর্থ এখন জানিবে যে কেবল আপেক্ষিক মাত্র, নতুবা পদার্থাংশে যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাই। এখন দেখ তোমার আক্ষেপ, আকাঙ্ক্ষা, বা তর্কফলের যথার্থ অর্থ ধরিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, কেন তুমি বালকবৎ নিত্য অভিনবদর্শী হইয়া সৃষ্ট হও নাই। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিও যে তুমি কর্ম্মভূমিতে প্রেরিত হইয়াছ, সে স্থলে তুমি যদি নিত্য অভিনবপ্রার্থী বালকবৎ হও, তবে আর তোমার দ্বারা কর্ম্মসাধন হইতে পারে কিরূপে? —বালকের দ্বারা কোন কর্ম্ম সাধন হয় না। দেখ, তুমি অনাস্থাদর্শী, বালক অভিনবদর্শী; আবার তোমাদের ছাড়া আরও এক দল দর্শী আছে, যাহারা আজন্ম রথ দেখিয়া আসিয়া তথাপি আবার দেখিবার জন্য ক্ষিপ্ত; ইহারা ভক্ত। তাহারা নিত্য রথ দেখিয়া আসিলেও, যতবার আবার দেখে ততবারই সেই রথ তাহাদিগের নিকট অভিনব, ততবারই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির স্থল। তুমিও সেইরূপ ভক্ত-দর্শক হও, দেখিতে পাইবে এই নিত্য দৃষ্ট বস্তুতেই আবার কত অভিনব বস্তু নিহিত রহিয়াছে; তাহা হইলে, এবং কেবল তাহা হইলেই, দৃশ্য এবং দর্শক উভয়েতেই সার্থকতা অনুভব করিয়া আনন্দবান হইতে পারিবে।

কেবল একমাত্র সভক্তি চেষ্টা দ্বারাই ঈশ্বর অনুভূত এবং কার্য্যযোগে প্রত্যক্ষ

হইয়া থাকেন। চেষ্টা ভক্তিযুক্ত হওয়া, যে কোন শিক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক। রসায়নবিদ্যা শিখিতে গিয়া যে গোড়াতেই তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করে, বা নিজ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে উহার বিবৃত বিবরণ গুলির প্রতি উদ্দেশে অসম্ভব বোধ হওয়ায় উদ্যমশূন্য হয়, সে কখনই রসায়নবিদ্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পুনশ্চ, কেবল চেষ্টা হইলেই হয় না, চেষ্টায় অধ্যবসায় চাই। অনেকে ক্ষেত্রতত্ত্ব আরম্ভ করিয়া, কেবল রৈখিক মীমাংসা পর্য্যন্ত গিয়া, জীবনে রৈখিক মীমাংসার কি প্রয়োজন তাহা দেখিতে পায় না; সুতরাং পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত কোন রূপে তাহা স্মরণ রাখিয়া, পরে অনাবশ্যক বোধে তাহাতে জলাঞ্জলি দেয়। অবশ্যই, অনন্বিতভাবে, কেবল রৈখিক মীমাংসায় কিছুই প্রয়োজন বা ফল নাই; কিন্তু যদি তাহারা আরম্ভের সেই নিরাশকর-রূপে-প্রতীয়মান অংশ অতিক্রম করিয়া একবার যাইতে পারি০ তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই সকল দিকে সার্থকতা দেখিয়া চরিতার্থ হইত। অতএব অনেক চেষ্টাশীলেরও অধ্যবসায় অভাবে চেষ্টায় নানা দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। আবার দেখ, অন্বেষণকারীর অন্বেষণ গভীর হইলেও, সে ব্যক্তি গভীরতার যতদূর সীমায় যাইতে সক্ষম বা যাওয়া উচিত ততদূর যদি না যায়, তবে একটু মাত্র ত্রুটিতে হয়ত সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবার কথা। মনে কর, ৭০ফুট বালি কাটিয়া মাটি প্রাপ্তে শোননদের পুলের ভিত্তি আরম্ভ হইয়াছে। সন্দেহবাদী-দিগের কথা শুনিতে হইলে, হয়ত ১০ফুট কাটিয়াই মাটি পাইলাম না বা পাওয়া যাইবে না বলিয়া, বালির উপরে ভিত্তি আরম্ভ করিতে হয়; এবং পুলও যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সে ভিত্তির উপরে নির্ম্মাণ না করা যায় এমন নহে, কিন্তু বালির উপর সে কাণ্ড কয় দিন থাকে? শোনার কোমতে আদি দার্শনিককে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইলে এই বালির উপর পুলের গাঁথনি হইয়া থাকে। যে পাকা ভিত্তি খুঁজিতে চায়, তাহার পক্ষে ৬৯ ফুট খুঁড়িয়া ক্ষান্ত হইলেও নিস্তার নাই; কারণ তোমার ৬৯ ফুটও যে ফল ১০ ফুটও তাহাই! বাঞ্ছারাম, নিশ্চয় জানিবে, যেখানে আমার অনু-সন্ধিৎসু শক্তির সীমা, ঠিক সেই স্থানেতেই আমার ধারণার উপযোগী অবলম্বন পদার্থরূপী ঐশ্বরিক সত্তারও পূর্ণাবয়বে বিদ্যমানতা। উহা ঈশ্বর কর্ত্তৃকই তদ্রূপ নিয়োজিত।

এই নাস্তিকতা বুদ্ধি জ্ঞানপর্য্যায় বিশেষের বিপ্লবদশাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। উপার্জ্জনের কাল, বৃথা জল্পনে ব্যয় করিবার সময় নহে, তাহা পূর্ণ সাত্ত্বিক কাল; মানুষের তখন বাক্যাড়ম্বর থাকে না, মানুষ তখন ধীরে ধীরে নিস্তব্ধে অথচ নিশ্চয় ভাবে উপার্জ্জনরত হইয়া থাকে। সর্ব্বকালেই নির্ব্বাকভাব

কার্য্যাক্ষমতার এবং বচনবাগীশী অকর্ম্মা ভাবের লক্ষণ। এ সাত্ত্বিক সময়ে চাতুরী, কাপট্য বা অসত্য বা অপরিণামদর্শী প্রগল্‌ভ ভাব বড় একটা স্থান পায় না; সুতরাং মানবও তখন প্রকৃত বলে বলী। সারল্য বলের চিহ্ন, কৌশল তাহার বিপর্য্যয়। উপার্জ্জনের পর ভোগের আরম্ভ, ভোগ হইতে স্বাভাবিক ভাবেই বিকার উপস্থিত হইয়া, কৃত্রিম কৌশল বা অলঙ্কারের প্রতি রুচি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; আত্মিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তা ক্ষয় পায়, অথচ সকল কনিষ্ঠ জেষ্ঠ হইয়া উঠে, মহত্ত্বের প্রতি ভক্তি লোপ হয়; তর্ক অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, কৌশল-সম্পন্ন বিষয় ও জটিলতাই এখন প্রশংসা স্থলীয়; অনুকরণপ্রিয়তা উপস্থিত হয়, অথচ দিগ্বিদিক-কম্পিতকারী বাক্যা-ড়ম্বরের সীমা পরিসীমা থাকে না। আসল বিষয়ে একেবারে দৃষ্টিরোধ হয়, নতুবা 'এক একতা' এই কথার অর্থ বুঝি-বার বা বুঝাইবার অভাবে সমগ্র ভারত ধ্বংস হয়! সত্যাবলম্বনে স্বাভাবিক সরল বিষয় যাহা তাহা নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যায়, বুঝাইতেও কেহ আয়াস লয় না এবং বুঝিতেও কেহ মন দেয় না। সরল বলিয়াই সামান্য জ্ঞান, প্রকৃত বলের চিহ্ন যাহা, তাহা দুর্ব্বলের চিহ্ন বলিয়া উপেক্ষিত হয়। ভৌতিক গুণ ক্রমে ইন্ধন পাইয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু আত্মিক গুণ শীর্ণ হইয়া যায়। মানব সর্ব্বদা স্বাধীনচেতা হইবে বটে কিন্তু লাগামসংযুক্ত; এ সময়ে স্বাধীন-চেতা ভাবও নাই অথচ সে লাগামও নাই। মানব যদৃচ্ছা কোলাহলে যদৃচ্ছা তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া ধ্বংসরূপী ঘূর্ণাবর্ত্তের আবির্ভাব করাইয়া থাকে। শক্তি কখনও ধ্বংস হইবার নহে, নিষ্ফলও কখন হয় না; সুতরাং চালনার ফলে যখন যেরূপ তখন সেরূপ ফল প্রসব করে। যে হিন্দুশক্তি এতকাল সুশাসনে, শাস্ত্র-প্রকটনে, তত্ত্ব উদ্ভাবনে, নানাবিধ মহৎ কার্য্যে অতিবাহিত হইত; এখনও সে শক্তি না আছে এমন নহে, এখনও তাহা তাহাই রহিয়াছে। কিন্তু তাহা এখন নিমকহারামি গোলামি করণে, গোলামির মহিমা গানে, অলঙ্কারশাস্ত্র নিষ্পীড়নে, বটতলা উজ্জ্বল করণে, কাব্য নাটক ও নবেল লিখনে, বিলাতি দর্শনবিজ্ঞানের বচনবাগীশী বিলোড়নে, নাস্তিকতা পাজিটিবাগরী বা পাষণ্ডতাকে মহত্ত্বের চিহ্ন রূপে পরিজ্ঞাপনে পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছে। আশা কেবল এই, যথায় একের সীমা তথায় অপরের আরম্ভ। যে অভিনয় মহৎ বিষয়ের মহৎ বিপ্লবে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়ের ক্ষুদ্র বিপ্লবেও তাহাই অভিনীত হয়; প্রকরণ এক, প্রভেদ কেবল উপকরণের।

নাস্তিকতা দুই প্রকার। এক ইচ্ছায় নাস্তিক, অপর বিপাকে নাস্তিক। ইচ্ছা-নাস্তিক যাহারা তাহারা ঈশ্বর না থাকেন, কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি না থাকে, পাপ পুণ্য ও পরলোক বুদ্ধি না

থাকে, ইহাই নিয়ত বাঞ্ছা করিয়া থাকে; ইহা হইলেই তাহাদের কুকর্ম্মশীল জীবনের পক্ষে ভাল হয়, এই হেতুই নাস্তিক হইবার জন্য আগ্রহবান। তাহারা আপন মনের স্বভাব অনুরূপ মনঃপুত প্রমাণ পদার্থাদি লইয়া মনঃপুত ফল আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি অনেক কর্ম্মপশু আপন কর্ম্ম-ভয়ে নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা কায়িক বাচিক মানসিক বা সর্ব্ব-প্রকার আপন কর্ম্মভয়ে, শান্তির আশায়, আগে এধর্ম্ম ওধর্ম্ম ও সেধর্ম্ম করিয়া, এবং সকল ধর্ম্মেরই শাসন অল্প ইতর বিশেষে কঠোরতায় প্রায় সমানই দেখিয়া, অব-শেষে না-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বিপাকে নাস্তিকের ভাব সেরূপ নহে। ইহারা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়া, শেষে চেষ্টা চালনায় ভ্রান্তগতি হওয়ায় দেখিতে না পাইয়া, অগত্যা নাস্তিকতার ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদের উপর এখনও আশা করা যাইতে পারে, এবং এখনও ইহাদিগকে প্রকৃত ঈশ্বরের দাস বলিয়া গণনা করা যায়। ইহারা যে নাস্তিক হয়, তাহা পরিতাপের সহিত হইয়া থাকে। আরও এক শ্রেণীর নাস্তিক আছে, তাহা প্রধানতঃ কেবল আমাদের দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়; এ নাস্তি-কতার ভাব স্বতন্ত্র, ইহা কি বুদ্ধি চালনা, কি প্রাকৃতিক গতি, কি কর্ম্মদোষ, কি ভ্রান্তমতি, ইহার কিছুরই অনুসংগে নহে। ইহা সাময়িক সখ বা ফেসিয়নের অনু-সরণে। যে ফেসিয়নের অনুসরণে কখন হিন্দু, কখন ব্রাহ্ম, কখন খৃষ্টান; যাহার অনুসরণে দাড়ি চসমা কোট পোষাকে নিত্য নূতন আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, এ নাস্তিকতাও সে ফেসিয়ন হইতে উৎপন্ন। কোন স্কুল-পাঠ্য তর্কদর্শন, কোন শিক্ষকবিশেষের বাক্যবিশেষ, বা ইয়ারগণের তদানীন্তন মতি গতি, তদ্রূপ মত পরিবর্ত্তনের পক্ষে যথেষ্ট। বঙ্গসন্তান বাঞ্ছারাম যেমন সারশূন্য আস্তিকতায় এবং ধর্ম্মপথে, তেমনিই সারশূন্য নাস্তিকতায় এবং অধর্ম্মপথে; অধিকন্তু উভয় দিকেই বচনের ছড়া ছড়ি। বিপাক-নাস্তিক, ইচ্ছা নাস্তিক, ফেসিয়ান-নাস্তিক, এই ত্রিবিধ নাস্তিকের মধ্যে ফেসিয়ান-নাস্তিকই সর্ব্বাপেক্ষা অধম; সত্য বটে যে ইচ্ছা-নাস্তিক ঘোরতর কর্ম্মদূষিত, কিন্তু তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভালয় হউক মন্দয় হউক, তাহার আত্ম-অস্তিত্ববোধ এখনও লোপ হয় নাই।

নাস্তিক-শিরোমণি বাঞ্ছারাম কথা কহিয়া, ইতিহাস খুলিয়া, নানারূপে সর্ব্বদা দেখাইয়া থাকে যে "তোমরা যে আস্তিকতাকে সকল মঙ্গলের নিদান বলিয়া থাক, তাহা, বস্তুত সকল মঙ্গলের নিদান নহে; কারণ এ পৃথিবীতে ধর্ম্ম লইয়া যত বিগ্রহ বিপ্লব রক্তপাত

ও নানা কুকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, এত আর কোন বিষয় লইয়া হয় নাই; ধর্ম্ম যদি প্রকৃত মঙ্গলের নিদান তবে তাহাতে এত অমঙ্গলের ঘটনা কেন? আর দেখ হিতবাদ বা সাম্যবাদ, যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে এই পৃথিবী প্রকৃত স্বর্গ হইয়া দাঁড়ায় কি না?" ধর্ম্ম লইয়া যে এ পৃথিবীতে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মর্ত্তব্য যে নাস্তিকতা লইয়া এ পৃথিবীতে কত কাণ্ড হইতে পারে তাহা এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে নাস্তিকতা ভাল কি আস্তিকতা ভাল তাহা প্রমাণিত হইতে পারে না। একবার, একবার মুহূর্ত্ত মাত্র, এ জগতে নাস্তিকতা, হিতবাদ, সাম্যবাদাদির কার্য্যে পরিণতি চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে ফরাসি-রাজবিপ্লব-রূপী কি লোমহর্ষণকর ফলই উৎপন্ন হইয়াছিল! ভীষণতায় সমগ্র জাগতিক ইতিহাসের কোথাও আর তাহার সমান তুলনা পাওয়া যায় না। জীবজগতের অপরাপর জীব সহ মানবও একধর্ম্মবিশিষ্ট একটি জীব বিশেষ, সুতরাং হিতাহিতশূন্য উন্মাদ ক্রূরবুদ্ধি ও পাশব ভাব, মানবে অপরাপর পশুর ন্যায় সমানই বা মানব উচ্চ স্তুতি হেতু আরও অধিক পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে। পশু হইতে উপরস্ত মানবের পার্থক্য কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্ম। এই জ্ঞান ও ধর্ম্মই স্বীয় শাসনবলে পাশবভাবকে প্রশমিত করিয়া, মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব পথে লইয়া আসিতেছে। এমন প্রত্যাশা করা যায় না যে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম স্বীয় শাসনকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া একেবারেই আপন পূর্ণ আধিপত্যের ফল ফলাইতে সক্ষম হইবে, কারণ আমরা দেখিতেছি প্রকৃতি কোন কার্য্যই সহসা নিষ্পাদন করেন না—ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে, অতর্কিত ভাবে। এ সংসারে আদিম অবস্থার শাসন যেমন ক্রমে শিথিল, আবার উত্তরোত্তর অবস্থার শাসন ক্রমে কেমন আয়ত্তকরী হইবাতে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব-বিষয়িণী অবস্থান্তর সংঘটিত হয়; এবং এই জন্যই, বাঙ্গারাম, একজন আদিম অসভ্য ও তথা হইতে পর পর তোমা পর্য্যন্ত, মনুষ্যত্ব ভাবের এত তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পাশব বল সর্ব্বদাই অন্ধ এবং আত্মবলদৃপ্ত, সুতরাং সহসা শৃঙ্খলবদ্ধ হইতে চাহে না; এই জন্য, ধর্ম্মের নামে এ জগতে কথিত যে সকল কুকাণ্ডের বিস্তার দেখিতে পাই, তাহা বস্তুত ধর্ম্মের ফল নহে; তাহা ধর্ম্ম-শাসনের প্রতি পাশব ভাবের বিদ্রোহাচরণের ফল বা পাশব ভাবের এখনও অশাসিত অংশটুকুর ক্রীড়া। জ্ঞান ও ধর্ম্মে মনুষ্যত্ব; এক্ষণে, তাহার অভাবে বা নাস্তিকতার প্রবর্ত্তনে কতদূর ও কিরূপ ফল যে ফলিতে পারে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না। তবে সাম্য-

বাদের সমতা যে তাহাতে পূর্ণভাবেই ফলিতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কে বলিবে যে বানরমণ্ডলে ধনী আছে, দরিদ্র আছে,—চাষার ক্ষেত্র বা কলা বেগুনের গাছ সকলেরই নিকট সমান প্রাপ্য!

আর একটী কথা আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি নাস্তিকতাই সত্য হয়, তবে এ সংসার চলিতে পারে কিরূপে? মানবের হিতাহিতজ্ঞান না থাকিলে, পশুবংশের ন্যায় একরূপ চলিবার পক্ষে বাধা হইত না; কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানের অস্তিত্ব যথায় তথায় সেরূপ কোন মতেত চলিতে পারে না। ঊর্দ্ধদেশের সহিত বন্ধনশূন্য হইলে, আমাদের সকল কার্য্য, সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল নীতি, সমস্তই অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। তখন ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, সত্য এবং মিথ্যা, হিত এবং অহিত, স্বদেশপ্রিয়তা, সহৃদয়তা, এ সকল অর্থহীন মনুষ্যনির্ম্মিত নির্ব্বোধের বন্ধনপাশ হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রতি নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার প্রতি নূতন অসুখের কারণ স্বরূপ হয়, যেহেতু প্রতি আবিষ্কার নূতন অভাবের উৎপাদক। তখন সভ্যতার বৃদ্ধি, প্রয়োজনজালের বিস্তার হেতু কেবল কষ্টজীবনের বৃদ্ধি বলিতে হইবে; তুমি বলিবে যে তাহা নহে, উহা সুখজীবনের বৃদ্ধি; তুমি বলিবে বটে কিন্তু তোমার শ্রেণীর অতীতস্থ আর কেহ সে কথা বলিবে না; সুখজীবন বলিতাম যদি উহা কেবল আপেক্ষিক বুদ্ধিজাত ধারণা না হইত,—তাহার সাক্ষ্য ঐ দেখ যে বসনে তুমি সন্তোষ লাভ করিতেছ, অসভ্য অরণ্যবাসী তাহা টুকরা করিয়া হেয়-নিক্ষেপ করিয়া ফেলিতেছে। আসল কথা বাপ্পারাম, যদি এ জীবন, এ জীবনের পরিণাম না থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলেই বাতুলালয়ে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছি। যে ব্যক্তি তোমার স্বদেশপ্রিয়, যে সহৃদয়, যে পরহিতের জন্য কাতর, আমি বলি প্রথম নম্বরের পাগল সেই; কারণ একরূপ সংসার যথায়, তথায় স্বার্থপরতাই একমাত্র উপাস্য দেবতা হওয়া উচিত। তুমি বলিবে পরহিতও ভাল বিষয়, আমি বলি এই "ভাল বিষয়" কেবল তোমার কথায়, তদ্ভিন্ন উহার অন্য কোন মূল নাই; তোমার মস্তিষ্কের শিরা ধমনীর আকুঞ্চন বিকুঞ্চনের একটু এদিক ওদিকের ফল মাত্র, এবং আমরা জানি তদ্রূপ আকুঞ্চন বিকুঞ্চনের বিশেষ কোন মূল নাই। "অন্যের প্রতি সেইরূপ হিত আচরণ করিও যেরূপ তোমার প্রতি আচরিত হওয়ার বাঞ্ছা করিয়া থাক"—ইহা যদি তোমার নীতিমূল হয়, তাহা হইলে দেখ ইহা দ্বারাও আমার সেই আত্মস্বার্থ সূচিত হইতেছে, প্রতিদানে যে টুকুতে আমার ভাল, কেবল সেই টুকুই অপরের জন্য করিব; তদতিরিক্ত কিছু করিলে আমার নিজের লোকসান এবং তেমন স্থলে কে না বলিবে যে আমি নির্ব্বোধ। আমি আমার স্বার্থপরতা

সহ বলি হইলাম, দেশ বা আর দশ জনে তাহাতে উপকার লাভ করিল, ইহাতে আমার লাভের অংশ কি? আমার অংশ জীবনান্ত। আরও প্রথম নম্বরের পাগল কাহাকে বলে? হিন্দু শাক্যসিংহ, হিব্রু যিশুখৃষ্ট, সামান্য লোকের মধ্যে গ্রীক লিওনিদা প্রভৃতির ন্যায় বোকা ভূভারতে নাই। জগতের অপরাপর হিতের জন্যও যাহারা জীবনের সাধারণ সুখ দিকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, যথা নিউটন, কলম্বস প্রভৃতি, তাহারাও সামান্য বোকা নহে। বাপু বাঞ্ছারাম, আবার জিজ্ঞাসা করি আমার জীবনউৎসর্গ করিয়া তোমার হিত সাধনে ফল? তুমি বলিবে যশ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যখন আমার যশোগান করিবে, আমি তখন থাকিব কোথায়? তবু যদি আমি সেই যশের লোভে মজিয়া যাই, তবে আকাশকুসুমে অপরাধ করিয়াছে কি? ভোগী থাকিলেই ভোগের মূল্য, অতএব আমি যখন থাকিব না তখন আর সে যশের মূল্য কি? আমি বলি এরূপ যে যশের ইচ্ছা, তাহাও সেই মস্তিষ্কের শিরা ধমনী আদির বিকৃত আকুঞ্চন ও বিকুঞ্চনের ফল; এবং এমন স্থলে তদ্রূপ সকল কর্ম্মের মূলদেশে বস্তুত একমাত্র খেয়াল ভিন্ন অন্য কিছু দাঁড়ায় না। 'নিজের লোকসানে দশ জনের ভাল,' 'স্বকপোল-কল্পিত ন্যায় অন্যায় বুদ্ধিভ্রমে সন্তোগ-বিরতি' যাহারা সেই সকল খেয়ালকে অবলম্বন করিয়া আত্মবঞ্চনা ও নানা চিত্ততৃপ্তিকর পদার্থ সকল পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা। যদি পাগল না হয় তবে আবার পাগল কে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তথাপি আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, এ জগত কেবল সেই একমাত্র পাগলের দল হইতেই যাহা কিছু চির-উপকৃত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে; সুবুদ্ধিদলের দ্বারা কখন হয় নাই। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—দেখা যাইতেছে যে ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিয়াও, বুদ্ধি-মানগণের সুখের অঙ্কে সঙ্কুলান হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে অকুলানই পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু পাগল যাহারা, তাহার বুদ্ধিমানদিগকে ঋণ দিয়াও, হাসিতে হাসিতে এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

নাস্তিকবুদ্ধি ব্যক্তি 'সুখ'রূপ ফলের জন্য কিছু অধিক আগ্রহবান, এবং তাহার বিবেচনায় উহাই এ জগতে এক মাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় পদার্থ; আস্তিকবুদ্ধও যে সাধারণত সে সুখ পদার্থের জন্য কিছু কম ব্যস্ত তাহা নহে। 'সুখ' পদার্থ কি?—ইহা যাহার যেমন ধারণা, সকলে সেই স্ব স্ব ধারণা অবলম্বনে ভ্রমাশয়ে, নিজ কৃত ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে বিঘূর্ণিত হইয়া-ফিরিতেছে; এবং সতে বা অসতে, যথায় যখন স্বীয় কল্পিত সুখের ছায়াপাত দেখিতেছে তখন তথায়, সতে বা অসতে, ইতস্তত বিচরণ করিয়া কদাচ আত্মতৃপ্ত, কখন বা আমূলত আত্মধ্বংস করিতেছে।

সুখ পদার্থকে একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে, এবং সুখ পদার্থ কি তাহার ধারণা প্রকৃত না হইলে, কাজেই এরূপ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। এরূপ সুখের ধারণা সাধারণত বাহ্য সম্পদে বা ভোগে নিহিত; লোকেও সদসৎ নানা পথে জীবন মন বিক্রয় করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে; অনুসরণ করে বটে, তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে তাহাদের অসুখ পদার্থের যে তাহাতে কিছু ন্যূনতা হইয়াছে তাহা নহে। সুতরাং এরূপ সুখের ধারণা ও অনুসরণপ্রণালী এ দুই যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে তাহাতে এরূপ ফল ফলিবে কেন? অপার সম্পদে ও ভোগেও আমরা দেখিতে পাই যে মানব অসুখী, অথচ অসম্পদে ও অভোগেও দেখিতে পাই যে মানব সুখী! ইহার কারণ? বাঞ্ছারাম, সুখ বাহ্য সম্পদে বা ভোগে নহে, এবং সুখও ক্ষণিক চিত্তোন্মাদ নহে। চিত্তের যে তৃপ্তি, যাহাকে চিত্তপ্রসাদ বলে, তাহাই প্রকৃত সুখ। সে সুখ একমাত্র সাত্বিক বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য সাধন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার জীবন, স্বীয় ধারণা অনুরূপ, আমূলত সাত্বিক এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ; তাহার চিত্তপ্রসাদ সর্ব্বক্ষণ, এবং সেই এ জগতে প্রকৃত পক্ষে সুখী। সুখ কর্ত্তব্য সাধনের মজুরী স্বরূপ। কর্ত্তব্য বুদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া সুখের প্রার্থনা করা, আর মজুরের কার্য্য না করিয়া মজুরী প্রত্যাশা করা, উভয়ই সমান। জ্ঞানীরা সুখের মূল স্বরূপ কর্ত্তব্য সাধনকে জীবনের উদ্দেশ্য ভাবিয়া থাকেন, এবং সুখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই তাহার অনুসরণ করেন; এই জন্য তাঁহাদের দ্বারা জগৎও স্থায়ীরূপে উপকৃত হয়, এবং সুখও তাঁহাদের অযাচিতের ন্যায় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য বুদ্ধির অভাবে যে সুখের ধারণা, তাহা মূলশূন্য ধারণা সুতরাং যদৃচ্ছা-কল্পিত ও বিকৃত; এ নিমিত্ত তাহার অনুসরণক্রিয়া ও ফলও তদ্রূপ বিকৃত হইয়া থাকে। অতএব কেবল "সুখ" "সুখ" করিয়া মাতালের ন্যায় ভ্রান্তিমদে মাতিয়া বেড়াইও না। যেমন তোমার মূলশূন্য বিকৃত সুখচেষ্টা অনীতি ও অহিতাদির কারণ স্বরূপ হয়, তোমার যশচেষ্টাও তদ্রূপ; কারণ উহাও কর্ত্তব্য সাধনের পুরস্কার বিশেষ বা সুখের অংশকলা, উহাও সুখের ন্যায় উহারই জন্য অনুসর্ত্তব্য নহে। পুনশ্চ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ব্যতীত, কেবল যশঃপ্রার্থী কখন এ জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। ভাল, যশ কত দিনের বস্তু? কাল যথায় অনন্ত, তথায় যশ দ্বিসহস্র বা দ্বিলক্ষ বর্ষ স্থায়ী হইলেও ত তাহা মুহূর্ত্তবৎ! মুহূর্ত্ত এবং বর্ষে প্রভেদ কি? ইহার ধারণা কি এতই কঠিন?

সুখের ধারণা নাস্তিকদিগের সর্ব্বদাই বিকৃত, তাহার কারণ উর্দ্ধদেশের সহসংস্রব ছিন্নে তাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব। যাহা হউক, তথাপি দেখিতে পাওয়া

যায় যে, কোন কোন নাস্তিক এখনও আপনি না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইয়া থাকে; আপনার ক্ষতি করিয়া অন্যের হিত করে; এখনও গুরুর প্রতি ভক্তি, লঘুর প্রতি দয়া; এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য, ইত্যাদির মোহ একেবারে ছাড়াইতে পারে নাই। সাধ্য কি? পথে হউক অপথে হউক, মানব স্বয়ং কর্ম্মক্ষম বলিয়াই যে সকলকর্ম্মক্ষম তাহা নহে, তাহারও সীমা আছে। সুপথমুখে হউক বা কুপথমুখে হউক, তাহার সাধ্য কি যে প্রকৃতির যে নির্দ্দিষ্ট গতি তাহা একেবারে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন হয়। অতএব নাস্তিক এবং আস্তিকের মধ্যে ফলে এই পর্য্যন্ত দাঁড়ায়,—যথায় অপরে জীবন্ত বৃক্ষের পুষ্পঘ্রাণে আমোদিত ফলের রসাস্বাদনে তৃপ্ত, নবপত্রপুঞ্জের শৈত্যে শান্ত, এবং বৃক্ষস্থ বিহঙ্গমকুলকলে মোহিত হইয়া থাকে; তথায় নাস্তিকেরও সেইই বৃক্ষ আশ্রয় বটে কিন্তু বৃক্ষ এখানে ছিন্নমূল হেতু, ফুল শুষ্ক নির্গন্ধ, ফল রসশূন্য বীতস্বাদ, পত্র শুষ্ক তাপোত্তেজক এবং কোন বিহঙ্গম আসিয়া সেই বৃক্ষে আশ্রয় লয় না—যদি আসে ত সে দাঁড়কাক! কি সুখ! কি তৃপ্তি! ইহাদের নিকট বিশ্বস্থ তাবৎ বিষয় বন্ধনশূন্য এবং বিকৃত; এবং তত্ত্বস্থলে তাবৎ বিষয়েরই মূল অনিরাকৃত বা কল্পনায় নিহিত, সকলেই পৃথক পৃথক ও সামঞ্জস্যশূন্য; বহুত্বই সর্ব্বত্র, একত্ব কোথাও নাই। কিন্তু যথায় তদ্রূপ দুষ্ট বুদ্ধির অভাব, তথায়?—সর্ব্বত্রই বহুত্বের মধ্যে একত্ব বিরাজিত; সর্ব্বত্রই সকল বিষয় নিরাকৃত হইয়া মধ্যবিন্দুতে আসিয়া সমাহিত। মধ্যবিন্দু হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া তাবৎ বিষয় দিগন্ত-প্রসারিত হইতেছে, আবার সে সকলেই পর্ব্বে পর্ব্বে গুটিত হইয়া মধ্যবিন্দুতে আসিয়া সংম্মিলিত হইয়া যাইতেছে। কি অচিন্তনীয়! কি অনন্তবিকাশী লীলা-প্রকট!

যখন মানবীয় অপরাপর সকল প্রকার চিত্তবৃত্তি, যথা বুদ্ধি বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি, পর পর পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয়, তখন বলা বাহুল্য যে আস্তিকতা ও তাহার বৈপরীত্যসাধক নাস্তিকতা সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যে কোন বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা বা বিকারে, বস্তু ফলত একই; প্রভেদ কেবল অবস্থাদ্বয়ের অন্যতর ভাব। অতএব যখন যে প্রকৃতির আস্তিকতা, তখন নাস্তিকতাও সেইরূপ প্রকৃতির হয়। আস্তিকতা যখন দেবতত্ত্ব লইয়া, নাস্তিকতাও তখন দেবতত্ত্ব লইয়া। আস্তিকতা যখন জ্ঞানকাণ্ডের উপর, নাস্তিকতাও তখন জ্ঞানকাণ্ড-আশ্রয়ী। আস্তিকতা যখন বৈজ্ঞানিক, নাস্তিকতাও তখন বৈজ্ঞানিক আকার ধারণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই বৈজ্ঞানিক; বর্ত্তমান বঙ্গীয় আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই ফেশিয়ন-প্রাণ। আমরা যে সময়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ের

আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই আংশিক দেবতত্ত্ব এবং আংশিক জ্ঞান-কাণ্ড আশ্রয়ী। গ্রীকের নাস্তিক-শিরোমণি এপিকুরস্; হিন্দুর নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক,—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

গ্রীকভূমে তত্ত্বাঙ্ক নাস্তিকতা আরিষ্টি-পুসের সময় হইতে দৃঢ় হয়। আরিষ্টি-পুসের পূর্ব্বগত তত্ত্ববিৎবর্গের কাহারে কাহাতে যদিও নাস্তিকতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা আরিষ্টিপুসের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব শাস্ত্র-স্বরূপে শ্রেণীনিবদ্ধ হয় নাই। আরিষ্টিপুস তত্ত্ববিদ্যার ব্যবসায়ী ছিলেন। ইনি সক্রেটিসের নিকট তত্ত্বশিক্ষা করেন, শেষে আত্মবুদ্ধির কৌশলে নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি প্লেটোর সমসাময়িক লোক। ইহাঁর বিশ্বাস যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে যেমন সে সেইরূপ হইয়া, মিলিত হইতে পারাই তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের একটি বিশেষ ফল। ইহাঁর মতে পরম পুরুষার্থ,—যে কোন উপায়ে সুখ বা প্রমোদলাভ, এবং তাহা যদি কোন অপকৃষ্ট বা ঘৃণিত উপায় দ্বারা সাধিত হওয়া প্রয়োজন হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। ইনি বলিতেন শারীরিক সুখ মানসিক সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং শারীরিক দুঃখ মানসিক দুঃখ অপেক্ষা মন্দ। পৃথিবীতে সুখ এবং দুঃখ এই দ্বিবিধ পদার্থ আছে. লোকে যে কোন দ্রব্য সুখজনক তাহা আহরণ করিবে ও সেইরূপ যে কোন দ্রব্য দুঃখজনক তাহা যে কোন উপায়ে পরিহার করিবে।

আরিষ্টিপুস অতিশয় কুতার্কিক ছিল, এবং কুতর্কযোগে অসৎকে সৎ এবং সৎকে অসৎ বলিয়া ভুলাইত। একদা প্লেটো তাহাকে অমিতব্যয়িতার জন্য ভর্ৎসনা করায়, আরিষ্টিপুস্ প্লেটোকে জিজ্ঞাসা করিল,

"দিওনিস্যুস্ ভাল লোক কি না?"

প্লেটো। "ভাল।"

আরি। "দিওনিস্যুস্ আমার অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করে অথচ সে ভাল; অতএব দেখ অধিক ব্যয় করা ও ভাল মানুষ হওয়া এক সঙ্গে না হইতে পারে এমন নহে।"

একদা কোন ব্যক্তি আরিষ্টিপুস্‌কে একটা বেশ্যা লইয়া ঘরকন্না করার নিমিত্ত ভর্ৎসনা করিলে,

আরি। "ভাল, একটা বাড়ী যথায় বহুলোক বাস করিয়া গিয়াছে তথায়, এবং যথায় কেহ কখন বাস করে নাই তথায়, এ দুই স্থানে বাস করায় কিছু প্রভেদ আছে কি না?"

উত্তর। "না।"

আ। "যে জাহাজে আগে বহুসহস্র লোক পার হইয়া গিয়াছে, এবং যাহাতে কেহ কখন পার হয় নাই, এই দুয়ে পার হওয়ার কিছু প্রভেদ আছে কি না?

উ। "না"।

আ। "এখানেও ঠিক তাহাই, একটা স্ত্রীলোক যাহার সঙ্গে বহুলোক

সহবাস করিয়া গিয়াছে, এবং যাহাতে কেহ কখন উপবত হয় নাই, আমার পক্ষে এ উভয়ই সমান।"

এই স্ত্রীলোকটি গর্ভিনী হইলে, আরিষ্টিপুসের নিকট প্রকাশ করে যে তাঁহা কর্তৃক তাহার গর্ভ ধারণ হইয়াছে; ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতি আরিষ্টিপুসের উত্তর—"সেকি কথা! কঁটাবন বেড়াইয়া কে কবে বলিতে পারে যে কোন কাঁটায় তাহার আঁচড় লাগিয়াছে?" এরূপ তর্ক ও বুদ্ধি খরচে আরিষ্টিপুসর শিষ্য থিওডোরুস আরও পণ্ডিত। এই ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে, অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী ছিল; তজ্জন্য ইহার তর্ক এইরূপ ছিল:—

থি। "যে স্ত্রীলোক শিক্ষিত, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না?"

উ। "অধিক।"

থি। "যে বালক বা যে যুবা যে পরিমাণে শিক্ষিত, তাহার প্রযোজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না?"

উ। "অধিক।"

থি। "এই নিয়ম অনুসারে যে স্ত্রীলোক বা যে বালক যে পরিমাণে সুন্দর, তাহারা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কি না'?'

উ। "শ্রেষ্ঠ।"

থি। "যে যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না?"

উ। "অধিক।"

থি। "ভাল, তাহা যদি হইল, তবে এখন দেখা যাইতেছে যে সৌন্দর্য্যের প্রয়োজনীয়তা এই যে তাহা অপরের দ্বারা সম্ভোগিত হয়; আমি সেই সম্ভোগ করিয়া থাকি। প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজনীয় ভাব রক্ষা করাই ন্যায়সঙ্গত, তদন্যতর অন্যায়, আমি সেই অন্যায় কার্য্য করি না।"

ইহারা অর্থ প্রাপ্তির জন্য কোন প্রকার নীচতা স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিল না। দিওনিস্যুসের নিকট আরিষ্টিপুস একদা অর্থ যাচ্ঞা করায়, দিওনিস্যুস্ বহু বিরক্ত হইয়া ও ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন "তুমি বলিয়াছিলে না যে জ্ঞানীদিগের কখন অভাব হয় না?" আরিষ্টিপুস,—"আগে আমাকে কিঞ্চিৎ দিউন, পরে যাহা বলিবেন তাহার উত্তর দিতেছি।" দিওনিস্যুস্ কিঞ্চিৎ দান করিলে পর, অর্থ দেখাইয়া—"এই দেখুন আমার কথা সত্য কি না।" আর এক সময়ে,

দি। "কি জন্য তুমি এখানে আইস?"

আ। "যখন তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যক ছিল, তখন সক্রেটিসের দুয়ারে যাইতাম; এখন অর্থের আবশ্যক, এখন তোমার দুয়ারে আসিয়া থাকি।" আরও এক সময়,

দি। "তত্ত্ববিদেরা কি কারণে ধনীর দুয়ারে আসিয়া থাকে, ধনীরা ত তত্ত্ববিদের দুয়ারে যায় না?"

আ। "তাহার কারণ তত্ত্ববিদেরা আপন অভাব যাহা তাহা বুঝে, ধনীরা আপন অভাব বুঝে না।"

ইহার মতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতে ভাঙ্গা এবং আভাঙ্গা ঘোড়ায় যে প্রভেদ সেই প্রভেদ। আরিষ্টিপুসের শিক্ষায় 'ন্যায়' 'যশ' 'অযশ' বলিয়া বস্তুত কোন পদার্থ নাই, লোকেব মনের খেয়াল হইতে ঐ ঐ বিষয় উৎপন্ন ও বদ্ধমূল হইয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

থিওডোরুসের মতে,—'সুখ এবং দুঃখ, এই দুইটী মুখ্য বস্তু। সুখ জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয়, দুঃখ অজ্ঞান হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। বন্ধুত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কারণ তাহা কি নির্ব্বোধ কি জ্ঞানী কাহারই কার্য্যে লাগে না যেহেতু, প্রথমোক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট কার্য্য উদ্ধার হইলেই বন্ধুত্বের কারণ লোপ হইল; এবং জ্ঞানী যাহারা তাহারা আপনাতেই পূর্ণ আত্মা, অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। বিজ্ঞতা থিওডোরুসের মতে প্রধান আচরণীয় গুণ। যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সে কখন স্বদেশপ্রিয়তার মোহে আশঙ্কার স্থলে পা দেয় না, কারণ কি জন্য সে পাঁচ জন মূর্খের মঙ্গল হেতু আপনার বিপদ জড়াইতে যাইবে; বিশেষ যে ব্যক্তি জ্ঞানী, দেশ তাহার নিকট কোন সীমাবদ্ধ স্থান নহে, সমস্ত পৃথিবীই তাহার দেশ। জ্ঞানী ব্যক্তি যে.সে সচ্ছন্দে চুরী, বেশ্যাগমন বা যে কোন অপকর্ম্ম সময় মত করিতে পারে; কেবল এই পর্য্যন্ত দেখা আবশ্যক যে, যে সকল নির্ব্বোধমণ্ডলীর ধারণা অনুসারে ঐ ঐ গুলি অপকর্ম্ম বলিয়া গণিত, তাহাদের দৃষ্টিতে না পড়ে, কারণ সমাজ রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। জ্ঞানী ব্যক্তি দেশ কাল পাত্র বজায় রাখিয়া যে কোন বিষয়ে মনের সাধ মিটাইতে পারেন। এইটি সত্য, এইটি অসত্য, ইত্যাদি ন্যায় অন্যায়, সৎকর্ম্ম অপকর্ম্ম, এ সকল কেবল লোকের ধারণা ও চলিত রীতি হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন উহাদের আর কোন অর্থ বা মূল নাই, ইত্যাদি। ইহাই অল্প ইতর বিশেষে আরিষ্টিপুসের সাম্প্রদায়িক তাবৎ নাস্তিকের মত। আরিষ্টিপুসের সম্প্রদায় ব্যতীত, ইউক্লিড ও বিওন প্রভৃতি আরও বহুতর নাস্তিকতত্ত্ববিৎ ও তাহাদের শিষ্যানুশিষ্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

সমর-সেখর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মেষ চরাইয়া ধায়
সুখে বালা গান গায়,
কেহ না মজিল তাহে,—কে হেন বুঝিল।
বুঝিলা সন্ন্যাসী এক,—বুঝিয়া মজিল॥

সংবৎ ১৫৭১ অব্দের চৈত্রমাসের একদা প্রদোষকালে পুনার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-স্থিত একটী উচ্চ শৈলকূটের উপত্যকা ক্ষেত্রে একটী বালিকা কতকগুলি মেষ চরাইতেছিল এবং চরাইতে চরাইতে সময়ে সময়ে গান গাইতেছিল। নিকটে আর কেহই ছিল না, কেবল একজন সন্ন্যাসী একটী বিশাল বটবৃক্ষের তলদেশে বসিয়া একমনে সেই বালিকার গান শুনিতে ছিলেন। বসন্তের প্রদোষ: সূর্য্যদেব হাসিতে হাসিতে পাটে বসিতেছেন। তাঁহার হাসিমাখা রমণীয় কিরণমালা বালিকার সদ্যপ্রস্ফুটিত কমলবৎ সুন্দর মুখমণ্ডলে পড়িয়া আরও রমণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। স্নিগ্ধ মলয়পবন তাহার অলকদাম লইয়া এক এক বার খেলা করিতেছে; আর এক একবার নিস্পন্দ হইয়া যেন বালিকার মনোমোহন গান শুনিতেছে। বালিকা গাইলেন—

বরদে বরদে বরবরণী,
কালী করালী কাল কৈতবহারিণী।
ওমা! সাগর-অম্বর পরি
গিরিরাজে শিরে ধরি,
বিজয়ী সরিৎশৈল কীরিটি-শিখরিণী
কোটী করালভুজে কৃপাণধরা রঙ্গী।

সন্ন্যাসী তৃণাসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন, নিস্পন্দ নিষ্পলক নয়নে বালিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু এক পদও সরিলেন না। বালিকা গাহিতে লাগিল:—

ওমা! ধরাধর বক্ষ ঢাকি,
ধরণীরে পায়ে রাখি।
হাসিতে হাসিতে নাশিলে সব ধরণী
এবে কোথা সে শকতি শক্তিধারিণি!
যে শকতি পূজা করি
রাবণে নাশিলা হরি
রামরূপ ধরি ত্রেতাযুগেতে;
পূজি যাহা ধনঞ্জয়
করিলা ভুবন জয়,
বিমুখিলা সেকন্দরে, পুরুকুলমণি;
এবে কোথা সে শকতি, শক্তিধারিণি!
উর উর ত্বরা করি,
উর মা ভুবনেশ্বরি,
ষট্‌-চক্রমাঝে আজি ষড়্‌রিপুহারিণী।

বালিকা এক মনে গাহিতেছিল, সন্ন্যাসীকে দেখে নাই, এক্ষণে হঠাৎ তাঁহাকে নিকটে দেখিয়া থামিল। সন্ন্যাসী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, বৃক্ষতলে থাকিয়াই তাঁহার গান শুনিবেন; কিন্তু গান শুনিতে শুনিতে সে কথা ভুলিয়া

অমনি বালিকার নিকটে গিয়া পড়িয়া ছিলেন। বালিকা থামিলে, তাঁহার সে মোহ দূর হইল; তিনি স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন "কেন, থামিলে কেন?—গাওনা, তোমার গান আমাকে বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। আহা! এমন গান তোমাকে কে শিখাইল?"

বালিকা ঈষৎ সলজ্জ ভাবে উত্তর করিল "কেহ শিখায় নাই, আমি নিজে শিখিয়াছি।"

"কোথায় শিখিলে?—কি প্রকারে শিখিলে?"

"ষট্‌চক্রের ভিতর ঠাকুররা সব প্রত্যহ এই গানটী গাহিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদেরই মুখে শুনিয়া শিখিয়াছি।"

সন্ন্যাসী চমৎকৃত হইলেন; ভাবিলেন, "পরের মুখে শুনিয়া কি এমন ভাল করিয়া শিখা যায়? অবশ্য বালিকা সামান্যা নয়।"

ইহার পর এই মাত্র যে ষট্‌চক্র ও ঠাকুরদের কথা বালিকার মুখে শুনিলেন, তাহা কি? ষট্‌চক্র ত শরীরের মধ্যস্থিত পদ্মাকার ছয় প্রকার চক্র, তবে তাহার মধ্যে আবার ঠাকুর কে? শাস্ত্রে আছে, এক একটী চক্রে এক একটী দেবতার অধিষ্ঠান। তবে কি বালিকা সেই দেবতাদিগকেই নির্দ্দেশ করিয়া বলিল? সন্ন্যাসী কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই সকল চিন্তা ঝটিতি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত ও প্রসারিত হইয়াছিল। পরক্ষণেই তিনি বালিকার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, বালিকা মেষ তাড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসী তাহার নিকটে গেলেন, "এখনও তত অন্ধকার হয় নাই, কেন তুমি তাড়াতাড়ি করিতেছ?"

"ইহা অপেক্ষা অন্ধকার হইলে আমি আর চক্রে প্রবেশ করিতে পাইব না।" বালিকা ত্রস্তপদে উপত্যকাক্ষেত্রের উপর চলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া আগ্রহের সহিত বলিলেন, "যদি নিতান্তই যাইবে, তবে আমার দুইটী বিষম সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দাও, আমি অন্তরের সহিত তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বৃথা হইবে না।"

বালিকা দাঁড়াইল, বলিল "কি, কি অনুমতি করুন।"

"তুমি যে এই মাত্র ষট্‌চক্র ও ঠাকুরদের কথা বলিলে তাহা কি?"

"ষট্‌চক্র নারায়ণ স্বামীর আশ্রম, আর ঠাকুররা তাঁহার শিষ্য।"

নারায়ণ স্বামীর নাম কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সন্ন্যাসী হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার নয়ন দিয়া দুইটী তীব্র জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "নারায়ণ স্বামী! সে দুষ্ট এখানে কবে আসিল?"

বালিকা তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিল না; বলিল "তিনি এখানে আজ এক বৎসর আসিয়াছেন।"

"তুমিও কি সেই আশ্রমের ভিতর থাক?"

"আজ্ঞা, হাঁ, আরও অনেকগুলি স্ত্রীলোক থাকে।"

"সে আশ্রম কিসের আশ্রম?"

"শক্তির আশ্রম, আমরা সকলেই দেবীর পূজা করিয়া থাকি।"

সন্ন্যাসী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "স্ত্রীপুরুষে শক্তির উপাসনা?"

"অসম্ভব কি? আপনি দেখিতে চান?"

"না, সে কলুষিত আশ্রমে আমি যাইতে চাহি না" বলিয়া সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া উপত্যকার মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন এবং দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। বালিকা মেষপাল লইয়া ষট্‌চক্রের দিকে অগ্রসর হইল, এবং অল্প সময়ের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া আপনার দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

বালিকার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া এক ব্যক্তি আশ্রমের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, বালিকা প্রবেশ করিলে সে বলিল "কি, মা, আজ এত বিলম্ব হইল কেন? —কাহাকেও কি দেবীসঙ্গীত শুনাইতেছিলে না কি?"

"হাঁ, এক জন সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইয়াছিল, তাঁহারই সহিত কথা কহিতে এত দেরি হইল।"

"সন্ন্যাসী! তিনি কোন পথে গেলেন?"

"এই দিকেই আসিতেছিলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া ফিরিয়া গেলেন।"

"ফিরিয়া গেলেন! তুমি কি আমার নাম তাঁহাকে বলিয়াছিলে?"

"বলিয়াছিলাম।"

"আ! পাগলী!" বলিয়া সেই ব্যক্তি স্বহস্তে আশ্রমদ্বার রুদ্ধ করিয়া বালিকার সহিত আশ্রমের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আর এক ব্যক্তির সহিত পুনর্ব্বার বাহিরে আসিলেন এবং তাহাকে মঠের দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন "সতর্কে থাকিও; আমি এক্ষণে সেই সন্ন্যাসীর অন্বেষণে চলিলাম; আকাশের যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে শীঘ্র ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।" তিনি মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মঠের বিরাট লৌহকবাট আবার প্রচণ্ড ঘর্ঘরশব্দে রুদ্ধ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী উপত্যকার মধ্য দিয়া দ্রুত বেগে উত্তর মুখে গমন করিতে লাগিলেন। শুক্ল সপ্তমীর শশধর [illegible] পশ্চিমাচলের শিরোদেশে থাকিয়া [illegible] শুভ্র কিরণে এতক্ষণ জগৎকে বিধৌত করিতেছিল। চন্দ্রের বিমল কৌমুদীর সাহায্যে পথ দেখিয়া সন্ন্যাসী [illegible] দ্রুত পাদক্ষেপে চলিতেছিলেন; কিন্তু সে শশাঙ্করেখা পশ্চিমাকাশে বিলীন হইতে না হইতেই হঠাৎ [illegible] রূপান্তর হইল। পশ্চিমাকাশ [illegible]

নিবিড় ধূমপুঞ্জের ন্যায় একখানি মেঘ দেখা দিল। মেঘখানি সানুদেশ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিল;—উর্দ্ধে উঠিয়া ক্রমে ক্রমে নিবিড়তর হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তৎপশ্চাৎ বপ্রকেলিমত্ত এক একটী মাতঙ্গের ন্যায় এক একখানি মেঘ কাঁপিতে কাঁপিতে তরঙ্গ বেগে উত্থিত হইল,—গিরিশৃঙ্গ ছাড়িয়া যত উপরে উঠিতে লাগিল, ততই তাহাদের বেগ দ্রুততর হইতে লাগিল। একখানির পশ্চাৎ একখানি ছুটিল, পশ্চাৎ আর একখানি,—ক্রমে আর একখানি,—দুইখানি—তিনখানি, দেখিতে দেখিতে অগণ্য মেঘাবলি অনন্ত গগনপথে অনন্ত স্রোতে ছুটিয়া চলিল। বহুদূর ধাবিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল,—ক্রমে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া বিদ্যুদগ্নি উদ্গারণ পূর্ব্বক তীব্র বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। এক এক খানি করিয়া সংশ্লিষ্ট হইতে হইতে ক্রমে সবগুলি মিশিয়া গেল, সকলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া অবশেষে এক হইয়া গেল,—সমস্ত আকাশ ছড়াইয়া পড়িল—জগৎকে নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল; দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অনন্ত বিদ্যুতের বিকট হাস্য, নিবিড় জলদাবলির শ্রবণভৈরব গর্জ্জন এবং করকামিশ্রিত শিলামূল তীব্র বৃষ্টিবিন্দুনিচয়ের প্রচণ্ড প্রহারে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সন্ন্যাসীর মাথার উপর দিয়া প্রকৃতির এই ভীষণ অত্যাচার বহিতে লাগিল। তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন। কোথায় যাইতেছেন—কোথায় যাইবেন—কোথায় যাইলে আশ্রয় পাইবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মাথার উপর মুষলধারে তীব্র করকা ও বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রতিক্ষণে শত শত তড়িৎ উন্মাদ হাস্যে তাঁহাকে ভয় দেখাইতেছে, বজ্র বিকটরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাতে অণুমাত্র ভীত নহেন। যেন সেই প্রলয়ঙ্করী প্রকৃতির প্রাদুর্ভূত একটা অদ্ভুত জীবের ন্যায় তিনি সেই অনন্ত ধারাপতন সহ্য করিয়া এক দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকৃতির ভীষণমূর্ত্তি আরও ভীষণতর হইয়া উঠিল। এদিকে নিম্ন উপত্যকাক্ষেত্রে রাশি রাশি বারি একত্রিত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, জল ততই বাড়িতে লাগিল। অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে তিনি মনে ভাবিলেন বুঝি কোন নদী মধ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছেন;—সুতরাং যে দিকে যাইতেছিলেন, সেই দিক হইতে ফিরিলেন; ফিরিয়া বিপরীত দিকে চলিলেন; কিন্তু জলরাশি যেন ক্রমে বাড়িতে লাগিল। সেই অনন্ত জলরাশি যে, কোথা হইতে আসিল, তাহা সন্ন্যাসী কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে

জলরাশি বাড়িতে লাগিল; সন্ন্যাসী দেখিলেন, তাহা তাঁহার জানুদেশ স্পর্শ করিয়াছে; দেখিতে দেখিতে জানুদেশ অতিক্রম করিয়া কটিতট পর্য্যন্ত গ্রাস করিল,—ক্রমে বক্ষে উঠিল—স্কন্ধদেশ আক্রমণ করিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন আর অল্প সময়ের মধ্যেই জলরাশি তাঁহার মাথার উপর উঠিবে। তখন তিনি উল্লম্ফন সহকারে জলরাশির উপর ভাসিয়া উঠিলেন এবং অবলীলাক্রমে একদিকে সন্তরণ করিয়া চলিলেন। তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা যে পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হয়েন। কিন্তু সেই উচ্চ শৈলরাজি যে কোন দিকে বিরাজিত তাহা তিনি নিবিড় অন্ধকারে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া গভীর অন্ধকাররাশিকে ক্ষণে ক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে অন্ধকার অপগত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও নিবিড়তর হইয়াছিল। সুতরাং সন্ন্যাসী দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট তরির ন্যায় এক দিকে ভাসিয়া গেলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহার হস্তপদাদি অসাড় হইয়া পড়িল। ক্রমে চেতনা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। তিনি মথিতহৃদয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মা, জগজ্জননি! তোমার আদেশ পালন করিতে পারিলাম না। মনে ছিল হৃদয়ের রক্ত দিয়া তোমার তুষ্টিবিধান করিব;—কিন্তু মনের আশা বুঝি মনেই রহিল; তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সেরেজের উদ্ধারার্থ গোয়ার শাসনকর্ত্তা আলফান্সো আলবুকার্ক একখানি রণতরি প্রেরণ করিলেন। পর্ত্তুগিজভাষাভাষী ব্যক্তি সেই জাহাজের পথপ্রদর্শক হইয়া চলিলেন। জাহাজে দশটী কামান এবং এক শত জন পর্ত্তুগিজ সৈন্য ছিল। জাহাজখানির নাম আর্মেডিস্। ভগ্ন দ্বীপের নিকট যে জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছিল, আর্মেডিস্ তাহার মত বড় নহে। ইহার তিনটী মাস্তুল। গোয়া নগরীর বন্দরে জাহাজ সজ্জিত করিয়া নাবিকগণ পাল গুটাইয়া পবনদেবের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। সৈনিকগণ নূতন দেশ জয় করিবে ভাবিয়া আশার সোহাগে কতই উৎফুল্ল হইতে লাগিল। কেহ মনে মনে রাশি রাশি রত্ন লুণ্ঠন করিয়া যুদ্ধ ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবার কল্পনা করিতেছে, কেহ বা শত সহস্র রাজকন্যা বন্দী করিয়া রাজকুমারগণের জন্য পর্ত্তুগেলে পাঠাবার ইচ্ছা করিতেছে, কেহ বা প্রকৃত যুদ্ধজীবীর ন্যায় যুদ্ধে উচ্চ সম্মান লাভের কামনায় উৎসাহিত হইতেছে। জীবনতোষিণী আশার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মনে মনে পূজা করিয়া তাহারা স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্রাদি মার্জ্জিত করিতে লাগিল।

কেহ নিজ বন্দুক, কেহ তরবার, কেহ বা ভল্লটীকে মাজিয়া ঘষিয়া পালিশ করিয়া লইল, আবার কেহ বা কোন একটী কামানের একটু আধটু মরীচা তুলিতে লাগিল। এইরূপে একটী সমগ্র দিবাভাগ কাটিয়া গেল। রজনী উপস্থিত হইবামাত্র মাল্লারা জাহাজের দারু ও লৌহ নির্ম্মিত সোপনাবলি উপরে তুলিয়া লইয়া একস্থলে অগ্নি জ্বালিল এবং তাহার চারি দিক বেষ্টন পূর্ব্বক অগ্নি সেবন করিতে করিতে নানা প্রকার গল্পে প্রবৃত্ত হইল। এদিকেকাপ্তেন সাহেবসেই পর্ত্তুগিজবেশী পুরুষকে নিকটে ডাকিয়া সুখালাপে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। উভয়েরই বিশুদ্ধ পর্ত্তুগিজ ভাষায় কথোপকথন হইতে লাগিল। আমরা তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকটিত করিলাম।

পর্ত্তুগিজবেশী আসন গ্রহণ করিলে কাপ্তেন সাহেব বিনম্রভাবে কহিলেন "মহাশয়ের নামটী কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে—"

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ভদ্রলোক ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাতে আর সঙ্কোচ কি? আজ্ঞা, এ দীনের নাম ভন-দি-গামা। ভদ্রতার অনুরোধে নামের সঙ্গে একটু পরিচয়ও না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।" তিনি কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিলেন; কাপ্তেন হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব। আপনার নাম শুনিয়া বোধ হইতেছে, মহাশয়, মহাত্মা ভাস্কোদি-গামার কেহ হইবেন।"

ভন বিনীত ভাবে বলিলেন "মহাশয়! অধিক আর কি বলিব;—তিনি সম্পর্কে এ দীনের মাতামহ হয়েন।"

"মাতামহ! মাতামহ! তাহা হইলে আপনি মাতৃ-অংশে উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন" আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আনন্দগদ্গদ ভাবে কাপ্তেন সাহেব বলিয়া উঠিলেন এবং ভনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

ভন পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "ভাস্কোদি-গামার আডিলা ও ইষাবিলা নামে দুইটী কন্যা ছিলেন, দীন ভন-দি-গামা সেই জ্যেষ্ঠা আডিলার গর্ভে জন্মিয়াছে।"

কাপ্তেন। "পরিচয় শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। এক্ষণে জানিবার কৌতূহল হইতেছে, আপনি সেরূপ উচ্চ বংশীয় হইয়া এরূপ নাবিকের কার্য্যে কেন ব্যাপৃত হইয়াছেন?"

ভন। "বলিতে গেলে ইহা আমার একরূপ স্বেচ্ছাবশতঃই বলিতে হইবে। রাজানুগ্রহে পিতা এলগ্রেভে একখানি বড় জমিদারী পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমার বড় আসক্তি নাই। বাল্যকাল হইতে নৌবিদ্যা আলোচনা করিয়া আসিতেছি। আতলান্তিকের শিলাময় উচ্চ বেলাভূমে বসিয়া যখন তাহার অনন্ত তরঙ্গলীলা এবং ভীষণ উচ্ছ্বাস দেখিতাম, তখন মন সহসা উন্মত্ত

হইয়া উঠিত, সংসারের চিন্তা ছাড়িয়া সেই আতলান্তিকের অতল—অনন্ত—আকাশস্পর্শী জলরাশির সহিত মিশিয়া যাইত। মনে হইত, তাঁহার অগণ্য বীচিমালার ন্যায় স্বাধীনভাবে তাহার বক্ষের উপরে ছুটিয়া বেড়াই; কোথাও তাহার কূল আছে কি না, দেখিয়া আসি। এইরূপ চিন্তাতেই দিন কাটিয়া যাইত। ক্রমে নৌ-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম; অধ্যয়ন করিতে করিতে য়ুরোপ ও আমেরিকায় স্থলে ভ্রমণ করিয়া আসিলাম, শেষে ভারতের বিবরণ শুনিয়া এদেশে আসিবার ইচ্ছা হইল। সেই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার আশায় সেরেজের সহিত আসিলাম। কিন্তু আসিয়া এক হইতে আর হইল,—বিপাকে পড়িলাম। এখন এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, তবেই ত মঙ্গল; নতুবা লাভেমূলে সব যাইবে। যিশুমেরিয়া! তোমাদেরই ইচ্ছা।" গভীর দীর্ঘশ্বাসে ভন-দি-গামার হৃদয় স্ফীত হইল। তিনি কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, কাপ্তেন রুমাল বাহির করিয়া অপাঙ্গ হইতে একটী অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিলেন। সহসা ভনের অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাস্যরেখা বিভাত হইল। কিন্তু তিনি তখনই তাহা গোপন করিলেন, কেহই দেখিতে পাইল না; গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে পরিচয় হইল, তখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আর বাধা কি? বলি, মহাশয়, এই সুদূর ভারতে পর্ত্তুগেলের শাসন কিরূপ বুঝিতেছেন? আপনি বোধ হয় এদেশে অনেক দিন আছেন, অতএব এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর আপনার নিকট হইতে পাইব মনে হইতেছে—"

ভনের কথা শেষ হইতে না হইতে কাপ্তেন ধীরগম্ভীর ভাবে বলিলেন "বড় নিরাপদ বুঝিতেছি না।"

"কেন? দেশীয়েরা কি বড় দুর্দ্দান্ত?"

"যেমন দুর্দ্দান্ত, তেমনই যুদ্ধবিশারদ। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে এ বয়সে অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ রণনিপুণ ও প্রতাপান্বিত জাতি কোথাও দেখি নাই। ইহাদের যুদ্ধকৌশল দেখিলে ইহাদের এক একটীকে মার্থের অবতার বলিয়া বোধ হয়।"

"তবে কি প্রকারে এই দূরদেশে মহাত্মা ইমানিউলের রাজ্য দৃঢ় থাকিবে?"

"আমি তাহাই ভাবিতেছি, বোধ হয় অসিবল ভিন্ন ভারতে পর্ত্তুগিজ আধিপত্য দৃঢ় রাখিবার উপায়ন্তর নাই।"

"আপনার এরূপ ধারণায় আমার সন্দেহ জন্মিতেছে;—বলিতে পারি না বোধ হয় এরূপ ধারণা ভ্রান্ত! ভাল, ভারতবাসী কি অত্যাচার সহিতে পারে?"

"রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিয়া কোন মানব অত্যাচার সহিতে পারে?"

"মহাশয়! প্রগল্ভতা মার্জ্জনা করিবেন;—আপনি পর্ত্তুগিজ হইয়া এ কথা কেন বলিতেছেন? একবার নূতন

জগতের দিকে চাহিয়া দেখুন ; দেখুন পর্ত্তুগিজ ও স্পানিয়ার্ডগণ দেশীয়দিগের উপর কিরূপ অত্যাচার করিতেছেন ;—তথাপি তাহারা কেমন তাহা সহ্য করিয়া পরাধীনতাশৃঙ্খল বহন করিতেছে? সত্য, তাহারা সময়ে সময়ে জেতাদিগের বিরুদ্ধে অসি উদ্যত করিয়াছিল, কিন্তু বলুন দেখি, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কয়টী নির্ম্মক যুদ্ধ হয়েছে? জেতারা বিজিত দেশীয়দিগকে পশুর ন্যায় … সংহার করিয়াছেন, কিন্তু কয়বার তাহারা একত্র দলবদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা করিয়াছে? ধরিতে গেলে একবারও নহে। সেই নূতন জগতের অধিবাসীদিগের সহিত কি ভারতীয়দিগের তুলনা হইতে পারে? ভারতবাসী কি নির্ব্বিবাদে পর্ত্তুগিজদিগের অত্যাচার সহ্য করিবে? বলিতে পারি না আপনার কিরূপ ধারণা।

কাপ্তেন গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা মিথ্যা নহে ; তবে কি জানেন বাহুবল সর্ব্বত্রই জয়ী হইয়া থাকে।"

"তাহা বলিয়া কি বাহুবলে সাগর শোষণ ও পর্ব্বত উৎপাটন করা যাইতে পারে?"

"হইবে না কেন? হার্কুলিস কি করিয়াছিলেন?"

"প্রত্যেক পর্ত্তুগিজ কি হার্কুলিস নাকি?"

"প্রত্যেক না হউক, সমবেত পর্ত্তুগিজ বল এক হার্কুলিসের বল ধারণ করিতে পারে ; তাহাতে অসম্ভব কি?"

"ভাল, তাহা মানিলাম ; কিন্তু সমগ্র পর্ত্তুগিজ দলকে আপনি কি প্রকারে সাগর পার করিয়া এই সুদূর ভারতে আনয়ন করিবেন?—আর তাহা হইলে পর্ত্তুগালেই বা কে থাকিবে?"

কাপ্তেন নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন,—বলিলেন "আমি কথার কথা বলিতেছি ; আপনি যে এত তর্ক করিবেন, তাহা আমি জানিতাম না ; ফল কথা, সাধ্যপক্ষে দেশীয়দিগকে বাহুবলে শাসন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করা হইবে না। আপনিও পর্ত্তুগিজ হইয়া মাতৃভূমির গৌরবের জন্য যথাসাধ্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।"

"অবশ্য—অবশ্য—তাহা না হইলে যে মায়ের কুসন্তান হইতে হইবে।"

এই সময়ে জাহাজের ভিতর ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল। কাপ্তেন ও ভন রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে ধীরে ধীরে দক্ষিণ বায়ু বহিতে লাগিল ; সাগর জল প্রশান্ত বলিয়া বোধ হইল। কাপ্তেন শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং মাল্লাদিগকে জাহাজ ছাড়িতে আদেশ করিলেন। এদিকে ভনও উত্থিত হইয়া জাহাজ চালনা করিতে লাগিলেন। জাহাজের তিনটী মাস্তুলে পাল টাঙ্গাইয়া এবং মাস্তুলশিরে

নানা রঙ্গের ধ্বজা উত্থিত করিয়া নাবিকগণ জাহাজ ছাড়িয়া দিল। ধীর দক্ষিণ পবনে চালিত হইয়া আর্মেডিস্ আরবসাগরের অনন্ত বীচিমালাকে ভিন্ন করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে বেগে অগ্রসর হইল। ডন্, ক্যাবিনের শিরোদেশে কাপ্তেনের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া দূরবীক্ষণ চালনা করিতে লাগিলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া সমরমেটকে পোতচালনে পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল জলযাত্রার পর বেলা চারি ঘটিকার সময় আর্মেডিস্ স্থলের নিকট আসিল; দূর হইতে শৈলকাননমণ্ডিত সমুচ্চ বেলাভূমি নাবিকদিগের দৃষ্টিগোচর হইল। ডন কাপ্তেনকে একটী বৃক্ষ নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ যে পর্ব্বতশিরে উচ্চ বটবৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার নিকটে আমাদের জাহাজ নঙ্গর করিতে হইবে।"

কাপ্তেন দূরবীক্ষণ উদ্যত করিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন "এখান হইতে ঐ স্থল কতদূর হইবে, আপনি বোধ করেন।"

"আমার বিবেচনায় উহা এখান হইতে দেড় ক্রোশের অধিক হইবে না।"

"তবে এই বেলা ধীরে ধীরে পাল নামাইতে হইতেছে" বলিয়া কাপ্তেন মাল্লাদিগকে পাল নামাইতে আদেশ করিলেন।

নাবিকগণ অচিরে তাঁহার আদেশ পালন করিল। অধিকাংশ গুণবস্ত্র নমিত হইলে বায়ুর সহায়তা করিবার নিমিত্ত মাস্তুলে দুই চারিখানি মাত্র সজ্জিত রহিল। দেখিতে দেখিতে পোত সেই নির্দ্দিষ্ট বটবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইল। জাহাজ থামাইতে আদেশ করিয়া কাপ্তেন অত্রত্য সাগরজল মাপিয়া দেখিলেন। জল তত বেশী বলিয়া বোধ হইল না সুতরাং সেই স্থলে জাহাজ রাখিয়া নৌকার সেতু সাহায্যে তীরে উঠাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অতঃপর কোন স্থলে যে নৌকাসেতু সংলগ্ন হইবে, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য কাপ্তেন সমুচ্চ ক্যাবিনের শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া পার্শ্বস্থ বেলাভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যে বটবৃক্ষের কথা এইমাত্র উল্লিখিত হইল, তাহা একটী উচ্চ শৈলকূটের শিরোদেশে সংস্থিত। শৈলকূটটী আরবসাগরের বেলাবিলম্বী পশ্চিমাচলের একটী অংশ মাত্র। ইহা সমুদ্রের নীল জলরাশির উপরেই উত্থিত। সাগরবক্ষবিহারী বীচিসমূহ ইহার পদতল ধৌত করিয়া দূরদূরান্তরে প্রবাহিত হইতেছে। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন জলপতি এই অস্বাভাবিক দেহ ধারণ করিয়া ঘোর তপে নিমগ্ন রহিয়াছেন। পশ্চিমাচলের এই অংশটী সম্পূর্ণ নির্জ্জন। সাগরবক্ষ হইতে দেখিবামাত্র সহসা বোধ হয়, যেন এ স্থলে কখনও মানব পদার্পণ করে নাই। যেন ইহা মানব জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

কাপ্তেন ক্যাবিনের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া বেলাভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভন তাঁহার অনুমতি লইয়া একখানি ছোট বোটে করিয়া তীরে উঠিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে তীরস্থ নিবিড় বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কাপ্তেন চীৎকার করিয়া বলিলেন "ভন! ভন! অধিক দূরে যাইবেন না।" "এই বাক্য শেষ হইতে না হইতে তীরের দিকে তীব্র শন্ শন্ শব্দ শ্রুত হইল, অমনি দেখিতে দেখিতে তাঁহার মাথার টুপিটী উড়িয়া সাগরজলে পতিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, সেই টুপিতে একটী বৃহৎ তীর বিদ্ধ রহিয়াছে! কাপ্তেন বুঝিতে পারিলেন যে, এ তীর নিশ্চয়ই শত্রুদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অমনি তিনি সৈনিকদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং সজ্জিত হইবার জন্য ছাদ হইতে নামিতে গেলেন। তিনি দুই এক ধাপ নামিয়াছেন, এমন সময়ে আর একটী তীর আসিয়া তাঁহার ললাটে বিদ্ধ হইল। কাপ্তেন অমনি সোপানমঞ্চ হইতে জাহাজের ডেকে পতিত হইলেন। সৈনিকগণ সবিস্ময়ে দেখিল তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে! জাহাজ মধ্যে মহা-হুলস্থুল পড়িয়া গেল; পোতাধ্যক্ষের নিধনে নাবিক ও সৈনিক মাত্রেই ত্রাস্ত ও চকিত ভাবে জাহাজের মধ্যে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। এই সময়ে সেই শৈলকূট হইতে কে মেঘগম্ভীর স্বরে বিশুদ্ধ পর্ত্তুগিজ ভাষায় বলিল "সৈনিকগণ! নিরস্ত হও, বৃথা আয়াস করিও না,—করিলে তোমাদের একজনও জীবিত থাকিবে না। অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আমাদিগের করে জাহাজ ও আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের গাত্রে কণ্টক মাত্রও বিদ্ধ হইবে না; আত্মসমর্পণ কর—জাহাজ ছাড়িয়া দাও—নিরস্ত হও!"

কাহার মুখ হইতে এই গম্ভীর বাক্য নির্গত হইল, তাহা জানিবার জন্য সকলে সেই পর্ব্বতের দিকে চাহিল, দেখিল সেই পর্ত্তুগিজ বেশধারী ভন-দি-গামা।

রাজ-অভ্যর্থনা।*

১

কেন প্রতি গৃহ আজি পরে দীপমালা,
কেন কলিকাতাবাসী এত প্রফুল্লিত?
প্রতি তোরণেতে কেন ঝোলে পুষ্পমালা,
বারাণ্ডা ছাদেতে আজ কেন লোক এত?

২

কেন হুলুধ্বনি আজ হয় প্রতি গৃহে,
নিশান ধরিয়া ছুটে কেন ছাত্রগণ?
একতান বাদ্য বাজে কেন প্রতিগৃহে,
আনন্দে উৎফুল্ল কেন নাগরিকগণ?

* এই প্রস্তাবটী কিছু দিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ প্রকাশিত হয় নাই।

৩

সারি গাঁথি লোক কেন যায় পাদপথে ?
জীবন তটিনী যেন বহে দুই ধারে !
জগন্নাথ দেব যেন উঠেছেন রথে,
দেখিতে ছুটিছে যেন আনন্দে তাঁহারে।

৪

রাজ-অভ্যর্থনা হেতু উন্মত্ত নগর,
একদৃষ্টি হয়ে পথ আছে নিরীক্ষিয়া ;
কখন আসেন লর্ড রিপণ সুধীর,
ভাবিছে অন্তরে তাই একাগ্র হইয়া।

৫

বহে না নিশ্বাস; চক্ষে পড়ে না পল্লব,
সহিতে অক্ষম সবে বিলম্ব বিস্তর,
জীবন-লক্ষণ নাই, নিস্পন্দ নীরব,
মণিহারা ফণী মত, অধীর-অন্তর।

৬

দেখিতে দেখিতে রথ আইল অদূরে,
নিদাঘ-সন্তপ্ত ভূমে যেন বারিধারা
বরিষার বারিধারা যেন দাবানলে,
রিপণে দেখিয়া হ'ল তেমতি তাহারা।

৭

গগন বিদারি রব উঠিল অমনি,—
'জয় রিপণের জয়, ভারতের জয় !'
ফিরাইয়া সেই ধ্বনি, বলে প্রতিধ্বনি,—
'জয় ভারতের জয়, রিপণের জয় !'

৮

আবাল-প্রবৃদ্ধ সবে করে জয়ধ্বনি,
একতান বাদ্য বাজে শকট উপরে,
যুবতীরা সৌধছাদে করে হুলুধ্বনি
প্রাচীন প্রাচীনা তাঁরে আশির্ব্বাদ করে।

৯

রিপণের রথোপরি করে অবিরাম
লাজবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি পুরাঙ্গনাগণ ;
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত, নাহিক বিরাম,
কাঁশর, মুরলী, বীণা, বাজে একতান।

১০

'সাম্য-স্বাধীনতা-ন্যায়পরতা' অঙ্কিত
পতাকা কম্পিত করে যত ছাত্রগণ,
সাম্য-স্বাধীনতা-ন্যায়পরতা অন্বিত,
রিপণ কম্পিয়া শির করেন সম্মান।

১১

'দীর্ঘজীবী দীর্ঘজীবী হউন রিপণ'—
সমস্বরে সবে বলে নাহি ব্যবভেদ,
দিউন তাঁহাকে বিধি অনন্ত জীবন,
বলিয়া সকলে তাঁরে করে আশীর্ব্বাদ।

১২

'মুদ্রাযন্ত্র-স্বাধীনতা' 'স্বতন্ত্র শাসন'—
'ধর্ম্ম প্রবণতা বিনা নাহি জাতি উঠে'—
'জাতি বর্ণ ভেদ নাহি বিধির নিকটে—'
'বাহুবল বল নয়, বল ধর্ম্মবল'—

১৩

ইত্যাদি-সঙ্কেতাঙ্কিত পতাকা লইয়া
বিএ, এম্ এ, কত যান পশ্চাতে ধাইয়া
ব্যারিষ্টার, সম্পাদক, উকিল, হাকিম,
বণিক, কেরাণী, ধনী—হরেক রকম—

১৪

পরিধায়ি পরিচ্ছদ যান মহোল্লাসে ;
ভলাণ্টিয়র, বডিগার্ড, শিখসেন্যগণ,
চলে সবে কুতূহলে রিপণ আবাসে,
সমস্ত সহর চলে হয়ে একপ্রাণ।

১৫

রাখিয়া ভবনে তাঁরে নাগরিকগণ—
মহোৎসবে মহোল্লাসে যাপয়ে রজনী ;
নৃত্যগীত প্রমোদেতে অধিবাসিগণ
বিভোর অন্তরে কাটে সমস্ত যামিনী।

১৬

বিবিধ বাজির খেলা গগনেতে হয়,
শত শত ব্যোম-স্ফোটে গগন বিদরে ;
তারা বাজি ফুল বাজি করে আলোময়,
আকাশ ভূতল সুখী সকলে সহরে।

১৭

কেবল দুঃখের ভার বহে শ্বেতগণ ;
করিয়া চৌরঙ্গি স্থান তিমিরে আবৃত,
ঈর্য্যার কালিমা মেখে রাজধানীয়গণ,
ধরেছে বক্ষেতে হ'য়ে লজ্জায় আনত।

১৮

ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া রিপণ
হয়েছেন তাহাদের বিরাগভাজন !
চাহে না তাঁহারা তাঁরে—নামে তাঁর জ্বলে
তাই আজ পূজা দেখি কাঁদছে বিরলে।

১৯

জানে না নির্ব্বোধ তারা ; অস্ত্রে দেশ জয়
করা যায় সত্য,—কিন্তু মানব হৃদয়
বশ্য হয় না অস্ত্রেতে—বিনা প্রেমডোরে—
বিনা পাশে বাঁধা নাহি যায় তারে।

২০

ভারতের অধিবাসী পঞ্চবিংশ কোটী ;
উপনিবেশ সমেত সবে তিন কোটী—
শ্বেতদ্বীপ অধিবাসী ; পারে কি বলেতে
শুদ্ধ, এত অল্প লোকে শাসনে রাখিতে।

২১

ভারতের পঞ্চবিংশ কোটী মানবেরে,
প্রায় নবগুণিত মানব—একজন নয় জনে?
তাও নয় ; যেহেতু কি নিগূঢ় কারণে,
অধিক ইংরাজ হেথা বসতি না করে।

২২

দুই লক্ষ সবে মাত্র ব্রিটন ভারতে
এক জনে যার শতে, কেবল বলেতে
কভু কি রাখিতে পারে ? ভারত-সন্তান
নহে তত হীনবল ; তার নিদর্শন,

২৩

আফগান-রণজয়,—মিসর সমর।
আধুনিক সভ্যতার আদর্শ-ব্রিটন—
আসিয়াছে ভারতের মঙ্গল কারণ
বলিয়া আসিছে এই কথা বরাবর।

২৪

ধর্ম্মশীল হিন্দুজাতি সেই কথা শুনে,
আত্মসমর্পণ করে, ছিল স্নিগ্ধ মনে ;
ভাবেনি তখন তারা, অন্তর সরল,
উঠিবে অমৃত হ'তে কখন গরল।

২৫

ভাবেনি কখন তারা, হিতৈষী ইংরাজ
উন্নতি-বোধক হবে ; ভাবেনি তাহারা,
আশ্রয় লয়েছে যাকে ভাবিয়া চন্দন—
সে নহে চন্দন-তরু, উগ্র ফনিরাজ।

২৬

অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, না হলে এমন
ঘটিবে কেন ? যে সাধ ইংরাজ করিয়া
সর্ব্বস্ব পণ, জগৎ হইতে দারুণ
কঠোরদাসত্ব প্রথা সাগর মন্থিয়া

২৭

তুলিয়া বেড়ান—সেই দয়ার্দ্র ইংরাজ
কোন্ ভাগ্যদোষে হন ভারতে নির্দ্দয় ?
বল মা ভারতভূমি ? করেছ কি কাজ,
গর্হিত এমন, যাতে সুধা বিষ হয় !

২৮

রাজভক্তি-হীন তুমি ? না—হতে পারেনা
যতদিন লেখা আছে বক্ষেতে তোমার
—'নৃপতি ঈশ্বর";—যদি কেহ এধারণা
করে থাকে বলি তারে নিতান্ত পামর।

২৯

আর কি বলিব তারে? পূর্ব্বের কাহিনী
তারে বলি শুটিকত; যবে রঘুমণি
গেলা বনবাসে, সঙ্গে গেল যত প্রজা;
যে হেতু প্রজার তিনি মনোমত রাজা।

৩০

জগতে বিদিত তিনি প্রজা-প্রাণধন,
যেহেতু ত্যজিলা সীতা প্রাণপ্রিয়তরা
প্রজার অন্তর শুদ্ধ করিতে রঞ্জন,
জানিয়া নির্দ্দোষী তাঁরে বিচ্ছেদে কাতরা

৩১

ভাল রাজা হ'লে সবে তাঁর প্রশংসায়,
রামরাজ্যে বাস কবি বলে তুলনায়;
আদর্শ নৃপতি রাম আজিও ভারতে,
ভালবাসা কভু হিন্দু জানেনা ভুলিতে।

৩২

বাসিলে বাসিতে ভাল জানে হিন্দুগণ,
ভক্তির উচ্ছাসে তারা নহে কারো ম্লান,
প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত হয় নি হিন্দুরা,
দেবভাবে পূজে রামে আজিও তাহারা।

৩৩

বিশ্বশ্রুত বাদসাহ আকবর সাহা—
হিন্দু যবনেতে তার ছিল সমভাব,
আকবরি মোহরের সমাদর তাহা
আজিও ভারতে তাই, জড়ে ভক্তিভাব!

৩৪

শুণে মুগ্ধ হয়ে আজ দেখ সেই রূপ
জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ভুলে ভারতললনা,
লাজপুষ্পবৃষ্টি করে রিপণ উপরে,
হুলুধ্বনি দিয়া পূজে আপন রাজারে।

৩৫

বাল বৃদ্ধ হয়ে মত্ত ছুটে নৃপ-পাশে,
সুশিক্ষিত দল ছুটে সাজি নানা সাজে,
ইহাপেক্ষা রাজভক্তি আছে কোন্ দেশে,
কোন্ দেশ দেবভাবে পূজে নিজ রাজে?

৩৬

অস্ত্রবিধি শেল সম যদিও সবার
হৃদয়ে বাজিছে; যদিও সে রাহু গ্রাস
অর্দ্ধেক করেছে ভারতের বীর্য্যসার,
তথাপি যখন বহে ভারতে নিশ্বাস,

৩৭

পঞ্চবিংশ কোটী-দেহে, কি ভয় অস্ত্রে?
পঞ্চবিংশ কোটী নাসা হইতে আগুন
লোলজিহ্ব হয়ে উঠি পোড়াবে তাহারে,—
যে কেহ স্পর্শিবে কেশে নৃপতি রিপণ!

মৃচ্ছকটিক ও তদুল্লিখিত আচার ব্যবহার।

আলঙ্কারিকদিগের মতে কাব্য দুই প্রকার, দৃশ্য কাব্য ও শ্রব্যকাব্য। (১)

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা দৃশ্যকাব্যকে নাটক, প্রকরণ, ভান, ব্যযোগ, সমবকার, ডিম, ইহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন এই দশ রূপকের বিভাগে এবং নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক,

(১) দৃশ্যশ্রব্যত্বভেদেন পুনঃ কাব্যং দ্বিধা মতম্।
দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ং তৎ রূপারোপাত্তু রূপকম্।—সাহিত্য দর্পণ।

বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ ও ভানিকা এই অষ্টাদশ উপরূপকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যে সকল পার্থক্য থাকায় দৃশ্যকাব্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অতি সামান্য।

বঙ্গভাষায় দৃশ্যকাব্য মাত্রের সাধারণ নাম নাটক। বঙ্গভাষার আলঙ্কারিকেরা দৃশ্যকাব্যের পূর্ব্বোক্ত বিভাগ স্বীকার করেন না।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে মৃচ্ছকটিক একখানি প্রকরণ। তাঁহারা নাটক ও প্রকরণের প্রধান এই প্রভেদ বলেন যে প্রকরণের গল্প কবি-কল্পিত, নাটকের গল্প বিখ্যাত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। নাটকে বীররস অথবা আদিরস প্রধান—প্রকরণে একমাত্র আদিরস প্রধান। নাটকের নায়ক বিখ্যাতবংশ রাজর্ষি, তিনি ধীরোদাত্ত, প্রতাপশালী, দিব্য, অথবা দিব্যাদিব্য। প্রকরণের নায়ক বিপ্র, অমাত্য অথবা বণিক এবং তিনি ধীর প্রশান্ত। প্রকরণের নায়িকা, কোন স্থানে কুলস্ত্রী, কোন স্থানে বেশ্যা, এবং কোনও স্থলে উভয়ই। প্রকরণে কিতব দ্যূতকরাদি, বিট, চেট প্রভৃতি অভিনয় হইয়া থাকে, নাটকে তাহা হয় না।

অতএব, নাটকে ও প্রকরণে যে প্রভেদ করা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য মাত্র। বঙ্গভাষায় যে প্রকরণ ও নাটক বলিয়া কোন প্রভেদ নাই তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।

বঙ্গভাষায় নাটক ও প্রকরণ বলিয়া বিভিন্ন নাম না থাকিলেও আমরা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের অনুসরণ করিয়া মৃচ্ছকটিক প্রকরণ বলিয়া উল্লিখিত করিব।

সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল দৃশ্যকাব্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার রচনা লোকোত্তর চাতুর্য্যময়। ইহার গল্পও মনোহর, ইহাতে রস, ভাব, প্রভৃত পরিমাণে আছে এবং সর্ব্বত্র মাধুর্য্য ও প্রসাদ-গুণসম্পন্ন। গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই মনে অলৌকিক আনন্দ অনুভব হয়।

এই গ্রন্থের রচনা কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। অনেকে বলেন যে এই গ্রন্থ ২০০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আমরা এই প্রস্তাবের শেষভাগে আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিব। ফলতঃ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। *

এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের প্রণেতা কে, তাহাও নির্দ্দেশ করা কঠিন। আমাদের এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য পরে বিবৃত করিব।

* অনেক পাঠক বোধ হয় মৃচ্ছকটিকের আখ্যায়িকা অবগত নহেন। সেই জন্য সংক্ষেপে মৃচ্ছকটিকের আখ্যায়িকা লিখিত হইল।

মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত, ইনি এক জন ব্রাহ্মণ। উজ্জয়িনী নগরে ইঁহার বাস ছিল। চারুদত্ত দুঃস্থ জনের উপকার করিয়া স্বয়ং অতি দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গণিকাগর্ভসম্ভূতা গুণ-গ্রাহিণী বসন্তসেনা তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। বসন্তসেনা গণিকা-কন্যা, একথা শুনিলে বোধ হয় যেন নায়িকা, অসরলা, অর্থলোভী, বিশ্বাসঘাতিনী ও নানা অসদ্‌গুণের আধার হইবে, কিন্তু বসন্তসেনার যেরূপ স্বভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি কুলজাদিগেরও অনুকরণীয়া; তাঁহার স্বভাব দেখিলে স্বতঃ ভক্তির উদয় হয়। তাঁহার হৃদয়, নারীস্বভাব-সুলভ গুণ-গ্রাম-পরিপূর্ণ অথচ অলৌকিক মাধুর্য্য-ময়। আমরা তদ্বিষয়ে স্থানান্তরে আলোচনা করিব।

পালক নামক উজ্জয়িনীর রাজার শ্যালক সংস্থানক, বসন্তসেনার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পশুবৃত্তি সাধনে যত্নবান ছিল; এই রাজ-শ্যালক সংস্থানকে শকার (১) বলিয়া গ্রন্থে সর্ব্বত্র উল্লেখ আছে। বসন্তসেনা কাম-দেবায়তনোদ্যানে চারুদত্তকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার অসাধারণ গুণ অবগত হইয়া তাহার প্রতি মনঃসমর্পণ করেন।

প্রথম অঙ্কে, বসন্তসেনা অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারিকা হইয়া চারুদত্তের বাটীতে একাকিনী যাইতেছেন, রাজপথে শকারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, শকার তাহাকে নানা প্রকার স্তুতি করিতে লাগিল, বসন্তসেনা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া চারুদত্তের বাটীর অভিমুখে চলিলেন। তৎকালে চারুদত্ত চতুষ্পথে মাতৃকাদিগকে বলি দিবার জন্য তাহার মিত্র মৈত্রেয়নামক একটী ব্রাহ্মণকে ও তৎসঙ্গে পরিচারিকা রদনিকাকে পাঠাইয়াছিলেন। মৈত্রেয় দ্বারোদ্ঘাটন করিবামাত্র বসন্তসেনা অঞ্চলদ্বারা প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মৈত্রেয় রদনিকাকে নিষ্ক্রমণের উপদেশ দিয়া বাটীর মধ্যে প্রদীপ আনিতে গেলেন।

এদিকে শকার, বসন্তসেনাকে অন্বে-ষণ করিতে করিতে রদনিকার কেশ ধারণ করিল—রদনিকা চীৎকার করিতে লাগিল। এই কালে মৈত্রেয় প্রদীপ হস্তে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। শকার ও মৈত্রেয়ের মধ্যে বিবাদ হইতে লাগিল; শকার বিফলপ্রযত্ন ও অপমানিত হইয়া নিঃস্ব চারুদত্তের উদ্দেশে অনেক গালাগালি দিয়া, মৈত্রেয়কে দিয়া চারুদত্তকে বলিয়া পাঠাইল "নির্ধন চারুদত্তকে যাইয়া বল, সে যেন স্বয়ং বসন্তসেনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করে, নতুবা আমার আমরণান্তিকক্রোধ থাকিবে।"

---

(১) মদমূর্খতাভিমানী দুষ্কুলতৈশ্বর্য্য-সংযুক্তঃ।
সোঽয়ম নৃপভ্রাতা রাজ্ঞঃশ্যালঃ শকার ইত্যুক্তঃ॥

শকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া নিঃসৃত হইল।

এদিকে, বসন্তসেনা নির্বাক্ হইয়া চারুদত্তের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। চারুদত্ত রদনিকা ভ্রমে বসন্তসেনার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রদনিকা ও বিদূষক (মৈত্রেয) উপস্থিত হইলেন। তখন চারুদত্তের ভ্রম ঘুচিল।

মৈত্রেয় চারুদত্তকে শকারের প্রগল্ভ বাক্য বিজ্ঞাপন করিল। তাহা শুনিয়া চারুদত্ত অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "ও নিতান্ত মূর্খ।" তাহার পর, বসন্তসেনা চারুদত্তকে বলিলেন "আর্য্য। আপনি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমি প্রার্থনা করি যে আপনার গৃহে আমার এই অলঙ্কারগুলি রাখিয়া যাই; অসৎ লোকেরা অলঙ্কারের লোভে আমাকে অনুসরণ করে।"

চারুদত্তের গৃহ জীর্ণ। তিনি বলিলেন "আমার এ গৃহ ন্যাস রাখিবার অযোগ্য স্থান!" বসন্তসেনা বলিলেন "আর্য্য! এ মিথ্যা কথা, লোকে গৃহ দেখিয়া ন্যাস রাখে না। লোক দেখিয়াই দ্রব্য ন্যস্ত রাখে" চারুদত্ত সম্মত হইয়া অলঙ্কার রাখিলেন।

চারুদত্তের হস্তে এই অলঙ্কার ন্যস্ত করিবার বসন্তসেনার অতি সদাশয়-পূর্ণ গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, স্থানান্তরে তাহা আমরা প্রকাশ করিব।

দ্বিতীয়াঙ্কে বর্ণিত আছে যে মথুরনামে দ্যূতসভার অধ্যক্ষ দশ সুবর্ণ মুদ্রার জন্য সম্বাহক নামে এক ব্যক্তিকে তাড়না করায় সম্বাহক দর্দ্দুরক নামে অপর একটী চতুর দ্যূতক্রীড়কের সাহায্যে পলায়ন করিয়া বসন্তসেনার আশ্রয় গ্রহণ করে। বসন্তসেনা বদান্যতা প্রকাশ করিয়া দশটী সুবর্ণ মুদ্রা দান করতঃ সম্বাহককে ঋণদায় হইতে মুক্ত করেন। সম্বাহক দ্যূতকর কর্ত্তৃক বিশেষ অপমানিত হওয়ায় সেই অবধি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইলেন।

এই অঙ্কে দর্দ্দুরক প্রকাশ করে যে একজন সিদ্ধপুরুষ আদেশ করিয়া যান যে আর্য্যক নামে একজন গোপালপুত্র উজ্জয়িনীর রাজা হইবে।

তৃতীয় অঙ্কে চারুদত্ত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অধিক রাত্রিতে নিজগৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন। চন্দ্র অস্তমিত হইয়াছে। শর্ব্বিলক নামে এক ব্রাহ্মণ চারুদত্তের গৃহে সন্ধি খনন করিয়া চুরি করিতেছেন। শর্ব্বিলক বসন্তসেনার ন্যস্ত ধন চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। চারুদত্ত ও মৈত্রেয় জাগরিত হইয়া বাসগৃহে সন্ধি খনন ও ধনাপহরণ অবগত হইয়া বিস্মিত ও যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি নির্ধন, ধনলোভে তিনিই অলঙ্কার গোপন করিয়াছেন, লোকে তাহার এই চরিত্র-দূষণ প্রবাদ রাষ্ট্র করিবে এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পরিণীত-পত্নী (ধূত) তাঁহার স্ত্রীধন বহুমূল্য রত্নমালা চারুদত্তকে প্রদান করিলেন। চারুদত্ত ঐ রত্নমালা বিদূষকের হস্তে

দিয়া বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

বসন্তসেনার মদনিকা নামে এক দাসী ছিল; চোর শর্বিলক তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া, তাহাকে দাসবৃত্তি হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য চারুদত্তের গৃহে চুরি করে শর্বিলক অলঙ্কার লইয়া মদনিকাকে দেখাইল, মদনিকা চিনিতে পারিল যে বসন্তসেনার অলঙ্কারই চুরি করিয়া আনিয়া তাহাই আবার দাসবৃত্তি মোচনের নিষ্ক্রয়স্বরূপ উপস্থিত করা হইতেছে। মদনিকা শর্বিলককে পরামর্শ দিল যে চারুদত্ত ন্যস্ত অলঙ্কার তাহার দ্বারা প্রেরণ করিয়াছে এই বলিয়া বসন্তসেনাকে অলঙ্কার প্রত্যর্পণ কর শর্বিলক সাহসে ভর করিয়া গেল।

বসন্তসেনা মদনিকা ও শর্বিলকের সমস্ত আলাপ গোপনে শুনিতেছিলেন শর্বিলক যখন সলজ্জ ভাবে বসন্তসেনার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন বসন্তসেনা বসিবার আদর করিলেন। শর্বিলক না বসিয়াই বলিল "জীর্ণগৃহ বলিয়া চারুদত্ত এই অলঙ্কার ভাণ্ড সংরক্ষণ করা ক্লেশকর বিবেচনায়, ইহা প্রত্যর্পণ করিলেন।" শর্বিলক চলিয়া যায় বসন্ত-সেনা ডাকিয়া বলিলেন "আমার প্রত্যুত্তরে কিছু বলিবার আছে।" শর্বিলক তখন মনে মনে ভাবিতেছে "সেখানে যাবে কোন্ শালা।" বসন্তসেনা বলিলেন আপনি মদনিকাকে গ্রহণ করুন। শর্বিলক তখন বলিল "আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।" বসন্তসেনা বলিলেন, "চারুদত্তের সহিত আমার কথা আছে যে, যে লোক এই অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিবে তাহাকে মদনিকা সম্প্রদান করিতে হইবে।" শর্বিলক বুঝিলেন যে বসন্তসেনা সমস্ত অবগত হইয়াছে। তৎপর বসন্তসেনা মদনিকাকে শর্বিলকের হস্তে প্রদান করিলেন। কি অপূর্ব্ব বদান্যতা!!

কিয়ৎকাল পরে বিদূষক (মৈত্রেয়) রত্নমালা হাতে উপস্থিত হইয়া বসন্তসেনাকে বলিল "চারুদত্ত বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি সুবর্ণভাণ্ড নিজ ধন বলিয়া বিশ্বাস করিয়া দ্যূতে তাহা হারিয়াছেন, অতএব তাহার পরিবর্ত্তে এই রত্নাবলী গ্রহণ করুন।" বসন্তসেনা এই ব্যবহারে অতি বিস্মিত হইলেন। অলঙ্কার পুনঃপ্রাপ্তির বিষয় সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রত্নাবলী গ্রহণ করিয়া বিদূষককে বলিলেন "আর্য্য চারুদত্তকে বলিবেন অদ্য আমি প্রদোষে তাঁহাকে দেখিতে যাইব।" মৈত্রেয় বলিল "বলিব;" মনে মনে কহিল "বলিব যে এই বেশ্যার সংসর্গ ত্যাগ কর।"

পঞ্চম অঙ্কে বসন্তসেনার সহিত চারুদত্তের নিশিযোগে মিলন বর্ণিত হইয়াছে। বসন্তসেনা "দ্যূতকর" চারুদত্তকে পূর্ব্বন্যস্ত পুনঃপ্রাপ্ত অলঙ্কারগুলি দেখাইলেন, চারুদত্তের বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। তিনি প্রথমে ঘটনা সত্য

বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

সেই রাত্রি বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ বর্ষাকালের স্বাভাবিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ এবং ইহার রচনা অতি মনোহর।

ষষ্ঠ অঙ্কে চারুদত্তের বিপদের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। রাত্রি প্রভাত হইলে বসন্তসেনা চেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের দ্যূতকর কোথায়?" চেটি বলিল, "তিনি পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে গিয়াছেন।" বসন্তসেনা বলিলেন "তাঁহাকে রাত্রিতে উত্তমরূপে দেখিতে পাই নাই, অদ্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিব।"

বসন্তসেনা দাসীর হস্তে রত্নাবলী দিয়া সানুনয়ে বলিলেন, "এই রত্নাবলী লইয়া ভগ্নী আর্য্যা ধূতাকে সমর্পণ কর, বলিও, আমি অদ্য চারুদত্তের গুণগৃহীতা দাসী, এবং তাঁহারও দাসী বটে। অতএব এই রত্নাবলী তাঁহার কণ্ঠাভরণ হউক।"

দাসী রত্নাবলী লইয়া গেল। পুনরায় তাহা ফিরিয়া আনিয়া বলিল, আর্য্যা ধূতা বলিলেন "এই রত্নাবলী আর্য্য চারুদত্ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে দিয়াছেন; আমার ইহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। বসন্তসেনাকে বল, আর্য্যপুত্রই আমার অলঙ্কার বিশেষ।"

এই সময় রদনিকা রোহসেন নামক চারুদত্তের শিশুপুত্র ক্রোড়ে করিয়া উপস্থিত হইল। রোহসেন প্রতিবাসী এক গৃহপতির পুত্রের সুবর্ণ শকট লইয়া খেলিতেছিল, সে তাহা লইয়া গেল। রোহসেন শকটের জন্য কাঁদিতে লাগিল; রদনিকা তাহার সান্ত্বনার জন্য একটী মৃত্তিকা শকট প্রস্তুত করিয়া তাহাকে দিলেন; রোহসেন তাহা লইতে চাহে না; সে সুবর্ণ শকট চাহে। দরিদ্র চারুদত্ত সুবর্ণ শকট কোথা হইতে দিবেন? রদনিকা, রোহসেনের চিত্ত বিনোদনের জন্য বসন্তসেনার নিকট উপস্থিত করিলেন; রোহসেন তখনও কাঁদিতেছিল।

বসন্তসেনা রোদনের কারণ জানিতে পারিলেন। বলিলেন "বৎস! তুমি অবশ্যই সুবর্ণ শকট লইয়া খেলা করিতে পারিবে।" রোহসেন বসন্তসেনাকে দেখিয়া রদনিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "ইনি কে?" বসন্তসেনা কহিলেন "তোমার পিতার গুণনির্জ্জিতা দাসী।" রদনিকা বলিল "আর্য্যা তোমার জননী হন।" বালক বলিল "রদনিকে! তুমি মিছা বলিতেছ, যদি ইনি আমার জননী হইবেন, তবে ইহাঁর গায়ে অলঙ্কার কেন। শুনিয়া, বসন্তসেনা অশ্রুজল ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া কহিলেন "এখন আমি তোমার জননী হইলাম, তবে তুমি এই অলঙ্কার গুলি লইয়া শকট প্রস্তুত কর।"

বালক কহিল "যাও—আমি উহা লইব না তুমি কাঁদিতেছ।" বসন্তসেনা,

চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন "বৎস! আমি আর কাঁদিব না,—যাও, তুমি খেলা কর গিয়ে," তৎপরে অলঙ্কার দ্বারা মৃচ্ছকটিক (১) পূরণ করিয়া বলিলেন, "বৎস! সুবর্ণশকট প্রস্তুত কর গিয়া।" রদনিকা বালক লইয়া প্রস্থান করিল।

এই অংশ কত সুন্দর! অর্থগৃধ্নু বারবিলাসিনীর কতদূর নিস্পৃহতা! কেমন সরলতা!

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উপলক্ষে এই প্রকরণের নাম "মৃচ্ছকটিক" হইয়াছে।

এই সময়ে চারুদত্তের শকটবান্ বর্দ্ধমানক বসন্তসেনাকে জানাইল যে প্রবহণ প্রস্তুত; পক্ষদ্বারে বসন্তসেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

বসন্তসেনা বেশভূষায় নিযুক্ত হইলেন। বর্দ্ধমানক যানাস্তরণ ফেলিয়া আসিয়াছিল—সে শকট লইয়া তাহা আনিতে গেল।

এদিকে শকারের আদেশক্রমে স্থাবরক নামে এক শকটবান্ তাহার প্রভুর আদেশে পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে যাইতেছিল। চারুদত্তের পক্ষদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে, দেখিতে পাইল, পথে একটী শকটের চক্র বিদ্ধ হইয়া পথ রুদ্ধ হইয়াছে। স্থাবরক চক্র পরিবর্ত্তনের জন্য গেল। শকট চারুদত্তের পক্ষদ্বারের সম্মুখে রহিল।

বসন্তসেনা বেশভূষা করিয়া উপস্থিত হইলেন, চারুদত্তের শকট মনে করিয়া তিনি শকারের শকটে আরোহণ করিলেন।

শকারের শকটবান্ স্থাবরক প্রত্যাগত হইয়া শকট সহকারে বসন্তসেনাকে লইয়া শকারের নিকট চলিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে গোপাল পুত্র আর্য্যকনামে একজন রাজা হইবে এই সিদ্ধাদেশ হয়। রাজা পালক সেই সংবাদ অবগত হইয়া, তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। আর্য্যক বন্ধন ভেদ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল; তাহার পদাগ্রে ছিন্ন বন্ধনশৃঙ্খল এবং মুখে অবগুণ্ঠন ছিল।

আর্য্যকের বন্ধন ভেদ করার সংবাদ রাজপুরুষেরা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতে লাগিল।

এই সময় চারুদত্তের শকটবান্ বর্দ্ধমানক যানাস্তরণ লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। রদনিকাকে বলিল, "আর্য্যা বসন্তসেনাকে পাঠাইয়া দেও।"

আর্য্যক সুযোগ বুঝিয়া ঐ শকট মধ্যে প্রবেশ করিল; বন্ধনশৃঙ্খলের শব্দ নূপুরশব্দ বিবেচনায় বর্দ্ধমানক মনে করিল বসন্তসেনা শকটস্থা হইয়াছেন। সে নিঃসন্দেহে শকট লইয়া চারুদত্তের উদ্দেশে পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে চলিল।

এইরূপে, শকারের শকটে বসন্তসেনা ও চারুদত্তের শকটে আর্য্যক উঠিলেন। উভয়ই চারুদত্তের অমঙ্গলের কারণ হইল।

পথিমধ্যে রাজপুরুষ বীরক ঐ শকট

(১) মৃৎ + শকটিক।

অবরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ কাহার শকট?" বর্দ্ধমানক বলিল "এ শকট চারুদত্তের, ইহাতে বসন্তসেনা আছেন; আমরা পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে যাইতেছি।"

রাজপুরুষগণের মধ্যে চন্দনক, আর্য্যকের বন্ধু শর্ব্বিলকের আত্মীয় ছিল। রাজপুরুষ বীরকের আদেশে তাহার প্রতি তদন্তের ভার পড়িল। আর্য্যক চন্দনকের শরণাগত হইলে, চন্দনক অভয় প্রদান করিলেন। চন্দনক ফিরিয়া আসিয়া বীরককে বলিল "দেখিলাম আর্য্য—না, না, আর্য্যা বসন্তসেনা প্রবহণে আছেন।" বীরক বলিল, "চন্দনক তোমার কথায় আমার সন্দেহ হইতেছে —আমি স্বয়ং দেখিব।"

তখন চন্দনক বিবাদ বাধাইল। বীরক শকট পরীক্ষা করিতে যাইতেই চন্দনক তাহার কেশ ধরিয়া পাদ প্রহার করিতে লাগিল। বীরক ক্রোধ করিয়া বিচারালয়ে চলিল।

চন্দনক আর্য্যকের হস্তে গোপনে খড়্গ প্রদান করিয়া ও শকটবানকে প্রবহণ চালাইতে অনুমতি দিয়া শর্ব্বিলকের দলে প্রবিষ্ট হইল।

সপ্তম অঙ্কে চারুদত্ত মৈত্রেয়ের সহিত নগর হইতে সুদূরস্থিত পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত অবস্থায় আছেন; এই সময় তাঁহার শকটবান বর্দ্ধমানক, আর্য্যককে শকটে লইয়া উপস্থিত হইল। তখন বসন্তসেনার স্থলাভিষিক্ত আর্য্যক অবতরণ করেন না। চারুদত্তের আদেশে মৈত্রেয় বসন্তসেনাকে আনিতে গেলেন। তিনি যানাবরণ খুলিয়া বলিলেন "ওগো মহাশয়! এত বসন্তসেনা নহেন, বসন্তসেন মহাশয় যে উপস্থিত হইয়াছেন।"

চারুদত্ত পরিহাসে বিরক্ত হইয়া শকটের নিকটে গেলেন। তখন আর্য্যক তাহার নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়া সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিল। চারুদত্ত তাঁহাকে অভয়দান করিয়া তাঁহার শকটে আর্য্যককে পঠাইয়া দিয়া উদ্যান হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

অষ্টমঅঙ্ক শকারের শকটে বসন্তসেনা পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানের অপর একভাগে উপস্থিত হইলেন। বসন্তসেনা তখন যান-বিপর্য্যয়ের বিষয় বুঝিতে পারিলেন। ক্রমে বসন্তসেনার উপস্থিতি বৃত্তান্ত শকার অবগত হইল।

শকার বসন্তসেনার পদতলে পতিত হইয়া নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। বসন্তসেনা উচ্চস্বরে "অনার্য্য! দূর হও" বলিয়া পদাঘাত করিলেন।

শকার শকটবানকে জিজ্ঞাসা করিল "একে কোথায় পেয়েছিস্?" সে বলিল "রাজপথ শকটরুদ্ধ হওয়ায় চারুদত্তের বৃক্ষবাটিকায় শকট রাখিয়া চক্রপরিবর্ত্তনে গিয়াছিলাম, তখন ভ্রমক্রমে এই শকটে ইনি আরূঢ়া হইয়াছেন।"

শকারের ক্রোধের সীমা রহিল না। প্রথমে তাহার বিশ্বাস ছিল যে বসন্তসেনা তাহার অভিসরণ করিয়াছে; এখন বুঝিলেন, চারুদত্তের অভিসরণ জন্য বসন্তসেনা আসিয়াছে। শকার বলিল "গর্ভদাসি! শীঘ্র নাম; নতুবা চুল ধরিয়া নামাইব।"

ভয়ে বসন্তসেনা অবতরণ করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন।

শকার বসন্তসেনার প্রাণবধে কৃত-সংকল্প হইয়া প্রথমতঃ তৎসমভিব্যাহারী বিটকে, পরে শকটবানকে বহুবিধ লোভ প্রদর্শন করিয়া বসন্তসেনার প্রাণ বধের জন্য বলিতে লাগিল। উভয়েই অস্বীকার করিল। শকার শকটবানকে দূরে অবস্থান করিবার আদেশ দিল, সে চলিয়া গেল। তখন শকার স্বয়ং বদ্ধ পরিকর হইয়া নিঃসহায়া বসন্তসেনাকে আক্রমণের উদ্যোগ করিল। বিট এই অমানুষিক কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া শকারের গলদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায় ভূতলে পাতিত করিল। শকার সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিটকে কপট বাক্যে বলিল "মহাশয়! আমি মহৎকুলে জন্মিয়া এমন কুকার্য্য করিব, এই কি আপনার বিশ্বাস? আমি বসন্তসেনাকে ভয় প্রদর্শনে সম্মত করাইবার জন্য ঐরূপ করিয়াছিলাম। আপনার সম্মুখে বসন্তসেনা লজ্জার সম্মত হইতেছে না— আপনি শকটবান্ (স্থাবরককে) ডাকিতে যান।"

বিট এইরূপ অনেক কথায় প্রতারিত হইয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল এবং কিছুকাল অন্তরালে থাকিয়া শকার কিরূপ ব্যবহার করে দেখিতে লাগিল। পাছে বিট লুক্কায়িত ভাবে থাকে, এই ভাবিয়া শকারও বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য বসন্তসেনাকে নানা প্রকার প্রণয় সম্ভাষণ করিতে লাগিল। বিট শকটবানকে আহ্বান করিতে চলিয়া গেল।

বসন্তসেনা শকারের প্রণয়ে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিলেন 'সহকার পাদপ সেবা করিয়া পলাশ বৃক্ষের সেবা করিব না।"

চারুদত্তের সহিত এইরূপ তুলনা করাতে শকার দ্বিগুণিত ক্রোধে বলিল "দেখি এখন তোর দরিদ্র চারুদত্ত কেমন করিয়া রক্ষা করে।" পরে বসন্তসেনার কণ্ঠ নিপীড়ন করিতে লাগিল। বসন্তসেনা মূর্চ্ছিতা ও নিশ্চেষ্টা হইয়া পতিত হইল। যখন শকার বিশেষ পরীক্ষায় দেখিল যে বসন্তসেনা মরিয়াছে তখন মনে মনে নিজ বাহুবলের গর্ব্ব করিতে লাগিল।

বিট স্থাবরককে সঙ্গে লইয়া পুনরাগমন করিল। জিজ্ঞাসা করিল, বসন্তসেনা কোথায়? শকার উত্তর করিল— "সে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছে।" বিট বলিল "সে ত আমার সঙ্গে যায় নাই।"

শকার। আপনি কোন্ দিকে গিয়াছিলেন?

বিট। পূর্ব্বদিকে।

শকার সে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে।

বিট। আমি ত দক্ষিণদিকেই গিয়াছিলাম।

শকার। সে উত্তরদিকে গিয়াছে।

বিট বলিল "তুমি প্রলাপ বলিতেছ—ঠিক কথা বল।"

তখন শকার বলিল "আমি তাহাকে বধ করিয়াছি। বিশ্বাস না হয়, আমার বাহুবলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ।" এই বলিয়া বসন্তসেনার মৃতদেহ দেখাইল।

তখন স্থাবরক ও বিট উভয়েই আক্ষেপ করিতে লাগিল। শেষে বিটের উপর এই দুষ্কার্য্য আরোপ করে, এই ভয়ে সে যাইতে উদ্যোগ করিল—শকার তাহাকে ধরিল।

বিট। পাপিষ্ঠ আমাকে স্পর্শ করিও না।

শকার। সে কি! তুমি বসন্তসেনাকে স্বয়ং বধ করিয়া আমার উপর দোষ দিয়া কোথায় পলাও?

বিট বিপদ গণিতে লাগিল। শকার হাস্য করিতে লাগিল। সে বলিল "এই দুষ্কার্য্য যাহাতে যার তার শিরে পড়ুক তাহারই উপায় করা যাউক।"

বিট অস্বীকার করিলেই অমনি তাহাকে ধরিয়া শকার বলিল "তুই উদ্যানে বসন্তসেনাকে মারিয়া কোথায় পলায়ন করিস্? আমার ভগিনীপতির সমক্ষে চল—তোর বিচার হইবে।"

বিট ক্রোধে খড়্গ নিষ্কোষিত করিল। শকার তাহাকে ছাড়িয়া দিল। বিটও প্রস্থান করিয়া সর্ব্বিলকের দলে প্রবিষ্ট হইল।

তখন শকার তাহার বাড়ীর সর্ব্বোপরি কুঠরিতে থাকিবার জন্য স্থাবরককে আদেশ দিল। সে প্রস্থান করিল।

শকার পুনরায় বসন্তসেনাকে পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত মৃত্যু অবধারণ করিয়া স্বীয় দুষ্কার্য্য চারুদত্তের উপর আরোপ করিবার জন্য বিচারালয়ে গমন করিল।

পাঠকগণের বোধ হয় দ্বিতীয় অঙ্কে উল্লিখিত সংবাহকের বিষয় স্মরণ আছে। বসন্তসেনা দ্যূতকরদিগকে দশ সুবর্ণমুদ্রা দান করিয়া সংবাহকের মুক্তি করেন, সেই সময় হইতে সে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী হইয়াছিল। শকারের নিষ্ক্রমণের পর সে বস্ত্র শুষ্ক করিবার জন্য উদ্যানে উপস্থিত হইল।

বসন্তসেনা বাস্তবিক মরেন নাই। মূর্চ্ছিত ও স্পন্দরহিত হইয়াছিলেন মাত্র। ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইল। সংবাহকের শুশ্রূষায় তিনি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া সংবাহকের পরামর্শে "বিহার" (বৌদ্ধমঠ) স্থিত তাহার ধর্ম্মভগ্নীর নিকট গমন করিলেন।

নবম অঙ্কে অধিকরণক (বিচারক), শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ সহকারে বিচারালয়ে উপবেশন করিয়াছেন। শকার প্রাতঃস্নান করিয়া বেশভূষা করিয়া বিচারালয়ে জ্ঞাপন করিল যে বসন্তসেনাকে কে যেন উদ্যানে অলঙ্কারের লোভে বধ করিয়াছে। বিচারকের আদেশে বসন্তসেনার মাতা আনীতা হইল, তাহার কথায় প্রকাশ হইল যে বসন্তসেনা চারুদত্তের নিকট

গমন করিয়াছে। তখন, চারুদত্ত বিচারালয়ে আনীত হইলেন। চারুদত্ত মনে মনে ভাবিলেন যে আর্য্যকের গোপন-প্রেরণের বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। কিন্তু তিনি আসিলেই বসন্তসেনা তাঁহার নিকট আসিয়াছিল কি না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল। চারুদত্ত স্বীকার করিলেন।

বিচারক। বসন্তসেনা কোথায়?

চারুদত্ত। তিনি গৃহে গিয়াছেন।

বিচারক। তিনি পদব্রজে গিয়াছেন অথবা শকটে গিয়াছেন?

চারুদত্ত। আমার প্রত্যক্ষে যান নাই অতএব তিনি পদব্রজে বা শকটে গিয়াছেন, জানি না।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বীরক চন্দনক কর্তৃক অপমানিত হইয়াছিল। রাত্রি প্রভাত হইলে সেও বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করিল "আর্য্যকের বন্ধন ভেদ করিয়া পলায়ন করার পর একটী আবৃত শকট চন্দনক পরীক্ষা করিলে আমি পুনঃ পরীক্ষা করিব বলিবামাত্র চন্দনক আমাকে পদ প্রহার করিয়াছে। মহাশয় বিচার করুন।"

বিচারক। কাহার শকট তাহা জানেন?

বীরক। শকটবাহক বলিয়াছিল যে এই আর্য্য চারুদত্তের শকটে বসন্তসেনা আরূঢ়া, এবং পুষ্পকরণ্ডক জীর্ণোদ্যানে ক্রীড়ার্থে যাইতেছিলেন—

বিচারক। আপনার বিচার পরে হইবে। এই বিচারালয়ের দ্বারদেশে অশ্ব আছে, আপনি পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে যাইয়া দেখুন, কোন মৃতা স্ত্রী আছে কি না।

বীরক রাজশ্যালক শকারের অনুগত হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলেন যে একটী স্ত্রী-শরীর সেখানে আছে; শ্বাপদে আহার করিতেছে।

বিচারকের সহায়তাকারী শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ জিজ্ঞাসা করিল যে কিরূপে জানেন যে স্ত্রী-শরীর?

বিচারক। কেশ হস্ত পাণি পাদ দ্বারা জানিলাম যে স্ত্রী-শরীর।

শকার বলিতে লাগিল চারুদত্ত নিঃসন্দেহ অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত চারুদত্ত আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বিচারকের আদেশে তিনি তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। যে চারুদত্ত দান দ্বারা সমস্ত বিভব হস্তান্তর করিয়াছেন, তিনি অলঙ্কারের লোভে যে স্ত্রীহত্যা করিয়াছেন উহা বিশ্বাস করিবার তখনও কোনও কারণ ছিল না।

এই সময়ে আবার নূতন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইল। বসন্তসেনা চারুদত্তের পুত্র রোহসেনকে সুবর্ণশকট নির্ম্মাণার্থ যে সমস্ত অলঙ্কার দিয়াছিলেন চারুদত্ত তাহা প্রত্যর্পণের জন্য মৈত্রেয়ের হস্তে দিয়া তাহাকে বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি পথে শুনিলেন যে চারুদত্ত বিচারালয়ে নীত

হইয়াছেন। কারণ জানিবার জন্য মৈত্রেয় তথায় উপস্থিত হইলেন। অলঙ্কারগুলি তাঁহার কক্ষে ছিল।

চারুদত্তের মুখে তাঁহার বিপদ শুনিলেন। মৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিল "একথা কে বলে ?"

চারুদত্ত শকারকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। মৈত্রেয় তখন শকারকে তিরস্কার করিয়া আক্রমণ করিল। উভয়ে বিবাদ আরম্ভ হইল। মৈত্রেয়র কক্ষদেশ হইতে অলঙ্কারগুলি পড়িয়া গেল।

তখন শকার সেই অলঙ্কারগুলি দেখাইয়া বলিল "চারুদত্ত এই সামান্য অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে বধ করিয়াছে।"

বসন্তসেনার মাতাকে বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন "এই অলঙ্কার তোমার কি না।"

বসন্তসেনার মাতার চারুদত্তের সুচরিত্র ও মহানুভাবের প্রতি অচল বিশ্বাস ছিল। চারুদত্ত তাহার কন্যাকে বধ করিয়াছে একথা সে কখনও মনে স্থান দেয় নাই। সে বলিল "তক্তুল্য ই বটে কিন্তু ঠিক তাহা নহে।"

শকার বসন্তসেনার মাতাকে ঐ সকল অলঙ্কার যে তাহারই ইহা বলাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইল।

বিচারক বলিলেন যে শিল্পকারেরা অনুকরণ করিয়া থাকে সুতরাং সাদৃশ্য দ্বারা, ঠিক সেই অলঙ্কার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ চারুদত্তকে বলিল "এ গুলি কি আপনার ?" চারুদত্ত বলিলেন "না।"

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। তবে কাহার ?

চারুদত্ত বলিলেন "বসন্তসেনার।"

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ। আর্য্য চারুদত্ত আপনি সত্য গোপন করিবেন না। যথার্থ কথা বলুন

চারুদত্ত। এই সকল অলঙ্কার যে অঙ্গে এখনও ধারণ করা হইয়াছিল তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে ইহা আমার গৃহ হইতে আনীত হইয়াছে—

শকার। উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মারিয়া এখন কপটাচরণ করিতে বসিয়াছেন।

বিচারক। যথার্থ কথা বলুন ; নতুবা আপনার সুকুমার অঙ্গে কশাঘাত হইবে।

চারুদত্ত এই দুষ্কার্য্য অস্বীকার করিলেন কিন্তু বসন্তসেনা বিরহে তাঁহার জীবন তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল।

তিনি বলিলেন আমি ইহলোক ও পরলোকের ভয়ত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোক—ইহার অপর অংশ এই লোক (শকার) বলিবে।

শকার। হত্যা করিয়াছি—তুই বল্ না "আমি মারিয়াছি।"

চারুদত্ত। তুমিই বল না।

শকার। মহাশয়েরা শুনুন এই লোক হত্যা করিয়াছে—এখন সংশয় দূর হইল। ইহার শারীরিক দণ্ড অবধারণ করুন।

বসন্তসেনার মাতা বলিল যে যে ব্যক্তি চৌরাপহৃত সামান্য দ্রব্যের জন্য অমূল্য রত্নমালা দান করিতে পারে সে সামান্য

অলঙ্কারের জন্য যে আমার কন্যাকে বধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যদি মারিয়া থাকে সে মরিয়াছে। চারুদত্ত দীর্ঘজীবী হউক। আমি বাদী, আমি ইহার বিরুদ্ধে দাবি রাখি না; ইহাকে মুক্ত দিন্।

শকার। রে গর্ভদাসি! দূর হ— দূর হ তোর এ সকলে কি কাজ?

বিচারক বৃদ্ধাকে নিষ্কাশনের জন্য আদেশ দিলেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

বিচারক। আমরা দোষী নির্দ্দোষী স্থির করিতে পারি কিন্তু রাজার আদেশ মত কায হবে। একজন রাজপুরুষকে বলিলেন "শোধনক! তুমি পালক রাজাকে বল যে মনু বলিয়াছেন যে বিপ্র বধ্য নহে এবং পাতকী বিপ্রকে যাবৎ ধন সম্পত্তি সহকারে নির্ব্বাসন করা কর্ত্তব্য।"

শোধনক ফিরিয়া আসিয়া বলিল "রাজা ইহাকে দক্ষিণ শ্মশানে শূলে আরোহিত করিয়া বধ করিবার আদেশ দিয়াছেন"

চারুদত্ত ধর্ম্মবিগর্হিত দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া পালকের উপর অভিসম্পাত করিলেন এবং মৈত্রেয়ের উপর তাঁহার স্ত্রী পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া বধ্য ভূমিতে নীত হইলেন।

দশম অঙ্ক—দুই জন চণ্ডাল চারুদত্তকে বধ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। রাজপথ লোকারণ্য। চণ্ডালদ্বয় তাহাদিগকে অপসারণ করিতে করিতে চলিল। কতকদূরে উপস্থিত হইলে চারুদত্ত ভ্রমর মত তাহার পুত্র ও স্ত্রী এবং বয়স্য মৈত্রেয়কে সঙ্গে দেখিতে পাইলেন। এই সময়ের মিলন পাঠ অশ্রুজল ত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে পুষ্পকরণ্ডকে বসন্তসেনার বধ-বৃত্তান্ত শকারের ভৃত্য স্থাবরক অবগত ছিল। সে পাছে ঘটনা প্রকাশ করে এই জন্য শকার তাহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া নিজ ভবনে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। এ স্থান দিয়া চণ্ডালগণ কর্তৃক চারুদত্ত শ্মশানে নীত হইবার সময় স্থাবরক উচ্চৈঃস্বরে প্রকৃত ঘটনা ঘোষণা করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে কথা কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। স্থাবরক নিরপরাধের প্রাণদণ্ড সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া প্রাসাদের উপর হইতে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ভূতলে পতিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে নিগড়ও ভগ্ন হইল। তখন স্থাবরক আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। তখন বধ্য পটহ ও ডিণ্ডিম ঘোষণা স্থগিত হইল।

এই সময়ে শকার চারুদত্তের বধ দেখিতে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শত্রুবিনাশে তাঁহার অসীম সন্তোষ। শকার আবার শুনিয়াছিল যে শত্রুর বধ যে দেখে তাহার জন্মান্তরে চক্ষু রোগ

হয় না। তিনি লোক সমারোহ দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন যে দরিদ্র চারুদত্তের বধে এত লোকের সমাগম, যখন আমাদের মত বড় মানুষের বধ হয় না জানি কতই অধিক লোক হয়।

শকার উপস্থিত হইলেই শুনিতে পাইল সকলেই বলিতেছে, শকার বসন্তসেনাকে বধ করিয়াছে এবং চারুদত্ত নির্দোষী।

শকার দেখিল বড় বিপদ। তখনি বলিল "মহাশয়গণ! এই চেটা সুবর্ণ চুরির জন্য ধৃত হইয়া প্রহারিত হইয়াছে ও ইহাকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। এ মনোবাদ বশতঃ যাহা বলিতেছে তাহাই কি সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন?" শকার স্থাবরকের নিকট আসিয়া গোপনে তাহার হস্তে সুবর্ণালঙ্কার দিয়া মৃদুস্বরে বলিল "বৎস স্থাবরক! এইটী লইয়া অন্যরূপ বল।"

স্থাবরক তাহা লইয়া সকলকে দেখাইয়া বলিল "মহাশয়েরা দেখুন, আমাকে সুবর্ণ দিয়া লোভ প্রদর্শন করিতেছে।"

শকার উহা তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইয়া বলিল "এই সেই স্বর্ণালঙ্কার যাহার জন্য ইহাকে রুদ্ধ করিয়াছিলাম। এ আমার সুবর্ণ ভাণ্ডারে নিযুক্ত ছিল; সুবর্ণ চুরি করায় মারিয়াছি; প্রত্যয় না হয়, ইহার পৃষ্ঠদেশ দেখুন।"

শকার যেরূপ দয়াল প্রভু, তাহাতে স্থাবরকের পৃষ্ঠে আঘাতের চিহ্নের অভাব ছিল না। সকলে চিহ্ন দেখিয়া স্থাবরকে অবিশ্বাস করিল। চারুদত্ত বধ্যভূমিতে নীত হইতে লাগিলেন। শকার তাড়াতাড়ি বধ করিবার জন্য চণ্ডালদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। চারুদত্তের শিশু সন্তান (রোহসেন) বলিল "বাবাকে মুক্ত দিয়া আমাকে মার।"

শকার বলিল; "ভালই সপুত্র চারুদত্তকে বধ কর।"

চারুদত্ত দেখিলেন মূর্খের অসাধ্য ক্রিয়া নাই। তাঁহার পুত্রকে বলিলেন "বৎস! তুমি তোমার মাতার সমভিব্যাহারে আশ্রমবাসী হও; নতুবা নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হইবে।"

শকার পুনরায় বলিল "রে চণ্ডালগণ! চারুদত্তকে তৎপুত্রের সহিত বধ কর"। চণ্ডালগণ বলিল "রাজার এমন আদেশ নাই।" তাহারা রোহসেন ও মৈত্রেয়কে সে স্থান হইতে তাড়াইয়া দিল।

বধ্যস্থান অতি নিকট, দুই চণ্ডালের মধ্যে কাহার বধ করিবার "পালা" তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক হইল। শেষে—একজনের পালা স্থির হইল। সে বিলম্ব করিতে লাগিল। শকার পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। চারুদত্ত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন। চণ্ডালগণ বলিল "চারুদত্ত! রাজ নিয়োগের গৌণ হইতেছে—ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ কর এবং উত্তাল হইয়া স্থিরভাবে থাক তাহা হইলে এক প্রহারে জীবন শেষ হইবে।" চারুদত্তও সেইরূপ করিলেন।

চণ্ডাল খড়্গ নিষ্কোষিত করিয়া বধের

উদ্যোগ করিল চণ্ডালের হস্ত হইতে খড়্গ নিপতিত হইল।

অপর চণ্ডাল বলিল "রাজার আদেশ মত শূলে আরোপণ করা যাউক।"

তখন দুইজনে তীক্ষ্ণ শূলে চারুদত্তকে আরোপণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে উর্দ্ধশ্বাসে বসন্তসেনা ও ভিক্ষু সংবাহক উপস্থিত হইল।

শকার বসন্তসেনাকে দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিল চণ্ডালগণ বলিল "আমাদের রাজার আজ্ঞা এই যে যে বসন্তসেনাকে মারিয়াছে তাহাকে বধ করিতে হইবে—চল্ শকারকে ধরিয়া আনিয়া প্রাণ বধ করি।"

এদিকে শর্বিলক পতিত রাজা পালককে বধ এবং আর্য্যককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া চারুদত্তের নিকট উপস্থিত হইল।

চারুদত্ত শর্বিলকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "আপনার গৃহ ভেদ করিয়া ন্যস্তধন অপহরণ মহাপাপ যে করিয়াছিল আমিই সেই।"

চারুদত্ত বলিলেন "সখে একরূপ কথা বলিও না; তুমিই এই প্রণয়ের মূল।" এই বলিয়া তিনি শর্বিলকের কণ্ঠ ধারণ করিলেন।

অনতিবিলম্বে শকার পশ্চাদ্দেশে বাহু বদ্ধ অবস্থায় আনীত হইল। শকার চারুদত্তের পদতলে পতিত হইয়া শরণাগত হইল। তিনিও অভয় দান করিলেন।

শর্ব্বিলক শকারকে চারুদত্তের চরণ প্রান্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করিল "ইহার প্রতি কি দণ্ড বিধান করিবেন করুন, এখনই সম্পাদন করিব।"

চারিদিক হইতে "বধের আজ্ঞা দিন—বধের আজ্ঞা দিন্" বলিয়া চীৎকার হইতে লাগিল। বসন্তসেনা চারুদত্তের কণ্ঠ হইতে বধ্যমালা লইয়া শকারের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

চারুদত্ত বসন্তসেনার এইরূপ ইঙ্গিত বা অন্য কোন লোকের অনুরোধ না মানিয়া বলিলেন "আমার বধ্য নহে শোন, তবে ইহাকে এখনই মুক্ত দেও"।

শর্বিলক অনেক তর্ক বিতর্কে চারুদত্তের মত পরিবর্তন করিতে না পারিয়া শকারকে মুক্তি দিলেন।

চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা অগ্নি প্রবেশের উদ্যোগ করিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া চারুদত্ত তখনই চিতারোহণ স্থানে উপস্থিত হইয়া অনলপ্রবেশোন্মুখা ধূতার জীবন রক্ষা করিলেন।

শর্বিলক বসন্তসেনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল রাজা আপনাকে "বধূ" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বসন্তসেনাকে অবগুণ্ঠনাবৃত করিয়া দিলেন।

তৎপরে চারুদত্তের অভিপ্রায় অনুসারে ভিক্ষু সংবাহক সকল বিহারের কুলপতি হইল। স্থাবরক দাস বৃত্তি হইতে মুক্ত হইল। চণ্ডালদ্বয় সকল চণ্ডালের অধিপতি হইল; চন্দনক দণ্ডপালক হইল এবং শকার পূর্ব্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিল; শর্বিলক বলিলেন "যাহা বলিতেছেন

তাহাই হইবে, কিন্তু এই পাপিষ্ঠ শকারকে ছাড়িয়া দেন, ইহাকে বধ করি।" চারুদত্ত বলিলেন "শরণাগতকে অভয় দিয়াছি। ইহাকে বধ করা উচিত নহে"।*

(ক্রমশঃ) শ্রীপ্রসন্ন—

বাল্য-বিবাহ।

এতদ্দেশে যেরূপ বাল্য-বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে, তাহা সমর্থনার্থ দুই জন লেখক যে কতিপয় হেতু দিয়াছেন তাহার বিচার করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। একজন লেখক বিগত চৈত্র (১২৮৯) মাসের বঙ্গদর্শনে "বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য" নামক প্রস্তাবে তাহা খ্যাপন করিয়াছেন, অন্যতর লেখক "মানবতত্ত্বের" গ্রন্থকার।

বাল্য-বিবাহের বিপক্ষে এক্ষণকার নবযুবকেরা যাহা প্রধান আপত্তি স্বরূপ ধরিয়া থাকেন, আমাদিগের লেখকদ্বয়ের মধ্যে কেহই তাহা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সে আপত্তির নিরসন করিতে না পারিয়া কতকগুলি সামান্য হেতু দেখাইয়া ঐ রীতির পক্ষ সমর্থনার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন। বাল্য-বিবাহ পক্ষে তাঁহারা যে সকল যুক্তি দিয়াছেন তাহা কতদূর সারবান, তাহা আমরা দেখিব। কিন্তু এতৎপক্ষ সমর্থনের পূর্ব্বে আপত্তিগুলি খণ্ডন করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য ছিল। সাপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষীয় যুক্তির বিচারনা হইলে কোন বিষয়ের স্থির মীমাংসা হইতে পারে না। এক্ষণে দেখা যাউক, লেখকেরা এ বিষয়ের কিরূপ বিচার করিয়াছেন।

বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি বঙ্গদর্শন লেখক নিজমুখেই এইরূপ বিবৃত করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। "বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, শৈশবাবস্থায় কন্যা বিবাহিত এবং পতিহস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত বয়সে সন্তানোৎপাদন করিয়া তিনি স্বয়ং স্বাস্থ্য হারাইবেন এবং সন্তানগুলিকেও রুগ্ন করিয়া ফেলিবেন। আজ কাল এই সকল কথা অনেকের মুখে শুনা যায় এবং অনেকেই বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা নিবারণ করিবার আশায়, কিছু বেশী বয়সে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু চরক শুশ্রুতের মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, আর সর বেনজমিন ব্রোডির মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, যিনি যেমন করিয়াই বলুন, বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্য-বিবাহের ফল, তাহা সপ্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

* এই প্রবন্ধের প্রথম কিয়দংশ উষা নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে, বালিকা-পত্নী তাহার জন্য নয়। সে পশু, বালিকারূপ পবিত্র কুসুম তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, যে রকম উদ্দেশে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিবাহ করিতেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যে বিবাহ করে, বালিকা-পত্নী তাহারই প্রাপ্য। যিনি জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, পরিণতবয়স্ক, উন্নতমনাঃ, মহৎ আশয়ে মহিমান্বিত, তাঁহার পত্নী চিরকালই সৌষ্ঠব এবং সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, তাঁহার সন্তান সন্ততি সকল সময়েই সুপ্রস্ফুটিত পুষ্প।” বাল্য-বিবাহের বিপক্ষে যে আপত্তি লেখক অনেকের মুখে শুনিতে পান, এবং আজ কাল যাহা সকল লোকেরই মুখে শুনা যায়, তাহা অবশ্য প্রধান আপত্তি। কিন্তু যাহা প্রধান আপত্তি, লেখক তাহা সামান্যতঃ এই রূপ খণ্ডন করিতেছেন। তিনি বলেন, যাঁহাদের বলিবার অধিকার আছে, যাঁহারা দেহতত্ত্ব ভাল বুঝেন, তাঁহাদের মত উল্লেখ করিয়াই বলুন, বাঙ্গালির শারীরিক দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্য-বিবাহের ফল, তাহা “সপ্রমাণিত” বলিয়া তিনি স্বীকার করিতে পারেন না। চরক, শুশ্রুত এবং সার বেনজামিন ব্রোডির মত দেহতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ লোকেরা কিছু বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার সকল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, যে স্থির করিবেন কোনটি সেই দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। বাঙ্গালির দুর্ব্বলতার বহুবিধ কারণ থাকিতে পারে এবং তন্মধ্যস্থ বাল্য-বিবাহ অন্যতম কারণ হইতে পারে। কিন্তু দুর্ব্বলতার ইহা অন্যতম কারণ হইলেই চরক ও শুশ্রুতের মত বজায় রহিল। লেখকের নিকট বাল্য-বিবাহ বাঙ্গালির শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীয়মান না হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য যে উহা একেবারেই দুর্ব্বলতার কারণ নহে, এমত কথা ত তিনি বলিতে পারিলেন না। সুতরাং বেনজামিন ব্রোডি এবং চরক শুশ্রুত আপনাদের বিষয় আলোচনায় বাল্য-বিবাহকে যে বাঙ্গালির একটি দুর্ব্বলতার কারণ স্থির করিয়া গিয়াছেন সে মত খণ্ডিত হইল না। বাল্য-বিবাহ শারীরিক দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ না হইলেও একটি অপ্রধান কারণ বলিয়া ত লেখক ধরিবেন। তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল।

লেখকের দ্বিতীয় কথা এই যে, আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মোদ্দেশে বিবাহ করিলে বালিকাপত্নীই গ্রহণ করা ভাল। বিবাহের উদ্দেশ্য যদি ধর্ম্ম-প্রয়োজন হয়, তবে পত্নী বালিকা না হইয়া বরং যত বৃদ্ধা হইবে ততই আমাদের নিকট ভাল জ্ঞান হয়। কারণ, বৃদ্ধ বয়সেই লোকের ধর্ম্মে মতি অধিকতর হয়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের বিবাহের উদ্দেশ্য যদি শুদ্ধ ধর্ম্ম-প্রয়োজন সাধন হইত, তাহা হইলে পরিণয় কার্য্য বৃদ্ধ বয়সেই স্থির করা হইত। তাঁহাদের বিবাহ যে কেবল

ধর্ম্ম-প্রয়োজন সাধন জন্য, শারীরিক প্রয়োজন ও সাধন জন্য নহে এমত প্রতীত হয় না। তাহাতে শারীরিক প্রয়োজনও ছিল। শারীরিক প্রয়োজনও যে ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, লেখক এমতও প্রতিপাদন করিতে পারিবেন না। যাহাতে শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, যাহাতে সন্তান সন্ততি চিররোগী ও দুর্ব্বল হয়, যাহাতে তাহাদের আয়ুঃ কমিয়া যায়, এরূপ কার্য্য কি ধর্ম্মসঙ্গত? যাহা হউক, লেখকের মতে যদি প্রাচীন কালে ধর্ম্ম-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, এক্ষণকার কালের ধর্ম্মনীতিতে এরূপ কার্য্যে ঘোর অধর্ম্ম আছে বলিয়াই স্থির হইয়াছে। সুতরাং বাল্য-বিবাহে ধর্ম্ম-হানিও হইতেছে। যিনি বালিকারূপ পবিত্র কুসুমের স্বাস্থ্য ভস্ম করিয়া তাহার আয়ুঃ হানি করিতে পারেন, তাহাকে বরং ঘোর অধর্ম্মাচারী বলিতে হইবে, সে রূপ পবিত্র কুসুম তাহার কখনই প্রাপ্য নহে। অতএব, কি শারীরিক প্রয়োজন কি ধর্ম্মোদ্দেশ্য, বাল্য-বিবাহ কোন উদ্দেশ্যই সাধন করিতে সমর্থ নহে।

বাল্য-বিবাহের প্রধান আপত্তি বঙ্গ-দর্শন-প্রস্তাব লেখক এই রূপ খণ্ডন করিয়াছেন। "মানবতত্ত্ব" লেখক সে আপত্তি কি রূপ খণ্ডন করিয়াছেন দেখা যাউক। যে স্থলে বালপতির সহিত বালিকার পরিণয় হয়, সে স্থলে "মানবতত্ত্ব" লেখকের মতে পরিণয় অশেষ দোষের আকর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তিনি বলেন "কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। তাহাতে নানা দোষের উদ্ভব হইতে পারে। উভয়েরই অল্প বয়সে বিবাহ হইলে অপক্ক বীজে দুর্ব্বল সন্তান জন্মিতে পারে, মানবগণ অল্প বয়সে প্রণয়মগ্ন ও সন্তানভারে জড়িত হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে অশক্ত ও অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হয়।" সুতরাং তিনি এপ্রকার বাল্য-বিবাহ সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে ১০।১২ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ২০।২২ বৎসরের পুরুষের বিবাহ অনুচিত নহে। এরূপ বিবাহ সমর্থনার্থ তিনি কেবল বলিয়াছেন "ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, অধিক বয়স্ক পুরুষের ঔরসে অল্প বয়স্কা নারীর গর্ভজাত সন্তান দুর্ব্বল হয় না।" মানবতত্ত্ব লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন "যদি পৃথিবীর কোন দেশে প্রকৃত জ্ঞানালোচনা হইয়া থাকে, তবে সে ভারতবর্ষে।" এরূপ স্থলে ভারতবর্ষের চরক ও শুশ্রূতের মত অবহেলা করিয়া ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করা কি তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে? তিনি কোন্ কোন্ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে, এবং কি কি প্রমাণানুসারে বাল্য-বিবাহের সমর্থন করিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে চাহি। তিনি কি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, যে পণ্ডিতগণ বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, তাঁহারা ঠিক তাহার নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহ সমর্থন-

করেন কি না? কারণ, ইয়ুরোপীয়গণ নির্দ্দিষ্ট বালক বালিকার বয়স আমাদের বালক বালিকার বয়সের সহিত সমান না হইতে পারে। আমরা আরও জানিতে চাহি, সেই ইয়ুরোপীয়গণের এবিষয়ে মত দিবার কত দূর অধিকার আছে, তাঁহাদের মত ও প্রমাণাদি কতদূর গ্রহণযোগ্য, এবং এদেশে তাঁহাদের মত কতদূর চলিতে পারে। এ সমস্ত বিষয় বিচার না হইলে মানবতত্ত্ব-লেখকের কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে যাহা প্রধান আপত্তি, তাহা এখনও পর্য্যন্ত অখণ্ডিত রহিল।

মানবতত্ত্ব লেখক বলেন "মানবগণ অল্পবয়সে প্রণয়মগ্ন ও সন্তানভাবে জড়িত হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে অশক্ত ও অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হয়"—এ আপত্তি কি তাঁহার নিজ-নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে উক্ত হইতে পারে না? পুরুষের ২৫। ২৬ বৎসরে সন্তান সন্ততি হইলে তিনি কি অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হয়েন না, তিনি কি সন্তান ভারে জড়িত হয়েন না? আর একটি কথা এই, স্ত্রীলোক অল্পবয়সে সন্তান সন্ততি ভারে জড়িত হইলে, তাহার জ্ঞানার্জ্জন হয় কই? এ আপত্তি সম্বন্ধে লেখক বলেন "স্ত্রীজাতির ও বিদ্যাশিক্ষা করা আবশ্যক বটে, কিন্তু পুরুষের ন্যায় তাঁহাদের অধিক শিখিবার আবশ্যকতা নাই।" নাই কেন? যদি আবশ্যকতা না থাকে তবে অল্প শিখিবারই বা প্রয়োজন কি? আর অল্প বিদ্যা শিখিলে তাহার ফল মন্দ, না ভাল হয়? ইংরাজী কবি পোপ যাহা বলিয়াছেন;—"Little learning is a dangerous thing" লেখক কি এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করেন না? আর তিনি যে অল্পবিদ্যা শিখিবার কথা বলিয়াছেন, তাহার পরিমাণ কি, আমরা জানিতে চাহি। তিনি কাহাকে অল্পবিদ্যা বলেন, কাহাকেই বা অধিক বিদ্যা বলেন? অল্পবিদ্যা দান করিলে স্ত্রীজাতির মধ্যে কি অনেকে অধিক বিদ্যার প্রার্থী হইবেন না? অধিক বিদ্যার প্রয়াসিনী স্ত্রীলোককে কি তাহা হইতে বঞ্চিত করা উচিত? যদি উচিত হয়, কেন উচিত, যদি না হয় বিদ্যা শিখিবার সময় কই? এ সকল কথার মীমাংসা না হইলে, তাঁহার আপত্তি-খণ্ডন গ্রাহ্য নহে।

আর একটী কথা। মানবতত্ত্ব-লেখক আর একটী আপত্তি গ্রহণ করেন নাই। তিনি সন্তান সন্ততির দোষ ঘটে কি না, শুদ্ধ এই বিষয় বিচার করিয়া নিজ-নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু গর্ভিণী অর্থাৎ বিবাহিতা বালিকার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় কি না, তদ্বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। বাল্য-বিবাহে যদি বালিকার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তিনি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হয়েন, তাহা হইলে, লেখকের নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহ অবলম্বনীয় হয় কই? এ আপত্তি যখন খণ্ডিত

হইতেছে না, তখন তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহ অবশ্য অগ্রাহ্য বলিতে হইবে। অল্পবয়সে অনেকগুলি সন্তান সন্ততি প্রসব করিয়া গর্ভিণী শীঘ্র শীঘ্র দুর্ব্বলা, রুগ্ন, ও অকালে জরাগ্রস্থা হয়েন না, লেখক যদি এমত প্রমাণ করিতে পারেন তবে তন্নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহ একাংশে আপত্তি-বিরহিত হইতে পারে, নহিলে নহে।

মানবতত্ত্ব-লেখক বলেন "ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, অধিক বয়স্ক পুরুষের ঔরসে অল্পবয়স্কা নারীর গর্ভ-জাত সন্তান দুর্ব্বল হয় না"। এ কথা কি এ দেশে খাটে? আমরা বাস্তবিক যাহা ঘটিতেছে দেখিতেছি, তাহা কি কোন পণ্ডিতের মতে বিপর্য্যস্ত হইতে পারে? তিনি যদি পণ্ডিত-গণের মত বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে প্রমাণ করুণ, এতদ্দেশীয় বালক বালিকাগণ দুর্ব্বল নহে। তাহা যদি না পারেন, তাহা হইলে কি কোন পণ্ডিতের মত বাস্তবিক ঘটনার বিপরীত হইলেও তাহা গ্রহনীয় হইতে পারে? আর আমরা বুঝিতে পারি না, যখন স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষীয় পক্ক বীর্য্য মিশ্রিত হইলে সবল সন্তান জন্মে, তখন সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও কিরূপে বলিষ্ঠ সন্তান জন্মিতে পারে। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ক সমুদায় প্রমাণ,ও ও বাস্তবিক ঘটনার ফল তুলনা করিয়া না দেখিলে কোন কথা বলিতে পারি না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না, মানবতত্ত্ব-লেখক প্রমাণাদি দ্বারা তাঁহার সন্তান বিষয়ক হেতু সমর্থন করিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা কখনই গ্রহণীয় হইতে পারে না। পণ্ডিতের মত মাত্র এই প্রমাণ নহে, বাস্তবিক ঘটনা দ্বারা এই প্রমাণ সমর্থিত হওয়া চাই।

বাল্য-বিবাহ বিপক্ষে যাহা প্রধান আপত্তি, আমাদের লেখকগণ তাহা কতদূর খণ্ডন করিয়াছেন, আমরা প্রদর্শন করিলাম। সেই রীতির প্রতি যে অপরাপর আপত্তি আছে, আমাদের লেখকগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং সে সমস্ত আপত্তি অখণ্ডিত রহিল। তাঁহারা এই সকল আপত্তি খণ্ডন করিতে না পারিয়া কতিপয় সাপক্ষ কথা বলিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। দেখা যাউক, সেই কথাগুলি কতদূর যুক্তিসঙ্গত। প্রথমে বঙ্গদর্শন-প্রস্তাব-লেখকের কথা গ্রহণ করিলাম।

তিনি বলেন, এদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রণালী চলিত আছে। পিতা, মাতা, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, ভাই, ভগিনী, মাতৃস্বসা, পিতৃস্বসা প্রভৃতি লইয়া এখানে পরিবার গঠিত হয়। সুতরাং এখানে পত্নীর সম্বন্ধ শুদ্ধ পতির সহিত নহে, অনেক লোকের সহিত। যাহার সম্বন্ধ অনেক লোকের সহিত, তাহার শিক্ষার বিষয় বেশী। অল্প বয়স হইতে পতির

পরিবারে থাকিয়া এই শিক্ষা লাভ না করিলে, এ শিক্ষা প্রায়ই লাভ করা যায় না। পত্নীকে এইরূপে শিক্ষিতা করিবার জন্য, তাহার শৈশব-বিবাহের ব্যবস্থা। অতএব, কন্যার শৈশব-বিবাহ কখনই নিন্দনীয় নহে।

এই যুক্তির সমুদায় বল একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রণালীর উপর স্থাপিত। ঐ পরিবার-প্রণালী এদেশে এককালে উপযোগী ছিল; কিন্তু এক্ষণে উপযোগী কি না, সে এক স্বতন্ত্র কথা। এক্ষণে স্থির হইতেছে যে, এই পরিবার-প্রণালীর গুণ-ভাগ অপেক্ষা দোষ-ভাগই অধিক। যদিও ইহা এখনও চলিত আছে বটে, কিন্তু ইহা এতদ্দেশীয় অপরাপর রীতির ন্যায়ই চলিত। ইহার এখন ভগ্নদশা উপস্থিত। ইহার বন্ধন ক্রমশঃই শিথিল হইতেছে। যে প্রণালীর উপর কন্যার শৈশব-বিবাহের বল, যখন সেই প্রণালী তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, তখন শৈশব-বিবাহের যুক্তির দাঁড়াইবার স্থল কই? দ্বিতীয় কথা, শিক্ষা। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কন্যাকে কি শিখিতে হইবে, এবং সে শিক্ষা কি অধিক বয়সে অসম্ভব, ও আবশ্যক? যদি অসম্ভব না হয়, তবে একজনের শরীর ভগ্ন করিয়া শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা কি? আর যদি অসম্ভব হয়, তবে এক দিকে কন্যার শারীরিক স্বাস্থ্যভঙ্গের গুরুতর পাপ, অন্য দিকে সেই কঠিন মূল্যে কতকগুলি সামান্য সাংসারিক উপকার-লাভ। তুলাদণ্ডে কোন্ দিক্ ভারী হইয়া পড়ে? এই কঠিন মূল্যে যে উপকার লাভ হইতেছে, সে উপকার গুলি কি কি আমরা বিশেষ করিয়া জানিতে চাহি। লেখক যখন শিক্ষার বিষয় গুলি বিশেষ করিয়া বলেন নাই, তখন তাঁহার সে কথার সম্যক্ বিচার হইতে পারে না। আমরা আরও জানিতে চাই, আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার-মণ্ডলে শিশু-কন্যার কি প্রকার শিক্ষা লাভ হয়, এবং ভবিষ্যতে সে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? কন্যার বিবাহ কালীন তাহার শ্বশুরালয়ের পারিবারিক গঠন এক প্রকার থাকে, কিন্তু দিন দিন তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসে। এমত কি, কিছু দিন পরে, পরিবার মণ্ডলে সেই কন্যার পূর্ব্বকার সমুদায় সম্বন্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে? যিনি বধূ ছিলেন, তিনি হয় ত গৃহিণী হয়েন। বধূ শৈশব কালে যে সংসারে ঢুকিয়াছিলেন, গৃহিণী বেলায় তাহার হয় ত কিছুই বর্ত্তমান নাই। তবে তাহার শৈশবাবস্থায় শিক্ষার ভবিষ্যৎ ফলাফল কি?

ভবিষ্যৎ প্রয়োজন-সাধন সকলশিক্ষারই উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু লেখক বলিতে পারেন এই ভবিষ্যৎ আমরা যত দূরবর্ত্তী মনে করিতেছি তত দূরবর্ত্তী না হইতে পারে। এই ভবিষ্যৎ কল্যও হইতে পারে, এক মাস পরেও হইতে পারে, এক বৎসর পরেও হইতে পারে।

শ্বশুর, ভাশুর সম্বন্ধে কন্যা কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অন্য তাহার শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ শিক্ষা কি শিশু-কন্যা তাহার পিত্রালয়েই প্রাপ্ত হয় না? অনেক স্থলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে শ্বশুরালয়ে কিসের শিক্ষা হইবে? যদি না হয়, এ শিক্ষা দিতে আর কত দিন যায়? দুই চারিটা মুখের উপদেশ মাত্র। বাকী সমুদায় বালবধূ পরের দেখিয়াই শিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বধূকে অতি তরুণাবস্থায় গৃহে আনি বলিয়া যদি সাংসারিক কার্য্য কিছু শিখাইতে হয়, একটু অধিক বয়সে আনিলে বোধ হয় তাহাও শিখাইতে হয় না। বালিকাবস্থায় যাহা শিখাইতে হয়, একটু জ্ঞান এবং বোধাবোধ জন্মিলে অনেকে আপনিই তাহা বুঝিয়া করিতে পারে। শিশুকালে বধূর গুরু-লঘু-জ্ঞান যদি কিছু অসম্পূর্ণ থাকে, একটু বয়স হইলে তাহা বিলক্ষণ স্ফুরিত হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ইউরোপীয় সমাজ। সেখানে যুবতীরা যখন শ্বশুর ভাশুর লইয়া ঘর করিয়া থাকেন, তখন সেই গুরুজনের প্রতি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সাধনে কি কিছু ত্রুটি হয়? তাঁহারাও সকলের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিয়া সংসার-ধর্ম্ম বরং কোন কোন স্থলে উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন করেন। একথা যদি স্বীকার্য্য হয়, তবে আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না, লেখক যে বালবধূর এত শিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সে শিক্ষা কি? এবং বালিকার অধিক বয়সে বিবাহ হইলে কি সে শিক্ষার আবশ্যকতা থাকে?

লেখক বলেন "হিন্দুপত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ। দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক। অতএব এক রকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পতিকুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুস্ত্রীর শৈশব বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।" হিন্দু-বিবাহের যদি এই রূপ উদ্দেশ্য হয়, পার্থিব সুখসৌকর্য্য, শ্বশুর ভাশুরগণের সেবা ও সুখের জন্য, তাঁহাদের শারীরিক আয়াসের জন্য যদি হিন্দু শাস্ত্রকার শৈশব বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে আর লেখক বলিতে পারেন না "আধ্যাত্মিক উদ্দেশে, যে রকম উদ্দেশে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিবাহ করিতেন, সেই রকম পবিত্র উদ্দেশে যে বিবাহ করে, বালিকা পত্নী তাহারই প্রাপ্য।" লেখক এক কালে শারীরিক, আধ্যাত্মিক দুই প্রকার উদ্দেশ্যই বলিতেছেন। যদি সাংসারিক সুখ ও শরীরের আয়াসের জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে তিনি আবার কিরূপে বলিতেছেন, শুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও পবিত্র ধর্ম্মোদ্দেশে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করিতেন? সুতরাং লেখক আপনার কথার আপনিই বিরোধী হইয়াছেন।

বঙ্গদর্শন-প্রস্তাব-লেখক বাল্য-বিবাহ সমর্থনার্থ আরও একটি যুক্তি দিয়াছেন। তিনি বলেন "ফলতঃ যাঁহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, যাঁহার কিছুই আপন হইতে পৃথক থাকিবে না, তাঁহাকে গোড়া হইতেই আপনাতে মিশাইতে আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, তাঁহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত আশা, এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আপনার অভিলাষানুযায়ী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যাঁহাকে এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহার জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, এবং পরিণত-বয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাঁহাকে এক রকম হাড়ে হাড় মিশিতে হইবে, তাঁহার শিশু হওয়া একান্ত আবশ্যক।" এই কথা গুলির সম্যক সমালোচনা আমরা "হিন্দু-বিবাহ" নামক পূর্ব্ব প্রস্তাবে করিয়াছি *। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক। লেখককে শুদ্ধ এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কেবল কি হিন্দুরা পতিপত্নী মিশিয়া এক-মন, এক-প্রাণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইউরোপীয়েরাও কি তাহা করে না? লেখক যে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের কথা বলিয়াছেন, ইউরোপীয় সমাজেও কি পতি পত্নী একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া সংসার-ধর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে না? যদি করে, তবে তাহারা ত বালিকা বিবাহ না করিয়াও সে উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। সুতরাং বাল্য-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা কি?

এক্ষণে আমরা "মানব তত্ত্ব" লেখকের সাপক্ষ কথা গুলি গ্রহণ করিলাম।—

বঙ্গদর্শন প্রস্তাব-লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন "পুরুষ অধিক বয়সে বিবাহ করিবে, কিন্তু স্ত্রীর বিবাহ শৈশবাবস্থাতেই সম্পন্ন হওয়া চাই। প্রথম ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না হইলে কন্যার পিতৃকুলের উপরনীচে চৌদ্দ পুরুষ নরকগামী হইবে—শাস্ত্রকারদিগের এমনি কঠিন শাসন। কি জন্য তাঁহারা পুরুষের বিবাহের নিমিত্ত অধিক বয়স এবং কন্যার বিবাহের নিমিত্ত অল্প বয়স ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন নাই বটে; কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় যে একেবারে বুঝিতে পারা যায় না এমন নয়। শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে, যাহা একটু বুঝিয়া দেখিলে এরূপ ব্যবস্থার তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। লেখক এই তাৎপর্য্য যেরূপ বাহির করিয়াছেন, তাহা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। "মানবতত্ত্ব"-লেখকও কি আমাদের শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছেন? কই, তাহা ত বোধ হয় না। বঙ্গদর্শন-প্রস্তাব-লেখক শাস্ত্রের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া তিনি যেমন বুঝিয়াছেন তাহাদের সেই রূপ তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছেন।

* গত কার্ত্তিক মাসের আর্য্যদর্শন দেখ।

কিন্তু মানবতত্ত্ব-লেখক সেরূপ কিছু করেন নাই। সুতরাং তাঁহার কথাগুলি যে আমাদের হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত এমত প্রতীত হয় না। যদি তাহা সেই শাস্ত্রানুমোদিত হয়, তবে তাহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে।

বঙ্গদর্শনে আমরা যে দ্বিবিধ যুক্তি বিন্যস্ত দেখিয়াছি, তাহা হিন্দু বাল্যবিবাহ মাত্রেই খাটে, কিন্তু মানবতত্ত্বের যুক্তি সকল তদ্রূপ নহে। হিন্দু সমাজস্থ সর্ব্ববিধ বাল্য বিবাহ মানবতত্ত্ব-গ্রন্থকার অনুমোদন করেন না। তিনি তন্মধ্যস্থ অনেকগুলি বিবাহের বিরোধী; তাহা অনেক দোষের আকর, সুতরাং সে প্রকার বাল্য বিবাহ সমাজ হইতে উঠিয়া যাওয়া উচিত। তিনি কেবল এক প্রকার বাল্য বিবাহ অনুমোদন করেন। তিনি বলেন "১০।১২ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ২০।২২ বৎসরের পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত।" তিনি এক্ষণে মনুর মতানুযায়ী ১২ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৩০ বৎসরের পুরুষের বিবাহ উচিত বোধ করেন না। তাঁহার মতে আবার স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নহে। মনুর মতানুযায়ী বিবাহ কেন এখন অনুচিত? তৎপক্ষে, স্ত্রী লোকে যেমন এক একটা যুক্তি দেয়, তিনি তদ্রূপ একটি যুক্তিও দিয়াছেন। তিনি বলেন "কেননা পূর্ব্ব কালের ন্যায় মানব এক্ষণে দীর্ঘজীবী নয় এবং এক্ষণে পূর্ব্বকালের ন্যায় বেদপাঠের আবশ্যকতা নাই।" সে যাহা হউক, তিনি যখন তাঁহার নিজ নির্দ্দিষ্ট বাল্য বিবাহ ভিন্ন সর্ব্ববিধ বাল্য বিবাহের বিরোধী, তখন তিনি অবশ্য সমাজ সংস্কার আবশ্যক, একথা স্বীকার করেন। তিনি একস্থলে সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া নব্য যুবাদিগকে ভর্ৎসনাও করিয়াছেন। তিনি কতকগুলি কৌলীন্য প্রথাকে নিন্দা করিলেন এবং তৎপরে বলিতেছেন "আধুনিক নব্য যুবারা যদি বৃথা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া এই সকল অহিত নিবারণের চেষ্টা করেন তাহা হইলে ঐ সকল দোষ দূরিত হইতে পারে।" যিনি এই প্রকার উক্তি করিয়াছেন, তাঁহাকে অবশ্য সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী বলিতে হইবে। কিন্তু এই দেখুন তিনিই আবার সেই এক মুখে এবং এক নিশ্বাসে অন্যত্র কিরূপ কথা বলিতেছেন—"যে ধর্ম্ম ও সমাজের উৎকর্ষ সাধন জন্য ভারতবাসীরা চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ও যাহার উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, বঙ্গবাসী ছন্নমতি হইয়া তাহারই সংশোধনে ব্যতিব্যস্ত। ঐহিক ব্যাপারে তাঁহারা তাদৃশ মনঃসংযোগ করেন নাই বলিয়া অধুনা ভারতের এই দুর্দ্দশা, তাহার উন্নতি চেষ্টা কেহ করেন না।" হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তিনি বলেন "বঙ্গবাসীর এই সকলের উন্নতির চেষ্টা অনাবশ্যক; বহির্জ্জাগতিক উন্নতি চেষ্টাই বঙ্গবাসীর নিতান্ত আবশ্যক।" তিনি হিন্দু সমাজের সমস্ত রীতি

নীতিকে বিচারাধীন করিয়া তাহাদের বহুবিধ দোষ দেখাইয়া যে অবশেষে কিরূপে উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি যে কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে, আমাদিগের সহযোগী "বিজ্ঞান-দর্পণে" বিগত অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, সমাজ সম্বন্ধেও সেই উক্তি কেমন অসঙ্গত তাহা আমরা একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রদর্শন করিলাম।

সে যাহা হউক, এক্ষণে মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। তিনি বাল্য বিবাহের যে সকল সাপক্ষ কথা বলিয়াছেন, দেখা গেল, তাহা হিন্দু সমাজস্থ কেবল একবিধ বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত। কারণ, তিনি অন্য সর্ব্ববিধ বাল্যবিবাহ অহিতকর অথবা অনুচিত জ্ঞান করেন। সুতরাং তিনি বাল্য বিবাহ এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার বাল্য বিবাহের অর্থ বালিকা বিবাহ। তিনি যখন ২০।২২ বৎসরের পূর্ব্বে (শুদ্ধ জন কয়েক ধনী লোকের সন্তান ব্যতীত) পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ জ্ঞান করেন, এবং যখন তিনি এই ২০।২২ বৎসরের মধ্যে পুরুষকে সর্ব্ববিধ বিদ্যায় সম্পন্ন জ্ঞান করিয়াছেন, তখন আর কিরূপে বলিব, তিনি বালকের বিবাহের বিধান করিতেছেন। সুতরাং তাঁহার বাল্য বিবাহের অর্থ বালিকা-বিবাহ। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার যুক্তি সকল এইরূপ বালিকা-বিবাহ সম্বন্ধে কতদূর প্রযুক্ত ও সঙ্গত। তাঁহার প্রধান যুক্তি স্থাপন করিবার জন্য গ্রন্থকার অগ্রে নানাবিধ হেতু দেখাইয়া সাব্যস্ত করিলেন যে বাল্য বিবাহ প্রণয় উৎপাদনে অত্যন্ত অনুকূল। তৎপরে তাঁহার কথা গুলির সার মর্ম্ম এইরূপ অবয়বে আনিতে পারা যায় :—

যে বিবাহ প্রণয়-পোষক তাহা ভাল। বাল্য বিবাহ (বালিকা-বিবাহ) প্রণয়-পোষক। অতএব, বালিকা-বিবাহ ভাল।

এই তর্কের প্রথম বাক্যের যাথার্থ্য, ভাল শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। শুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয় পোষক হইলেই যে বিবাহ ভাল হয় এমত নহে, ভাল বিবাহের অন্যান্য অঙ্গও থাকিতে পারে। কোন বিবাহ প্রণয়-পোষক হইতে পারে, কিন্তু তাহা সমাজের এবং দম্পতীদ্বয়ের কতদূর কল্যাণকর, তাহাও দেখিতে হইবে। সুতরাং শুদ্ধ প্রণয়-পোষক হইলেই যে বিবাহ ভাল হইল, এমত নহে।

কিন্তু তর্কের অনুরোধে স্বীকার কর যে, গ্রন্থকারের তর্কাবয়বের প্রথম বাক্যটী অ পত্তি-বিরহিত। তবে স্বীকৃত হইল যে, বিবাহ প্রণয়-পোষক হইলে তাহা ভাল। তৎপরে, গ্রন্থকার নানা হেতু দিয়া যে কথা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, দেখিতে হইবে তাহা কি সাধারণ সত্য এবং স্থির সিদ্ধান্ত? তিনি বলেন বাল্য-বিবাহ প্রণয়-পোষক। আমরা কিন্তু ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে

উপনীত হই। আমরা বলি গ্রন্থকার-নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহ অপ্রণয়-পোষক। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্তানুসারে গ্রন্থকারের যুক্তি অনুযায়ী বাল্য-বিবাহ ভাল নহে। এক্ষণে আমরা দেখাইব গ্রন্থকার-নির্দ্দিষ্ট বাল্য বিবাহ কেন প্রণয়পোষক নহে। তবে দেখা উচিত, প্রণয় কিরূপে উৎপন্ন হয়, কিরূপেই বা স্থায়িত্ব লাভ করে এবং কিরূপেই বা তাহা ভঙ্গ হয়। প্রণয়ের এই সমস্ত নিয়ম আলোচনা করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইবে। কবিবর শেলি অল্প কথায় প্রণয়ের একটী সুন্দর বৃত্তান্ত দিয়া তাহার প্রকৃতি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন ;—

"Love is inevitably consequent upon the perception of loveliness. Love withers under constraint ; its very essence is liberty ; it is compatible neither with obedience, jealousy nor fear ; it is there most pure, perfect and unlimited where its votaries live in cofidence, equality and unreserve."

শেলি একজন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত নহেন সত্য, কিন্তু কোন দার্শনিক পণ্ডিত যে প্রণয়ের প্রকৃতি এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন এমত আমাদের স্মরণ হয় না। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে শেলি যেরূপ প্রণয়ের প্রকৃতি বর্ণন করিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তবে তদনুযায়ী আমাদের গ্রন্থকারের বাল্য বিবাহ প্রণয়-পোষক কি না।

যেস্থলে সাম্য ও স্বাধীনভাব সেই স্থলে প্রণয়োৎপত্তি হয়। কিন্তু গ্রন্থকার-নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহে সম্পূর্ণ বৈষম্য এবং অধীনতা। যেখানে পরস্পরের প্রিয় বস্তু বিদ্যমান, সেই থানে তাহাদের মধ্যে অনুরাগ ও প্রণয় জন্মিয়া থাকে। কিন্তু গ্রন্থকার-নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহে ইহার বিলক্ষণ অভাব, সুতরাং সে স্থলে প্রণয় জন্মিবার কারণও নাই। যে স্থলে এক জন গুরু অন্য জন লঘু, যে স্থলে এক জন অন্য জনের উপর বল ও জোরজবর দস্তি করিতে পারে, যেখানে একজন অপরকে ভয় করে, সে স্থলে প্রণয় তিষ্ঠিতে পারে না। আমাদের গ্রন্থকার-নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহে ইহার সমুদায় বিদ্যমান। সুতরাং এস্থলে প্রণয় তিষ্ঠিতে পারে না।

বাল্য-বিবাহ-সম্বন্ধ দম্পতীর মধ্যে কোন বিষয়ের সাম্য নাই। কি শিক্ষা, কি বিদ্যা, কি বয়স, কি মতামত, কি মেজাজ সকল বিষয়েই পতি-পত্নীর মধ্যে বিলক্ষণ বৈষম্য। স্বাধীনভাবে এবং প্রিয় পদার্থ অথবা গুণ অবলোকনে তাহাদের মিলন সংঘটন হয় নাই। যতদিন দম্পতী বিদ্যমান, ততদিন স্ত্রী পতিকে সম্পূর্ণরূপে ভয় করিয়া থাকে, পত্নী স্বামীর সম্পূর্ণ দাসীত্বে নিযুক্ত, পতি স্ত্রীর পূজাপ্রাপ্ত ও মহাসম্মান-যোগ্য। স্বামীর ঘোর স্ত্রীকে উপেক্ষা করিতে হইবে,

কিন্তু স্ত্রীর সামান্য ত্রুটিও মার্জ্জনীয় নহে। স্ত্রী স্বামীর সম্পূর্ণ বশবর্ত্তিনী ও আজ্ঞাধীন দাসী। এ সমস্ত অবস্থায় তাহাদের মধ্যে প্রণয় কিরূপে জন্মিবে এবং জন্মিয়া কিরূপেই বা তিষ্ঠিতে পারে? আমরা সংক্ষেপে এই রূপে দেখাইলাম যে, বাল্য-বিবাহ প্রণয়-প্রতিপোষক নহে। এক্ষণে গ্রন্থকারের এক একটী হেতুর বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার প্রথম হেতু এই:—

"বাল্যকালে মানবের যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় জন্মে অর্থাৎ বাল্যকাল-জাত প্রণয় যেরূপ দৃঢ় ও স্থায়ী হয় অন্যকোন সময়ে সেরূপ হয় না।" তর্কের অনুরোধে স্বীকার করা গেল, পতি পত্নীর উভয়েরই বাল্যকাল। তাহা হইলেও আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্য-কালজাত প্রণয় দৃঢ় ও স্থায়ী হইয়া থাকে। গ্রন্থকার নিজমুখেই বলিতেছেন যে "মানব যত বয়োধিক হইতে থাকে ততই তাহাদিগের মধ্যে স্বার্থপরতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ও ইন্দ্রিয়-বিকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ও ততই তাহারা সাংসারিক চাতুরী শিক্ষা করিয়া কুটিল-হৃদয় হয়।" সুতরাং বাল্যকালে যে প্রণয়-সম্ভূত হইয়াছে তাহা দৃঢ় ও স্থায়ী হইতে পারেনা। বিদ্যালয়ে একত্রে অনেক বালক একশ্রেণীতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। তাহারা একত্রে থাকে, একত্রে ক্রীড়া করে। তাহাতে কি সকলের সহিত সকলের প্রণয় জন্মে, না যাহারা সেই বিদ্যালয়ে প্রিয়বন্ধু বলিয়া পরিচিত থাকে, বয়স হইলেও তাহারা তদ্রূপ প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে? আমরা জানি বাল্যকালের অনেক বিষয়ই ক্ষণ-স্থায়ী হয়; এবং প্রণয়ও তদ্রূপ। তার পর দেখুন, সেই বিদ্যালয়ে কাহার সহিত কাহার প্রণয় জন্মে? এই কথার বিচার করিলে লেখক যেরূপ প্রণয়ের প্রকৃতি বর্ণন করিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইতে পারিবে। গ্রন্থকারের বাল্য-বিবাহ-সম্বন্ধ স্ত্রীপুরুষ কি সেই রূপে মিলিত হইয়াছেন? তাঁহারা কি উভয়ে বালসখা? আমরা বলি তাহারা বালসখাও নহে, এবং প্রণয়সূত্রে মিলিতও নহে। স্ত্রী বালিকা বটে, কিন্তু পতি বালক নহে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্ত্রীপুরুষ মধ্যে প্রণয় জন্মিবার কারণ নাই, এবং যদি প্রণয় জন্মে, সেই অল্প বয়সের প্রণয় বরাবর প্রণয়রূপে থাকিতে পারে না।

গ্রন্থকার-নির্দ্দিষ্ট বাল্য বিবাহে প্রণয় জন্মিবার দ্বিতীয় হেতু স্বরূপ তিনি বলেন "বাল্য-বিবাহে প্রণয় জন্মিবার আর এক কারণ এই যে, তখন স্ত্রীপুরুষ কোন বিশেষ সংস্কারাধীন হয় না, সুতরাং বিবাহান্তে উভয়ই এক রূপ সংস্কারে বিশিষ্ট হওয়াতে অধিক প্রণয়বান হয়।" তিনি আরও বলেন "২০ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যে সিবিল সার্ভিস পর্য্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।" স্বামী এই রূপ বিএ, এম, এ, কিম্বা সিবিল সার্ভিস

পর্য্যন্ত বিদ্যালাভ করিলেন, তৎপরে ২২ বৎসরে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইলেন। গ্রন্থকারের মতে এই রূপ বিদ্যাবান ২০।২২ বৎসরের পাত্রই বিবাহার্থ অবশ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাঁহার মতে এরূপ পাত্রের কন্যা কিরূপ হইবে? বিবাহার্থিনী কন্যার হদ্দ ১২ বৎসর বয়ঃক্রম এবং সেই কন্যার বিদ্যা হদ্দ "বোধোদয়" কি "কথামালা"। এই রূপ হিন্দুকন্যার সহিত এম, এ, পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত বিদ্যাবান্ পুরুষের বিবাহ বন্ধন মিলন হইল। অথচ গ্রন্থকার বলিতেছেন "বিবাহান্তে উভয়ই একরূপ সংস্কার-বিশিষ্ট হওয়াতে অধিক প্রণয়বান হয়। আমরা ত জানি এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকি যে, এরূপ পতি পত্নী উভয়ে হিন্দু হইলেও, তাহাদের মতামত, বুদ্ধি বিবেচনা, এবং সংস্কারাদির পার্থক্য স্বর্গ মর্ত্ত্য ভেদ। তবে পতি যদি নিতান্ত মূর্খ ও মেয়ে মানুষের মধ্যে একজন হয়, তবেই তাহাদের সংস্কারের মিল কতকদূর সম্ভব। তবু বয়সের পার্থক্য হেতু তাহাদের সংস্কারের অনেক পার্থক্যও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এক বিষয়ে কিছু মিল থাকিলে কি হইবে, অপরাপর বিষয়ে যে অনেক গরমিল থাকিতে পারে। তাহা যদি হয়, তবে তাহাদের প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা কই?

শুদ্ধ প্রণয়বন্ধনের উপর যে বিবাহ স্থাপিত তাহা ইউরোপীয় বিবাহ প্রথা এবং অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন স্বয়ম্বর প্রথা। কিন্তু এই দুই প্রথাই আমাদের গ্রন্থকার নিন্দনীয় ও অহিতকর বিবেচনা করেন। অতএব তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন যে, যে বিবাহ প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ সে বিবাহ ভাল নয়। সুতরাং এরূপ উদ্বাহ-মিলনের যাহা বিপরীত, অর্থাৎ যাহা প্রণয়সূত্রে সূত্রিত নহে, তাঁহার বিবেচনায় সেই বিবাহই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। তারপর, তিনি অস্মদ্দেশীয় বাল্য বিবাহকে সেই রূপ অপ্রণয়-সূত্রিত বিবাহ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "যখন প্রমাণ হইল গান্ধর্ব্ব বিবাহ সমূহ অনিষ্টকর তখন মানবের স্বতঃ বিবাহ করিবার ইচ্ছা জন্মিবার পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া উচিত।" তাঁহার এই যুক্তি তর্কাবয়বে আনিলে এইরূপ দাঁড়ায়:—

যে বিবাহ শুদ্ধ প্রণয়ের উপর স্থাপিত তাহা ভাল নয়।

বাল্য-বিবাহ শুদ্ধ প্রণয়ের উপর স্থাপিত নহে।

সুতরাং বাল্য-বিবাহ ভাল।

যে বিবাহ শুদ্ধ প্রণয়ের উপর স্থাপিত তাহা গ্রন্থকার পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাহা তদ্বিপরীত তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ তিনি বলিতেছেন, দেখ, বাল্য-বিবাহ কেমন প্রণয়ানুকূল! গ্রন্থকার বলিতে পারেন যে, ইউরোপীয় বিবাহপ্রণালীতে বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয় জন্মে, এজন্য তাহা ভাল নয়। কিন্তু বাল্য-বিবাহে বিবাহের পরে প্রণয় জন্মে এজন্য তাহা ভাল। যদি তিনি এ কথা বলেন,

তবে দেখা যাইতেছে যে, বিবাহের পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক যে বিবাহে প্রণয় পরিবর্দ্ধন করে সেই বিবাহকেই তিনি ভাল বলিলেন। তাহা যদি হয়, তবে ইউরোপীয় প্রথায় প্রণয় নিশ্চয় জন্মিয়াছে দেখা যায় এবং বাল্য-বিবাহে তাহা জন্মিবে কি না সন্দেহ—তাহাতে প্রণয় জন্মিবার খুব কম সম্ভাবনা। সুতরাং এ পক্ষ ধরিতে গেলেও ইউরোপীয় প্রথা বাল্য-বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে। তবে গ্রন্থকার বলিতে পারেন যে, ইউরোপীয় প্রথায় কোন কোন স্থলে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা দোষে তাহার অপব্যবহার হয়। তৎপক্ষে আমরা বলি যে, এরূপ অপব্যবহার সকল বিষয়েই আছে। বাল্য-বিবাহে বরং ইউরোপীয় প্রথা অপেক্ষা অধিকতর অপব্যবহার হইয়া থাকে। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা জগতের সকল কার্য্যেই আছে, তা বলিয়া কি জগতের কার্য্য বন্ধ করিয়া বনে যাইতে হইবে? লোকে প্রবঞ্চনা প্রতারণা শাসন করিতেই চেষ্টা পায়। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ঘটে বটে, কিন্তু তাহা নিয়ম নহে, তাহা নিয়মের সামান্যতম নিপাতন মাত্র।

গ্রন্থকার ইউরোপীয় বিবাহের আর একটি দোষ ধরিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপীয় বিবাহে "অনেক অঘটন ঘটিয়া থাকে। অনেকে প্রণয়াকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে না পারিয়া আত্ম-বিনাশ সাধন করে, অনেকে চিরকালের জন্য প্রণয়নৈরাশ্যজনিত দুঃখে ভাসিতে থাকে।" আমরা জানি এ দোষ বাল্য-বিবাহেরই দোষ, কারণ, এ দোষ বাল্য বিবাহেই অধিক ঘটে। ইউরোপীয় বিবাহে যদি প্রেম-নৈরাশ্য হাজারের মধ্যে একটা ঘটে, বাল্য-বিবাহে তাহা শতকরা ৭৫টা ঘটিয়া থাকে। যে প্রকার নির্ব্বাচনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া বাল্য বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহাতে এ প্রকার দোষ অধিক ঘটিবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বাস্তবিক বাল্য-বিবাহ যে প্রকার নির্ব্বাচন-প্রণালীর উপর স্থাপিত, তাহাতে তাহা প্রণয়-উৎপাদক না হইয়া অনেক স্থলেই প্রণয়-প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা বর্ত্তমানকালের এমতও কতিপয় ঘটনা শুনিয়াছি যেস্থলে মনোমত কন্যার সহিত বিবাহ হয় নাই বলিয়া যুবকেরা অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এ ত গেল মনোমত কন্যার অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন,—অনেকে আবার মনোমত হয় নাই বলিয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় বার মনোমত দার পরিগ্রহ করিতেছেন। গ্রন্থকারের মতে বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও হিন্দু সমাজের ত ইহা এক প্রকার নিয়ম বলিলে হয়। যে সমাজে বালিকার বিবাহ না দিলে জাতি যায় এবং বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত, সে সমাজে বহু-বিবাহ চলিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু লেখকের মত বড় আশ্চর্য্য। তিনি বলেন, বালিকা বিবাহ

বর্ত্তমান থাক, বিধবা বিবাহও অপ্রচলিত থাক, অথচ বহু-বিবাহ উঠিয়া যাউক। সে যাহা হউক, হিন্দু সমাজে যে এত ব্যভিচার প্রচলিত আছে, বাল্য-বিবাহ-জনিত প্রেম-নৈরাশ্য ই তাহার প্রধান কারণ। গ্রন্থকার কিরূপে তবে বলিয়াছেন, বাল্য-বিবাহ প্রণয়-প্রতিপোষক। আমরা জানি বাল্য-বিবাহ ঠিক ইহার বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত। বাল্য-বিবাহ প্রণয়বিরোধী। সুতরাং লেখক যদি বলেন, যে বিবাহ প্রণয়-পোষক তাহা ভাল, তবে বাল্যবিবাহ কোনমতেই ভাল নহে।

আমরা পূর্ব্বে যে দুইটী তর্কাবয়ব বিন্যাস করিয়া দেখাইয়াছি, তাহার তুলনা করিয়া দেখিলেও গ্রন্থকারের মতদ্বৈধ এবং সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে। তিনি ভিন্ন স্থলে যে প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সাংমর্ম্ম ঐ রূপ অবয়বে বিন্যস্ত হইতে পারে। সুতরাং তিনি এক-কালীন অসঙ্গত মতদ্বয় স্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের গ্রন্থকার এতদ্দেশীয় প্রাচীন স্বয়ম্বর প্রথাকে এই জন্য পরিত্যজ্য জ্ঞান করেন। তিনি বলেন যে "ভারতে উক্ত পদ্ধতি নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল না, পূর্ব্বকালে গান্ধর্ব্ববিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা ভারতে বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঋষিগণ উহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াই এক্ষণে উক্ত প্রথা রহিত করিয়াছেন। উহা দ্বারা অনিষ্ট না হইলে কখনই উহা রহিত হইত না।"

এই প্রকার যুক্তি অনুসারে আধুনিক সমাজের সমস্ত দোষ ও গুণ হইয়া দাঁড়ায়। কোন কারণে কোন রীতি রহিত হইলেই যদি তাহা মন্দ হয়, তবে সমস্ত মানবতত্ত্ব গ্রন্থ একখানি বৃহৎ অযুক্তি এবং পরস্পর অসঙ্গত বাক্য-বিন্যাসের প্রধান দৃষ্টান্ত হইয়া পড়ে। তাহা হইলে দেখুন, আধুনিক পৌত্ত-লিকতা ভাল এবং গ্রন্থকার যে নাস্তিক-ধর্ম্মকে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সমাজে রহিত হইয়াছে বলিয়া তাহা মন্দ ও পরিত্যজ্য। বেদপাঠ রহিত হইয়া এক্ষণে পুরাণপাঠই প্রচলিত, সুতরাং বেদপাঠ মন্দ ও অহিতকর। বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে রহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম সমুদায় মন্দ। মনু প্রণিত যত রীতি নীতি এক্ষণে হিন্দু সমাজে অপ্র-চলিত দেখা যায়, তাহা সমুদায় মন্দ ও পরিত্যাজ্য। তবে কেন গ্রন্থকার প্রাচীন হিন্দু রীতি নীতির এত সাধুবাদ করেন?

গ্রন্থকারের আর একটি যুক্তি এই যে, "গান্ধর্ব্ব-বিবাহ ও স্বয়ম্বর-প্রথা স্বাভবিক সুতরাং অসভ্যতা।" স্বাভাবিক বলিয়া তাহা অসভ্যতা ও পরিত্যাজ্য। গ্রন্থকার আবার বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তাহাদের (বালক বালিকার) সেই বাল্যমিলনজাত প্রণয় নিসর্গোৎপন্নের,

ন্যায় হইয়া হৃদয়ের সহিত এরূপ দৃঢ় সম্বন্ধ হইয়া যায় যে, তাহা প্রাণ থাকিতে নষ্ট হয় না।" যে প্রণয় নিসর্গোৎপন্নের ন্যায় হয় তাহা অবশ্য স্বাভাবিক সুতরাং অসভ্যতা এবং তজ্জন্য তাহা পরিত্যজ্য। বাল্যবিবাহে যদি কখন প্রণয় উৎপন্ন হয়, তবে তাহা স্বাভাবিক হইবে সুতরাং বাল্যবিবাহ মনুষ্যকে স্বাভাবিক প্রণয়ী করিয়া অসভ্য করিয়া ফেলে। লেখকের মতে স্বাভাবিক প্রণয় বন্ধনেই বাল্যবিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব; সুতরাং এরূপ বন্ধন ও বিবাহপ্রণালী অসভ্যতা।

আমরা বলিয়াছি বাল্যবিবাহে প্রণয় জন্মিবার যত অন্তরায় আছে এমত ইউরোপীয় বিবাহ প্রণালীতে নাই। সেই জন্য বাল বিবাহে প্রণয় জন্মিবার খুব কম সম্ভাবনা। এই সকল অন্তরায়ের কোন খানে একটি, কোন খানে দুইটী, কোন খানে ততোধিক বর্ত্তমান থাকিয়া দম্পতীর প্রণয় জন্মিতে দেয় না। তবে যে কোন স্থলে একেবারে প্রণয় জন্মায় না এমত কথা বলা আমাদের অভিপ্রায় নহে। আমরা বলি, বাল্য বিবাহে প্রণয় উৎপন্ন হওয়া অত্যন্ত বিরল।

বাল্যবিবাহে প্রণয় কেমন দৃঢ় ও স্থায়ী হয়, তাহার প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থকার পূর্ব্বকার সতীদাহের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ রীতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বকালে কয়জন সতীদাহে প্রাণ ত্যাগ করিত? অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক কি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিত না? আর যাঁহারা সতীদাহে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন, তাঁহারা কি সকলেই প্রণয়োৎসর্গে প্রাণ দান করিতেন, গ্রন্থকার কি এমত নিশ্চয় বলিতে পারেন? তিনি কি জানেন না, এ দেশে বৈধব্য-দশার কত অশেষবিধ যন্ত্রণা ও ক্লেশ। এই সমস্ত ক্লেশের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কি অনেকে স্বামীর অনুগামিনী হইতেন, এমত সম্ভাবনা হয় না? গ্রন্থকার কি জানেন না যে, স্বামীর অনুমৃতা স্ত্রীর বিলক্ষণ পুণ্যসঞ্চয় হয়, প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগের এমত বিশ্বাস ছিল? অনেকে কি এই বিশ্বাস-নিবন্ধন পুণ্যসঞ্চয়ার্থ এবং অক্ষয় স্বর্গলাভার্থ অনুমৃতা হইতেন না? আমরা বলি, এইরূপ ঘটিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তখনকার সমাজে সতী বলিয়া গণ্য হওয়াও বিলক্ষণ গৌরবের বিষয় ছিল; অনেকে কি এইরূপ গৌরব লাভার্থও অনুমৃতা হইতেন না? স্বামী পরলোক প্রাপ্ত হইলে তখনকার কালে স্ত্রীকে সতী হইতে অনেকে উত্তেজনাও করিতেন, বুদ্ধি বিবেচনা-হীনা স্ত্রী সেই ঘোর শোক তাপের সময় হৃদয়ের অত্যন্ত ব্যথায় নিপীড়িত হইয়া, বুদ্ধি-বিবেচনা-শূন্য-প্রায় হইয়া, শত লোকের উত্তেজনাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া, হৃদয়ের আবেগে অন্ধ হইয়া, কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া কি শত লোকের গৌরব-ধ্বনি মাঝে পাগলিনী প্রায় হইয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিতেন

না? এবং একবার সেইরূপে ঝম্প প্রদান করিলে তাঁহার আর কি নিস্তার থাকিত? দশজনের যষ্টী-প্রহারেই তাঁহার সর্ব্বশেষ হইয়া যাইত। সতী কি লোক লজ্জা ভয়ে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে পুনরায় উঠিয়া আসিতে পারিতেন? এ সমস্ত কথা বিচার করিয়া সতীর প্রণয়ের কথা গ্রন্থকারের উল্লেখ করা উচিত ছিল।

গ্রন্থকার বাল্যবিবাহ প্রস্তাবের সূত্রপাত করিবার পূর্ব্বে গান্ধর্ব্ব বিবাহের আলোচনায় দেখাইলেন যে, নির্ব্বাচনের দোষ-ক্রমে গান্ধর্ব্ববিবাহের কতিপয় সামান্য অপব্যবহার ঘটিতে পারে। তৎপরে তাহার যুক্তি এই—গান্ধর্ব্ব বিবাহে নির্ব্বাচনে যখন এক প্রকার দোষ ঘটিতে পারে, তখন গান্ধর্ব্ব বিবাহ অবশ্য পরিত্যাজ্য। গান্ধর্ব্ব বিবাহ পরিত্যাজ্য হইলে, বাল্য-বিবাহ অবশ্য গ্রহণীয় হইল। তিনি এই যুক্তিবলে বাল্য-বিবাহ পরিস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহে পাত্র-নির্ব্বাচনে কখনও কোন খানে একটু ত্রুটি ঘটে বলিয়া যদি গান্ধর্ব্ব বিবাহ পরিত্যাজ্য হয়, তবে ত বাল্য-বিবাহ তদপেক্ষাও পরিত্যাজ্য। কারণ, বাল্যবিবাহ যত নির্ব্বাচন-দোষে দুষ্ট হইতে পারে ও এক্ষণে দুষ্ট হইতেছে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ তত নহে। গান্ধর্ব্ববিবাহের নির্ব্বাচনে যদি একটি দোষ ঘটে, বাল্যবিবাহের নির্ব্বাচনে তবে শত দোষ ঘটে। যে বিবাহ পরের নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিতেছে, সে বিবাহ যে কখন দম্পতীর পক্ষে শুভ হইতে পারে না, তাহা, আমরা প্রতি দিন সহস্র দৃষ্টান্তের দৃষ্টিগোচর করিতেছি। এ সকল নির্ব্বাচন দোষ উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। বাল্য-বিবাহ যদি এই রূপ দোষে অধিকতর দূষিত সপ্রমাণ করা যায়, তবে কি গ্রন্থকারের যুক্তি অনুসারেই বাল্যবিবাহ পরিত্যাজ্য হইতেছে না? তিনি পৃথিবীর কোন রীতি একেবারে দোষ শূন্য দেখাইতে পারিবেন না। তবে যে রীতির অধিক দোষ তাহাই পরিত্যাজ্য হয় এবং যাহার অল্প দোষ তাহাই গ্রহণীয় হয়। এরূপে পরীক্ষা করিলে, গান্ধর্ব্ব বিবাহ বাল্যবিবাহ অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় হইয়া দাঁড়ায়।

গ্রন্থকার গান্ধর্ব্ববিবাহের আর একটি দোষ এই রূপ উল্লেখ করেন। "অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্ত্রী ও পুরুষের ভিন্ন রূপ বিশ্বাস ও সংস্কার জন্মিতে পারে। তাহাতে পরে মনোভঙ্গ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। পুরুষের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ও স্ত্রীর হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যাওয়ার পর উভয়ে যদি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কখনও তাহাদের মনোমিলন হইতে পারে না।" আমরা বলি, এরূপ স্থলে গান্ধর্ব্ববিবাহ সংঘটন হইবারই কথা নহে, তবে যদি হয়, তাহা সেই পদ্ধতির অপব্যবহার। যিনি সে রূপ অবিবেচনার কার্য্য করিবেন, তাহাকে অবশ্য তাহার ফলভোগ

করিতে হইবে। যে দম্পতীরা বিবেচনায় চালিত না হইয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন, তাহাদিগকে অবশ্য অবিবেচনা নিবন্ধন ফলভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধন সংঘটন হয় না। ইউরোপীয় সমাজ ইহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং গন্ধর্ব্ববিবাহের এ দোষ অত্যন্ত বিরল। এত বিরল যে উল্লেখ-যোগ্যই নহে। কিন্তু লেখক কি মনে করেন যে, দম্পতীরা দুই জনে হিন্দু, কি মুষলমান, কি খৃষ্টান হইলেই তাহাদের মিলন হইবার সম্ভাবনা? আমরা দম্পতীর মধ্যে যত গরমিলের দৃষ্টান্ত দেখি, তাহা কি সমুদায় বিভিন্ন ধর্ম্ম-জনিত? পতিপত্নী উভয়ে হিন্দু হইলেই কি তাহারা আর অপ্রণয় করিবে না? তাহা যদি হয় গ্রন্থকার এমত বলেন, তবে গ্রন্থকারের মত সৃষ্টিছাড়া ও দৃষ্টান্তের বিরোধী। তাঁহাকে এমত দৃষ্টান্ত দ্বারা স্থাপন করিতে হইতেছে। যে হিন্দুসমাজে সকলই হিন্দু, কি যে মুষলমান সমাজে সকলই মুষলমান, সেই হিন্দু কি মুষলমান সমাজে কি অপ্রণয়, বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুই নাই? এ বড় আশ্চর্য্য কথা। ইহা যদি সত্য হয়, তবে গান্ধর্ব্ববিবাহ-আবদ্ধ দম্পতীরা যাহাতে পরস্পর এক ধর্ম্মাবলম্বী হয় এমত বিধান করিয়া দিলেই ত গান্ধর্ব্ববিবাহ একপ্রকার দোষ-শূন্য হইতে পারে।

আমাদের গ্রন্থকার এইরূপ সামান্য সামান্য আপত্তি তুলিয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহের দোষ দেখাইয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে বলিয়াছেন যে, আমাদের প্রাচীন "ঋষিগণ উহার (গান্ধর্ব্ব বিবাহের) অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াই এক্ষণে উক্ত প্রথা (স্বয়ম্বর প্রথা) রহিত করিয়াছেন।" গ্রন্থকার যে সকল আপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ঋষিগণেরও কি সেই সকল আপত্তি ছিল? না অন্য আপত্তি ছিল? যদি অন্য আপত্তি থাকে, তাহা আমরা শুনিতে চাই। তার পর দেখুন, গান্ধর্ব্ব বিবাহ কিয়দংশে মন্দ হইলেই যে বাল্যবিবাহ সর্ব্বাংশে ভাল হইল, এমতও প্রতিপাদিত হয় না। গ্রন্থকার সহস্রলোচনে গান্ধর্ব্ব বিবাহেরই দোষ দেখিয়াছেন, এবং আশ্চর্য্য এই, তিনি নিজ-নির্দ্দিষ্ট বাল্যবিবাহের একটিও দোষ দেখিতে পান নাই। পরপক্ষের ছিদ্র বাহির করিলে কি আত্মপক্ষের পোষকতা করা হয়, না আত্মপক্ষের নির্দ্দোষিতা ও উৎকর্ষ সপ্রমাণ করা চাই? গ্রন্থকার নিজে আত্মপক্ষের কোন দোষই দেখেন নাই, তজ্জন্যই আমরা তাহার কোটির কতিপয় পূর্ব্বপক্ষ বাহির করিয়া দিয়াছি। আমরা তন্নির্দ্দিষ্ট বাল্যবিবাহের যে কতিপয় দোষ নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহা এই;—

(১) গ্রন্থকার-নির্দ্দিষ্ট বাল্য-বিবাহ বালিকা পত্নীর শরীর ভঙ্গ করে।

(২) বাল্য বিবাহ-জাত সন্তান সন্ততি

যে দুর্ব্বল হয় না এমত প্রতিপাদিত হয় নাই। সুতরাং শুশ্রুত প্রভৃতি আর্য্য-চিকিৎসকগণের মত অখণ্ডিত রহিয়াছে।

(৩) বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে দম্পতী মধ্যে প্রণয় উৎপাদন হইবার সম্ভাবনা অত্যল্প; সুতরাং অনেক স্থলেই তাহারা অসুখী।

(৪) এই প্রেমনৈরাশ্য নিবন্ধন সমাজে ব্যভিচার প্রভৃতি অনিষ্টের বৃদ্ধি হইবার অনেক সম্ভাবনা, অনেক অঘটনও ঘটিয়া থাকে এবং বহুবিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

(৫) গ্রন্থকার-নির্দ্দিষ্ট বালিকাবিবাহে বালবিধবার সংখ্যার বৃদ্ধি করিতে পারে সুতরাং স্ত্রীজাতি পক্ষে ইহা অত্যন্ত অহিতকর এবং সংসারের ক্লেশ বৃদ্ধি কর।

(৬) বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষার প্রতিকূল, সুতরাং স্ত্রীজাতির মূর্খতা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মানসিক দুর্ব্বলতাবও বৃদ্ধি করে। ইহা যে তাহাদের শারীরিক দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি করে তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

(৭) ইউরোপের অনেক বড় বড় লোক সুমাতার উপদেশে ও যত্নে যে মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, অশিক্ষিতা, মূর্খ, দুর্ব্বল, ও অতেজস্বিনী মাতা হইতে সেরূপ লাভের অত্যন্ত অল্প সম্ভাবনা।

(৮) উল্লিখিত দোষসমূহ হইতে সংসার কার্য্যে অনেক অনিষ্টাপাত হয় ও বিশৃঙ্খলা ঘটে।

(৯) বালিকাবিবাহের পাত্র নির্ব্বাচন কার্য্য পরহস্তে ন্যস্ত হইতে হইবেই হইবে। আত্মহস্তে ন্যস্ত থাকিলে সে কার্য্যের দুই একটী দোষ ঘটিতে পারে। সে দোষ পরহস্তে না ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু অপরাপর নানাবিধ দোষ ঘটে। দোষের সংখ্যা ও প্রকৃতি বিবেচনা করিলে পর-হস্তে নির্ব্বাচন-কার্য্য ন্যস্ত থাকা অপেক্ষা আত্মহস্তে থাকাই ভাল। কিন্তু আত্ম-হস্তে নির্ব্বাচন কার্য্য লইতে হইলে বালিকার অধিক বয়সে, অধিক সদসৎ বিবেচনা কালে এবং অধিকতর শিক্ষিতা-বস্থায় তাহার বিবাহ করা উচিত।

আমরা উপরে বাল্যবিবাহের যে সকল দোষ দেখাইলাম তাহা গ্রন্থকার-নির্দ্দিষ্ট বাল্যবিবাহের প্রতিই প্রযুক্ত। আমাদের সমাজে যত প্রকার বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে তাহাদের দোষ সংখ্যা আরও অধিক দাঁড়ায়।

বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের বাল্যবিবাহ হইতে, ৭০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের বালিকা বিবাহ পর্য্যন্ত সকলই বাল্যবিবাহ এবং সে সকলই সমাজ মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু গ্রন্থকার সে সকল প্রকার বাল্যবিবাহের যখন অনুমোদন করেন না, তখন বলিতে গেলে তিনি একরকম বাল্যবিবাহের বিপক্ষ; তবে বোধ হয় এতদ্দেশীয় সকল প্রচলিত রীতি নীতি সমর্থন করিতে হইবে বলিয়াই যেন তিনি এক-প্রকার বাল্যবিবাহের পোষকতা করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিয়াছেন। যখন তিনি সর্ব্ব প্রকার বাল্যবিবাহ অনুমোদন করেন না তখন তিনি কিজন্য

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন "আধুনিক নব্যযুবারা যদি বৃথা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া, এই সকল অহিত নিবারণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ঐ সকল দোষ দূরিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া কল্যাণকর অন্তঃপুর প্রথা, বাল্য ও সবর্ণ বিবাহ রহিত, এবং স্ত্রী স্বাধীনতা ও বিধবা বিবাহাদি প্রচলনে নিতান্ত যত্নবান।" একথার পর আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি নিজেই কি অনেক রকম বাল্যবিবাহ রহিত করিতে যত্নবান নহেন? তাহা যদি হয় তবে তাহারও কথার সঙ্গতি কোথায়?

গ্রন্থকারের নিজ নির্দ্দিষ্ট বাল্যবিবাহের পোষকতা করিবার প্রধান কারণ এই যে, তদ্দ্বারা দম্পতী মধ্যে প্রণয়ের বৃদ্ধি করে। প্রণয়ের বৃদ্ধি করে, কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু যাঁহারা সেই প্রকার বাল্যবিবাহ দেন, তাঁহারা কি দম্পতী মধ্যে প্রণয় স্থাপন হইবে বলিয়া বালিকার বিবাহ দেন,—না, সে বিবাহ দিবার অন্য প্রবল কারণ ও উদ্দেশ্য আছে? যদি থাকে, তবে লোকে প্রধানতঃ কি সেই উদ্দেশ্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করেন না? সে সময়ে প্রণয়ের কথা তাঁহাদের মনেও হয় ত উদয় হয় না।

গ্রন্থকার আর একটি চমৎকার হেতু দেখাইয়া বাল্যবিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন "অধিক বয়সে বিবাহে স্ত্রী জাতির অতি কদর্য্য ব্যবহার প্রকাশ পায়। কেন না স্ত্রীজাতিকে পিতৃমাত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বামী গৃহে যাইতে হয়। আজন্ম সহচর, হৃদয়সর্ব্বস্ব, পরমোপকারী পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর স্নেহরজ্জু ছেদন করিয়া ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া অপরিচিত বা ক্ষণপরিচিত পুরুষের সহিত অপবিত্র ভাবে যাওয়া কি যুবতীর পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর ও কুৎসিত ব্যবহার নয়? উহা কি রমণীর মানবোচিত কার্য্য না সভ্যতার চিহ্ন? * * * * বাল্য-বিবাহে বালিকাকে একপ রাক্ষসোচিত ব্যবহার প্রকাশ করিতে হয় না।"—গ্রন্থকার কি বলেন যে, বাল্য-বিবাহে বালিকাকে পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী দিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয় না? যদি যাইতে হয়, তবে একের বেলা লজ্জাকর ও অপবিত্র প্রথা হইল এবং অন্যের বেলা তাহা হইল না কেন? বাল্য-বিবাহে পিতা মাতা প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষগণ কি কন্যার বর এবং বরের কন্যা যুটাইয়া দেন না? শুদ্ধ যুটাইয়া দিয়া কি ক্ষান্ত হয়েন, যাহাতে আবার সেই দম্পতী মধ্যে এক রকম মিলন হয় তজ্জন্য কি অশেষবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন না? যদি গ্রন্থকারোক্ত প্রথা লজ্জাকর হয়, তবে বাল্য-বিবাহের কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টাদিও কি লজ্জাকর নহে? কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে কোন পক্ষীয় প্রথাই লজ্জাকর নহে। যাহা অবশ্য করিতে হইবে, যাহা দেশাচার-নির্দ্দিষ্ট, যাহা না করিলে বরং

লজ্জার বিষয়; তাহা সাধন করিতে আবার লজ্জা কি? বিবাহের পর পিতা মাতার গৃহে কন্যা থাকিলে বরং তাহার ব্যবহার নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। যে দেশে সকলই এক কাণ-কাটা সে স্থানে এক কাণকাটার আবার লজ্জা কি? তবে যদি স্ত্রীজাতির এরূপ ব্যবহার লজ্জাকর হয়, যত দিন না তাঁহারা স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, যত দিন না তাঁহাদের পতির একান্ত বশবর্ত্তিতা ও গোলামী পরিত্যাগ করিতে হইতেছে, ততদিন তাঁহাদিগকে এই প্রকার এক রূপ না এক রূপ লজ্জাকর ও অমর্য্যাদাজনক ব্যবহারে লিপ্ত থাকিতে হইবেই হইবে। ইউরোপীয় প্রথা যদি লজ্জাকর হয়, আমাদিগের হিন্দু প্রথাও সমান লজ্জাকর আর ইউরোপীয় প্রথা যদি লজ্জাকর না হয়, হিন্দু প্রথাও নহে। সুতরাং যে জন্য ইউরোপীয় প্রথা পরিত্যজ্য, সেই জন্য হিন্দুপ্রথাও পরিত্যজ্য। তবে যদি কাহার দোষ থাকে, তাহা রমণী কুলের দোষ নহে, তাহা দেশাচারের দোষ, তাহা-দেশাচার প্রতিষ্ঠাকারিগণের দোষ। এই দোষ সংশোধন করিতে হইলে, স্ত্রীস্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। কারণ, এ প্রকার লজ্জাকর প্রথা সর্ব্বসমাজ হইতে উঠাইতে হইলে স্ত্রীজাতির স্বাধীন-বৃত্তি আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং সর্ব্ববিধ বিবাহ-প্রথার দোষ নিবারণের এক মাত্র উপায়—স্ত্রীস্বাধীনতা।

শ্রীশ——

সংগীত যোগ।

সকল রকম যোগের ফল আত্ম-মনঃসংযোগ। মন আত্মনিষ্ঠ হইলে বাহ্য জ্ঞান থাকে না। গানে আর আধ্যাত্মিক জ্ঞানে লোক সকল যেমন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওতঃ পরমানন্দ সম্ভোগ করে এরূপ আর কিছুতে হয় না। বিরহে, ভয়ে, আঁর মদে ও মোহে বাহ্যজ্ঞান রহিত হয় সত্য, কিন্তু বিমল আনন্দ সম্ভোগ হয় না বলিয়া শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "জ্ঞানাৎ পরতরং গানং গানাৎ পরতরং নহি।" আনন্দদায়ক সম্বন্ধে জ্ঞান হইতেও গান শ্রেষ্ঠ। গান হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। যেহেতু সাধারণ প্রাণির মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রবিষ্ট হইতে পারে না। অতিভাগ্যে মানব বিশেষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকেই আনন্দিত করাইতে পারে, কিন্তু গান দ্বারা জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ধ্বনিতে মহারণ্যবাসী শ্বাপদকুল আনন্দিত হইয়া হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে জীবন ধারণ

করিয়া কালযাপন করিত। শ্রীকৃষ্ণ যখন মুরলী যন্ত্র দ্বারা রাগ রাগিণীর আলাপচারি করিতেন তখন অহি নকুলে গো আর ব্যাঘ্রে একত্র হইয়া আনন্দ উপভোগ করিত, কেহ কাহাকে হিংসা করিত না। সংগীত যোগের এমনি ক্ষমতা যে নির্ব্বোধ হিংস্রক নিত্যবৈরী পশুপক্ষিগণকেও মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন তিনি যখন শ্রীরাগের আলাপচারি করিতেন তখন অসময়ে বসন্ত মূর্ত্তিমান হইত এবং শুষ্ক বৃক্ষ ও প্রাচীন প্রাচীনা মনুষ্য পশু পক্ষীরাও যৌবন-শ্রী ধারণ করত যৌবনোচিত কার্য্য করিত। তিনি রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে মহাবীর অর্জ্জুনের হৃদয়দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থ দীপক রাগে যে নীতিগর্ভ গান করিয়া অর্জ্জুনের রণ-প্রবৃত্তি বলবতী করিয়াছিলেন, তাহা প্রসঙ্গাধীন এখানে লেখা যাইতেছে। যথা।—

"মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়
নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং
ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।"

—ভগবদ্গীতা।

এই গান ও নীতিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ অন্যান্য গান শুনিয়া অর্জ্জুন রণোন্মত্ত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অপর, দ্বারকাবাসের কালে সমুদ্রে গিয়া সপরিবারে জলকেলী করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ, দেবর্ষি নারদ ও স্বর্গবিদ্যাধরীগণ সকলে একত্রিত হইয়া যে দেবদুর্লভ ছালিক্যগান গাইয়াছিলেন অর্জ্জুন ইহার বাদ্যকর হন। এ গানে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, জলচর, খেচর, ভূচর প্রাণী মাত্রই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। হরিবংশ দেখ।

ভারতে এক্ষণে যত রাগ রাগিণী শুনা যায়, সে সকলই ছালিক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ছালিক্য সংগীত দেবলোক হইতে শ্রীকৃষ্ণ আনয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাদব বংশ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ ভারতের সর্ব্বত্র উহা প্রচার হয়। ২৭।২৮ শত বৎসর পূর্ব্বে যে জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভারত একেবারে নির্ম্মনুষ্য ও নির্ধন ও নির্জ্ঞান ও গান শূন্য হইবার উপক্রম হওয়ায় ভারতের অতিশয় শোচনীয় দশা হইয়া পড়িয়াছে। তৎপরে এক্ষণে ভারতসন্তান আর্য্য জাতির যেরূপ অবস্থা, ইহা নিতান্তই হীনাবস্থা। জলপ্লাবনের ৭।৮ শত বৎসর পরেই বৌদ্ধবিপ্লাবন, তৎপরে যবন, তৎপরে ম্লেচ্ছ বিপ্লাবন হইতেছে। এত বিপ্লাবনে না আছে ধন, না আছে ধর্ম্ম, না আছে গান, না আছে বিদ্যা, না আছে তপস্যা, না আছে যোগ যাগ। সমস্তই কালের উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এখন যে সংগীত শুনা যায় ইহা প্রকৃত সংগীত নহে। উহা সংগীতের বিকৃত ছায়ামাত্র। মুসলমান রাজারা প্রকৃত সংগীতকে বিকৃত করিয়া ফেলায় সংগীত নূতন বেশ ধারণ করিয়া বেড়াইতেছে।

আর্য্য সংগীত পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে। আর্য্য সংগীত যোগসিদ্ধ হইলে গায়কের নিকট রাগরাগিণী মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া দেখা দেন। তৎপরে সাধক যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া দেহাবসানে রাগরাগিণীতে লীন হইয়া যান। ইহাই সংগীত যোগের চরম ফল।

প্রত্যেক রাগ রাগিণীর মন্ত্র তন্ত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। উঁহাদিগের জপ হোম পূজা প্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছে। সে সকল বিষয় এখন মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহার চর্চ্চা একেবারে রহিত হইয়া পড়িয়াছে। এবং গন্ধর্ব্ববেদও বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল ২।১ খানি তন্ত্র আর পুরাণে অসম্পূর্ণ সংগীতযোগ পাওয়া যায় এই মাত্র। কিছু দিন পরে ভগবদিচ্ছায় পুনরায় ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও আয়ুর্ব্বেদও দেখা দিবেন এমত ভরসা করি। জ্ঞান হইতে সংগীতের বিশেষ ক্ষমতা এই—জ্ঞানে কেবল জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ পায়; গানে বীর, বীভৎস, প্রেম, বাৎসল্য, করুণ প্রভৃতি রস প্রদান করায় সর্ব্বসাধারণের মনোহারক হয়। ইহার সামান্য উদাহরণ এই বঙ্গদেশীয় পুরাণব্যাখ্যাকারক কথকঠাকুর যখন ব্যাসাসনে বসিয়া, সংগীতমিশ্রিত পুরাণাদি ব্যাখ্যা করিতে থাকেন তখন তাঁহার নিকটে যতই লোক থাক না কেন সকলকেই কথকতার গুণে মোহিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থির থাকিতে হয়। তবু কথকঠাকুরের নিকটে না থাকে তানপুরা না থাকে বাদ্যযন্ত্র ও দোয়ার। ইনি যখন সংগীত যোগে জগতের স্বভাব বর্ণন করিতে থাকেন তখন স্বভাব যেমন স্বয়ং মূর্ত্তিমান হইয়া আবির্ভূত হইতে থাকে। আর যখন করুণাস্থল বর্ণন করেন তখন অতি-পাষাণ-হৃদয় লোকেরও অশ্রুপাত হয়। যখন বীর রস ঘটিত কথকতা করেন, তখন দুর্ব্বল মনুষ্যেরও শরীর স্ফীত হইতে থাকে। যখন ভক্তিরসোদ্দীপক কথা কহিতে থাকেন তখন অতি পাষণ্ডের মনে ভক্তি জন্মিতে থাকে। যিনি ভাল কথকের কথা কিম্বা ভাল কীর্ত্তনওয়ালার কীর্ত্তন শুনিয়াছেন তিনি প্রস্তাব্য বিষয়ের যথার্থ অর্থ বোধ করিতে পারিবেন।

খ্যাল, ধ্রুপদ ও টপ্পায় যেরূপ আনন্দ না জন্মে কথকতায় ও কীর্ত্তনে তদপেক্ষা যে অধিক আনন্দ জন্মে তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। ধ্রুপদে অনেক স্তব আছে। সে সকল স্তব যে ধ্রুপদী আদায় করিতে পারেন তাঁহার গানে জ্ঞানী লোকেরা মুগ্ধ হইতে পারেন। ভগবদ্গীতা, ত্রিপুর বিজয় ও সামস্তোত্র গান অতি মনোহর। তাহা এক্ষণে প্রায় শুনা যায় না। দুই একটি যোগীর নিকট পুরুষ সূক্ত ও মহিম্নস্তবগান শুনিয়া তৎকালে বোধ হইয়াছিল যে যত গান জন্মা গিয়াছে এ গানের নিকট তৎ সমস্তই-

অতি অকিঞ্চিৎকর। সাধারণ মানব সমাজে গান অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক পদার্থ আর কিছুই নাই। কিন্তু অসাধারণ জ্ঞানী লোকদিগের নিকটে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্থাৎ আত্ম-বোধ জ্ঞানের নিকটে গানাদি কিঞ্চিন্মাত্রও সুখদায়ক নহে।

যাঁহার আত্মবোধ হইয়াছে। তিনিই বিদিতবেদ্য। তিনি অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য-শালী। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা। তিনিই পরমাত্মা। জগৎ তাঁহার দ্বারের ভিখারী।

বাহ্য জগতের আনন্দজনক বস্তু গান হইতে আর কিছু নাই সত্য। কিন্তু অন্তর্বহিরুভয় জগতের আত্মবোধ জ্ঞানই অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্য ও আনন্দদায়ক। কিন্তু এ জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। এজন্য পণ্ডিতেরা গানের এত প্রসংশা করিয়াছেন ইতি। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

ওয়ালেস্।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ওয়ালেস ফরাশি সেনাপতি-পদে বৃত। এড্ওয়ার্ড কর্ত্তৃক স্কটল্যাণ্ডের পুনরাক্রমণ। কিউসিন্ ও ক্রাস সন্ধি। আমিনের সন্ধি। ইংরাজগণ কর্ত্তৃক স্কটলণ্ডের আবার আক্রমণ। রস্লিনের যুদ্ধ। ইংরাজগণের পরাভব। এড্ওয়ার্ড কর্ত্তৃক স্কটলণ্ডের পুনরাক্রমণ। ফিলিপের বিশ্বাসঘাতকতা।

ফরাশিরাজ ওয়ালেসকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর সমস্ত গাইন-প্রদেশের অধিপতিত্ব অর্পণ করিলেন। তিনি ওয়ালেস্কে ডিউক করিতে চাহিলেন; কিন্তু ওয়ালেস্ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে নাইট উপাধি ও ফরাশি-সেনাপতির পদ প্রদান করিলেন। তিনি ওয়ালেস্কে আপনার পরিচ্ছদ-চিহ্ন আপনি নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে বলিলেন। ওয়ালেস্ তদনুসারে চিহ্ন-স্বরূপ 'লোহিত-সিংহ'-লাঞ্ছিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতে লাগিলেন। ফিলিপ্ তাঁহাকে অবিলম্বে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিলেন। তৎকালে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল। ওয়ালেস্ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ামাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য স্কট্ তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। লণ্ডভিল্ ও তাঁহার জন্য অনেক ফরাশি সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। অচিরকালমধ্যে দশ সহস্র সৈন্য তাঁহার পতাকাশ্রয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। এদিকে ডিউক্ অব্ অর্লিন্স্ও দ্বাদশ সহস্র সৈন্য

লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বোধ হইল যেন জয়লক্ষ্মী ওয়ালেসের উপর সুপ্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

এদিকে স্কট্‌লণ্ড-রবি পূর্ব্বসাগরে বিলীন হওয়ার পর ঘোর দুঃখনিশা আসিয়া সমস্ত স্কট্‌লণ্ডকে তমসাচ্ছন্ন করিল। গৃহশত্রুই স্কট্‌লণ্ডের সর্ব্বনাশের মূল। বিশ্বসঘাতক জাতীয় শত্রু সার্ আমের্ ডি ভ্যালেন্স্ লিয়ন্ হাউসের অধিপতিত্ব প্রদানের আশা দিয়া সার্ জন মেন্‌টীথ্‌কে এডওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করাইলেন। এদিকে এডওয়ার্ডও মহতী সেনা লইয়া এই অবসরে আবার স্কটলণ্ড আক্রমণ করিলেন। ওয়ালেসের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সেনার অধিনায়ক হইবার যোগ্য লোক তৎকালে আর কেহ ছিল না। সুতরাং এক একটী করিয়া সমস্ত স্কটিশ্ দুর্গ বিনা যুদ্ধে তাঁহার করতলস্থ হইল। যাঁহারা এডওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকারে অস্বীকৃত হইলেন, তাঁহারা উদীচ্য দ্বীপাবলীতে পলায়ন করিলেন। বিসপ্ সিংক্লেয়ার বুটে পলায়ন করিলেন। স্বাধীনতার স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার জন্য এডওয়ার্ড রোমীয় প্রাচীরমালা উন্মূলিত, ও রাজ্য-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাগজপত্র নষ্ট করিলেন। যাঁহারা তাঁহার অধীনে জমীদারী করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন। সার্ উইলিয়ম্ ডগ্‌লস্ ইংলণ্ডের কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন। টমাস্ র‍্যাণ্ডল্‌ফ, লর্ড ফ্রেজার এবং হিউদিহে—ইঁহাদিগকে তিনি ভ্যালেন্সের রক্ষণে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। সীটন্, লণ্ডর, ও লণ্ডিন্ বাহে পলায়ন করিলেন। ম্যাল্‌কম ও ক্যাম্বেল্ বুটে বিসপ্ সিংক্লেয়ারের নিকট গমন করিলেন। র‍্যাম্‌সে ও রুথ্‌ভেন্ পলাইয়া ক্লাইমেছ নামক এক ব্যক্তির সহযোগে রছ-সায়ারের অন্তর্গত ষ্টক্‌ফোর্ড নামক নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আডাম্ ওয়ালেস, লিন্‌ডছে, রবার্ট বয়ীড্ আরানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেসরূপ সূর্য্যের অন্তর্ধানে যেন স্কটিশজাতীয় সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলী কেন্দ্রজ আকর্ষণবিরহে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কম্‌প্যাট্রিক্ এড্‌ওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া আপন দুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এবার্ণেথি, সোলিস, কিউমিন, লোরনের জন্, লর্ড ব্রেচিন এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এডওয়ার্ডের সহিত সন্ধি করিয়া আপন আপন ভূমিসম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। যেন এক সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলী সহসা নিজ-কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইয়া কেন্দ্রান্তরে বিলম্বিত হইল।

এইরূপ দাসত্বের নিগড় বন্ধনে মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া বুট-বাসী দেশহিতৈষী বল

একখানি জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া দূতসহ সেখানি ওয়ালেসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি আসিয়া স্কটলণ্ডের শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া রাজমুকুট পরিধান করুন, তাঁহারা বিশ্বাসঘাতক এড্ওয়ার্ডের আর অত্যাচার সহিতে পারেন না। ফল্কার্কের নিষ্ঠুর ব্যবহার ওয়ালেসের অন্তরে এখনও জাগরূক ছিল, সুতরাং তিনি ইহিতে দিদলের এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। জাতীয় দূত ভগ্ন হৃদয়ে শূন্য যান লইয়া ফিরিয়া আসিল। জাতীয় দল ঘোর বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল।

এদিকে স্কটলণ্ডের বন্দোবস্তকার্য্য নির্ব্বিবাদে চলিতে লাগিল। এড্ওয়র্ড সমস্ত স্কট্লণ্ডে আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়া অনুগত ও আশ্রিত সামন্তবর্গকে ইহার ভূমিসম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। তিনি ইয়র্কের আরল্কে সেণ্ট জনষ্টনের অধিপতিত্ব এবং টে ও দি নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন; লর্ড বাউমণ্ডকে উদীচ্য প্রদেশের সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন; লর্ড ক্লিফোর্ডকে ডগলাস্ডেলের অধিপতিত্ব ও দক্ষিণ স্কটলণ্ডের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিলেন; বিশ্বাসঘাতক কিউমিনকে সমস্ত গেলোয়ে প্রদেশ অর্পণ করিলেন; এবং লর্ড সোলিসকে সমস্ত মার্চ প্রদেশের অধিপতিত্ব ও বারউইকের সেনাপতিত্ব প্রদান করিলেন। এড্ওয়ার্ড পবিত্র আতিথ্য ধর্ম্মের নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বর্ণগত বিসপ্ লাম্বার্টন্, ও লর্ড ওলিফণ্টকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে এড্ওয়ার্ড স্কট্লণ্ডে শান্তি স্থাপন করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন।

পাপের ধন অধিক দিন ভোগ হয় না। এড্ওয়ার্ড জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা উদ্দীপিত করিয়া স্কটলণ্ডের বক্ষে যে রাজ্যসৌধ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতেই, বিশ্বাসঘাতকতার বিপ্রকর্ষণী শক্তি বলে সে প্রকাণ্ড সৌধের তলভেদ ঘটিল। বিশ্বাসঘাতক কিউমিন্ এই মর্ম্মে ব্রুসের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইলেন যে যদি তিনি তাঁহার সাহায্যে স্কট্লণ্ডের রাজমুকুট প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি যত পরিমাণ ভূমিসম্পত্তি চাহিবেন তাঁহাকে তাহাই দিতে হইবে।

এবার সমস্ত স্কট্লণ্ড এড্ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দুর্গ আবার স্কট্গণের করতলস্থ হইল। কেবল ষ্টার্লিং দুর্গ, ও লকমেবেন ও অন্যান্য সামান্য নগর এখনও ইংরাজদিগের দখলে ছিল। ১২৯৮-৯৯ সালে স্কটেরা ক্রমাগত ইংরাজাধিকৃত দুর্গ সকল আক্রমণ করিতে লাগিল। ১২৯৯ সালে পোপের সঙ্গে এডওয়ার্ডের এক সন্ধি হয়। সেই সন্ধির মর্ম্মানুসারে এডওয়ার্ড স্কটিশ সিংহাসনের অন্যতর প্রতিদ্বন্দ্বী বেলিয়লকে পোপের হস্তে সমর্পণ করেন।

ওয়ালেস স্কটলণ্ডের অভিভাবকের পদ পরিত্যাগ করিলে কিউমিন, লর্ড সোলিস, ও সেণ্ট আণ্ড্রুসের বিসপ ল্যাম বার্টন—তিন জনে স্কটলণ্ডের রিজেণ্টেঃ পদে অভিষিক্ত হন। রিজেণ্টেরা এক-বাক্যে শত্রুনির্য্যাতন-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ষ্টার্লিং দুর্গ অবরোধ করিলেন। এড্‌ওয়ার্ড এই সংবাদে ভীত হইয়া সামন্তবর্গকে সসৈন্য তাঁহার সহিত স্কট্‌লণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু সামন্তবর্গ অবিরাম রণে ক্লান্ত হইয়া এবার এড্‌ওয়ার্ডের নিকট বিবিধ ওজর আপত্তি করিয়া যুদ্ধে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ড নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন। তিনি স্বকীয় সৈন্য লইয়াই ষ্টার্লিং অভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্কট্‌লণ্ডে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে স্কটেরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সবিশেষ প্রস্তুত রহিয়াছে—দেখিলেন স্কটিশ সৈন্যসংখ্যা এবার তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা ন্যূন নহে—দেখিয়া তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করাই সুবিবেচনার কার্য্য মনে করিলেন। ষ্টার্লিং দুর্গবাসিগণকে সুতরাং অগত্যা লর্ড সোলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। স্কটিশ্ রিজেণ্টগণ সার্ উইলিয়ম্ ওলিফ্যাণ্টকে ষ্টার্লিং দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

কিউমিন্ এই সময় নিজের পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিলেন। অতুল সম্পত্তি ও অসীম অধিকারে, তৎকালে স্কটিশ্ সামন্ত-বর্গের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় আর কেহ ছিল না। তিনি এই সময়ে তাঁহার সম্পত্তির অনুরূপ দানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দানশীলতায় প্রজাসাধারণ তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ রিজেণ্টেরা, তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিলে ওয়ালেস্ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছেন, এই সংবাদ শ্রবণাবধি বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিউমিন্ নিজ সদ্ব্যবহারে প্রজাসাধারণের সবিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। ওয়ালেসের প্ররোচনায় ফরাশিরাজ ফিলিপ্ ফ্রান্স হইতে বিবিধ শস্য ও মদ স্কট্‌লণ্ডে পাঠাইতে লাগিলেন। কিউমিন্ অর্দ্ধমূল্যে সেই সকল দ্রব্য প্রজাদিগের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিলেন। প্রজারা তাঁহাকে 'গুড্ স্কটিশম্যান'—'সাধু স্কটিশম্যান' নামে অভিহিত করিল।

এদিকে এড্‌ওয়ার্ড স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সামন্তবর্গের সমস্ত আপত্তি মিটাইয়া ১৩০০ সালের ১লা জুলাই মহতী সেনা সহ আবার স্কট্‌লণ্ড আক্রমণ করিলেন। সপ্তাধিক অশীতি জন সামন্ত এবার আপন আপন সৈন্য লইয়া এড্‌ওয়ার্ডের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত স্কট্‌লণ্ডের পূর্ণ ও শেষ জয় এবারকার অভিযানের লক্ষ্য

সেই সামন্তবর্গের মধ্যে ব্রিটেনের নাইটগণ, লোরেন্, স্কটশরাজ বেলিয়লের ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার বেলিয়ল, প্যাট্রিক, সপুত্র আরল্ ডনবার, সার্ সাইমন্ ফ্রেজর, গ্রেহামের হেনরী, এবং রিচার্ড সিউয়ার্ড প্রধান। এই মহতী সেনা চারিভাগে বিভক্ত হইল। প্রথমভাগ লিঙ্কলনের আরলের, দ্বিতীয়ভাগ ওয়ারেনের আরল্ জনের, তৃতীয়ভাগ স্বয়ং এডওয়ার্ডের ও চতুর্থ ভাগ যুবরাজ এড্ওয়ার্ডের অধিনায়কতায় অভিযানার্থ নির্গত হইল। একজন রণকুশল সৈনিক পুরুষ—সেণ্টজনের জন—সপ্তদশমাত্রবয়স্ক যুবরাজ এড্ওয়ার্ডের সাহায্যে নিযুক্ত হইলেন।

এই মহতী সেনা লইয়া এড্ওয়ার্ড প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ কেরলাভেরকের অবরোধকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তৎকালসুলভ বিবিধ সামরিক যন্ত্র লইয়া এডওয়ার্ড দুর্গভেদ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বার বার তাঁহার আক্রমণকারী সৈন্যেরা বলে দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু প্রতিবারই প্রত্যাহত হইতে লাগিল। এইরূপে বহুদিন কাটিয়া গেল, তথাপি দুর্গ অধিকৃত হইল না। দুর্গবাসীরাও ক্রমিক প্রত্যাক্রমণে ক্লান্ত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যদি তাঁহাদিগকে অক্ষতশরীরে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেওয়া হয়, তাঁহারা এড্ওয়ার্ডকে দুর্গ অর্পণ করিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। এডওয়ার্ডকে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। দুর্গবাসীরা রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া এড্ওয়ার্ডের শিবিরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। এড্ওয়ার্ড দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে ষাইট্ জনমাত্র বীর পুরুষ এতদিন তাঁহার অগণ্য সৈন্যের সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া দুর্গ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কোন কোন ইতিহাস-লেখক বলেন, যে এডওয়ার্ড তাঁহার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া উক্ত বীরদলের অনেকগুলিকে ফাঁসি দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এড্ওয়ার্ড দুর্গ অধিকার করিয়া হিয়ারফোর্ডের আরল্কে দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া, সসৈন্য উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

এদিকে স্কটিশ্ কমিশনেরা ফরাসিরাজ ফিলিপের নিকট সহায়তা না পাইয়া রোমনগরীতে গমন করিলেন। তাঁহাদের দুঃখকাহিনী শুনিয়া পোপ এড্ওয়ার্ডকে স্কট্লণ্ডের স্বাধীনতাহরণের চেষ্টা হইতে অতঃপর বিরত হইতে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিলেন। এড্ওয়ার্ড এরূপ অনুশাসনলিপি পাইয়া প্রথমে ক্রোধে অধীর হইলেন, কিন্তু অবিলম্বেই শান্ত হইয়া পোপকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে তিনি তাঁহার পত্র পার্লেমেণ্টের সম্মুখে অর্পণ করিবেন। পত্র পাঠাইয়া অবিলম্বেই তিনি লিঙ্কলনে একটী পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিলেন। এই

সভায় একশত চারিজন ব্যারন্ উপস্থিত হন। সকলে স্বাক্ষর করিয়া এই মর্ম্মে পোপের নিকট পত্র লেখা হইল যে স্কট্লণ্ড বহুদিন হইতে ইংলণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়া আসিতেছে সুতরাং ইংলণ্ড এতদিনের প্রভুতা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। পত্র প্রেরণ করিয়া এড্ওয়ার্ড মত্ত মা ঙ্গের ন্যায় সমস্ত স্কট্লণ্ড আলোড়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে স্কটিশ্ সৈন্যদলের সঙ্গে তাঁহার সৈন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশৃঙ্খল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অসংখ্য দুর্গ ক্রমে ক্রমে তাঁহার করতলস্থ হইতে লাগিল।

এদিকে আবল ওয়ারেনের সৈন্যদলও ইব্‌ভিঙ্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। তথায় রিজেণ্টগণের সঙ্গে ওয়ারেনের ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। স্কটিশ্ সৈন্য সংখ্যায় অতি অল্প ছিল, সুতরাং বারবার ইংরাজ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। অন্য দিকে যুবরাজের সৈন্যদল ক্লাইডেস্‌ডেল্, বথ্ওয়েল্ দুর্গ ও লেস্‌মাহাগো আবে ভস্মীভূত করিল। পূর্ব্বোক্ত দুর্গদ্বয় ও শেষোক্ত আবেতে অনেক স্কট্ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা এই অগ্নিকাণ্ডে সকলেই ভস্মীভূত হইয়া গেলেন।

"এড্ওয়ার্ড সমস্ত দক্ষিণ স্কট্লণ্ডকে চিরস্থায়িরূপে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের অধীন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি জীর্ণ দুর্গগুলির জীর্ণসংস্কার আরম্ভ করিলেন, এবং সমস্ত দুর্গগুলিকে প্রাকার পরিখাদি দ্বারা সুসংরক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ড হইতে অসংখ্য মজুর আনিতে হইয়াছিল, স্বদেশানুরাগোদ্দীপ্ত স্কটিশ্ভূমিতে তিনি একজনও মজুর পান নাই। ধন্য স্কট্লণ্ড! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! এড্ওয়ার্ড শুদ্ধ যে মজুর পান নাই এরূপ নহে—তাঁহার অগণ্য সৈন্যের আহার সামগ্রী পর্য্যন্ত তাঁহাকে ইংলণ্ড হইতে আনাইতে হইয়াছিল—কারণ স্কটেরা ইংরাজসৈন্য যাহাতে খাদ্যসামগ্রী পাইতে না পারে তজ্জন্য বাজার বন্ধ করিয়াছিল, এবং যাহাতে শিল্পজাত কোন সামগ্রী পাইতে না পারে তজ্জন্য সমস্ত কল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। ধন্য স্বদেশানুরাগ! ধন্য স্বজাতিপ্রেম!

আধুনিক সময়ে ইংরাজেরা আফগানিস্থান জয় করিয়া যেরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, এডওয়ার্ড দক্ষিণ স্কটলণ্ড জয় করিয়াও সেইরূপ সঙ্কটে পড়িলেন। অধিকৃত প্রদেশ সকল শাসনে রাখিতে যেরূপ ব্যয় পড়িতে লাগিল, তদনুরূপ কোন ফল ফলিল না। এদিকে ফিলিপও তাঁহাকে অন্ততঃ সাময়িক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। এডওয়ার্ডের দূত পারিস নগরে গিয়া এই সাময়িক সন্ধির নিয়মগুলি স্থির করিলেন। ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ অক্টোবর ডমফ্রাইজ নগরে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির মধ্যে স্কটলণ্ড অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সন্ধির নিয়মানুসারে

হ্যালেমাছ হইতে ছইটস্যাণ্ড পর্য্যন্ত ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ফ্রান্সে শান্তি বিরাজিত থাকিবে। কেহ কাহারও উপর কোন হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

সাময়িক সন্ধির কাল অতীত হইবা-মাত্র এডওয়ার্ড স্কটলণ্ডের আক্রমণ পুনরারম্ভ করিলেন। ইংরাজ সেনা লিন্‌লিথগাউ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। এদিকে ফরাশিবাজ ফিলিপের দরবারে স্থায়ী সন্ধির নিয়মা-বলী স্থিরীকৃত হইতেছিল। আরল্ বিউকান্, স্কটলণ্ডের ষ্টিউয়ার্ট জেম্‌স ও রিজেণ্ট সোলিস্ এবং ইন্‌জেল্‌রাম্ ডি অম্‌ফ্রেভিল—এই কয় জন স্কটলণ্ডের প্রতিনিধিস্বরূপ পারিসে উপস্থিত ছিলেন। এডওয়ার্ড ও ফিলিপ্ দুই জনেই শান্তির জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। এড্‌ওয়ার্ডের মনে মনে লক্ষ্য ছিল যে ফিলিপের সঙ্গে বিরোধ মিটিলেই তিনি স্কটলণ্ডে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সংস্থাপন করিবেন। এদিকে ফিলিপও সমরের বায়ভারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ফিলিপ্ স্কট্‌লণ্ডকে ছাড়িয়া সন্ধি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এড্‌ওয়ার্ডও তাহাতে কিছুতে সম্মত হইলেন না। অনেক বাদানুবাদের পর একটা রফা হইল। এডওয়ার্ড আপ্রত ফ্রেঞ্চ সম্-পত্তিকে পরিত্যাগ করিলেন; ফিলিপ পরিত্যক্ত স্কটলণ্ডকে এডওয়ার্ডের কৃপার উপর অর্পণ করিলেন। ইংলণ্ডের বাণি-জ্যের ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইলেও, এডওয়ার্ড দুর্দ্দমনীয় রাজ্য পিপাসায় অন্ধ হওয়া ইহাতে সম্মত হইলেন। এই সন্ধির নাম আমিন্‌সের সন্ধি *।

ইংরাজেরে নাম সাইমন্ ফ্রেজার এড-ওয়ার্ডের পতাকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাতীয় পতাকানুসে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি অতি প্রতিভাশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আগমনে জাতীয় দলের সবিশেষ বলোপচয় হইল। এদিকে রাজ্যের বিষয় এডওয়ার্ডের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ফ্রেজারের আগমনে এই ক্ষতি পূরণ হইয়াও লাভের অংশ অধিক হইল।

১৩০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ নবেম্বর ডম-ফ্রায়েরর সন্ধির দিন অতীত হয়। সেই দিনই জন ডি সিগ্রেভের অধিনায়কতায় বিশ সহস্র ইংরাজ সৈন্য স্কটলণ্ডাভিমুখে প্রেরিত হয়। এই মহতী সেনা রস্‌লিন নগরের অদূরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। তথায় গিয়া ইংরাজ সেনা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া তিনপথে উত্ত-রাভিমুখিনী হইল। এই সংবাদ পাইয়া সহকারী গবর্ণর জন কিউমিন, ও সাইমন ফ্রেজার দুইজনে অষ্ট সহস্র সৈন্য লইয়া ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ ফেব্রুয়ারীর প্রত্যুষে সহসা প্রথম সেনাবিভাগের

* Treany of Amiens. This peace was subsequently confirmed at Paris.

উপর আসিয়া আক্রমণ করিলেন। ইংরাজেরা এরূপ হঠাক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং সমস্ত ইংরাজ সেনা ভয়চকিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। একে একে স্কটেরা তিন সেনাবিভাগকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তিন সেনাবিভাগকেই সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত করিলেন। তাঁহাদিগের অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী সমস্ত ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হইল। সার জন ডি সিগ্রেভ পুত্র ও ভ্রাতার সহিত স্ব স্ব শয্যায় শায়িত ছিলেন। পরাজয়ের পর সৈন্যগণের কোলাহলে তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া দেখিলেন তাঁহারা বিজয়ী স্কটগণের হস্তে বন্দী। সার টমাস নেভিল, এডওয়ার্ডের কোষাধ্যক্ষ সার রালফ ডি কফারার এবং ১৬ জন নাইটও বন্দী হইলেন।

অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কতিপয় মাত্র স্কটের হস্তে সিগ্রেভের ন্যায় সেনাপতির অধিনায়কত্বে মহতী ইংরাজ সেনার পরাজয়ে এডওয়ার্ড ক্রোধে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। ইউরোপে তাঁহার সৈন্যের প্রতিপত্তি কমিয়া যাওয়ায় তিনি সবিশেষ ভীত হইলেন। বিলুপ্তপ্রায় সামরিক যশের পুনরুদ্ধার কামনায় এডওয়ার্ড শেষ চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্কটলণ্ডের জন্য যে লৌহ শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন এডওয়ার্ড এবার যে কোন প্রকারে স্কটলণ্ডের পায়ে তাহা পরাইয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। এই জন্য তিনি স্বদেশে বিদেশে যে যেখানে ছিল সমস্ত সৈন্য ও সামন্তবর্গকে নিজ পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। অসংখ্য রণতরি খাদ্য দ্রব্যে ও বস্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া জলপথে স্কটলণ্ডাভিমুখে ধাবিত হইল। তিনি স্বয়ং সেই মহতী সেনা লইয়া স্থলপথে উত্তরাভিমুখী হইলেন।

এদিকে ফিলিপের বিশ্বাসঘাতকতা এই সময়ে চরম সীমা লাভ করিল। তিনি স্কটিশ কমিশনরগণকে এই মুমূর্ষু সময়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এডওয়ার্ডকে স্কটলণ্ডের সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এই লোভ বাক্যে কৌশলে তাহাদিগকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। তাদৃশ বীরবৃন্দের তৎকালে স্বদেশে অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তথাপি ফিলিপ কিছুতেই তাঁহাদিগকে আসিতে দিলেন না। এইরূপে তিনি প্রকারান্তরে এডওয়ার্ডের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

এডওয়ার্ডের আগমনবার্ত্তা স্কটলণ্ডের সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইতে না হইতেই অর্দ্ধ হৃদয় সম্রান্ত স্কটগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিয়া এডওয়ার্ডের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কাপুরুষ জাতীয় বিশ্বাসঘাতক সার জন কমীণ্, সেই অকৃত-

সামন্তবর্গের অগ্রণী। তিনি এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ সমস্ত লেনকস্ প্রদেশের অধিপতিত্ব প্রাপ্ত হইলেন; এবং তাঁহার পূর্ব্ব পদেও (ডর্বাটনের গবর্ণরত্ব) থাকিতে অনুমতি পাইলেন।

উনবিংশ শতাব্দী ও কলিযুগ।

অনেক দিন হইল বাল্যাবস্থায় একদা একজন শাস্ত্রব্যবসায়ী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছিলাম, যে, জগতে কলিযুগ উপস্থিত, অবিলম্বে ইহ সংসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার থাকিবে না, পাপপুণ্যের প্রভেদ বিলুপ্ত হইবে, মনুষ্যজাতি ঘোরতর লোমহর্ষণ পাপাচারে প্রবৃত্ত হইতে অনুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবে না। সেই অপরিণত বয়সে, সেই শৈশবকালেও একথা অবিশ্বাস করিয়া ছিলাম। অবিশ্বাস করিয়াছিলাম বটে কিন্তু কথাটী ভুলিতে পারি নাই। মনে হইত কথাটী সত্য নহে, তথাপিও যেন ইহাতে সত্যের কিছু ছায়া আছে। যেন ভাবিতাম, ইহাতে প্রতীতি করিবার কোন কারণ নাই বটে, তথাপি কথাটী নিতান্ত অমূলক নহে। বোধ হইত, যেন ব্রাহ্মণ ভালরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে নাই, যেন কি বলিতে কি বলিয়াছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর গত হইল, সহসা দেখিলাম দূর পশ্চিম দেশ হইতে মহাকায় প্রবল স্রোত অতি প্রবলবেগে আসিতেছে। শত সহস্র নরনারী, শত সহস্র বলিষ্ঠকায় অমিত শক্তি পুরুষ সেই স্রোতে ভাসিতেছে।

যে স্রোতের সম্মুখে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বলশালী জাতি সকল দাঁড়াইতে পারে নাই, দুর্ব্বল বাঙ্গালী কি সে স্রোতের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয়? সুতরাং বঙ্গদেশে অনেকেই আপনা হইতেই বিনা বল প্রয়োগে স্রোতোমুখে দেহ সমর্পণ করিবে। বিস্মিত হইয়া অনুসন্ধান করিলাম এ স্রোত কি, কোথা হইতে আসিল? জানিলাম ইহার জন্ম ইংলণ্ডদেশে ও ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা জন ষ্টুয়ার্টমিল! ইহার উৎপত্তিস্থান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইহার জন্মদিন উনবিংশ শতাব্দী। দেখিলাম মিল উচ্চকণ্ঠে মনুষ্য জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমি অনেক চেষ্টায় অনেক পরিশ্রমে জগতের হিতার্থে এ পবিত্র স্রোত আনিয়াছি, কাহারও সাধ্য থাকে ইহার গতিরোধ কর, নতুবা ইহাতে আত্মসমর্পণ কর! ভগীরথ গঙ্গা আনি-

বার এরূপ কথা এত স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। দেখিলাম মিল চীৎকার করিয়া বলিতেছেন তোমরা এতদিন অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়াছিলে, ঈশ্বর মানিতে, পরলোকে বিশ্বাস করিতে, ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া গণ্ডগোল করিতে, আমি যাহা বলিতেছি শুন, বুঝিতে পারিবে অন্যায় করিয়াছ! লোকে শুনিল, বিশ্বাস করিল, নিজের স্রোতে দেহ ভাসাইল। মিলের উপদেশের প্রতিধ্বনিতে জগৎ পরিপূর্ণ হইল। স্পেনসার (Spencer) হারিসন (Harrison) প্রভৃতি পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ দূরে থাকিয়াও মিলের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এক বাঙ্গালী জাতি চাকচিক্য বড় ভালবাসে, নূতন জিনিসে বড়ই প্রীতি, গণ্ডগোল শুনিলে দৌড়িয়া আসিয়া তাহাতে যোগ দেয়, সুতরাং বাঙ্গালাদেশেও একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বিস্মিত হইয়া শুনিলাম, কালেজের পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক শিষ্যের নিকট শিক্ষাকালে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর (Positivism ও Materialism) অখণ্ডনীয় তর্ক সমূহে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। স্তম্ভিত, চমকিত হইয়া দেখিলাম অপরিণতবয়স্ক যুবা, অজাতশ্মশ্রু বালক আপন জননীর নিকট দাঁড়াইয়া পরিচয় দিতেছে যে পাপপুণ্যের প্রভেদজ্ঞান ভ্রমমূলক! চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, জাতীয় ধর্ম্মের পক্ষপাতী ন্যায়বাগীশ কুক্ষণে প্রিয় তনয়কে ইংরাজী শিখিতে কালেজে পাঠাইয়াছিলেন, তাই আজি শিশুপুত্রের মুখে শুনিতে হইল যে, যে ব্যক্তি অপ্রামাণিক সত্য বিশ্বাস করে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহাকে মূর্খ মধ্যে পরিগণিত করে। কি সর্ব্বনাশ! পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক! বড় আশা করিয়া পুত্রকে ইংরাজী শিখিতে দিয়াছিলে! তবে কি বাল্যকালে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট যে শুনিয়াছিলাম যে জগতে কলিকাল উপস্থিত, তাহা কি সত্য হইল? শৈশবকালে যাহা মূর্খের কুসংস্কার মনে করিয়াছিলাম, অশিক্ষিতের অন্ধ বিশ্বাস ভাবিয়াছিলাম, এত দিন পরে আজি কি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইল? সক্রেটিস! প্লেটো! শঙ্করাচার্য্য! শাক্যমুনি! তোমরা শত শত বৎসর জগতকে যে শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলে তাহার পরিণাম কি এই হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য! পরাশর! মনু! তোমাদের নীতিপুস্তক সকল আজি বুঝি অনলে নিক্ষিপ্ত হয়! বেদব্যাস! বাল্মীকি! মিল্‌টন! তোমরা কি ভস্মে ঘৃতাহুতি দিয়াছিলে? কালিদাস! সেক্ষপিয়র! বহুযত্নে বহুপরিশ্রমে যে অক্ষয় জ্ঞান পরিপূর্ণ করিয়া বীণা বাঁধিয়াছিলে, আজি তোমাদের সেই সাধের বীণা বুঝি মনুষ্যজাতির অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়! আর আমরা? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, অসীম ব্রহ্মাণ্ডে কীটানুকীট, সহায় শূন্য—সংসার সমুদ্রে যে একমাত্র ভেলা ছিল, পতিতপাবনের নাম, তাহাও বুঝি ছাড়িতে হইল! [illegible]

কলুষপূর্ণ তিমিরময় জগতে একমাত্র ভরসা ছিল, পুণ্যের জয়, পাপের পতন তাহাও বুঝি ফুরাইল! বিপদ সঙ্কুল শোক তাপময় সংসারে একমাত্র সম্বল ছিল "বিপত্তে মধুসূদন" তাহাতেও বুঝি বঞ্চিত হইতে হইল! মহাত্মা যীশু! পবিত্র প্রাণ চৈতন্য! এতদিনে বুঝি প্রতিপন্ন হয়, তোমাদের আত্মা জড়পিণ্ড মাত্র ছিল! ভস্মাবশেষ হইয়া জড় পদার্থে মিশিয়াছে! আশা করিয়াছিলে ইহ সংসারে অশেষ যাতনা সহিয়া, এ কলুষ সমুদ্র পার হইয়া, উচ্চতর, পবিত্রতর স্থানে গিয়া শান্তি পাইবে, বুঝি আজি বিশ্বাস করিতে হইল, তোমাদের সে আশা মৃগ-তৃষ্ণা মাত্র ছিল। ভাবিলাম, এ ভয়াবহ তর্কের প্রতিবাদ করিয়া ইহার অলীকতা সপ্রমাণ করে, এমন কি কেহ নাই? মনে করিলাম এমন কি কোন পণ্ডিত নাই যে জগতের হিতার্থে, মনুষ্য জাতির মঙ্গল কামনায়, ইহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে? কিন্তু অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ মৃত হস্তে মিলের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। ক্রমে ভীত হৃদয়ে দেখিলেন সত্য সত্যই মিল শিক্ষিত সমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আর নিরস্ত থাকা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। [illegible] জিভন্স, ক্যানন বার্কি, বিশপ বটলার, প্রফেসর কার্নাস, প্রেসিডেণ্ট ডানিয়েল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মিলের মীমাংসার বিচারে অগ্রসর হইলেন! পণ্ডিতবর জিভন্স দেখাইলেন যে মিলের অলীক সিদ্ধান্তে লোকের আস্থা ক্রমে এত অধিক হইতেছে যে আর নিরস্ত থাকা উচিত নহে।*

বাস্তবিক প্রোফেসর জিভন্সের ন্যায় পণ্ডিত যে মিলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার উপযুক্ত, বোধ হয় তাহা কেহ অস্বীকার করেন না। তাঁহার "The experimental methods" প্রভৃতি গ্রন্থ মিলের মীমাংসা সকল ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ বলিয়া

---

*But for my part, I will no longer consent to live silently under the incubus of bad logic and bad philosophy which Mill's works have laid upon us. On almost every subject of social importance * * * he has expressed unhesitating opinions and his sayings are quoted by his admirers as if they were the oracles of a perfectly wise and logical mind. If to all his other great qualities had been happily added logical accurateness, his writings would indeed have been a source of light for generations to come. But in one way or another Mill's intellect was wrecked. The cause of injury may have been the ruthless training imposed upon him in tender years. * * But however it arose, Mill's mind was essentially illogical.

Stanley Jevons review's of Mill's Logic.

প্রতিপন্ন করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, আদৌ কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। মিলের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে সৃষ্টি কর্ত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ এত সামান্য যে তাহাতে বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ক্যানন ব্যারি তাঁহার "Boyle lectures" নামক গ্রন্থে যে সকল জাগ্রত জীবন্ত প্রমাণ* দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা পাঠকের সম্মুখে ধরিব বলিয়া, মিলের মীমাংসা খণ্ডনের চেষ্টা করিব বলিয়া, এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। এ সত্যে বিশ্বাস করিবার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য চাহি না। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য যে মিলের মীমাংসার স্রোতের সে প্রবল বেগ অনেক মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমে আরও হইবে। শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে জগতে কলিযুগ উপস্থিত, সে আশঙ্কা অমূলক অলীক স্বপ্নমাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আমি জানি এইরূপ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য ও প্রকৃতিসিদ্ধ। বহুবার জগতে অনেক বার এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতি যেমন তেমনিই আছে। অকস্মাৎ দেখিলাম পশ্চিম গগন ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল, ক্রমে দিগন্তব্যাপী মেঘের অন্ধতামসে বসুধা পরিপূর্ণ হইল। প্রলয়ের ঝটিকায় যেন বসুমতী কম্পিত হইতে লাগিল। ভীত হৃদয়ে ভাবিলাম একি প্রলয় কাল উপস্থিত? কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার দেখিলাম মেঘজাল বিদূরিত হইল, ঝটিকা থামিল, প্রকৃতি আবার শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল! অনেক প্রকাণ্ডকায় মহীরুহ ভূতলশায়ী হইল বটে, অনেক উচ্চ প্রাসাদ চূড়া চূর্ণ হইল সত্য, কিন্তু প্রকৃতির কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। শরতের শশী আবার হাসিতে হাসিতে আপন স্থানে উদয় হইল, মৃদু সমীরণ আবার ফুল্ল কুসুমের সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। লোকে বুঝিল প্রকৃতির নিয়মই এইরূপ, ইহাতে প্রলয়ের আশঙ্কা অমূলক মাত্র। অকস্মাৎ ভারতে মন্বন্তর উপস্থিত হইল, মনুষ্য জাতি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া উদরান্নের জন্য হিংস্র পশুর ন্যায় ফিরিতে লাগিল, ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদে, পীড়িতের করুণ চীৎকারে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল। কিছুদিন পরেই আবার দেখিলাম বসুমতী ধনধান্যে পূর্ণ হইল, কৃষক আবার গীত গাইয়া গাভী লইয়া মাঠের দিকে চলিল। অনেকে মরিল বটে, কিন্তু প্রকৃতি যেমন তেমনিই রহিল, নৈসর্গিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। জগতে সত্যের বিপ্লবও ঠিক এইরূপ। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে এইরূপ সত্যবিপ্লবের আশঙ্কা নূতন নহে। অগষ্ট কোমতের সময় কালে এইরূপ ঘটিয়াছে, ইহানীতন জর্ম্মনিতে অনেকবার

---

*"There is evidence * * * amounting to the lower degrees of probability." P, 242.

এইরূপ হইয়াছে, ভারতবর্ষে চার্ব্বাকের সময় অনেক পরিমাণে হইয়াছিল। কিন্তু চিরন্তন সত্যের আলোক আজিও জগতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। দিনকর অনেকবার মেঘের ভিতর লুকাইয়াছে কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দিনকর যেমন উজ্জ্বল আলোক বিতরণ করিত, আজিও সেই রূপ করিতেছে। তাই বলিতেছি জাজ্বল্যমান সত্যে বিশ্বাস করিবার জন্য আমি বিজ্ঞানের সাহায্য চাহি না, হ্যামিলটন পাতঞ্জলের তর্কের আশ্রয় প্রার্থনা করি না। উনবিংশ শতাব্দীর রাসায়নবিৎ পণ্ডিতের বিজ্ঞানে পাঠ করিলাম আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। সে সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করিতে চাহি না, কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া করি কি? সে তর্ক সকল তো খণ্ডন করিতে পারি না। হৃদয় বড় চঞ্চল হইল, আপনাকে কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইল। মীমাংসার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের Materialism এর পক্ষপাতী সুপণ্ডিত ডাক্তারের নিকটে গেলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার বুদ্ধি বড় স্থূল কিন্তু আমার বড়ই ইচ্ছা, আমি প্লেটোর মত দার্শনিক হই অথবা কালিদাসের মত পণ্ডিত হই; তোমাদের উন্নত Science হইতে দেখিয়া আমাকে এমন কোন ঔষধ দিতে পার যাহাতে আমার এ স্থূল বুদ্ধি রোগ নিরাকৃত হয়?" ডাক্তার হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন।

"Therein the patient must minister to himself.

প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া আত্মা সম্বন্ধে যে সন্দেহ জন্মিয়াছিল তাহার অর্দ্ধেক অপনোদিত হইল। সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রাকৃতিক শক্তি ("First cause and force)" সম্বন্ধে মিলের মীমাংসা সকল নিবিষ্ট চিত্তে পড়িলাম। গভীর নিশীথে একাকী বসিয়া সে মীমাংসা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলাম, চেষ্টা বিফল হইল। মনে বিশ্বাস হইল এ তর্ক সকল অভ্রান্ত, তাই খণ্ডন করিতে পারিতেছি না, আমি কুসংস্কারাপন্ন তাই বুঝি ইহাতে সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিতেছে না। প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম মহিমাময় তপন অনন্ত প্রকৃতি আলোকিত ও পুলকিত করিয়া, সুপ্তজগত জাগরিত করিয়া, নীলগগনে সুবর্ণধারা বর্ষণ করিয়া উদয় হইতেছে। বিস্মিত হইয়া বলিলাম ইংরাজ দার্শনিক! না বুঝিয়া তোমার তর্কে বিশ্বাস করিয়াছিলাম। দেখিলাম আলুলায়িত কুন্তলা, পবিত্র মূর্ত্তি ভারতের বিধবা যুবতী পরলোকগত পতির মঙ্গল কামনায় ইষ্টদেবতার কল্পিতমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যূথিকা কুসুম লইয়া পূজা করিতেছে! সুপ্তোত্থিত হইয়া বলিলাম পাশ্চাত্য বিজ্ঞান! তুমি আমাকে প্রতারণা করিয়াছিলে! ইউরোপীয় দার্শনিক! আমি তোমার পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক চাহিনা, কেননা তোমার সিদ্ধান্ত আমি অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব

না। তোমার বিজ্ঞানের স্রোতে আত্ম সমর্পণ করিব না! ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানবিৎ বাঙ্গালি! আমাকে মূর্খ কুসংস্কারাপন্ন বলিতে হয় বলিও তোমার নূতন সত্যে আমার বিশ্বাস হইল না। আর শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত। যদি কখন জগতে কলিযুগ আবির্ভূত হয়, যদি কলিকাল শাস্ত্রকারের কপোল কল্পিত না হয়, তবে এই স্বতঃসিদ্ধ জাজ্বল্যমান সত্য আজি এ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে যেমন আছে, কলিযুগেও এইরূপ থাকিবে, ইহার নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি অই মধ্যাহ্ন তপনের উজ্জ্বল কিরণের ন্যায় অনন্তকাল অনন্ত বিশ্ব আলোকিত করিবে।

পরিব্রাজক।

অজড় জড় ও জড় অজড় হওয়া।

এ বিষয়ে আর্য্য পণ্ডিতেরা নানা প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিচারমল্ল নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেন, সৃষ্টি আরম্ভ সময়ে প্রত্যেক জাতীয় পদার্থের পরমাণু পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় মানবীয় পরমাণু হইতে মানব, ঘোটকীয় পরমাণু হইতে ঘোটক, ছাগীয় পরমাণু হইতে ছাগ, এই রূপ যবীয় পরমাণু হইতে যব, গোধূমীয় পরমাণু হইতে গোধূম শালীয় পরমাণু হইতে শালীধান্য প্রভৃতি হওয়ার নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। ইহার ব্যতিক্রম হয় না। অর্থাৎ একজাতীয় পরমাণু হইতে অন্য জাতীয় বস্তু হয় না। মীমাংসকেরা বলেন অদৃষ্টই জগৎ-বৈচিত্রের হেতু। সেই অদৃষ্ট কর্ম্মমূলক। কর্ম্মশক্তিকে মানুষ জড় হয়। কর্ম্ম-শক্তিকে জড় অজড় হয়।

জড়স্য চিৎসমাযোগা-
চ্চিত্বং ভূয়াচ্চি তথা।
জড়সঙ্গাজ্জড়ত্বং হি
জলাগ্ন্যোর্ম্মেলনং যথা।

অ: রা: অ: চ:।

ইহার তাৎপর্য্য জলের যেখানে অল্পতা, অগ্নির অধিকতা, সেখানে জল অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়। আর যেখানে জল অধিক অগ্নি অল্প, সেখানে অগ্নি জলভাব প্রাপ্ত হয়। প্রস্তাবা বিষয়েও সেই রূপ ঘটিয়া থাকে। যে মন নিরন্তর চৈতন্যকে চিন্তা করে সে মন চৈতন্য-ময় হয়। আর উনি সর্ব্বদা বিষয়সংসর্গী হইলে জড়ময় হইয়া পড়েন। ইহার উদাহরণ যোগী আর ভোগী। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানী যোগী, অনাত্মজ্ঞানী ভোগী। অথবং কর্ম্মই জগতের মূলে জগৎ কর্ম্মের আয়ত্ত। কর্ম্মশূন্য হইলে জগৎ

শূন্যময় হয়। অতএব কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। যেমন দেহ কর্ম্মসম্ভব, তেমনি সংসারও কর্ম্মজ।

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম
কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং
কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥

—মহাভারত।

বেদান্ত বলেন অঘটন ঘটন পটীয়সী ঈশ্বরশক্তি মায়া, এই মায়া আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি প্রভাবে অঘটন ঘটাইতেছেন। উক্ত শক্তিদ্বয় সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ এবং অজড়কে জড় ও জড়কে অজড় করতঃ জগদ্বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছেন। এই শক্তিদ্বয় ভিন্ন মায়ার আর তিনটি গুণ আছে। প্রথমটির নাম সত্ব, দ্বিতীয়ের নাম রজঃ, তৃতীয়টির নাম তমঃ। এই তিন গুণ আর ঐ শক্তিদ্বয় যদি মায়াতে না থাকিত তাহা হইলে পূর্ণাত্মা পরব্রহ্ম বাক্যমনাতীত না হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশ পাইতেন। জগজ্জালও বিলয় হইত। এরূপ অবস্থা যে কিরূপ তাহা প্রকৃত পরমহংসেরা অনুভব করিতে পারেন।

যাহা দেখা বা শুনা বা অনুভবে জানা যায় তত্তাবতই অসৎ মায়াময় জড় পদার্থ অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী স্বপ্নবৎ জগৎ। ইহা অসদ্বৈসৎ হইতে পারে না। এই সুদীর্ঘকাল স্থায়ী অসৎ জগতের উপাদান ও কর্ত্রী এক মায়াও আত্মা। এক মায়া হইতে সংখ্যাতীত পদার্থে নির্ম্মিত সংসার সাজান ও প্রস্তুত হইয়াছে। মহাযোগী ব্যাসদেব বলিয়াছেন, যে, অনন্ত কোটি জগতের উপাদান এক পরমাত্মা, নির্ম্মাতাও এক মায়া। স্বর্ণকার যেমন এক স্বর্ণপিণ্ড হইতে নানা রূপ অঙ্গাভরণ প্রস্তুত করতঃ লোকের চিত্তবিনোদ জন্মায়, মায়াও তেমনি এক আত্মাতে নিজ শক্তি ও গুণ যোগে বিচিত্র সংসার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আত্মা হইতে যখন মায়াশক্তি ও গুণ দূরীভূত হয় তখন যে আত্মা সেই আত্মাই থাকেন। মহাপ্রলয়াবসানে মায়া পরমাত্মায় বিলীন হইলে সকলি পরমাত্মাময় হয়।

এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব সম্বন্ধে বিজ্ঞানগর্ভ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ যা বলিয়াছেন তন্মধ্যে যোগবাশিষ্ঠের ও রামায়ণের মত অগ্রে বল যাইতেছে। মার্কণ্ডেয় হইতে দীর্ঘজীবী পক্ষিরাজ ভূশুণ্ডকে বশিষ্ঠদেব এক সময় বলিয়াছিলেন, পক্ষিবর তুমি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী অথচ নিষ্পাপ ও আত্মতত্বজ্ঞানী মহাযোগী। তুমি বল দেখি জগতে কি কি আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। আমি তাহাই শুনিবার জন্য তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। বিশেষতঃ বৃদ্ধসংসর্গ ও তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞানোপদেশ না পাইলে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইতে পারা যায় না। এইরূপ বিনয়নম্র বচন শুনিয়া ভূশুণ্ড অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন, ব্রহ্মানন্দন

আমি এ বয়সে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি তাহা আপনাকে কত বলব। তবে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে আপনার কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন, মহাশয় আপনি যে কতবার দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া কথন অগ্নি, কথন জল, কথন বায়ু, কথন আকাশ, কথন পর্ব্বত, কথন বৃক্ষ, কথন দেবতা, কথন মনুষ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টিপ্রবাহ নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহা কি জানেন না। ঐরূপ ভগবান বিষ্ণুকে কথন পঞ্চ মহাভূত, কথন সূর্য্য, কথন দেবতা, কথন মৎস্য, কথন কূর্ম্ম, কথন বরাহ, কথন নৃসিংহ, কথন বামন, কথন অনন্ত, কথন গরুড়, কথন মানব প্রভৃতি কত দেহ ধারণ করিতে দেখিয়াছি। আপনারা যোগসিদ্ধ, মনে করিলে সবলই হইতে পারেন। আপনাদিগের কথা স্বতন্ত্র। হে ব্রহ্মন্, সকল কালেই যে পদার্থসকলের রূপ সমান থাকে এমত বিশ্বাস করিবেন না। মহাশয় আমার স্মরণ হয় যে এক সময় এই পৃথিবীকে কেবল অরণ্যে পরিবৃত এবং অজাতসমুদ্র দেখা গিয়াছে।

এক সময়ে এই পৃথিবীকে কেবল অনন্ত পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছন্নও দেখিয়াছি। তথন মনুষ্যের সম্পর্ক ছিল না। ইহাতে প্রস্তাব্য বিষয়ের এইমাত্র প্রমাণ হইতেছে যে জড় হইতে অজড় চৈতন্যময় মানবদেহ উৎপন্ন হইতে পারে ও হইয়েছে। এথন অজড় চৈতন্যময় মানব যে জড় দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার উদাহরণ অহল্যার পাষাণত্ব প্রাপ্তি। আবার শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় সেই পাষাণত্ব ঘুচিয়া গিয়া মানবত্ব যে লাভ হইয়াছিল রামায়ণ তাহার প্রমাণ।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে কর্ম্মবিপাক প্রকরণে প্রকাশ আছে যে লোকসকলের কর্ম্মগতিকে মানবত্ব গিয়া পশুত্ব ও সর্পত্ব ও বৃক্ষত্ব জন্মিতে পারে। যথা—

"ম্লেচ্ছসেবী ম্লেচ্ছজীবী যো বিপ্রো ভারতেভুবি।
সচ তপ্তসমীকুণ্ডে স্বলোমাব্দং বসেৎ ধ্রুবং।
তাডিতো যমদূতেন তপ্তাজী তত্র তিষ্ঠতি
তত্র ত্রিজন্মনি ভবেৎ কৃষ্ণবর্ণ পশুঃ সতি॥
দ্বিজন্মানি ভবেচ্ছাগঃ কৃষ্ণসর্প ত্রিজন্মনি।
ততশ্চ তালবৃক্ষশ্চ ততঃ শুদ্ধোভবেন্নরঃ॥"

এই মায়িক জগৎ কেবল বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। তর্কে ইহার অন্ত পাইবার যো নাই, ইহা তর্কাতীত। জগতের কার্য্যকলাপ তাকিকেরা কি দেখিয়াছেন, যে তর্ক করিবেন। সিদ্ধ পুরুষেরা বরং কতক দেখিয়াছেন। জীবন্মুক্ত মহাজ্ঞানী লোকসকল যাহার অন্ত পান নাই তাহা কি মানবতর্কে পর্য্যবসিত হইতে পারে। এমন কি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তিনিও মায়ার অন্ত করিতে পারেন নাই। অন্যে পরে কা কথা।

জাগতিক বিচিত্র ঘটনার বিষয়ে পুরাণ অন্যাপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ। সেই পৌরাণিক প্রমাণ হিন্দুজাতির অন্ধা-

দরণীয়। বিনা পুরাণে কেহই জগতের আশ্চর্য্য ঘটনাবলি জানিতে পারেন নাই। অতি পুরাতন ঘটনাবলিকে পুরাণাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই প্রস্তাবটি পুরাণ দ্বারা প্রমাণিত করা গেল ইতি।

পূর্ব্বে যে কর্ম্মের বিষয় বলা হইয়াছে সেই কর্ম্মও তিন প্রকার। ধর্ম্ম অধর্ম্ম আর বিকর্ম্ম। কর্ম্ম আর বিকর্ম্মে সংসার প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

কর্ম্মের ফল সুখ, অকর্ম্মের ফল মুক্তি অর্থাৎ সুখদুঃখরাহিত্য, বিকর্ম্মের ফল দুঃখভোগ। জীব অগ্রে বিকর্ম্মের ফল, তৎপরে কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। অকর্ম্মের দ্বারা জীবের জীবত্ব ধ্বংস হইলে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। সাধুসঙ্গ, ভগবদ্ভক্তি, ভগবদারাধনা, সচ্ছাস্ত্রালোচনা, নাম কিম্বা মন্ত্রজপ এই কয়েকটিই মুক্তিদ্বার। জীব যতদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজ থাকিবে ততদিন মুক্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় না। উক্ত পঞ্চবিধ অকর্ম্ম আর নিত্য নিত্য যোগাভ্যাস করিলে জীব শিব হয়। অকর্ম্মে মুক্তি হয়। বেদবিহিত কার্য্যকে কর্ম্ম বলে বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মকে বিকর্ম্ম বলে। অহেতুকী ভক্তিসম্পন্ন বৈদিক তান্ত্রিক ও পৌরাণিক বৈধ ক্রিয়াকে অকর্ম্ম বলা যায়। ইহার ভগবদ্গীতায় ও ভাগবতে প্রমাণ আছে। ইতি

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

আর্য্যবীর।

মহারাণা রাজসিংহ।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

হাস্যময়ী ভারতপ্রকৃতি আর সেই অনন্ত শোভার আকর নয়; আর তাহার সুচারু গগনতল শতচন্দ্রসমন্বিত সুষমারাশি বিকাশ করে না; নিদাঘের নৈশগগনে আর তারারাশি ফুটে না; বসন্তের অঙ্গুলিপ্ত পবন আর প্রাণ মন বিমোহিত করে না; যেন সকলেই নিবিড় ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। সাগরাম্বরা ভারতী-সতী যাহা একদা আর্য্যবংশ-চূড়ামণি নররূপী দেবতা রামচন্দ্রের রামরাজ্য বলিয়া, সাক্ষাৎ-ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরের লীলানিকেতন বলিয়া, সদর্পে সানন্দে উন্নত শীর্ষে অবলোকন করিয়াছিল, আজি সেই শান্তি-প্রীতি-সমুন্নত আর্য্যবীরের কীর্ত্তিকাননে এ গভীর নৈরাশ্যের ভাব কেন? অভ্রভেদী হিমালয় অবনতমস্তক। যেন ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সে অনন্ত প্রতাপ অন্তর্হিত হইয়াছে। পর্ব্বতনন্দিনী ভাগিরথী কূল

কুল স্বরে শোকগীতি গান করিতেছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি অনন্ত শোভার সদন প্রকৃতির চারুছবি মসিমণ্ডিত দেখিতে পাই। প্রকৃতির লীলানিকেতন পর্ব্বতসানুতে আর সেই পবিত্র সৌম্যমূর্ত্তি তাপসের বীণাবিনিন্দিত বেদঝঙ্কার শ্রবণগোচর হয় না। তপোরত ধ্যানরত পবিত্র তাপসের পবিত্র ভূমি অপবিত্র পিশাচে অধ্যুষিত। শোভনে প্রকৃতি সতি! কে তোমার সুষমারাশি হরণ করিল? কে তোমার চারু অঙ্গে অনলরাশি ঢালিয়া দিল? তোমার সেই শান্তিজ্যোতিঃ-সমাকীর্ণ আনন্দরাশি অপহরণ করিয়া কে এই নৈরাশ্যের ছবি আনয়ন করিল? তোমার হাস্যরাশিসম্বলিত সুশোভন মনোমোহন মোহিনী মূর্ত্তি বিষাদবিম্বিত বিমলিন কেন? হাহাকার অন্ধকার অনন্ত অন্তর্যাতনায় তোমার কমনীয় কোমল হৃদয় আকুলিত কেন? তোমার সেই পূর্ব্বতন বৈদিক গবেষণা আর অদ্যকার অদম্য অন্তর্যাতনা; আর্য্যকবির বীরগান আর এই বর্ত্তমান শোকতান; ঋষিমুনির অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা আর এই প্রকৃতিকুলের অজ্ঞানান্ধকার তুলনা করিলে হৃদয় আকুল হইয়া উঠে। কালনাট্যের অপরিহার্য্য অভিনয়ে তোমার এই শোচনীয় পরিণাম!

হে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারক সর্ব্বভুক্ কাল তোমায় নমস্কার। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি অভ্রভেদী হিমাচল অতল জলধিতলে পরিবর্ত্তন করিতেছ; জলধির অতল তলে উন্নতশীর্ষ প্রকাণ্ড পর্ব্বত প্রস্তুত করিতেছ; তুমি সুশোভন মনোমোহন কাননবল্লরি শুষ্ক শীর্ণ বিবর্ণ করিয়া ধূলিরাশি সমাকীর্ণ মরুভূমি সৃজন করিতেছ, বনভূমি রাজধানী করিয়া দিতেছ। আজি তোমারই অনতিক্রম্য শাসনে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী অত্যাচারী যবনের করগত; ধর্ম্মের আসনে মূর্ত্তিমান্ পাপ। পাষণ্ড যবনের পাশব অত্যাচারে ভূস্বর্গ ভারতরাজ্য থরথরকম্পান্বিত। অত্যাচারের পর অত্যাচার অবিরল ধারায় বর্ষিত হইতেছে। যাহারা স্বার্থলোভে পিতা ভ্রাতা এমন কি প্রাণাধিক তনয়ের মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে, পরপীড়নের মোহকর প্রলোভনে যাহাদের আমিষনিষ্পেষিত উষ্ণ শোণিত উষ্ণতর হইয়া উঠে, সেই উদ্দাম-প্রকৃতি যবনপিশাচ ইন্দ্রপ্রস্থের উচ্চ আসন অধিকার করিতেছে, ভারতের অধঃপতন অপরিহার্য্য!

আজি আরাঞ্জিব সেই পৈশাচিক শাসনের পৈশাচিক নাম সার্থক করিতেছে, তাহার একদেশদর্শন, পক্ষপাত শাসন, অন্যধর্ম্মে অত্যাচার শাণিত ক্ষুরধারে হিন্দু হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। হিন্দুর আর নিস্তার নাই। ধর্ম্মসম্বল হিন্দুর কোমল প্রাণে বেদনা দিয়া পাষণ্ড উন্নতশীর্ষ পবিত্র মন্দির বিচূর্ণ করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিল; ক্ষোভে রোষে যাতনায় মর্ম্মাহত হইয়া, আর্য্যকুল

আকুল হইয়া অবনত মস্তকে তাহা সহ্য করিতে লাগিল। হায় যে জাতি ধর্ম্মের জন্য, পরের জন্য অকাতরে প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই জাতি অবনতশিরে ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করিতেছে; নিষ্ঠুরতা নির্দ্দয়তার জলন্ত মূর্ত্তি আরাঞ্জিব হিন্দুর শেষ শোণিত সন্দর্শনে অভিলাষী হইয়াছে। অত্যাচারের একশেষ হইয়াছে, তথাপি ক্ষান্তি নাই। কঙ্কালমাত্রবিশিষ্ট হিন্দুর রক্ত শোষণ করিয়াও রক্তপিপাসু পাষণ্ডের শোণিততৃষ্ণার শান্তি হইল না, জিজিয়া (মাথা গুনিয়া) করের প্রবর্ত্তনা করিল। মুমূর্ষু হিন্দুর অন্তর্দাহনার হৃদয়বিদারক হাহাকারে দেশ পূরিয়া উঠিল; ভারতসাম্রাজ্য যেন শোকপুরী হইল।

কে এই ভীষণ অন্ধতামসে আলোকধরী হইলেন? কে এই অকূল ভীমপারাবারে কর্ণ ধারণ করিলেন? ভারতের এই সার্ব্বজনিন অস্থিরতায় কাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল? নিরব নিস্পন্দ নির্জ্জীব ভারত কি এককালে নবীরশূন্য হইয়াছে? বিশ্ববিজয়ী ধনঞ্জয়! অতুল্যকীর্ত্তি দেব দাশরথি! একবার দিব্যচক্ষে চাহিয়া দেখ, তোমাদিগের লীলানিকেতন পুণ্যভূমি ভারতভূমি যবনের পুনঃপুনঃ সংঘর্ষণে, নিষ্ঠুর উৎপীড়নে, নির্দ্দয় নিষ্পেষণে, পাপের আকর হইয়াছে, নরকের প্রতিকৃতি হইয়াছে, পিশাচের আবাস হইয়াছে। কিন্তু হায় বৃথা প্রলাপ! দেবতারা কি এই নরক দৃশ্যে কটাক্ষ করিবেন? যে দৃশ্য রক্তমাংসধারী মানবের অসহনীয় তাহা কি দেবতার সহনীয় হইতে পারে? তবে কি এই ঘোর আহবে উপায়ন্তর নাই! আছে। এখনও রত্নপ্রসবা ভারত একবারে রত্নশূন্যা হয় নাই। ঐ দেখ মুমূর্ষু ভারতের কাতর ক্রন্দন শত শত গিরি নদী অতিক্রম করিয়া নিবিড় নিস্তব্ধ গহন কানন ভেদ করিয়া উদয়পুরে প্রবেশ করিল।

রাজপুতকুলগৌরব বাপ্পা-বংশধর মহারাণা রাজসিংহ মিবার সিংহাসন আলোকিত করিতেছেন; বীরহৃদয় স্বদেশপ্রেমে জাগরিত হইল, করুণায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল; জননী জন্মভূমির শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে রাজসিংহের ন্যায় বীরপুরুষ কি উদাসীন থাকিতে পারেন? বীরহৃদয় বৈদ্যুতিক বলে বলীয়ান্ হইল, অনন্ত করুণায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রতিজ্ঞা করিলেন যেরূপে পারি যবন অত্যাচারের প্রতিবিধান করিব। যদি ধন মান প্রাণ এই মহৎ ব্রতে পর্য্যবসিত হয়, যদি পিতামহ প্রতাপসিংহের ন্যায় এই মহোচ্চ সাধনায় বৈরাগ্য ব্রতে ব্রতী হইতে হয় তাহাও শ্লাঘ্য বলিয়া মানিব। হৃদয়ের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়াও স্বদেশরক্ষার্থ যত্নবান হইব। বীরের হৃদয় অটল অচল। তিনটী দুর্ব্বিসহ অত্যাচারের প্রতিবিধানে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষিত হইল। বলপূর্ব্বক প্রভাবতী পরিণয়, যোধপুররাজ উদয়সিংহের শিশু কুমারের প্রাণ সংহার

ষড়যন্ত্র এবং ঘৃণিত অবমানকর জিজিয়া প্রবর্ত্তন। রূপনগরের সামন্তরাজ বিক্রম সোলাঙ্কির প্রভাবতীনাম্নী পরম রূপবতী দুহিতা ছিল। কন্যার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের প্রশংসা সমস্ত ভারতে প্রতিধ্বনিত হইল। ভোগবিলাসের ক্রীতদাস যবন সম্রাট এ সংবাদে কি স্থির থাকিতে পারে? দুর্দ্দমনীয় রূপলালসা তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল।

কুক্ষণে দিল্লীর সিংহাসন যবনের করায়ত্ত হইয়াছিল; কুক্ষণে ভারতী সতী সৌন্দর্য্যের আধার সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সৌন্দর্য্যের অদম্য প্রলোভনে রূপতৃষ্ণার প্রবল পিপাসায় অত্যাচারী কামচারী যবন সম্রাট্ কত সময় কত মহানর্থ সংঘটন করিয়াছে, এই সৌন্দর্য্য পিপাসাতেই চিতোরের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; জয়পুরপতির জাতি গিয়াছে; কমলাবতী সতীত্বভ্রষ্টা হইয়াছে, অধিক কি মুসলমান-কুল-গৌরব আকবর ভূপতিও এই অদম্য জঘন্য রূপলালসা সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কূট কল্পনা নৌরোজাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ভারতের ললনাকুল যদি এইরূপ অতুল্য রূপের আকর না হইত, ভারতের প্রকৃতি যদ্যপি রত্নগর্ভা এবং প্রকৃতির প্রীতিভূমি না হইত, তাহা হইলে হয়ত আমরা পাষণ্ড যবনের পাশব অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতাম না। তাহা হইলে হয়ত আজি ম্লেচ্ছপদে দলিত হইয়া দুঃখ দরিদ্রতা মস্তকে বহন করিতে হইত না। সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকিতে হইত না। অনন্ত সুখের ধন স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া পরপদ লেহন করিতে হইত না। অহো বিড়ম্বনা! যে জাতি সভ্যতার উচ্চশিখরে সমারূঢ় হইয়া জ্ঞান ধর্ম্মে উদ্ভাসিত হইয়া বিপুল বিক্রমে ধরণী শাসন করিয়াছে, বেদ যাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, ভারত যাহাদের ইতিহাস, রামায়ণ যাহাদের কাব্য, ব্যাস যাহাদের বৈজ্ঞানিক, ভীমার্জ্জুন রামচন্দ্র যাহাদের বীর, বুদ্ধ চৈতন্য যাহাদের ধর্ম্মপ্রচারক, আজি সেই জাতি দীন হীন কাঙ্গালীর ন্যায় পরমুখাপেক্ষী! কোন্ দোষে কোন্ মহাপুরুষের অভিশাপে এই শোচনীয় দশা! আজ যদি ভারত-প্রকৃতি, রত্নপ্রসবা না হইয়া নগণ্য বন্ধুর পাষাণস্তূপ পরিবৃত্ত অনুর্ব্বর হইত তাহা হইলে হয়ত আমরা স্বাধীনতার স্বর্গীয় সুখে অধিকারী হইতে পারিতাম, দীন হীন কাঙ্গালীর ন্যায় পথের ভিখারী না হইয়া স্বাধীন বিহঙ্গের ন্যায় যথেচ্ছ সুখে বিচরণ করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রকৃতি ভারতের প্রতি প্রীতিনেত্রে অবলোকন করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। এই প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াই দুরবগাহ অনতিক্রম্য হিমালয় অতিক্রম করিয়া মুসলমানরা ভারতে আসিয়াছিল। এই প্রলোভনে অন্ধ হইয়াই অনন্ত সমুদ্রলহরী অগ্রাহ্য

রিয়া ইউরোপীয়দল দলে দলে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

রূপনগরকুমারীর লাবণ্যলীলা সর্ব্বস্থানে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিলে সম্রাট্ দীল্লির রত্নভাণ্ডারে এ মহামূল্য রত্ন সংস্থাপনে সযত্ন হইলেন। অচিরে রূপনগরে দূত প্রেরিত হইল।

সোলাঙ্কিপতি ভয়ে বিস্ময়ে মুহ্যমান হইলেন। সম্রাটের প্রার্থনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কাহার সাধ্য। তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র ভূপতি আরাঞ্জিবের বিরুদ্ধে উত্থান করিবে? বিশেষতঃ তৎকালে সম্রাট্ করে দুহিতা অর্পণ গৌরবের আস্পদ বিবেচিত হইত। রূপনগরপতি দুহিতার নিকট এই অসম্বদ্ধ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ক্ষত্রবালা পিতৃমুখে এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আরক্তমুখী হইলেন; সদর্পে সাহঙ্কারে সম্রাটদূতের সাক্ষাৎকারে বিজাতীয় ঘৃণার সহিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন আপনি পিতা, মহাগুরু; আপনাকে আর অধিক কি বলিব; যেদুরাত্মা দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া এই অনুচিত প্রার্থনা করিয়াছে, বামন হইয়া চন্দ্রের আশায় হস্ত বিস্তার করিয়াছে. চণ্ডাল হইয়া দেবভোগ বাঞ্ছা করিয়াছে তাহার মস্তকে আমি এই বামপদ প্রদান করি। এই বলিতে বলিতে লাবণ্যময়ী চার্ব্বঙ্গী বালা দেখিতে দেখিতে ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তাঁহার আরক্ত নয়নে অনলকণা ঝলসিয়া উঠিল। যে স্থির সৌদামিনী এতক্ষণ প্রকৃতির লীলাময়ী লাবণ্যরাশি বলিয়া অনুমিত হইতেছিল মুহূর্ত্তে তাহা ভীষণা হইয়া উঠিল। এ মূর্ত্তি অবলোকন করে কাহার সাধ্য? মুসলমান দূত পতঙ্গবৎ থরথর কাঁপিতে লাগিল। বীরবালা যেন অনলমালা-পরিবৃত দেববালা অনুমিত হইতে লাগিল।

চামুণ্ডার এই মার্ত্তণ্ডমূর্ত্তি সোলাঙ্কির ও ভীষিকা উৎপাদন করিল। তিনি সত্রস্তে কহিলেন মাতঃ! মূর্ত্তি সম্বরণ কর। সম্রাটদূতের অবমাননা করিও না। পিতৃবাক্যে প্রভাবতীর রোষানল শতগুণে প্রবল হইয়া উঠিল? বিদ্যুদ্দামবিস্ফুরিতাধর বিকম্পিত হইল, ধীরে ধীরে বাক্যবাণে পিতৃহৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পিতঃ! সম্রাটদূতের অবমাননা এই ভীরু কাপুরুষোচিত বাক্য কি বাপ্পারাওলের বংশধর বীর বিক্রমসিংহের মুখে শোভা পায়? বিধর্ম্মী যবন, দেশবৈরী দেববিদ্বেষী যবন আপনার প্রভু শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যে দুরাচার স্পর্দ্ধিত বিক্রমে পরবনিতায় প্রলোভন প্রকাশ করিল; সে যদি আপনার সম্রাট তবে শত্রু কে? আপনি দেশপতি বিলাসী, আপনার বিলাসবাসনার ইয়ত্তা নাই। পূর্ব্বপুরুষের, রাজপুতকুলের অক্ষয়কীর্ত্তির অনুসরণে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ যদি আপনার ইচ্ছনীয় না হয়, সম্রাটের শরণ লইয়া সুখে সম্পত্তি সম্ভোগ করুন,

আমি দুঃখিনী অবলা, সুখভোগের বাঞ্ছা করি না। ক্ষত্রবালার পরিণাম সম্বলও সম্যক অবগত আছি; স্ত্রীজাতি বলিয়া যুদ্ধে অক্ষম নহি। সহস্র যবনের শ্মশ্রুল শির এই শাণিত ছুরিকায় বিচ্ছিন্ন করিব। অবশেষে স্বীয় বক্ষ বিদ্ধ করিয়া চরমে পরম গতি লাভ করিব। বলিতে বলিতে রণরঙ্গিনী বিদ্যুদ্বেগে কক্ষনিহিত শাণিত কৃপাণ বাহির করিলেন, হিরকখচিত শাণিত অস্ত্র সূর্য্যকিরণ উদ্গিরণ করিতে লাগিল।

সোলাঙ্কিরাজ তনয়ার গর্ব্বিত ভর্ৎসনায় ক্ষোভে রোষে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং পরক্ষণই সাহঙ্কারে দূতের প্রতি বলিতে লাগিলেন দূত! তোমার সেই অত্যাচারী ভূপালকে বলিও বিধর্ম্মী যবন আমাদের সম্রাট্ নহে। আমরা রাজপুত্র। রাজপুত্র যুদ্ধে আশঙ্কা করে না। অত্যাচারী যবনের অনুচিত অনুরোধ ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করিলাম। যাও তাহাকে সজ্জিত হইয়া আসিতে কহ। সোলাঙ্কির দেহে প্রাণ থাকিতে এ অপরাধ বিস্মৃত হইবে না। যেরূপে পারি যবনশোণিতে ধরাতল অভিষিক্ত করিব।. যবনদূত অভিমানে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডবং দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কূটবুদ্ধি আরাঞ্জিব অচিরে বৃহদ্বাহিনী প্রস্তুত করিয়া রূপনগরে প্রেরণ করিলেন। প্রভাবতীর অপহরণ এবং রূপনগরের উচ্ছেদ সাধনই এই নির্য্যাণের উদ্দেশ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত-বৃত্তান্ত।

প্রথম সর্গ।

(মৎস্যগন্ধা।)

(বঙ্গীয় কবিকুলকেশরী মাইকেল মধুসূদনদত্ত বিরচিত)

"চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে সৃজিলা, —
কিহেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর! না পারি নড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরীবন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভূমিতলে!
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?
না বসে গুঞ্জরি অলি, শিলীমুখ যথা
শ্বেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে!

দেবদানবীয়ং *

মহাকাব্য;

প্রথম সর্গ।

(মহাকবি মাইকেল মধুসূদনদত্ত বিরচিত)

কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি,
কহো কি ছন্দঃ পছন্দ দেবি!
কহো কি ছন্দো মনানন্দ দেবে,
মনীষিবৃন্দে এ সুবঙ্গদেশে?

তোমার বীণা দেহ মোর [illegible];
বাজাইয়া তায় [illegible]
অমৃত[illegible] নব [illegible] বাণী
দেহো জননি গো [illegible] এ দেশে॥

তত্ত্ববিদ্যায় নাস্তিকতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হিন্দুদিগের মধ্যে নাস্তিকতা-পর্ক্ষে চার্ব্বাক-দর্শন, তৎপূর্ব্বগত বৃহস্পতিসূত্র, তৎপূর্ব্বগত রামায়ণস্থ জাবালির উক্তি দৃষ্ট হয়। জাবালির উক্তি রামায়ণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। জাবালি রামকে বুঝাইতেছেন,—

"রাম, তুমি সুবুদ্ধি এবং তপস্বী, সামান্য মানবের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য প্রতিপালন বিষয়িণী বুদ্ধি নিরর্থক না হউক। কিন্তু পিতা পুত্র সমস্তই মিথ্যা; এ জগতে কে কাহার বন্ধু, কাহার দ্বারা কোন পুরুষ কি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, আর একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব ইনি মাতা, ইনি পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্তবৎ জ্ঞান কর, কেহই

পাঠকগণ হ্রস্ব দীর্ঘের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই পদ্যটী পাঠ করিবেন।

* পঞ্চকোটের রাজার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মাইকেল মধুসূদন দত্তজ যখন পুরুলিয়ায় অবস্থান করেন, তৎকালে সংস্কৃত দীর্ঘচ্ছন্দে লিখিত এক বাঙ্গালা কাব্য তাঁহার হস্তগত হয়। ঐ কাব্যের উপর কটাক্ষ করিয়া, দত্তজ "দেবদানবীয়ং" লিখিতে আরম্ভ করেন। সমাপ্ত হইলে, মহাকবি-বিরচিত হাস্যরসোদ্দীপক এই কাব্যরত্ন বাঙ্গালা-সাহিত্যভাণ্ডার উদ্ভাসিত করিত।

খুলনার নৈহাটী }

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

কাহারও নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে গমন করত কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরদিন সেই আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, তেমনি পিতা মাতা গৃহ ধন সম্পত্তি মনুষ্যগণের আবাস মাত্র। হে কাকুৎস্থ! সজ্জনগণ এ বিষয়ে সংসক্ত হয়েন না।" পুনশ্চ,

"দশরথ তোমার কেহই নহেন, তুমিও তাঁহার কেহই নও, রাজা স্বতন্ত্র তুমি স্বতন্ত্র, অতএব আমি যাহা কহিতেছি তাহাই কর। পিতা জীবগণের বীজ, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ মাত্র, ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই উৎপাদনের কারণ, অর্থাৎ তাহাতেই ইহলোকে পুরুষের জন্ম হয়। সেই নৃপতি যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? ভূত সকলের স্বভাবই এইরূপ, কিন্তু তুমি পুরুষার্থ ভোগে নিস্পৃহ হইয়া বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদিরূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে তৎপর হয়, আমি তাহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি; অন্যের জন্য শোক করি না, কেন না তাহারা ইহলোকে দুঃখভোগ করিয়া জীবনান্তে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টকা প্রভৃতি পিতৃদৈবত্য শ্রাদ্ধ করিতে যে লোকে প্রবৃত্ত হয়, সে কেবল নিজ ভোগ সাধন অন্নাদির হেতু; দেখ মৃত ব্যক্তি কি ভোজন করিবে? এই স্থানে অপরের কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে গমন করে, তবে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া অন্নদান করুক, কৈ এরূপ করিলে তাহাতে ত পথিকের পাথেয় হয় না। দেবপূজা কর, অন্নদান কর, যজ্ঞে দীক্ষিত হও, তপস্যা কর এবং সন্ন্যাস অবলম্বন কর, এই সকল দানের বশীকরণোপায় স্বরূপ বেদাগমাদি গ্রন্থ মেধাবী ধূর্ত্তগণ স্বার্থসম্পাদন কারণ ও পামরগণ বঞ্চনা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। হে মহামতে! ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্ম্মাদি কিছুই নাই, তুমি নিজ বুদ্ধিতে ইহা বিজ্ঞাত হও, যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহাই অনুষ্ঠান কর, আর অনুমানাদিগম্য পরোক্ষকে পরিত্যাগ কর।"১—অঘোরনাথ তত্ত্বনিধির অনুবাদ। উপরে উদ্ধৃত অংশ যথার্থই বাল্মীকির লেখনীনিঃসৃত কি না, সে মীমাংসা স্বতন্ত্র। সে মীমাংসার স্থান এখানে নহে।

এক্ষণে বৃহস্পতিসূত্রের বুদ্ধিযোগে তর্কসমুদ্র মন্থনের ফল দেখা যাউক। "কামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ" কামশাস্ত্রানুসারে অর্থ এবং কামই পুরুষার্থ। চার্ব্বাকমতে "অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ" অঙ্গনা-আলিঙ্গনাদি জন্য যে সুখ, তাহাই পুরুষার্থ। বৃহস্পতিসূত্র হিন্দুনাস্তিক-

১। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮ সর্গ।

গণের বেদস্বরূপ। হিন্দুদিগের মধ্যে সকল আস্তিক তত্ত্ব যেমন বেদের দোহাই দিয়া থাকে, তেমনি সকল নাস্তিক তত্ত্ব বৃহস্পতিসূত্রের দোহাই দেয়। এখন দেখ বৃহস্পতির শেষ শিক্ষা কি, ২—"স্বর্গও নাই, অপবর্গও নাই, পরলোকগামী আত্মাও নাই। বর্ণ ৩ আশ্রমাদির ফলদায়িকা যে কোন ক্রিয়া তাহাও কিছুই নাই। অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, দণ্ডধারণ, ও ভস্মগুণ্ঠন, এ সকল বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। জ্যোতিষ্টোমে নিহত পশু যদি স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কি জন্য আপন পিতাকে সেইরূপ হিংসা না করিয়া থাকে? যে সকল জীব মৃত, শ্রাদ্ধ যদি তাহাদের তৃপ্তির কারণ হয়, তবে এখান হইতে দূরগামী ব্যক্তির পাথেয় কল্পনা করার আবশ্যকতা কিছুই নাই। এখান হইতে কৃত দানে যদি স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ হয়, তবে এখানে প্রদত্ত দ্রব্যে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ না হইবে কেন? অতএব সে সকল কোন কাজের কথা নহে। যতকাল বাঁচিবে, সুখে কাটাইবে, এবং ধার করিয়াও যদি ঘৃতাদি সুখকর দ্রব্যাদি খাইতে হয় তাহাও খাইবে, কারণ এই দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে আর তাহার ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। যদি আত্মা এই দেহ পরিত্যাগে পরলোকে যাইতে পারে, তবে কি জন্য বন্ধুস্নেহসমাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ না আইসে? মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্যের আর কোন অর্থ দেখিতে পাই না, কেবল এক ব্রাহ্মণের জীবনোপায় বলিয়াই বিহিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ধূর্ত্ত ভণ্ড নিশাচর, এই তিন জন বেদের কর্ত্তা।"

চার্ব্বাক কেবল উক্ত মত, প্রমাণাদি প্রয়োগ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন মাত্র। ইহার মতে ভূত চতুর্ব্বিধ, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুত। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সংযোগে মদ বলিয়া বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট বিভিন্ন একটী পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগেও তেমনি চৈতন্যের উদয় হয়; আবার সেই সংযোগ ভাঙ্গিয়া গেলেই চৈতন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাতে পরলোক বা প্রেত সংস্কার কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহে, দেহের অতিরিক্ত যে আত্মা আছে সে পক্ষে প্রমাণাভাব, সুতরাং তাহা অসিদ্ধ।

২। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ধৃত বৃহস্পতি বাক্য।

৩। নাস্তিকদিগের পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, এবং স্বীকারও করে না। বর্ণাশ্রমাদি যে সিদ্ধ নহে, নাস্তিকের তদ্বিষয়ক কারণ বা বিচার নৈষধকার চার্ব্বাকের মুখ দিয়া এরূপে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"শুদ্ধিবংশদ্বয়ী শুদ্ধৌ পিত্রোঃ-
পিত্রোর্যদেকশঃ।
তদনন্তকুলাদোষাদদোষা জাতির-
স্তিকা।
—নৈষধ ১৭ সর্গ।

প্রমাণ একমাত্র যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই গাহ্য; অনুমানাদি প্রমাণ নহে। ইহার মতে ইষ্টানিষ্ট বা অদৃষ্ট নাই, জগদ্বৈচিত্র আকস্মিক এবং স্বভাব হইতে উৎপন্ন। অঙ্গনা-আলিঙ্গনাদি জন্য সুখ প্রাপ্তিই একমাত্র পুরুষার্থ, মানব তাহারই অনুসরণ করিবে। সুখ প্রাপ্ত হইতে হইলে দুঃখও অপরিহার্য্য, যেহেতু সকল বস্তুই সুখদুঃখসম্ভূত। কিন্তু তাই বলিয়া সুখানুসরণে শান্ত হইবে না। তাহা এইরূপ উপমা দ্বারা দেখাইতেছে,—যেমন মৎস্যে শল্ক কণ্টকাদি আছে, তাই বলিয়া কি মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে; অথবা ভিক্ষুকে জ্বালাতন করে বলিয়া কে অন্ন দ পাক করিয়া না খায়, ইত্যাদি। যদি কোন ভীরু দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করে, তবে সে পশুবৎ মূর্খ। “যদি স্বশিষ্টং জীবদৃষ্টং সুখং তাতেহর্হ সংসম্বন্ধা থা ভবেৎ।”

অতঃপর শ্রীকমলাশিবচূড়ামণি এপিক্যুরসের নাস্তিকতার মতগুলির কোন কোন অংশ, অগ্রে দিওগিনীস লেওর্টিয়স হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

“যাহা তৃপ্তিকর এবং ধ্বংস হয় না, যাহা স্বয়ং ক্লেশকর নহে বা অন্যের পক্ষেও ক্লেশকর হয় না, আরও যাহা অন্যের ক্রোধ বা অকৃতজ্ঞতার কারণোদ্দীপক হয় না, তাহাই পরম পুরুষার্থ ও প্রকৃত সুখ পদার্থ স্বরূপ।

“মৃত্যু কিছুই নহে; কারণ যাহার ধ্বংস হয় তাহার অনুভবশক্তি রহিত হইয়া থাকে, যাহার অনুভবশক্তি রহিত হয়, তাহা অবশ্যই আমাদিগের নিকট কিছুই নহে।

“ন্যায়সঙ্গত ভাবে, সততা ও বিজ্ঞতার সহিত না চলিলে, প্রকৃত সুখসম্পৃক্তরূপে জীবনাতিবাহন করা অসম্ভব, অথবা প্রকৃতরূপে সুখসম্পৃক্তরূপে জীবনাতিবাহন করিতে গেলে, ন্যায়সঙ্গত, সততা এবং বিজ্ঞতার সহিত না চলা অসম্ভব। যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত ভাবে ও সততা এবং বিজ্ঞতার সহিত না চলে, সে কখন সুখী হইতে পারে না।

“যে কোন প্রকারে উৎপন্ন সুখ বস্তুতঃ মন্দ নহে; কিন্তু যে যে কারণ যোগে সেই সুখের উৎপত্তি হয়, তাহার আনুষঙ্গিক ব্যতিক্রমগুলির প্রাচুর্য্য হেতুই তাহা দূরণীয় হয়।

“কেবল মনুষ্য-সম্ভব ও সাধ্য সুখকর বস্তু আয়োজন করিতে পারিলেই যে সুখী হইয়া থাকে এমন নহে; যে পর্য্যন্ত পরলোক, নরক, ও অপরাপর অদৃষ্টশক্তি হইতে ভয়ের নিরাকরণ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সুখের সম্ভাবনা অতি অল্পই।

“অপরিমিত ক্ষমতা এবং ধনে, মনুষ্য সম্বন্ধে মানবকে কিয়ৎ পরিমাণে নিঃশঙ্ক করিতে পারে বটে; কিন্তু সর্ব্ববিষয় সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক ভাবের জন্য আকাঙ্ক্ষার শান্তি ও আত্মার শান্তির আবশ্যক হইয়া থাকে।

"জ্ঞানী ব্যক্তি যাহারা তাহারা প্রায়ই সৌভাগ্য দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের মনীষাশক্তি তাহাদিগকে যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট রত্ন সকল নিয়ত প্রদান করে, তাহাই তাহারা সর্ব্বদা সম্ভোগ করে এবং আজীবন করিতে থাকিবে।

"যে ব্যক্তি ন্যায়পথগামী সে সর্ব্বত্রই স্বাধীন, এবং সর্ব্বদাই সর্ব্বলোক সমক্ষে শান্তি ভোগ করিয়া থাকে। অন্যায়কারী যে, সর্ব্বদাই সে তদ্বিপরীত ভাবের নিকট শঙ্কিত হয়।

"আমরা যুক্তিশক্তির সহায়তায় শরীরের পরিণাম এবং ধ্বংস নিরাকরণ করিয়া, পরলোক বা অনন্ত সম্বন্ধীয় ভীতি হইতে যদি মুক্ত হই এবং পরলোকের সম্বন্ধ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে এই জীবন যে কোন প্রকার সুখানুভব ও সুখ পদার্থের সংগ্রহে পারক হয়। মনের ভাব এইরূপ অর্থাৎ ভয়শূন্য করিতে পারিলে মানব, তাহার ক্লেশ জীবনের ক্ষয়করীরূপে যন্ত্রণাদায়ক হইলেও, তাহার মধ্যে সুখী হইতে পারে; এবং এরূপ অবস্থায় যে মৃত্যু তাহা কেবল সুখজীবনের সীমাপ্রাপ্তি বা নিবৃত্তি ভিন্ন কিছুই নহে।

"'ন্যায়' ভাবের বস্তুত কোন অস্তিত্ব নাই; ইহা পরস্পর লৌকিক অঙ্গীকার হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্লেশবিদ্ধ হইতে না হয় এরূপ অর্থেই সংঘটন হইয়া থাকে।

"'অন্যায়' ভাব বস্তুত মন্দ নহে; তবে ইহা মন্দ এই জন্য যে ইহার সঙ্গে এরূপ ভয় সংযোজিত আছে যে, যাহারা অন্যায় নিবারণে নিয়োজিত তাহাদের দ্বারা ধৃত হওন ও শাস্তিপ্রাপ্ত হওন হইতে পলাইবার সম্ভব নাই।

"অমুক বিষয় করিব না; পরস্পরের অহিতকর বা ক্লেশজনক অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না; পরস্পরের সহ যে এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া যায়, কোন মানব গোপনে গোপনে তাহার অন্যথাচরণ করিবে না বা তাহা করা উচিত নহে। কারণ, যদিও সে সহস্রবার এরূপ করিয়া সহস্রবার ফাঁকি দিতে সক্ষম হইয়াছে, তথাপি এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় যে সে বরাবর ফাঁকি দিতে সক্ষম হইবে, যেহেতু তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবিতকালে সে যে কখন ধরা পড়িবে বা পড়িবে না তাহার স্থিরতা নাই।

"যে সর্ব্বজনসমক্ষে নিঃশঙ্ক ভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করে, সে সকলেরই সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিবে। যাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্ভব নহে, অন্তত তাহাদের সহ শত্রুতা যাহাতে পরিহার হয় সেরূপ করিয়া চলিবে। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে আত্মস্বার্থ বজায় রাখিয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সংস্রবে আসিবে না।

"সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুখী

যে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, যথায় পার্শ্ববর্ত্তী কোন বিষয় হইতেই তাহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এরূপ লোক পরস্পরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস বুদ্ধি সহ, পরস্পরের বন্ধুত্ব সুখ পূর্ণ ভাবে ভোগ করিয়া, অথচ কোন বন্ধুর অকাল মৃত্যু হইতে শোকসন্তপ্ত না হইয়া, সমজন সহ সৌহার্দ্দ সুখে সম্পৃক্ত ভাবে জীবনাতিবাহন করিয়া থাকে।"

আমূলত পর্য্যালোচনায় দেখা যাইতেছে যে এপিকুরসের প্রবর্ত্তিত তত্ত্বের মূলমন্ত্র ভয়। কি লৌকিক কি পারলৌকিক যাবতীয় প্রকারের ভয়ের নিরাকরণ করিয়া, ইহলৌকিক সুখাদি যথাসম্ভব উপভোগ করাই পরম পুরুষার্থ। অন্যান্য নাস্তিকগণ, পরলোকবুদ্ধিকে একবার উড়াইতে পারিয়া, বাঁধা ঘোড়ার বন্ধনবিহীনতার ন্যায় যেমন একেবারে দিগ্বিদিক্‌শূন্য হইয়া ছুটিয়াছে; এপিকুরসে,যদিও সে পরলোক নিরাকৃত এবং ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান মূলশূন্য, তথাপি সে স্বাধীনত্ব ও যথেচ্ছাচারী ভাব তেমন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাহার কারণ, ইহার পরলোকের প্রতি ভয় এমন যে, তাহার নিরাকরণ করিতেই অবসর পর্য্যবসিত হইয়াছে, তদতিরিক্তে উন্মাদিত হইতে আর অবসর পাইয়া উঠেন নাই। চিরভয়শূন্য গ্রীকচিত্তে, পরলোকবোধের সহসা আগমিত নববুদ্ধি এতই ভয় সঞ্চালনে সমর্থ হইয়াছিল!—অনভ্যাস মধ্যে সহসা অভ্যাস সাধারণত অপেক্ষা সহজেই কিছু উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এপিকুরসের ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ সত্য অসত্য ইত্যাদি ভাল মন্দ, কেবল ভয়ের কারণ ও তদনাকর হইতে গঠিত। দেখা যাইতেছে যে ইহার মতে সুখ যাহা তাহা ভয়ের নিরাকরণে, দুঃখ যাহা তাহা ভয়ের আধিক্যে। ভয়ের বিনাশ নিমিত্ত বন্ধুত্বের প্রয়োজন; এবং লোকাতীত ভয়ের দূর করার জন্য নাস্তিকতা-জ্ঞানের আবশ্যক। এপিকুরস বোধ হয় নিতান্তই ভয়ভ্রান্ত ছিলেন। দুঃখের নিরাকরণ করিতে গিয়া বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ; আর ভয়ের নিরাকরণ করিতে গিয়া এপিকুরসের নাস্তিকতা। যতদূর অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, এপিকুরসের জীবন অপেক্ষাকৃত নীতিসম্পন্ন ছিল, এবং মৃত্যুকেও ইনি সহাস ও সদানন্দ চিত্তে আলিঙ্গন করেন। ইহার পরবর্ত্তী শিষ্যবর্গে আর সেরূপ ভাব থাকে নাই; তাহারা বহু পরিমাণে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিল।

এপিকুরস কহিয়া থাকেন, এই বিশ্ব অনন্ত; পরমাণু সংযোগে নির্ম্মিত। পরমাণু অনন্ত বিভাগে বিভাজ্য নহে, কেবল ইহার গুণের পরিবর্ত্তন সম্ভব। পৃথিবী একটা নহে,বহুতর এবং অসংখ্য। পরমাণু অবিরত গতিশীল; সেই গতিযোগে এবং পরস্পর সংযোগে রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরাদি বলিয়া আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা ঐরূপ

রূপবিশেষ। শ্রবণ ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থগুলি, বহির্জগৎস্থ পদার্থনিচয়ের সহ ইন্দ্রিয়-পদার্থ সমগুণ-ধর্মাদি বিশিষ্ট হওয়ায়, তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাতে, সম্পাদিত হয়। চৈতন্য ও জ্ঞান যাহা, তাহা শরীরের অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি সূক্ষ্ম পরমাণুর সূক্ষ্ম সমাবেশ হইতে উৎপন্ন হয়। উহা যথায় যে প্রকার ও যে পরিমাণে সমাবিষ্ট, তথায় সেই রূপ বিভিন্ন ভাব ও স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে; এবং ইহা হইতে মানব বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। ঐ পরমাণুর ক্রিয়াশক্তি সকত্র দেহের সঙ্গে সম্বন্ধবান, এজন্য তাহার যে কিছু কার্য্য তাহা সমস্ত শারীরিক ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিয়া থাকে। আবার ঐরূপ শরীর-কার্য্য যাহা তাহা আত্মাকে স্পর্শ করে, এজন্য পরস্পর পরস্পরের সুখে ও দুঃখে সুখদুঃখবান্। দেহের সহ আত্মা ও চৈতন্যের ধ্বংস হয়। এই জীব ও চৈতন্যাদির বীজ অন্য কোন পৃথিবী বা অনন্ত গর্ভ হইতে যে পৃথকরূপে আনীত ও নিহিত হইয়াছে এরূপ নহে। এই পৃথিবীতে সে বীজ নিহিত এবং এই পৃথিবী হইতে স্বতঃই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শনে মানব বিস্ময়রসে মগ্ন হইয়া এবং তাহা-দিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট রূপে কল্পনা করিয়া, তাহাদিগের উপর দেবত্ব ভাব আরোপ করে; এবং এইরূপে লোকাতীত শক্তি ও স্বর্গ নরকাদির ভয় মানবের মনে বদ্ধমূল হয়। এক্ষণে এপিকুরাস দেখাইতেছেন যে, মানব এইরূপ আপনার কল্পনা হইতে উত্থিত ভয়ে আপনি আবদ্ধ হয়, নিজের অসুখের কারণ নিজে উৎপাদন করিয়া থাকে।

ঈশ্বর ও দেবতাবর্গ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, যদি তাহাদের প্রতি বিশ্বাসের অবলম্বনে জীবন নীতিপথে অতিবাহিত করিতে পার, ও উপাসনা ও অর্চ্চনাদি দ্বারা পরলোকের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাও, তাহা হইলে সেই দেবতত্ত্ব কল্পিত হইলেও, তাহাকে অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বরং দেবতায় বিশ্বাস করা ভাল, তথাপি প্রাকৃতিক তত্ত্বদর্শীর অপরিহার্য্য ও অনতিক্রম্য অপরিণামদর্শী হিতাহিতজ্ঞানশূন্য প্রয়োজনজালে জড়িত হওয়া ভাল নহে। এপিকুরস বলেন যে যদি দেবতা ও ঈশ্বর বিশ্বাস করিতে চাও, তবে যতদূর পবিত্র ও দিব্য বিভূতি ঐ দেবতত্ত্বজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করিতে পার ততই প্রার্থনীয়। যে দেবচরিত্রে সকলে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাতে অবিশ্বাস করা তত দূষণীয় নহে; যত সাধারণ লোকে তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের অনুকরণে দেবচরিত্রে যে অপকৃষ্ট বিভূতি আরোপ করিয়া থাকে তাহা। ফলত এপিকুরসের উদ্দেশ্য, যে কোন পদার্থ আদর্শ করিয়া হউক, নৈতিক ভাবে ও সুখে জীবনাতিবাহন ও পরলোকের প্রতি ভয়শূন্য হওন মনুষ্যজ্ঞানের মুখ্য ফল

হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বলিতেছেন,—যুবাও যেন ইহার অনুসরণ করিতে মনে না করে যে তাহার এখনও সময় আছে, অথবা বৃদ্ধও যেন এমন মনে না করে যে তাহার সময় নাই। আত্মার শিক্ষাকল্পে কোন সময়ই অযোগ্য বা প্রতিকূল নহে।*

অন্যান্য নাস্তিক তত্ত্ববিদ্‌দের ন্যায় এপিকুরাসও প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী। পরমাণু সকলের সংযোগে রূপের সঞ্চার হয় ও তাহাতেই সৃষ্টি প্রকাশমান হইয়া থাকে। পরমাণু অবিরত গতিশীল, এজন্য তাহাদের সংযোগজাত রূপ যাহা, তাহাও অনবরত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই 'রূপ' কতক অংশ পরমাণু বিক্ষেপ দ্বারা যে প্রতিভাস রাখিয়া যাইতেছে, ও আমাদের শরীর সমগুণধর্ম্মী হওয়ায় যে প্রতিভাস সেই শরীরে পতিত হইবাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতেছে, তাহাই একমাত্র প্রমাণস্বরূপে বিচারস্থলে অবলম্বিত হওয়া উচিত। চিত্তবৃত্তি সকলের অনুভূত বিষয়ও প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু অগ্রে তাহার প্রামাণাভাব রূপপ্রতিভাস-জনিত জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। যদি সে পরীক্ষায় তাহা টিকে, তবেই তাহা প্রমাণ; নতুবা ভ্রমের কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রম প্রধানত এই দুই কারণে উৎপন্ন হয়, প্রথম যখন এরূপ বিশ্বাস থাকে যে আমার এই মত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত অবশ্যই হইবে; এরূপস্থলে যখন প্রমাণ পদার্থ না পাওয়া যায়, তখন আমাদের কল্পনা বা চিন্তাশক্তির প্রবর্ত্তনা সেই অভাব পূরণের সহায়তা করিয়া থাকে। সেই প্রবর্ত্তনা যদিও মূলে কোন রূপপ্রতিভাস সংস্রবে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু পরে তাহার আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রূপ-সংস্রব না থাকায় ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, যেরূপ রূপপ্রতিভা প্রত্যক্ষ এবং অনুভূত হইতেছে, চিন্তাশক্তি যখন তাহাকে তাহার অতিরিক্ত বুদ্ধিতে লইয়া যায়। যে কোন বিষয় এইরূপ প্রকারের প্রমাণ গ্রহণ ও ভ্রম নিবারণ পূর্ব্বক যুক্তিদ্বারা স্থাপিত করিলে, তাহাই যথার্থ সত্য স্বরূপ হয়।

আশ্চর্য্য! মানব কি সামান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া কি গুরুতর বিষয় সকল মীমাংসা ও নিরাকরণ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। প্রতি কালপরিবর্ত্তনে প্রতি দর্শনবর্ণিত মতাদি অকর্ম্মণ্যতায় পড়িয়া যাইতেছে, অথচ প্রতি দার্শনিক ভাবিয়া থাকে আমি যাহা করিলাম, ইহা অভ্রান্ত এবং সর্ব্বকামপ্রদ। না হইবে কেন, নিত্য শত শত লোক মরিতে দেখিয়াও যে মানব আপনাকে অমর বলিয়া জ্ঞান করে, সে মানবচিত্তের পক্ষে স্বকৃত মত যে অভ্রান্ত এবং সর্ব্বকামপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

*এপিকুরাস হইতে মিনিকিওসের নিকট পত্র।

নাস্তিক তত্ত্ব-বিদ্যার ভাল মন্দ ভেদ অতি অল্পই, ইহা ফলে সর্ব্বত্রই সমান, এবং শিষ্যবর্গ সর্ব্বত্র পরিপক্ক ষণ্ডা হইবার কথা। নাস্তিকতার গুণ এমনি যে মানবকে পাষণ্ড হইতেই হইবে!—এপিকুরসের সংশিক্ষা সত্ত্বেও এপিকুরসের শিষ্যবর্গের যথেচ্ছাচার জগৎপ্রসিদ্ধ। ফলত, গাঁথুনসূত্রের অভাবে কখন মালা সজ্জিত হইতে পারে না; বিক্ষিপ্ত ছন্ন ভাবই সেরূপ স্থলের নিয়ম। পুনশ্চ প্রকৃতির মিথ্যা বা অচিৎভাগ যাহার মূল, সে তত্ত্ব কখনও সুফল প্রসব করিতে পারে না। ফল সর্ব্বদা মূলেরই ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, নাস্তিকতত্ত্ব জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে কিরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে ও কতদূর জাতীয় জীবনের উপর আধিপত্য ও তাহাকে চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রীক নাস্তিকতত্ত্ব বহুলাংশে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান প্রাণ, আর হিন্দু নাস্তিকতত্ত্ব তাহার বিপরীতে বহুলাংশে অনন্বিত আত্ম-চিন্তা-প্রাণ। আরিষ্টিপুস ও তদীয় সাম্প্রদায়িক থিওডোরুস প্রভৃতির যে নাস্তিকতা, তাহা ষণ্ডামির নাস্তিকতা; এবং এপিকুরসের যে নাস্তিকতা, তাহা ভয়ের তাড়নে নাস্তিকতা, বলা অধিক যে ইহা সমস্তই গ্রীক প্রকৃতির সহ সহধর্ম্মী, এবং ঐরূপ প্রকৃতি হইতে ঐরূপ ফলই আশা করা গিয়া থাকে। আরিষ্টিপুসের সময়ে লোকের পরিষ্কার পারলৌকিক অস্তিত্ব জ্ঞান কেবল প্রভাত হইয়াছিল মাত্র। সক্রেটিসের দ্বারা পূর্ব্বে উহা উপলব্ধ হওয়া, প্লেটো কর্ত্তৃক তখন তর্ক-যুক্তি দ্বারা সম্প্রমাণিত হইতেছিল। এই সময়ে আরিষ্টিপুসের নাস্তিকতা যেন তাহার প্রতিহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপে উত্থিত হয়, এবং প্লেটোর দ্বারা যে পরিমাণে সতের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছিল, উহারা সেই পরিমাণে অসৎকে বাড়াইয়া তাহাকে আসন প্রদান করিতেছিল। এপিকুরসের সময়ে [illegible] [illegible]; তখন কি পরলোককুল কি [illegible] অন্ধ বুদ্ধি উভয়েই ঘোর ভয়াকুল ভাব ধারণ করায়, তাহা হইতে মুক্তির উপায় স্বরূপ এপিকুরসের নাস্তিকতার উৎপত্তি হয়। ভয়ের মোহ ছাড়াইলেও, তাহার ছায়াতে ও আজন্ম সংস্কারের অনিবার্য্য প্রভাবে, মানবকে নম্র করিয়া রাখে; এই নিমিত্ত এপিকুরসের তত্ত্বে তেমন অমিশ্রিত অসতের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষত এই ছায়া যতই বিকৃত ভাবযুক্ত হউক না কেন, ইহা সৎপদার্থ-উদ্ভব যে ভয় তাহার ছায়া; সুতরাং ইহার কিঞ্চিন্মাত্র বর্ত্তমানতা থাকিলে, অসৎকে অবশ্যই সেই পরিমাণে হীন-অঙ্গ হইতে হইবে। সতের ছায়া হইলেও, সাধ্য কি যে অসৎ তাহার সম্মুখে সবিকাশে তিষ্ঠিতে সমর্থ হয়; সতের শক্তি এতই প্রবল এবং সর্ব্বজয়ী! মানব কিন্তু তাহা বুঝে না।

তাহার পর আরও এক কথা আছে। যে পদার্থ যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট, তাহার বিকারও সেই পরিমাণে অধিক বা অল্প মন্দ হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের আস্তিকতা কখনই উচ্চ অঙ্গের ছিল না, সুতরাং তাহাদের নাস্তিকতাও অতিশয় বীভৎস আকার ধারণ করিতে পারে নাই। আরিষ্টিপুসের সাময়িক নাস্তিকতা আপাতত নিতান্ত বীভৎস আকারের বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু কোন অসত্যেই দোষ নাই বলিয়া যেমন ঘোষিত হইয়াছে, তেমনি আবার কোন অসত্যই, অন্তত ক্ষতিকর অসৎ, সামাজিকতার খাতিরে যে অনবলম্বনীয় ইহার শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে ত্রুটি হয় নাই। সমগ্র ধরিতে গেলে, এখানকার নাস্তিকতা মাধুর্য্যগুণময়ী। হিন্দুর সেরূপ নহে। গ্রীকের চিন্তাশক্তি ক্ষীণ, বাহ্যদর্শনশক্তি তীব্র এবং বৈজ্ঞানিক, সুতরাং আত্মিক সংসারে ইহাদের তত্ত্ব সঙ্কীর্ণায়তন অথচ সুসজ্জিত; কাজেই ইহা মাধুর্য্যময় হওয়ার কথা। হিন্দুর চিন্তাশক্তি গগনভেদী, প্রত্যক্ষ প্রমাণ-প্রিয়তা হেতু যদিও তীক্ষ্ণ বহির্দর্শনের আবশ্যক তথাপি চিন্তাশক্তির আতিশয্যে ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহার মন তদ্বিষয়ে অনন্যমনা ও অবৈজ্ঞানিক; এ নিমিত্ত হিন্দুর তত্ত্ব বৃহদায়তন, শৃঙ্খলমুক্ত উন্মাদমূর্ত্তি, তত্ত্বও অনুরূপ বীভৎসভাবাপন্ন। হিন্দুর আস্তিকতাও যেমন উচ্চ অঙ্গের, উহার নাস্তিকতার যে শিক্ষা তাহাও তেমনি বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল। হিন্দুর নাস্তিকতা গ্রীকের ন্যায় সমধর্ম্মী কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহা নিরাশা হইতে উৎপন্ন। মোক্ষপ্রয়াসী হইয়া পরলোক নিরাকরণ ও আয়ত্ত করিবার জন্য অপরিমিত চেষ্টা করিতে করিতে, তাহার সন্ধান না পাওয়ায়, হিন্দু নাস্তিকতার উৎপত্তি হইয়াছে। যখন উৎপন্ন হইল, তখন যাহার জন্য চেষ্টা হেতু এত ক্লেশ পাওয়া গিয়াছে যেন সেই আস্তিকতার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই, নাস্তিকতা ওরূপ বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল। অনেক যত্নের পদার্থে বিফলতা উপস্থিত হইলে, তাহার অনেক দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

কিন্তু ঘোর আস্তিকতাময় হিন্দুসমাজে, নাস্তিকতা বড় একটা আত্মপ্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বুদ্ধ-শিক্ষাকে অনেকে নাস্তিকতা বলিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুত বুদ্ধ-শিক্ষা নাস্তিকতা নহে, কেবল বহুপরবর্ত্তী মাধ্যমিক নামক একটী সম্প্রদায় নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছিল। যাহা হউক নাস্তিকতার শিষ্যসংখ্যা যদিও কখন গণনায় আইসে নাই, তথাপি উহা সমাজকে, বিশেষত ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে উত্তেজিত করার পক্ষে নিতান্ত হেয় ছিল না। ধর্ম্মব্যবসায়ীরা যে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মবন্ধ কঠোর করিয়া তুলেন; এবং শেষে পৌরাণিক সময়ে, লোকের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি ও দর্শনশক্তি প্রভৃতি পর্য্যন্ত হরণ করিয়া, সর্ব্বসাধারণকে

ধর্ম্মকার্য্যের নানারূপ কল্পিত কঠোর বন্ধনে বন্ধন করেন; এই নাস্তিকতা তাহার একটি অন্যতর কারণ স্বরূপ। অনেকে ভাবিয়া থাকে যে, কেবল স্বার্থসাধন উদ্দেশে ধর্ম্মব্যবসায়ীরা এরূপ কার্য্য করিয়াছিল; হইতে পারে অংশত তাহাই কিন্তু কেবল তাহা নহে। স্বার্থ মানুষে কখন ছাড়া, তবে সমতা আর আধিক্য, এবং মহাপুরুষে ন্যূনতা। হয়ত এ সময়ে স্বার্থের কিছু আধিক্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও এমন কতকগুলি উপলক্ষ্য আবশ্যক যে স্বার্থ সাধন করিতে করিতেও লোক সকলকে বুঝাইতে পারা যায় যে, আমরা যাহা যাহা করিতেছি তাহা তোমাদেরই ভালর জন্য করিতেছি। পুনশ্চ যথায় লোকসমিতি বিপুল এবং তৎপার্শ্বে স্বার্থসাধকও বিপুল, তথায় স্বার্থ সাধারণত তদ্রূপ উপলক্ষ্যের আবির্ভাব করিয়া থাকে না; বহিরুৎপন্ন উপলক্ষেই, ইন্ধনদানে তথায় স্থিত স্বার্থের আধিক্য করিয়া থাকে।

গ্রীকভূমে নাস্তিকতা বহুব্যাপিনী হইয়াছিল। সক্রেটিস ও প্লেটোর পূর্ব্বে পরলোকের ধারণা বা চিন্তা ততটা পরিস্ফুট না থাকায়, লোকে আস্তিকতত্ত্ব সাধারণত সাংসারিক মঙ্গলোদ্দেশে নিয়োজিত করিত; অতএব আস্তিকতা এখানে অতি ক্ষীণপ্রাণ ছিল বলিতে হইবে। এমন স্থলে, ভয়শূন্য অস্ফুট যে পরলোক, যাহার থাকা বা না থাকার প্রতি লোকে তত আগ্রহ যুক্ত নহে, যদি বুঝাইতে পারা যায় যে তাহা বস্তুত অস্তিত্বশূন্য, এবং সাংসারিক মঙ্গল যাহা তাহা দেবার্চ্চনা না করিলেও পাওয়া যায় অথচ সামাজিকতারও কোন হানি হয় না; তাহা হইলে লোকে কেন না সে নাস্তিকতা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে? আস্তিকতার প্রতি অনপনেয় দৃঢ় সংস্কার হয়, পরিষ্কার পরলোকচিত্র এবং উদ্ধদেশের নিকট নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও পাপপুণ্য বোধ হইতে; কিন্তু গ্রীকদিগের সে বোধ তেমন ছিল না। ক্ষীণ পদার্থ সহজেই স্থানচ্যুত হইয়া থাকে; গ্রীক নাস্তিকতা ও আস্তিকতা উভয়েই, গ্রীকচিত্তে সেইরূপ সহসা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিত।

এপিকুরসের নাস্তিকতা গ্রীসে অত্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। সে সময়ে গ্রীস ধ্বংসমুখ *। তখন গ্রীসের পূর্ব্বশ্রী বিগত, আচার ব্যবহার উচ্ছৃঙ্খল; রাজ্যমধ্যে স্বার্থবিপ্লব আত্মকলহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনীতিজ্ঞগণ ক্ষীণচেতা ও ঘুষখোর—অর্থলোভে স্বচ্ছন্দে স্বদেশ পরের নিকট বিক্রয় করিতেছে। তত্ত্ববিৎ নামধারিগণ, পতন সময়ে যেরূপ হইয়া থাকে, কুতর্ক, বাগাড়ম্বর, টীকা, টিপ্পনি প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত। পূর্ব্বগত

*। এপিকুরসের জন্ম আনুমানিক ৩৪২ খৃঃ পূঃ, এবং মৃত্যু ২৭০ খৃঃ পূঃ। ইহাঁরা শিক্ষা সামোস ও আথেন্স এই উভয় স্থান হইতে প্রথম প্রচারিত হয়।

পদার্থনিচয়ের পরিপাচনে কালে নব নব জীবের উৎপত্তি নিমিত্ত, তাহাদের সংযোজন ও বিশ্লেষণ হেতু, এপিকারসের মতে তৎসধর্ম্মবিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ সমাবেশ বলিলে অসঙ্গত হয় না। পুনশ্চ যে জগদ্ব্যাপী ধর্ম্মবিপ্লব ও নীতিবিপ্লব পূর্ব্ব গগনে সমুদিত হইবে, তন্নিমিত্ত নব প্রভাত আনয়নের জন্য, তাহা পূর্ব্ব দিবার অন্ধকারময়ী অবসান সন্ধ্যা স্বরূপ; এখনও মধ্যরাত্রির অন্ধকার ক্লেশ সঙ্কুল অন্ধতামস ও তাহার আক্রম ক্রিয়া পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বর কি উপায়ে, কাহার দ্বারা, কোথায় দিয়া যে কিরূপ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকেন, তা। একমাত্র তিনিই জানেন; মনুষ্য বুদ্ধির নিকট তাহা অপরিজ্ঞেয়; আমরা কেবল তাহার ছায়াকণা মাত্র অনুভব করিতে পারিয়া, অনাহূত বারবিতণ্ডায় কালক্ষেপ করিয়া থাকি। "সহি ভূতানাং এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোহন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ।"

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপবর্গ।

হিন্দুগণ মুক্তিকে অপবর্গ বলিয়া জানেন। সেই মুক্তি পঞ্চবিধ। সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, সালিপ্য ও নির্ব্বাণ সাক্ষ্য। এবিধ মুক্তি মধ্যে শেষ মুক্তি সালিপ্য, জ্ঞান বৈরাগ্য সাধন হেতু অপরাপর মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠতমা। সালোক্য মুক্তিতে সগুণব্রহ্ম লোকে বাস, সারূপ্যে তাঁহার সমান রূপ, সাযুজ্যে সমান ক্ষমতা, সালিপ্যে নির্ব্বাণ অর্থাৎ জলে জল যেমন মিশ্রিত হয় তদ্রূপ সালিপ্যে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যায়। পরমহংস যোগিরাই এই মুক্তি লাভ করিতে পারেন। নচেৎ অন্য যোগিগণ কেবল স্বর্গভোগান্তে নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সংসার যাতনা ভোগ করিতে থাকেন।

পরমহংস এই প্রকার। জীবন্মুক্ত পরমহংস এক প্রকার। বিদেহ মুক্ত পরমহংস অন্য প্রকার। জীবন্মুক্তেরাও কখন কখন সংসার সাগরের আবর্ত্তে নিপতিত হন। বিদেহমুক্তেরা দেহপাত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহজগতে সাক্ষীস্বরূপ থাকেন। দেহাবসানে পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যাওয়ায় আর সংসারে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না। তিনি তখন অন্যান্য স্বর্গ হইতে সপ্তম স্থান আধ্যাত্মিক জগতে গিয়া বিশ্রাম লাভ করেন। জীবের জীবত্ব ক্ষয় না হইলে আধ্যাত্মিক জগতের প্রজা হইতে পারেন না। ভূলোক যেমন পাপ পুণ্য ও সুখ দুঃখ স্থান তেমনি সপ্তম স্বর্গ আধ্যাত্মিক জগৎ পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধি

নিষেধশূন্য। এখানে চন্দ্র সূর্য্যের ক্ষমতা না থাকিলেও উহা আত্ম-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান। পাঞ্চভৌতিক কোন প্রাকৃতিক পদার্থ এখানে না থাকিয়াও পঞ্চতন্মাত্রে নিত্য হইয়া বিরাজমান। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মনঃ, বুদ্ধি, ও পঞ্চ মহাভূত, অবিকৃত ভাবে একত্রিত হইয়া এখানে পরমাত্মায় সম্মিলিত হইয়া আছে। এ স্থানের মাহাত্ম্য বাক্য মনের অগোচর। সিদ্ধ যোগিরা সমাধি অবস্থায় ইহার বিষয় জ্ঞানের দ্বারা কিছু কিছু অনুভব করিতে পারেন।

ইহাকে পৌরাণিকেরা সত্যলোক বলিয়া থাকেন। ইহার আলোক প্রত্যেক জগতের কেন্দ্রীভূত সূর্য্যমণ্ডলে পতিত হওয়ায় তাবৎ সূর্য্যই জ্যোতিষ্মান। যোগি-সকল স্ব স্ব দেহে ষটচক্র ও সহস্রার স্বরূপ সত্যলোক চিন্তা করিতে করিতে যখন সত্য ধাম পবিত্র বুদ্ধি দ্বারা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে থাকেন তখন যোগী চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মক বাহ্যজগৎ বিস্মৃত হইয়া সপ্তম স্বর্গ সত্যলোকের আমোদে বিহ্বল হইয়া পড়েন। ইহাকেই যোগিরা আত্মসাক্ষাৎকার বলিয়া জ্ঞান করেন। এতদ্ভিন্ন পরমাত্মার প্রকৃতরূপকে কেহই সাক্ষাৎ করিতে পারেন না। যেহেতু যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—পরমাত্মার প্রকৃত রূপের বিষয় বলিতে বাক্য ও মন পরাভূত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃতার্থ এই ভ্রমপ্রমাদাদিদোষযুক্ত মন ও বাক্যের দ্বারা তাঁহার বিষয় বর্ণনা করিতে অপারগ। পবিত্র বাক্য ও মনের গাহ্য হেতু পবিত্রাত্মা যোগী সকল ষটচক্র চিন্তা করিতে করিতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঐ সত্যলোকের অধঃ মহর্লোক, মহর্লোকের অধঃ তপঃলোক, তস্যাধঃ জনলোক, তস্যাধঃ স্বর্লোক, তস্যাধঃ ভুবর্লোক, তস্যাধঃ ভূর্লোক। মূলাধার ভূর্লোক, স্বাধিষ্ঠান ভুবর্লোক, মণিপুর স্বর্লোক, অনাহত জনলোক, সহস্রার সত্যলোক। সত্যলোকে সত্ত্ব রজস্তম ও আবরণ বিক্ষেপের সম্পর্কশূন্য। সেখানে বিশুদ্ধজ্ঞান আর পরমানন্দ ও সত্য ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

জীবাত্মা যাবৎ পর্য্যন্ত নিবাসনাশূন্য ও বহির্জগৎ বিস্মৃত হইতে না পারেন তাবৎ পর্য্যন্ত বহির্জগতে অর্থাৎ ভূর্লোক হইতে মহর্লোকে ভ্রমণ করিবেন। ভূর্লোকবাসী যেমন সুখ দুঃখের ভাগী, সত্যলোক ভিন্ন অন্যান্য লোকও সেইরূপ সুখ দুঃখের আস্পদ। তবে ভূর্লোকের ঊর্দ্ধে মহর্লোক পর্য্যন্ত যত লোক আছে সে সকল লোকে ক্রমেই পাপাচার অল্প। সে সকল স্থানকে স্বর্গ বলে। স্বর্গীয় সুখ যাঁহারা সম্ভোগের অধিকারী তাঁহারাই পৃথিবী পরিত্যাগের পর ক্রমে পরম্পরায় ঐ সকল লোকে গিয়া সুখ সম্ভোগ করত পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করেন। বিনা যোগে বিনা জ্ঞানে কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজ

ধ্বংস হয় না। কেবল বিশুদ্ধ ভক্তি যোগেও কর্ম্ম ও কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইতে পারে এমত শাস্ত্র আছে। যথা।

কোন কোন তন্ত্রে বলে, আজ্ঞাখ্য চক্রের অর্থাৎ মহর্লোকের উপরি সহস্রারের অর্থাৎ সত্য লোকের অধঃ ধ্রুব, শুক্র, শিশুমার সূর্য্য ও চন্দ্রলোক আছে। এই লোক পঞ্চকোপরি কুজ্‌ঝটিকাবৎ কারণবারিও আছে। সেই বারির উপরি ব্রহ্মাণ্ডবহির্ভূত সত্যলোক আছে। এই সত্যলোককে বৈষ্ণবেরা গোলক, শৈবশাক্তেরা কৈলাস বলিয়া থাকেন।

সত্যলোক হইতে ভূলোক পর্য্যন্ত যে ১২টি স্থান তৎসমুদায়ই শ্রীগুরুর আসন অর্থাৎ পরমাত্মার আসন। বিদেহমুক্ত পরমহংসেরাই এ সমুদায় স্থান সন্দর্শন করিতে পারেন। নচেৎ অন্যের অসাধ্য। ক্রমশঃ।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

আমার জীবনের ইতিহাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সোণার হরিণ।

মাতুর কাছে আশ্বাস পাইয়া ও বিনোদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া হৃদয় অনেকটা শান্ত হইয়াছিল তাহা বলিয়াছি। তখনও হতভাগিনীর মনে আশা হইতেছিল যে অচিরে সে বিপদ হইতে নিস্তার পাইব;—অচিরে গৃহে ফিরিয়া গিয়া সেই আসন্ন মৃত্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব। তখন একটু একটু করিয়া পূর্ব্ব কথা সকল আবার মনে পড়িতে লাগিল; এবং হৃদয়ের ভিতরে না সুখ না দুঃখ, না ভয় না ভরসা, কেমন এক ভাবের উদয় হইল। 'মাতু বলিয়াছে শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইবে, সুতরাং দুই এক দিনের মধ্যে বাড়ীত যাইব; কিন্তু হইল কি? লোনা জল গিলিয়া, উত্তাল তরঙ্গ তাড়িত হইয়া, পুনরায় কূলে মৃতবৎ নিক্ষিপ্ত হইবার জন্য কি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলাম? চিরদিন শুধু কি কলঙ্কেরই কথা রহিয়া যাইবে?' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ প্রাণের ভিতরে চমকিয়া উঠিল; যে ঘোর বিপদ চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে কে যেন তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। অমনি চিন্তাস্রোত বিপরীত দিকে বহিতে লাগিল। 'ব্রহ্মাণ্ড দেব! আর কিছু চাহিনা। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, দেব, তাহাই কর; কিন্তু এ বিপদে পড়িয়া যেন প্রাণ না যায়। দেব! এখন এই বই আর কিছু চাহি না।'

বিনোদ চলিয়া গেলে একটু পরে মাতু আসিল, ও আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'বলি, এত বেলা হল, তা নাইতে টাইতে হবে কি?' আমি বলিলাম—'বড় শীত, নাইব না।' সে আবার বলিল—'আচ্ছা যেন নাই নাইলে, তা বড় শীতে খেতে দেতে আছে কি?' এবার আমি কোন উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিলাম, ও মাতু হাত ধরিয়া আমাকে বাহিরে লইয়া গেল। তথায় বিশেষ কিছু দেখিলাম না। বেলা তখন দশটা এগারটা হইয়াছে, সুতরাং সকলেই আহারাদির আয়োজনে ব্যস্ত, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও একটু ব্যস্ত থাকিতে হইল। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে হতভাগিনী নিস্তারের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। কিন্তু আমি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম না দেখিয়া বোধ হয় সে আমার সঙ্গে কথা কহিবার প্রয়াস পাইল না।

আহারাদির হাঙ্গাম চুকিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। বেলা প্রায় দুইটা হইয়াছে। আমি আমার ঘরটির ভিতরে চুপ করিয়া শুইয়া কি ভাবিতেছিলাম ও মাতু বাহিরে কি কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। এমন সময়ে বিনোদ ও ভুবন আমার কাছে আসিল। ভুবন তাহার নিজের ঘরটি ছাড়িয়া কাহরু সহিত বড় মিশিত না। আমার আসা অবধি এই প্রথম সে আমার কাছে আসিল। তাহার হাতে একখানি রামায়ণ পুঁথি, ও তাহার সেই গম্ভীর মুখখানিতে একটু মৃদু মৃদু হাস্য। আমি তাহাদিগকে পাইয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম, কারণ একলা আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তাহারা আসিবামাত্র আমি যত্ন করিয়া তাহাদিগকে আমার শয্যার উপরে বসাইলাম। দুই চারি মিনিট কাল বাজে কথায় কাটিয়া গেলে, পরে স্থির হইল যে আমাদের মধ্যে একজন রামায়ণখানি হইতে খানিক পড়িয়া অপর দুই জনকে শুনাইবে। কিন্তু কে পড়িবে সে মীমাংসা শীঘ্র হইল না। বিনোদ ও ভুবনের একান্ত জিদ যে আমি পড়িব, কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত না হইয়া জিদ করিতে লাগিলাম যে হয় বিনোদ না হয় ভুবনকে পড়িতে হইবে। আবার বিনোদ বলিল যে সে কখনই পড়িবে না—'আমি পড়িতে ভাল বাসি না, শুনিতে ভাল বাসি।' এইরূপ গোলমালের পরে অবশেষে স্থির হইল যে আমাদের তিন জনের মধ্যে ভুবন সকলের বড় সুতরাং তাহারই পড়া উচিত। ভুবন সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'আচ্ছা, আমিই যেন পড়িলাম; কিন্তু কোথায় পড়িব 'বলিয়া দাও দেখি।' বিনোদ কোন উত্তর করিল না। আমি বলিলাম—'যেখানে তোমার ইচ্ছা।'

ভুবন—সীতা হরণে রাবণের প্রতি মারীচের নিষেধ?

বিনোদ—সীতা হরণ ?—না মাসি, আর কোন বিষয় পড়। সীতাহরণ শুনিলে বড় প্রাণ কেমন করে!

ভুবন—সীতাহরণে প্রাণ কেমন করিবারইত কথা। কিন্তু আমি সেদিন এই বিষয়টি পড়িতে পড়িতে বড় একটা দরকার প'ড়ল বলিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। সেখান থেকে পড়িলেই ভাল হয় না?—বিনোদ আর কোন আপত্তি করিল না।

ভুবন পড়িতে আরম্ভ করিল। অভিমানী রাবণ খর দূষণের নিধন, সূর্পনখা ভগিনীর লাঞ্ছনা, ইত্যাদি অপমান মনুষ্য কীট রামের হস্তে পাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে অক্ষম। স্বয়ং ত্রিলোকের অধিপতি, পুত্র মেঘনাদ, সহায় অযুত হস্তীর বলধারী বীর মারীচ। এ সব সত্বেও কি ক্ষুদ্র রাম, দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল পাইবে না? মারীচ নিষেধ করিতেছে, কত বুঝাইতেছে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি লঙ্কেশ্বর বন্ধুর সৎপরামর্শ হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে—'ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।' এতক্ষণ বিনোদ স্থির হইয়া একমনে ভুবনের পড়া শুনিতেছিল। কবির মধুর শ্লোকগুলি ভুবনের মধুর স্বরে উচ্চারিত হইয়া আরও মধুর লাগিতেছিল। বিনোদ তন্ময় হইয়া বিস্ফারিত নয়ন দুটি আরও বিস্ফারিত করিয়া ভুবনের গম্ভীর মুখখানির উপরে একদৃষ্টিতে চাহিয়া! সেই সঙ্গীতসুধা পান করিতেছিল। এমন সময়ে ভুবন যেন ঈষৎ কম্পিত স্বরে পড়িল—'ঔষধ না খায় যার নিকট মরণ।' অমনি দণ্ডাহত কাল-সর্পিণীর ন্যায় বিনোদ হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—'ঔষধ খাইবে কি? যমে যাহাকে টানিতেছে সে ঔষধ খাইলে যমের বাড়ী যাইবে কে? পোড়ার মুখ আর কি! কি স্পর্দ্ধা! কি অহঙ্কার! বামন হইয়া চাঁদে আশা! একবার পাইত দেখি। ঝাঁটা পিটে আধমরা করে ফেলি। এত বড় স্পর্দ্ধা, এতবড়—

ভুবন—ও কিরে পাগ্‌লি? ক্ষেপিলি না কি?—থাম্, থাম্।

বিনোদ—থাম্‌ব?—একবার পাইত দেখি। কত বড় লঙ্কার রাজা সে তাই দেখি। কত অহঙ্কার তার—

বিনোদের কাণ্ড দেখিয়া আমরা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, দুই জনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিলাম। আমাদের হাস্যধ্বনিতে মাতু ও তাহার ভগ্নী আসিয়া জুটিল, এবং তাহারাও আমাদের সহিত হাসিতে লাগিল। বিনোদ তখন নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, এবং আর অধিক বাড়াবাড়ি করিল না। হাস্যের স্রোত থামিয়া গেলে বিনোদের মা তাহাকে বলিল 'খুব পড়া হয়েছে; এখন চল, বেলা গেছে।' বিনোদ একটু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল এবং মাতু ও তাহার ভগ্নীও সেই সঙ্গে প্রস্থান করিল।

আমরা পূর্ব্ববৎ আবার পড়িতে ও শুনিতে লাগিলাম। দুই চারি ছত্র না

পড়িতে পড়িতে আবার ঠিক পূর্ব্বের মত হইল। মারীচ রাবণকে কত বুঝাইতেছে, কিন্তু পাপিষ্ঠ সে সুমন্ত্রণায় কর্ণপাত করিল না। অবশেষে মারীচ সম্মত হইল—হতভাগিনী সীতার অদৃষ্ট ভাঙ্গিল! বহুরূপী রাক্ষস কেমন সোণার হরিণের রূপ ধরিয়াছে। আহা কি সুন্দর চক্ষুদুটি, কেমন বিজুলির ন্যায় লাল জিহ্বাখানি! মায়াবি! মনুজ-শ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ, নারীশ্রেষ্ঠ জনক-নন্দিনী, তাঁহারাও কি তোর মায়াজালে পড়িবেন? রূপের ছটায় বন আলোকিত করিয়া মৃগরূপধারী রাক্ষস যেখানে রাম সীতা বসিয়া আছেন সেইখানে গিয়া পৌঁছিল—'ডুবাইতে জানকীরে বিপদ-সাগরে।' হঠাৎ আমার চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু বারি বর্ষণ হইল; কিন্তু ভুবন তাহা না দেখিতে দেখিতে আমি মুছিয়া ফেলিলাম। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই স্থলে পাঠ বন্ধ করিতে হইল, কারণ ভুবনের এমন একটি প্রয়োজন পড়িল যে তন্মুহূর্ত্তেই তাহাকে পুস্তক খানি মুদিয়া উঠিয়া যাইতে হইল।

ভুবন চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার সেই শেষ কথাগুলি আমার কাণের ভিতরে যেন বাজিতে লাগিল—'ডুবাইতে জানকীরে বিপদসাগরে!' 'মা, চির দুঃখিনী হইবার জন্য কি মর্ত্ত্য-লোকে আসিয়াছিলে? জনকনন্দিনী হইয়া, জীবনদুঃখিনী হইয়া, কবে কি সুখ ভোগ করিলে মা?—চিরকাল ত দুঃখেই কাটিয়া গেল। মা, তুমিও কি বিধাতার নির্ব্বন্ধের অধীন? সে অলঙ্ঘ্য নির্ব্বন্ধ হইতে তুমিও নিস্তার পাইলে না! সোণার হরিণ তোমাকে কেমন করিয়া ভুলাইল, মা, একবার আসিয়া বলিয়া যাও। আজ এই হতভাগিনীও যে সেই মায়ায় পড়িয়া তোমারই মত বিপদসাগরে ভাসিতেছে। সে সোণার হরিণ কোথায় পলাইল, মা, জানি না! কেবল লাঞ্ছনা সার হইল; কেবল কলঙ্ক রহিয়া গেল। মা এ যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না। মাতা যদি দুহিতার দুঃখে দুঃখিনী না হইবেন তবে আর কে হইবে। মাতা যদি কলঙ্কিনী দুহিতার অপরাধ মার্জ্জনা না করিবেন তবে তাহার উপায় কি হইবে? মা, তুমি ত সকলই জানিতেছ; তবে আর তোমাকে বলিব কি? এ ঘোর বিপদ হইতে, মা, নিস্তার কর—মা, রক্ষা কর; এখন আর কিছু চাহি না!'

এইরূপে একাকিনী ভাবিতে ভাবিতে মন একবারে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কিরূপে পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাতু আশ্বাস দিয়াছে বটে যে শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইবে, কিন্তু—কেন বলিতে পারি না—তাহাতেও যেন অপ্রত্যয় হইতে লাগিল। তখন ভাবিলাম যে মাতুর সহিত দেখা হইলেই তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করা চাই যে সে ঠিক কবে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে।

আমি এখানে আর একদিনও থাকিব না।

ভুবনের পরামর্শ।

সেই মুহূর্ত্তেই মাতুর সহিত দেখা হইলে কি করিতাম বলিতে পারি না, কিন্তু একটু পরে যখন সে আসিল তখন তাহাকে বাটী যাইবার কথা পুনরায় বলিতে আর সাহস হইল না। মনে ভয় হইতে লাগিল পাছে সে কি উত্তর দেয়। সে আমি যেখানে বসিয়াছিলাম সেই খানে আসিয়া বসিল, এবং হাসিতে হাসিতে কত কি কথা কহিল; কিন্তু আমার কিছুই ভাল লাগিল না। এই সময় হইতে মাতুর প্রতি আমার কেমন বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল। যে দিন আপনাকে অনন্ত দুঃখ-নীরে ভাসাইবার জন্য তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম তখন বোধ হইয়াছিল তাহার মত সুহৃৎ কে? কিন্তু অচিরে সেই অমৃতের অমৃতত্ব ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। আমি তাহার আলাপে সে মিষ্টত্ব আর পাইতাম না; এবং সেই বন্ধুহীন স্থানে সে একমাত্র বন্ধু হইলেও, অনেক সময়ে সে কাছে না থাকিলেই ভাল থাকিতাম। সে হাসিতে লাগিল, গল্প করিতে লাগিল, কিন্তু আমি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া আর কিছু ভাবিতে লাগিলাম। সে তাহা বুঝিতে পারিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু একটু পরে সে উঠিয়া গেল এবং আমি পুনরায় একাকিনী হইলাম।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল এবং প্রকৃতি সুন্দরী বিশাল ললাটে দুই একটী করিয়া রত্ন পরিতে পরিতে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে তিমিরাবগুণ্ঠনে সর্ব্ব শরীর আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। রাজপথ-সমূহ দীপালোকে আলোকিত হইল; সান্ধ্য ধূমজালে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গেল; এবং রজনীর তিমির ক্রোড়ে মেদিনী লুক্কায়িত রহিল। চন্দ্রললাটিকে, নক্ষত্রমালা-বিভূষিতে, প্রশান্তগম্ভীরাননে রজনী! দেবি! জীবের শান্তির জন্য মর্ত্ত্যলোকে তোমার আবির্ভাব। তোমার আগমনে তবে জগতের পাপস্রোত এত প্রবাহিত হয় কেন? তোমার আবির্ভাব না হইতে হইতে পৈশাচিক পূজার আরতির এত আয়োজন কেন? কিন্তু সে কথা আর বলিব না,—সে ন্যক্কার-জনক দৃশ্য চিত্রিত করিয়া লেখনী আর কলঙ্কিত করিব না। আমি কিয়ৎকাল আপনাকে লুক্কায়িত রাখিলাম। শার্দ্দূল-ভীত মৃগশিশু যেমন সভয় নয়নে লতা-গৃহে লুকাইয়া থাকে সেইরূপ আপনাকে লুকাইয়া রাখিলাম। কিন্তু তাহাও ভাল লাগিল না। তখন কি করি কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অতি সংগোপনে ঘরের বাহির হইয়া ভুবনের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ভুবন করতলে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া একমনে বসিয়া কি ভাবিতেছিল।

আমার আগমনে সে যেন ঈষৎ চমকিত হইল, ও একটু হাসিয়া বলিল—'কি মনে করে গো?' আমি কোন উত্তর না দিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—'কথা কৈলে না যে? রাগ করেছ না কি?' এবার আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। ভুবন আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া বড় ব্যথিত হইল, ও আমার সান্ত্বনার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল।

ভুবন—'কাঁদ কেন বল দেখি? তুমি বড় ছেলে মানুষ।'

আমি—'আমার উপায় কি হইবে বলিয়া দাও; আমি আর যে পারি না। এ বিপদ হইতে কেমন করিয়া উদ্ধার পাইব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া দাও। তুমি নহিলে আমার বাঁচিবার অন্য উপায় নাই।'

ভুবন—'তা কাঁদিয়া কি হবে?—ভয় কি?'

আমি—'ভয় কি! সত্য করিয়া বল দেখি যে কোন ভাবনা নাই। তুমি ভরসা দাও, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব। বাড়ীর জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল নয়।—চুপ করিয়া রহিলে কেন?'

ভুবন—'হতভাগিনি কে তোমাকে এ দুর্ব্বুদ্ধি দিয়াছিল? কি দুঃখে, কাহার পরামর্শে স্বর্গ-সুখ ছাড়িয়া নরকে আশ্রয় লইতে আসিলে? এ মহা-পাকে যে একবার পড়িয়াছে তাহার যে আর নিস্তার নাই। তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট হইয়াছে। হতভাগিনি, কেন এমন কর্ম্ম করিলে?—কোন লোভে পড়িয়া এ ফাঁদে আত্মসমর্পণ করিলে?'

আমি তাহার রোদন দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, ও ভুবন তাহার অঞ্চলের দ্বারা আমার চক্ষু মুছাইয়া মৃদুস্বরে বলিল—'আর কাঁদিও না। কাঁদিয়া কি করিবে? এখনও উপায় রহিয়াছে। কি করিলে বাঁচিতে পারিবে কেবল সেই চেষ্টা দেখ। রোদনের উপরে নির্ভর করিয়া কে কবে বিপদ হইতে নিস্তার পাইয়াছে?'

আমি—'রোদন না করিয়া যে থাকিতে পারি না। কি করিলে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইব আমি কিছুই জানি না। তুমি আমাকে রক্ষা কর। বল, একবার বল প্রাণ বাঁচাবে, তুমি আমাকে ছাড়িবে না।' এই বলিতে বলিতে আমি তাহার হাত দুখানি জড়াইয়া বুকের ভিতরে পুরিলাম। ভুবন আমার অবস্থা দেখিয়া বড়ই কাতর হইল, এবং করুণ স্বরে বলিল—'যে দিন প্রথমে তোমাকে দেখিলাম সেই অবধি তোমার কথা ভাবি নাই এমন সময় নাই। তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল না, কিন্তু তোমার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল। তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার দিকে চাহিয়া দেখিতাম আর মনে মনে ভাবিতাম 'পাপিনীর মনে কি একটু দয়া হইল না?' তার পর তোমার

সঙ্গে আলাপ হইল। আলাপ হইয়া অবধি তুমি কিরূপে নিস্তার পাইবে অহর্নিশি কেবল তাহাই ভাবি। ভগবান্ তোমাকে এ বিপদ হইতে নিস্তার করুন। তিনি নহিলে ঘোর সঙ্কটে আর কে রক্ষা করিবে? কিন্তু তুমি নিজে আর নিশ্চিন্ত থাকিও না। যদি বাঁচিতে চাও তবে শীঘ্র আপনার পথ আপনি দেখিয়া লও। সকলইত বুঝিতেছ।'

আমি—'দিদি সকলই বুঝিতেছি সত্য, কিন্তু কি করিতে হইবে আমি যে কিছুই জানি না। আমি জন্মে যে কখন ঘরের বাহির হই নাই।'

ভুবন—'আমি যাহা বলিব করিবে?'

আমি—'তুমি যা বলবে আমি তাই করিব। তুমি যদি অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে বল আমি তাও করিতে রাজি আছি।'

ভুবন—'না, আপাততঃ তত কিছু করিতে হইবে না। আমি একটি সামান্য উপায় বলিয়া দিতেছি, তুমি তাই কর। যাদু তোমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। তুমি তাহাকেই গিয়া ধর—খুব জোর করিয়া ধরিবে, বুঝিলেত?—তুমি তাহাকে গিয়া ধর যে তুমি আর এখানে একবেলাও থাকিবে না। দেখ সে কি উত্তর দেয়—কেমন পারিবেত?'

আমি—'পারিব। আর নাই বা পারিব কেন? সে কি জানে না আমি তার কে?

ভুবন করুণ ভাবে একটু হাসিয়া বলিল—'না, সে সব কথায় কায নাই! তুমি শুধু তাকে খুব জিদ করিয়া ধর যে তুমি আর এখানে থাকিবে না—কেমন?'

আমি—'আচ্ছা। কিন্তু সে যদি স্বীকার না করে?'

ভুবন—'সে পরের কথা। এখন তুমি এই কর, তার পরে যা হয় হইবে। কিন্তু এমন করিয়া বলিবে যে সে বিরক্ত না হয়, অথচ খুব জিদ করিতে ছাড়িবে না। পারিবেত?'

আমি—'নিশ্চয় করিব। আমি তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি আমি তাহার কাছে জবাব লইয়া তবে ছাড়িব। দেখি পোড়ার মুখী কি উত্তর দেয়।'

ভুবন—'বেশ্ কথা। তবে আর উতলা হইও না। রাত্রি হইয়াছে ঘরে যাও। কিন্তু দেখো যেন তার হাসিতে ভুলে যেও না।'

আমি—'তার হাসিতে আমি আগুন জ্বালিয়া দিব।'

এই বলিয়া আমি গাত্রোত্থান করিলাম কিন্তু একলা ঘরে ফিরিয়া যাইতে সাহস হইল না। তাহার অপেক্ষা অন্ধকার রজনীতে নির্জ্জন প্রান্তরের ভিতর দিয়া গমনাগমন সহজ কথা। সুতরাং ভুবনকে সঙ্গে না করিয়া আসিতে পারিলাম না। ভুবন আমার সহিত দ্বার পর্য্যন্ত আসিল, এবং আমি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তথায় যাদু আমার

পূর্ব্বে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি প্রবেশ করিবা মাত্র সে একটু কপট রাগের সহিত বলিল—'এত রাত্রি হ'ল, কিছু খাবে না?' আমিও একটু কর্কশ ভাবে উত্তর করিলাম—'না।' মাতু আবার বলিল—'সে কেমন কথা?' এবং আমি পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলাম—'তুই কি আমাকে জোর করিয়া খাওয়াইতে চাহিস্?' এই খানে মাতু থামিয়া গেল, এবং আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আপনার বিছানার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

এখন ঘরের ভিতরে আর কেহ নাই, কেবল মাতু ও আমি। ভাবিলাম, 'ভুবনের সহিত যে পরামর্শ হইল এইত তাহার বেশ্ সময়। এখনি কেন পোড়া'র মুখীকে বলিয়া দেখি না?' আবার ভাবিলাম, 'না, এখন না।' 'এখনই বা নয় কেন?'—'না আজ রাত্রিত গিয়াছে, আজ না, কাল সকালে দেখিব।' অতএব সে রাত্রিতে কোন বিষয় উত্থাপন না করিয়া প্রাতঃকালের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণ শশীর উদয় হইয়াছে—আর ভয় নাই। আমার বোধ হইতে লাগিল যেন হৃদয়ের ভিতরে এক অভূতপূর্ব্ব বলসঞ্চার হইতেছে—মাতু কি করিতে পারিবে। হায় হতভাগিনি! সত্যই কি এত শীঘ্র তোর দুঃখাবসান হইবে? হরি! হরি!

শ্রীশ্যাম—

আয়ুর্ব্বেদ ও বঙ্গানুবাদ।

সমালোচনা।

অতি প্রাচীন কালে এতদ্দেশে মনুষ্য জীবনের অতি প্রধান হিতকারী আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রচার থাকাতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের যে মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, এবং বিবিধ কারণে কালক্রমে সেই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বিলুপ্তপ্রায় হওয়াতে যে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা আজি কালি অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে ও হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ও তদনুযায়ী চিকিৎসা-প্রণালীর উৎকর্ষসাধনার্থ যে সকল মহাশয় ব্যক্তি বিশেষ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিবেন বা করিতেছেন, তাঁহারা যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের মহোপকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যে সকল বিদ্বান ও তত্ত্বানুসন্ধায়ী মহাশয় ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের সম্পূর্ণরূপে অর্থবোধের নিমিত্ত প্রকৃত বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গদেশবাসী ব্যক্তি-

দিগের যথেষ্ট ধন্যবাদের পাত্র, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি। কোন গূঢ়ার্থ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিলে, যেমন উপকার, কৃতার্থতা লাভ না করিলে তেমনই অপাকারের সম্ভাবনা আছে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে "বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদোমাময়ং প্রহরিষ্যতি"—ইহার অর্থ এই যে বেদশাস্ত্র মনুষ্যগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-সাধক। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই বেদশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন পূর্ব্বক প্রকৃত অর্থ অবগত হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইলে, বেদশাস্ত্র তাহাকে এরূপ ভয় করেন যে, এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে। অর্থাৎ এতাদৃশ ব্যক্তি প্রকৃত অর্থ বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া ধর্ম্মস্থলে অধর্ম্মের শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে।

৮।১০ বৎসর সময়ের মধ্যে এতদ্দেশে কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রচার হইয়াছে। তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদীয় অতি-প্রামাণিক দুইটী সংহিতাগ্রন্থের মধ্যে শুশ্রুত-সংহিতার আদ্যন্ত বঙ্গানুবাদ আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। এ সকল পুস্তক অনুবাদ ঘটিত যে সকল দোষ আছে, কেহ কেহ সমালোচনা-মুখে তাহার উল্লেখ করিয়া অনুবাদক-দিগকে সতর্ক করিয়াছেন। পরিশেষে আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় অতি প্রধান গ্রন্থ চরকসংহিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া কৌতূহলের সহিত দেখিতে আরম্ভ করি। কিন্তু তাহাতে আমরা আনন্দ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিষাদ লাভ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। এই নিমিত্ত আমরা ঐ পুস্তক খানির সম্বন্ধে অদ্য আনন্দ ও বিষাদ উভয়ই ব্যক্ত করিব।

পুস্তক খানি এই, "চরকসংহিতা, শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন কবিরাজের অনুবাদ ও পরিশোধন সহিত প্রকাশিত। কলিকাতা চিৎপুর রোড ২৮৫নং ভবনে মুদ্রিত। মূল্য লিখিত নাই।

আমরা দেখিলাম, এই পুস্তক খানির ভূমিকা এবং প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদটী লিখিতে কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয়ই হউন বা অন্য কোনও ব্যক্তিই হউন, কিঞ্চিৎ যত্ন ও ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা সেই লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি এবং তাহা দেখিয়া অপেক্ষাকৃত আনন্দলাভ করিয়াছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ কয়েকটী পাতা ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থ খানিতে দৃষ্টিপাত করিয়া আমরা বিষাদিত হইয়াছি। কারণ, এতাদৃশ গভীরার্থ গ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইলে, গ্রন্থখানি রীতিমত অধ্যয়ন করা এবং অনুবাদ করিবার প্রণালী শিক্ষা করা আবশ্যক। অনুবাদক মহাশয়ের এই দুইটী বিষয়েই বিলক্ষণ অভাব লক্ষিত হইতেছে।

বিস্তৃতরূপে উদাহরণ দেখাইতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হয়, তজ্জন্য আমরা দুই একটী স্থানের অনুবাদ উদ্ধৃত করিব। বাস্তবিক ইহার এমন প্রস্তাব নাই, যাহা ভ্রমপ্রমাদে কলুষিত না হইয়াছে।

১। এই পুস্তকের অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃত ভাষার যেমন বিভক্তিগুলি ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ হইয়াছে। যথা—

সংস্কৃত,—"স্নেহোপগঃ স্বেদোপগঃ, বমনোপগঃ" ইত্যাদি। ২০—পৃঃ। বাঙ্গালা,—"স্নেহোপগ, স্বেদোপগ, বমনোপগ," ইত্যাদি। ২১—পৃঃ।

পাঠকগণ! আপনারা এই অনুবাদ পাঠ করিয়া সংস্কৃত মূলের অর্থ বুঝিয়াছেন কি না?

২। কোন কোন স্থলের বাঙ্গালা অনুবাদ এমন জঘন্য যে, তাহার অর্থ বোধ হয় না। যথা—

ক। "যাহাদিগের পিতা মাতাই প্রাণিমাত্রের উৎপত্তির কারণ এবং এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে চতুর্ব্বিধ প্রাণীর (স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, এবং জরায়ুজের) উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, পিতৃ মাতৃ হইতে কেবল জরায়ুজ ও অণ্ডজেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি মাতা পিতা হইতে হয় না।"

—চরক, সূত্রস্থান, ৬৪ পৃঃ।

খ। "কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই কারণ বন্ধ করিতে আরম্ভ করিবে, যাহাতে সভা তোমার নিজের পথের ন্যায় অভ্যস্ত অথবা বিপক্ষের দুর্গম প্রকরণের উল্লঙ্ঘ করে**। আর যে সভা কোন সংহিতাদির উপর নির্ভর করিয়া থাকে, ইত্যাদি।"

—বিমান স্থান, ৩৪৫ পৃঃ

৩। কোন কোন স্থলের অনুবাদ দেখিলে অনুবাদক মহাশয় যে, চরক-সংহিতা খানি কখনও কাহারও নিকট পাঠ করিয়াছেন, অথবা ইহার ব্যাখ্যার জন্য টীকা, টীপ্পনী দেখিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। যথা—

বাতজ্বর নিদানে বাত প্রকোপের নিদান মধ্যে,—

সংস্কৃত মূল।

"রুক্ষলঘুশীতব্যায়ামবমনবিরেচনাস্থাপনাতিযোগবেগসন্ধারণ।" ইত্যাদি। এই পাঠ অশুদ্ধ।

"রুক্ষ লঘু শীত বমন বিরেচনাস্থাপন শিরোবিরেচনাতিযোগব্যায়ামবেগ সন্ধারণ—" ইত্যাদি। এই পাঠই বিশুদ্ধ। (১)

বাঙ্গালা অনুবাদ।

"রুক্ষগুণবিশিষ্ট বস্তু,লঘু বস্তু, শীতল-বস্তু, পরিশ্রম, বমন, বিরেচন এবং আস্থাপন (নিরূহবস্তি) প্রভৃতির অতিশয় উপযোগ মলমূত্রাদির বেগধারণ"—এই অনুবাদ অসম্পূর্ণ।

রুক্ষ বা লঘু অথবা শীতগুণযুক্ত দেশ, কাল, আহার, ঔষধ, বমন, বিরেচন, আস্থাপন ও শিরোবিরেচন এই কয়টী

(১) মুরশিদাবাদে মুদ্রিত চরক দেখ।

প্রক্রিয়ার অতিযোগ অর্থাৎ একবারে অধিক পরিমাণে অনুষ্ঠান, কিম্বা উপযুক্ত পরিমাণে কপিককাল অনুষ্ঠান—(১) আর মলমূত্রাদির বেগধারণ ইত্যাদি।

বোধ হয়, এরূপ অনুবাদ হইলে, প্রকৃত অর্থ প্রকাশ হয়।

৪। সূত্রস্থান, দশম অধ্যায়, ৬০। ৬১ পৃঃ।

সংস্কৃত,—"ইদঞ্চ" হইতে "কান্ততমো ভবতি" পর্য্যন্ত।

উহারই বাঙ্গালা, "ইহা" হইতে "কমনীয়" পর্য্যন্ত।

সংস্কৃত—"হেতবঃ" হইতে "সুখ সাধ্যস্য লক্ষণং" পর্য্যন্ত।

উল্লিখিত স্থানটীতে, সংস্কৃত মূলের অশুদ্ধি, বাঙ্গালা অনুবাদের দুর্ব্বোধতা এবং মূলের বিপরীত অনুবাদ হইয়াছে।

এ স্থলে অশুদ্ধির উল্লেখ সহ, কিরূপ হইলে শুদ্ধ হইতে পারে, তাহাও লেখা যাইতেছে। যথা,—

ক। সংস্কৃত মূল।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
তদনাতুরেণ	যদনাতুরেণ
তুল্য চ ন গুণদূষ্যো	নচ তুল্যগুণোদূষ্যো
ন দোষা চুরুপক্রমঃ	নদেশো চুরুপক্রমঃ

খ। বাঙ্গালা অনুবাদের দুর্ব্বোধতা।

(১) "মেদস্বী কার্য্যকর ঔষধ প্রয়োগে উষ্ণ প্রকৃতি।"

(২) "কালগুণের সহিত তুল্য-শ্লেষ্মা বাত এবং পিত্তরোগ ধাতু ও দিবস সম্বন্ধে প্রাকৃত হইলে কাল গুণতুল্য কহে—।"

—অনুবাদকের লিখিত ৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

গ। মূলের বিপরীত অনুবাদ।

বাঙ্গালা—"যে রোগের দোষ প্রকৃতিস্থ নহে"—ইহা ভ্রান্তিপূর্ণ।

ইহার প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হওয়া উচিত,—কোনও ব্যক্তি বাত প্রকৃতি, কোন ব্যক্তি বা পিত্তপ্রকৃতি। এইরূপ মনুষ্যগণের প্রকৃতিতে প্রায়ই বাতাদি কোন না কোন দোষের বিকৃতি চিরকাল থাকে। তদনুসারে বাতাদি যে দোষে কোনও রোগ উৎপন্ন করে, সেই দোষটী যদি প্রকৃতির অন্তর্গত না হয়।

কৌতুকের বিষয় এই যে, অনুবাদক মহাশয়ের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। অনেকে মূলের কথাটীকে ভাল করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নে টীকা লেখে; ইহা দেখিয়া অনুবাদক কবিরত্ন মহাশয় ও এরূপ একটী টীকা লিখিয়াছেন। কিন্তু টীকা দ্বারা তিনি যে মূলের আরও সর্ব্বনাশ, করিলেন, ইহা বুঝিতে পারেন নাই। পাঠকগণ ৩১পৃষ্ঠাতে (৩) সংখ্যক টীকাটী দেখিবেন।

(১) ক্রুকলঘুশীতঃ ঔষধাহারদেশ-কালাঃ। বমনাদি চতুর্ণামেকতমস্য অতিযোগঃ, অতিযোগযুক্তবমনাদীনা-মিব সম্যক্ যোগেনাপ্যোষামতিসেবনেন বায়ুর্বৃং কুপ্যতি সোঽপি অরমতিনির্ব্ব-হৃতি। —চরক জল্পকল্পতরু টীকা।

৫। নিম্নলিখিত স্থলগুলিতে মূলের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। যথা—

(ক)। মূল—"গুরু বাতর্পণং স্থূলানাং কর্ষণং প্রতি।" বাঙ্গালা,—"স্থূলকায় ব্যক্তির স্থৌল্য বিনাশের জন্য গুরুপাকী এবং যে সমস্ত আহার দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ ও পুষ্ট হয়, এইরূপ আহার করিতে দিবেক।" এই অনুবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও অশুদ্ধ। ইহার প্রকৃত অর্থ এই,—যে সকল দ্রব্য পরিপাক করিতে অধিক সময় লাগে, এবং যাহা দ্বারা শরীরের রুক্ষতা ও কৃশতা সাধন হয়, এতাদৃশ দ্রব্য আহার করিলে স্থূলকায় ব্যক্তির স্থূলতা বিনাশ হয়।

—সূত্রস্থান, ১৩৮ পৃঃ।

(খ) মূল—"বিষমাহারেভ্যঃ"

অনুবাদ—"বিষাক্ত বস্তু ব্যবহারকারী।"

—নিদানস্থান, ২৪২ পৃঃ।

আমরা এই অনুবাদটী পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও বিষাদিত হইয়াছি। চমৎকারের কারণ এই যে, এতাদৃশ অনুবাদকারী ব্যক্তিও জনসমাজে "কবিরত্ন" উপাধি ধারণ করিয়াছেন। বিষাদের কারণ এই যে, এতদ্দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ। সুতরাং তাঁহারা এই বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া মহামূল্য চরক-সংহিতার শ্রাদ্ধ করিবেন এবং আয়ুর্ব্বেদের অর্থ বুঝিয়াছি, এই সংস্কারানুসারে লোকের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে সম্ভবতঃ অনেক লোকের প্রাণ নাশ করিবেন। (১) অধিকতর বিষাদের কারণ এই যে, ইণ্ডিয়ান্ মিরার প্রভৃতি যে সকল সংবাদপত্রের কথায় লোকের আস্থা আছে, তাঁহারা আপন আপন কাগজে এই চরকাণ অনুবাদের যেরূপ প্রশংসা প্রকাশ করিয়াছেন, যদি তাঁহারা বস্তুতঃ তদনুরূপেই হিত, অহিত ও দোষ গুণের বিচারে অসমর্থ হইয়া থাকেন, এবং দোষের পুরস্কার করিয়া গুণের পুরস্কারাভাব প্রচার করিতেছেন বলিয়া, আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয়, তবে আর আমাদিগের দুঃখের ইয়ত্তা নাই!!!

পরিশেষে আমরা কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয়কে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি যে, তিনি যেন যোগ্যতা লাভ না করিয়া আর এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপণ পূর্ব্বক আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত আয়ুর্ব্বেদের আরও দুরবস্থা সাধন না করেন; প্রধান প্রধান সংবাদ পত্র সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা পরের কথায় নির্ভর এবং উপরোধ অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের চিরাভ্যস্ত

(১) যাহা হউক, ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে,—পরিমিত অপেক্ষা অধিক, অথবা পরিমিত অপেক্ষা অল্প দ্রব্যর কিম্বা অনুপযুক্ত কালের ভোজনকে বিষমাহার বলে। (স্থল বিশেষে রাশি, করণ প্রভৃতি ৮ প্রকার আহার বিধানের বিপরীত আহারকে বিষমাহার বলে)।

সারবত্তা অবলম্বন করুন; এবং পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পুনরায় অনুবাদ না হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত তাহারা যেন প্রস্তাবিত চরকানুবাদ পাঠ করিয়া চরকসংহিতার অর্থ নির্ণয় না করেন। ইতি

কলিকাতা } কবিরাজ
আহীরীটোলা। } শ্রীচন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত।

ইন্দুমতী।

ইন্দুমতী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ কাব্য "মায়াকানন" নাটকের নায়িকা। আমাদের বিশ্বাস, মায়াকানন বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর নিকট সাধারণতঃ অপরিজ্ঞাত ও অনাদৃত। দশ বৎসরের মধ্যে এই নাটকের দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ প্রকাশিত হয় নাই। আজ কাল বঙ্গভূমে গৃহে গৃহে যে সকল মূর্ত্তিমান সেক্ষপিয়র বিরাজ করিতেছেন, প্রতি পল্লীতে যে সকল শাপভ্রষ্ট গ্যারিক অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের অনুগ্রহে নাটক অধ্যয়ন বালকের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, নাটক অভিনয় সাধুজনবিগর্হিত ও লোকসমাজে নিন্দনীয় হইয়া উঠিতেছে। কুক্ষণে বাঙ্গালী নাটক লিখিতে শিখিয়াছিল। কুক্ষণে বঙ্গদেশে বটতলায় সরস্বতী দেবী সর্ব্বভূতেষু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাই আজি এ দুর্ভাগ্য দেশের অকাল কোকিলের শেষ তান বঙ্গবাসী শুনিল না; এ অসংখ্য পলাশপুষ্পরাশির ভিতর এ মন্দার কুসুম প্রচ্ছন্ন রহিল। এ কাচমণির খনিগর্ভে পদ্মরাগ রত্ন হীনপ্রভ ও অন্ধকারাবৃত হইয়া রহিল।

মায়াকাননের যবনিকা উত্তোলিত হইল,আমরা সহসা রাজরাজেন্দ্র গান্ধাররাজের দুহিতা ইন্দুমতীকে একমাত্র সখী সঙ্গে সিন্ধুনগরের গভীর কাননমধ্যে দেখিলাম। তপস্বিনী অরুন্ধতীর নিকট শুনিয়াছি "যে ভারতরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, বৈভবে ও প্রভুত্বে দ্বিতীয় সুরপতি, শস্ত্রবিদ্যায় সাক্ষাৎ পাণ্ডবচূড়ামণি ফাল্গুনী ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমতুল্য, রাজর্ষি গান্ধাররাজ" কালের বিচিত্র গতিতে রাজ্যচ্যুত হইয়া ছদ্মবেশে উর্ব্বশী সদৃশ রূপসী কন্যার সঙ্গে সিন্ধুনগরে বাস করিতেছেন! যে কোমলতাময় গাম্ভীর্য্যময় গর্ব্বিত বচনে ইন্দুমতী সখী সুনন্দার সঙ্গে কথা কহিতেছেন পাঠক শুনুন, বুঝিতে পারিবেন অরুন্ধতী যাহা বলিয়াছেন সত্য, ইন্দুমতী রাজ-রাজেন্দ্র-নন্দিনীই বটে! তাহার মধ্যে দুইটী মাত্র কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ইন্দু। সখি! ঐ কি সেই মায়াকানন?

সুন। হাঁ রাজকুমারী!

ইন্দু। হা, ধিক্ সখি! তোর কি কিছুই জ্ঞান নাই? আমাদের কপাল গুণে বিধাতা কি তোরেও একেবারে জ্ঞানহারা করেচেন?

সুন। কেন?

ইন্দু। কেন কি? আমি রাজকুমারী, এমন কি রাজরাজেন্দ্রকুমারী; তবুও এ অবস্থায় আমাকে ওরূপ সম্বোধন করা আর কি সাজে?

সুন। হা বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? সখি! পোষা পাখী এক বার যা শিখেছে, সে কি আর সহজে তা ভুলতে পারে? * * * *

ইন্দু। সুনন্দা এখানে কেউ থাক আর না থাক্ প্রতিধ্বনিতো আছে। * * * *

এ গভীর অরণ্যানী মধ্যে ইন্দুমতী কেন আসিল? আর অই সখী সুনন্দার হস্তে পুষ্পপাত্র ও ধুপদান কেন? সুনন্দার মুখে শুনলাম "যে ভগবতী অরুন্ধতী দেবী বারংবার বলেচেন যে অই মায়াকাননে এক পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি আছে। যদি সুলগ্নে কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হইলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হইলে আপন ভাবী পত্নীকে সম্মুখে দেখতে পায়। আজ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সেই শুভলগ্ন। তা আমার বাসনা যে, এই সুসময়ে তুমি দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর, দেখি আমাদের ভাগ্যে কি আছে?"

কিন্তু ইন্দুমতীর হৃদয় সেখানে যাইতে যেন নিষেধ করিতেছে, তাহার পা যেন চলে না! সুনন্দা অনেক মিনতি করিয়া অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া পাষাণময়ী দেবী প্রতিমার সম্মুখে লইয়া আসিল। ইন্দুমতী অবশেষে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বর ভিক্ষা করিল যে তাহার ভাবী পতি দর্শনপথে উপস্থিত হউন। কবি ইন্দুমতী চরিত্রে দেখাইয়াছেন যে মনুষ্যের ইচ্ছাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ অধীন। স্বাধীন মনুষ্য ঘটনা-সমষ্টির মধ্যে সাগরতরঙ্গে পতিত বিহঙ্গের ন্যায়। ইন্দুমতীর ইচ্ছা পূর্ণ হইল। অকস্মাৎ অমেঘ আকাশের বজ্রধ্বনিতে বসুমতী কম্পিত হইল ও মৃগয়াবেশী সিন্ধুরাজকুমার অজয় দেবীসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মায়াকানন নাটকে যে গভীর রসের অবতারণায় মুগ্ধ হইয়াছি এইখানে, প্রথম দৃশ্যে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। ইন্দুমতীর প্রথম দর্শনেই আমরা বুঝিলাম যেন ইন্দুমতী এই পাপময় জগতের জীব নহে; যেন কোন পবিত্রতর স্থান হইতে ক্ষণকালের জন্য দর্শককে মোহিত করিবার জন্য এ মর্ত্ত্যলোকে আসিয়াছে। সে যেন নিজে বুঝিতে পারে না, কিন্তু যে তাহার কোমলতাময় সরোজকান্তি অবলোকন করে, তাহার বীণাঝঙ্কারের ন্যায় মধুর কথাগুলি শুনে, সেই যেন বুঝিতে পারে

যে তাহার পার্থিব জীবন স্বপ্নমাত্র। রাজকুমার অজয় যদি তমসাচ্ছন্ন বনস্থলীতে এ ফুল্লমুখী উষাপদ্মিনী প্রস্ফুটিত দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ না হইতেন তবে তিনিও বুঝিতেন যে এ মর্ত্ত্যভূমি এ সুরলোকের রত্নে অধিকক্ষণ উজ্জ্বল থাকিতে পারে না! অজয়ও দেবী-সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে "যেমন পদ্মে সুগন্ধ চিরবিরাজিত তেমনি ইন্দুমতী তাঁহার হৃদয়ে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত রহিলেন।" ইন্দুমতী ও অজয়ের বিদায়ের দৃশ্য অভিজ্ঞানশকুন্তলা হইতে অনুবাদিত। মাইকেলের গ্রন্থ পুস্তকসকল পাঠে বোধ হয় যে কালিদাস ও বাল্মীকির কাব্যসকল যেন তাঁহার অস্থি ও শোণিতের সঙ্গে মিলিত রহিয়াছে, তিনি চেষ্টা করিলেও যেন তাহা আপন কাব্য হইতে বিভিন্ন রাখিতে পারেন না। অজয়ের পিতা মন্ত্রীকে এ বিবাহে বাধা দিতে আদেশ করিয়া লীলা সম্বরণ করিলেন ও অজয় সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন! কিন্তু অজয় মায়াকাননে মনোমোহিনী ইন্দুমতীকে দেখিয়া অবধি উন্মত্তপ্রায়। মন্ত্রী রাজনন্দিনী শশী-কলার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাজকুমার হৃদয়মধ্যে যে চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তৃষ্ণাতুর পথিকের মনোমোহিনী মরীচিকা মাত্র কি না স্থির করিবার জন্য নগরের যাবতীয় কুমারী কন্যাকে বিলাসকাননে নিমন্ত্রণ করিলেন। ছদ্মবেশী গান্ধাররাজদুহিতাও বিলাস-কাননে আসিলেন! অজয়ের সঙ্গে আবার ইন্দুমতীর সাক্ষাৎ হইল!

বিলাসকাননে অজয় ও ইন্দুমতীর সাক্ষাতের এই দৃশ্যটী কাব্যজগতে দুর্লভ, বঙ্গীয় নাটকে অতুলনীয়! এ দৃশ্যের গভীর করুণরসে হৃদয় আর্দ্র হয়, বজ্রধ্বনির ন্যায় গম্ভীর, হৃদয়উন্মাদ-কর শব্দে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইতে হয়! অরুন্ধতী দেবী যথার্থ বলিয়াছিলেন একবার বনদেবীর মায়াতে যে অনল প্রজ্বলিত হয়েছিল, পুনঃসন্দর্শনে তাহাতে আবার আহুতি প্রদত্ত হইল। সে দৃশ্য এখানে উদ্ধৃত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য দেখান অসম্ভব। দৃশ্যকাব্য হইতে কোন একটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া তাহার দোষ গুণের বিচার করা যায় না। যেমন তাজমহল হইতে একটী অংশ ভগ্ন করিয়া দেখাইলে তাজমহলের প্রকৃত সৌন্দর্য্যের কিছুই দেখান হয় না, সেইরূপ চিত্র সংযোগ করিয়া কবি পর্য্যায়ক্রমে যে চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন, না দেখিলে, মায়াকাননে এই দৃশ্যের ইন্দুমতীচরিত্রের বিপুল সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। অজয়ের প্রতি ইন্দুমতীর অনুরাগ আকস্মিক ইন্দ্রজালবৎ! এই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়া, ইন্দুমতীর কোমল হৃদয়ে এ প্রচণ্ড অনল প্রজ্বলিত করিয়া, তাহাকে আশা-মরীচিকায় মুগ্ধ করিয়া, কবি পর মুহূর্ত্তে কি সুন্দর চিত্রনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। আশা-মরীচিকায় মুগ্ধ

কোমলপ্রাণা ইন্দুমতী সহসা শুনিল অজয় তাহাকে গান্ধারের বর্ত্তমান রাজা বিশ্বাসঘাতক ধূমকেতুর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের জন্য, আপন রাজ্যবিনাশ আশঙ্কায় তাহাকে গান্ধারদূতের সঙ্গে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। মায়াকানন নাটকের উপাখ্যান ভাগের এই অংশটীতে অজয় চরিত্রের সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইয়াছে সত্য কিন্তু করুণরসের অবতারণায় কবি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহার পর মায়াকাননে ইন্দুমতী ও অজয়ের শেষ অভিনয়। আমরা প্রথম হইতে ইন্দুমতীচরিত্র যে কৌশলময় সুসংস্থানে পরিপূর্ণ দেখিয়া আসিতেছি, এই দৃশ্যে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে মাধুর্য্যময় বর্ণে ইন্দুমতীচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে এই দৃশ্যে তাহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। "মহারাজকে বলিস্ গান্ধারের রাজকুমারী বিনিময়ের সামগ্রী নয়" এই একটী কথায় ইন্দুমতীর হৃদয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে!

ইন্দুমতীচরিত্র কি প্রকার সংস্থানসমূহে সংযোজিত হইয়াছে ও সেই সকল সংস্থান এই বিয়োগান্ত নাটকের কত দূর উপযোগী, এক্ষণ আমরা তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। ইন্দুমতীর প্রেম রূপমোহসম্ভূত। কিন্তু সেক্ষপিয়রের (Venus and Adonis) ভিনিস্ ও অ্যাডোনিসে চিত্রিত প্রেমের ন্যায় অন্ধ প্রেম নহে। বাইরণের (Byron) জুলেকা (Zuleika) অথবা গলনেয়ারের (Gulnare) প্রেমের ন্যায় বিবেকশূন্য নহে। যে কোমলতাময় বর্ণে ওথেলোর (Othello) দেসদিমনা(Desdimona)ও উত্তরচরিতের সীতার প্রেম চিত্রিত হইয়াছে ইন্দুমতীর প্রণয়ের চিত্রে সে কোমলতা নাই। ইন্দুমতীর প্রেম সহসা প্রদীপ্ত বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, উত্তপ্ত ও আলোকময়! যে উজ্জ্বল আভায় জুলিয়েট (Juliet) চরিত্র প্রদীপ্ত হইয়াছে, যে গভীর উজ্জ্বল বর্ণে শকুন্তলা ও সাগরিকা অঙ্কিত হইয়াছে ইন্দুমতীচরিত্র সেই গাঢ় বর্ণে চিত্রিত।

মায়াকানন বিয়োগান্ত নাটক। প্রথম হইতেই মায়াকাননে বিয়োগান্ত দৃশ্যের গভীর করুণ রসের আভাস পাওয়া যায়। তবে ইহার উপসংহারে যেন পাঠককে সান্ত্বনা প্রদান জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির অসার শব্দাড়ম্বরপূর্ণ দীর্ঘ বক্তৃতা কেন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঋষ্যশৃঙ্গের অভিনয় আমাদের মতে বটতলার নাটকের উপযুক্ত, মায়াকাননে স্থান পাইবার অযোগ্য। যে গভীর রসের অবতারণায় আমরা ইন্দুমতীর চরিত্র পরিস্ফুট দেখিলাম ইহাতে তাহার ব্যভিচার ঘটিয়াছে। নাট্যোল্লিখিত ঘটনাবলীর সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাই না। কবিবর মধুসূদন যখন রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া মায়াকানন নাটক প্রণয়ন শেষ করেন, সেই সময়ে তাঁহার হস্তলিপিক পাণ্ডু-

লিপি পড়িয়াছিলাম। তখন উহাতে প্রবাসুন্দ ও শিষ্যগণের নাম গন্ধও ছিলনা। রাজনন্দিনী শশীকলার আক্ষেপের পর যবনিকা পতন দেখিয়াছিলাম। যদি কবি পুনর্ব্বার নাটকখানি সংশোধন করিয়া থাকেন, বলিতে পারি না। কিন্তু রুগ্ন শয্যায়ও কবিকুলচূড়ামণি মধুসূদনের এরূপ মস্তিষ্কের বিকার জন্মিয়াছিল, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। সে যাহা হউক দোষ স্বত্বেও মায়াকানন যে বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে একটী উজ্জ্বল রত্ন, ইন্দুমতী যে কাব্য-উদ্যানে একটী সুন্দর সুরভি প্রসূন সে বিষয়ে সংশয় করি না। মাইকেলের এই শেষকাব্য খানি বঙ্গীয় পাঠকের রুচির সম্যক্ পরিচয় দিতেছে। যিনি বঙ্গ ভাষায় মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রণেতা, তিলোত্তমা ও ইন্দুমতীর সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি মাতৃভাষার উন্নতির জন্য কঠোর মন্ত্রসাধন করিয়া শরীর পতন করিলেন, আজি তাঁহার শিশু পুত্রকে উদরান্নের অভাবে শমনের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইল। বঙ্গদেশবাসি! তুমি না রাজনৈতিক আন্দোলনে জগতের সভ্যজাতি সকলের সহানুভূতি পাইবার আকাঙ্ক্ষা কর? যদি মাইকেল মধুসূদন ইউরোপখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে তিনি পীড়িত শয্যায় শয়ন করিয়া, অনশন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়, ব্যাধি ক্লেশবিধুর হৃদয়ে, জীবনের স্তিমিতপ্রায় দীপালোকে, যে কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা জঘন্য অপাঠ্য হইলেও তাহার মূল্যে তাঁহার পুত্র কন্যা স্বচ্ছন্দে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত, তবে, আজি তাঁহার স্বদেশবাসিগণ ইন্দুমতীচরিত্রের সুবর্ণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত! পাণ্ডিত্যাভিমানি ধনাঢ্য বঙ্গালি! তুমি যদি বাহ্যাড়ম্বরের দাস না হইতে, তবে এই যে স্বর্ণাক্ষররঞ্জিত বৈদেশিক গ্রন্থ-নিচয়ে পুস্তকাগার সজ্জিত রহিয়াছে, উহার এক পার্শ্বে মায়াকাননকেও স্থান দিতে। আর তুমি রাজনীতিবিশারদ শিক্ষিত যুবক! তোমার গৃহিণীর মনো-রঞ্জনের জন্য অইযে স্তূপাকার বাঙ্গালা নাটক ও উপন্যাসে শয়নগৃহ সজ্জিত করিয়াছ যদি স্বদেশের জন্য তোমার হৃদয়ে কিছুমাত্র মমতা থাকিত, তবে এই পুস্তকরাশি অন্ততঃ মসলাওয়ালার দোকানে পাঠাইয়া দিয়া তাহার বিনি-ময়ে এক খণ্ড মায়াকানন ক্রয় করিতে!

পরিব্রাজক।

সমর-শেখর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনন্দি-শামার বাক্য আহাজস্থ সকলের কর্ণে বজ্রবৎ ধ্বনিত হইল,—তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য নিস্পন্দ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল! সকলে ভাবিল, "এ কি স্বপ্ন!

ডন্‌-দি-গামা বিশ্বাসঘাতক?" প্রথমতঃ অনেকে মনে করিল ডন তাহাদিগের প্রতি বিদ্রূপ করিতেছেন; আবার অনেকের মনে হইল বুঝি ডন পাগল হইয়াছে; নতুবা এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ-বাক্য কেন বলিবে? ডন কি বিশ্বাস-ঘাতক?

কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃশ্য কে অবিশ্বাস করিতে পারে? বৈদান্তিকেরা করেন করুন, কিন্তু পর্ত্তুগিজগণ বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করে নাই; সংসারে থাকিয়া সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে গেলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের তুল্য আর কি প্রমাণ আছে? পোতস্থিত সৈনিকগণ যখন স্পষ্ট দেখিল সেই পর্ত্তুগিজবেশধারী ডন-দি-গামা হস্ত উত্তোলন করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে সেই কথাগুলি বলিলেন, তখন তাহারা কি প্রকারে অবিশ্বাস করিতে পারে? ডন যখন তাহাদিগকে সেইরূপ কঠোর বাক্যে ত্রাসিত করিলেন, তখন তাঁহার সেই পর্ত্তুগিজ বেশই পরিহিত ছিল, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাহারা দেখিল তাঁহার আর সে বেশ নাই; সেই অজানুলম্বিত অঙ্গরেখার পরিবর্ত্তে বিকট কবচ পরিহিত; মস্তকে দিব্য হেম কিরীট;—কিরীটের শীর্ষদেশ জ্যোতির্ম্ময় ত্রিশূলে পরিশোভিত, জ্যোতির্ম্ময় ত্রিশূল উজ্জ্বল রবিকিরণে বিভাসিত হইয়া তিনটী অচল বিদ্যুৎ-রেখার ন্যায় ধক ধক্ করিতেছিল; তবে কি ডন-দি-গামা পর্ত্তুগিজ নহেন? যদি পর্ত্তুগিজ হইবেন, তবে তাঁহার সেরূপ বেশ কেন? পর্ত্তুগিজগণ! প্রতারিত হইয়াছে; ডন পর্ত্তুগিজ নহেন, ডন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ডন হিন্দু, পরম হিন্দু; তিনি পবিত্র শৈব মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনি আর কেহই নহেন, আমাদের চির-পরিচিত সমর শেখর। সমর সতীশকে কাঁদাইয়া পিতৃ-আজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া এই কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে অগণ্য শস্ত্রধারী পুরুষ সমরের পশ্চাতে আসিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের সকলেরই সমরের ন্যায় বেশ বিন্যাস, কেবল শিরস্ত্রাণের তারতম্য আছে;—তাহাদের উষ্ণীষ অয়সময়, তদুপরি রজত ত্রিশূল উদ্যত। সমরের ইঙ্গিতমাত্র তাঁহার সৈনিকগণ জাহাজের প্রতি স্ব স্ব বন্দুক উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান হইল; তখন তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বিশুদ্ধ পর্ত্তগিজ ভাষায় আবার বলিলেন "পর্ত্তুগিজ সৈন্যগণ! এখনও আমার কথা শুন, নতুবা তোমাদের সহিত জাহাজ সাগরজলে ডুবাইয়া দিব।"

কাপ্তেন নিহত হইলে জাহাজের রক্ষণভার সারজেন্টের হস্তে অর্পিত হইল। তিনি তখন কাপ্তেনেরই পদে অভিষিক্ত হইলেন, সুতরাং আমরা তাঁহাকে কাপ্তেন বলিয়া অভিহিত করিব। নবীন কাপ্তেন বিচক্ষণ লোক; একটী গুপ্ত রন্ধ্র দিয়া তিনি ভাল করিয়া দেখিলেন যে, জাহাজ হইতে গোলা বর্ষণ করিলেও

শৈবী সেনার কিছুই হইবে না, কেন না তাহারা উচ্চ শৈলকূটের উপরিভাগে দণ্ডায়মান। গোলা তাহাদের বহুনিম্নে পর্ব্বতগাত্রে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তথাপি তাহাদিগকে ভয় দেখাইবার অভিপ্রায়ে তিনি স্বীয় সৈনিকদিগকে গোলা বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। অমনি এক একটী কামানের বিকট মুখগহ্বর হইতে এক একটী জলন্ত গোলা উদ্গীর্ণ হইয়া পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইল। সাগরাম্বু আলোড়িত হইল, পর্ব্বত প্রদেশ ভীষণ ভূকম্পনে কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত প্রদেশ নিবিড় ধূমপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ধূমজাল ছিন্ন ভিন্ন হইলে কাপ্তেন সবিস্ময়ে দেখিলেন, শৈবী সেনা পূর্ব্বের ন্যায় অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কাপ্তেন তখন আমের্ডার প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তলে সেনাদল-সমাবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সমর হাসিয়া বলিলেন "মালিম! তোমার ন্যায় চতুর ব্যক্তিকে প্রাণে মারিব না; কিন্তু তুমি নিজ দক্ষিণ বাহু রক্ষা কর?" অমনি বন্দুক উদ্যত করিয়া গুলি বর্ষণ করিলেন। কাপ্তেন সতর্ক হইতে না হইতেই দক্ষিণ ভুজে আহত হইয়া পোতাঙ্গনে পতিত হইলেন। সৈনিকগণ তাঁহাকে কামরার ভিতর লইয়া গেল।

কাপ্তেন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া তিনি একজন সুদক্ষ সৈনিককে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি দূতস্বরূপ উহাঁদের নিকট গিয়া উহাঁদের মনোভাব জানিয়া আইস।" অচিরে তাঁহার আদেশ পরিপালিত হইল। তখনই পর্ত্তুগেলের রণরঙ্গিণী পতাকা নমিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সন্ধিজ্ঞাপক শুভ্র ধ্বজা উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে সমর স্বীয় সৈন্যদিগকে অস্ত্রশস্ত্র নমিত করিতে আদেশ করিলেন। দূত নৌকারোহণে তীরে উপনীত হইল। তাহাকে উপযুক্ত শিষ্টাচারের সহিত গ্রহণ করিবার জন্য সমর কতিপয় সৈনিককে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা দূতকে সম্ভ্রমের সহিত আপনাদের অধিপতির নিকট আনয়ন করিল। দূত সমাগত হইলে সমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে কিরূপ সন্ধির প্রস্তাবের সহিত এখানে প্রেরণ করিলেন?"

দূত বলিল "তিনি সন্ধি স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে সন্ধির প্রতিজ্ঞা আপনার নিকট শুনিতে আসিয়াছি, আপনি কি কি সর্ত্তে সন্ধিবন্ধনে সম্মত হইতে পারেন?"

সমর যথোচিত শিষ্টাচারের সহিত উত্তর করিলেন "কাপ্তেন যখন সন্ধি স্থাপনে স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন উভয় পক্ষে অবশ্য ন্যায়সম্মত সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইবে। আমারও ইচ্ছা নহে যে, অকারণে প্রাণিহত্যা বা শোণিতপাত করি। যদি সন্ধি স্থাপন করাই আপনাদের অভিপ্রেত হয়, তবে কাহারও

ও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি, গোলা ও বারুদ আমাদের হস্তে অর্পণ করুন। ইচ্ছা হয়, আমার সেনাদলে নিবিষ্ট হউন, বন্ধুর ন্যায় সযত্নে থাকিবেন—নতুবা গোয়া নগরে ফিরিয়া যাউন, আমি উপযুক্ত যানবাহনাদি প্রদান করিতেছি।"

"যে আজ্ঞা, কাপ্তেন সাহেবকে তবে এই কথা নিবেদন করি" বলিয়া দূত আর্মেডায় ফিরিয়া গেলেন। সমরের শিষ্টাচারে তাঁহার মন মোহিত হইয়াছিল। শত্রুর নিকট এরূপ শিষ্টাচার তিনি কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই। অনন্তর যথাকালে জাহাজে উত্তীর্ণ হইয়া দূত সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন এবং সমরের যথোচিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন "শত্রুর নিকট এরূপ শিষ্টাচার কেহ কখনও পাইয়াছে কি না, সন্দেহ। ভারতীয়গণ বীরধর্ম্ম যথার্থই পালন করে।"

সমরের ঔদার্য্যের বিবরণ শুনিয়া কাপ্তেনও মোহিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন "এরূপ সঙ্কটে যুদ্ধ করা আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যুদ্ধ করিব না সন্ধি—সন্ধি—সন্ধিসূত্রেই আবদ্ধ হইব। কিন্তু এ কলঙ্কিত মুখ লইয়া কেমন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইব? আহা, কি উদারতা!—কি মহত্ত্ব! এরূপ মহোচ্চ হৃদয়ের পূজা কোন্ হৃদয়বান্ পুরুষ না করিয়া থাকিতে পারে? সন্ধিই স্থির;—আত্মসমর্পণই যুক্তিযুক্ত;—মহোচ্চ হৃদয়ের বন্ধুত্বই প্রার্থনীয়।" অমনি আর্মেডার সমস্ত ধ্বজা নমিত হইল। পর্ত্তুগিজ সৈনিকমণ্ডলী অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া অনাবৃত মস্তকে নৌকারোহণ পূর্ব্বক তীরে উত্তীর্ণ হইল। সমর তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আর্য্য অনার্য্যে, হিন্দুতে খ্রিষ্টানে,—শৈবে ক্যাথলিকে অপূর্ব্ব সম্মিলন! ভারতীয় ও পর্ত্তুগিজে হৃদয়ভরা আলিঙ্গন! "হর, হর, মহাদেব" রবে পর্ব্বতপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেই ঘোর রজনীযোগে পশ্চিমাচলের সেই উপত্যকা মধ্যে জলোচ্ছ্বাসে নিপীড়িত হইয়া সন্ন্যাসী মথিত হৃদয়ে যখন বলিয়া উঠিলেন "মা, তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না!" সেই সময়ে সেই নৈশ গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পর্ব্বত প্রদেশের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া একটী প্রচণ্ড গম্ভীর বাক্য নির্গত হইল "মায়ের উদ্ধারার্থ কি পণ করিতে পার।" সন্ন্যাসী চমকিত হইলেন। তাঁহার অবসন্ন দেহ আবার নব বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিল। সকলই স্বপ্নবৎ বোধ হইল। সেই ভীষণ দুর্যোগে, সেই সঙ্কটময় স্থানে কে তাঁহাকে সেরূপ প্রশ্ন করিল? সবিস্ময়ে একবার তিনি চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু

কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার সেই গম্ভীর বিকট নিস্তব্ধতা দূর করিয়া সেই গম্ভীর বাক্য উত্থিত হইল "মায়ের উদ্ধারার্থ কি পণ করিতে পার?" সন্ন্যাসীও বজ্রগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন "আপনি যেই হউন, আপনার সম্মুখ শপথ করিয়া বলিতেছি, মায়ের উদ্ধারার্থ আমি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারি।" সন্ন্যাসীর বাক্য শেষ হইবামাত্র আবার তখনই শ্রুত হইল—"তবে এই দিকে আইস।" অকস্মাৎ সমস্ত প্রদেশ এক বিমল আলোকে বিভাসিত হইল। যেন নির্ম্মল আকাশে শারদীয় পূর্ণ চন্দ্র উদিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী চমকিত হইয়া দেখিলেন একখানি নৌকা হইতে সেই সুবিমল আলোক নিঃসৃত হইতেছে। নৌকাখানি গোল, তাহার উপরে ছই নাই। তাহাতে একটী স্ত্রীলোক এক খানি ছোট বটে ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। রমণী অপূর্ব্ব সুন্দরী, সেরূপ অনুপম সৌন্দর্য্য সন্ন্যাসী পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তাহার সম্মুখে একটী বড় লণ্ঠনের মধ্যে একটা আলোক জ্বলিতেছে; সেই উজ্জ্বল আলোক সুন্দরীর স্বর্গীয় দেহে প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন এক খানি জ্যোৎস্নাময়ী প্রতিমা ভাসিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসীর ভ্রম হইল বুঝি সেই লাবণ্যবতীর সৌন্দর্য্যেই দিগ্‌দেশ আলোকিত হইয়াছে। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে তর্ক করিতে লাগিলেন, "একি! জননী আমার কি সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার রক্ষা করিতে আসিলেন; না এ কোন বনদেবী? ইনিত কখনই মানবী নন; এরূপ তরল লাবণ্যজ্যোতি এ পৃথিবীতে কি জন্মিতে পারে?" এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে সন্ন্যাসী সেই নৌকার নিকট সত্বরণ সহকারে গমন করিলেন। সুন্দরী স্বীয় সুকুমার হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে নৌকার উপর উঠাইয়া লইল; পরে তাঁহাকে একখানি শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া তরণী ছাড়িয়া দিল। সেই গভীর জলরাশির প্রশস্ত বক্ষ বিকম্পিত করিয়া ক্ষুদ্র নৌকাখানি একটী সঙ্কীর্ণ উপত্যকার ভিতর দিয়া তরতর বেগে একদিকে ছুটিয়া চলিল। সেই সঙ্গে একটী গীত শ্রুত হইল। গীত কে গাহিল, সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু সে গান শ্রবণে তিনি মুগ্ধ ও চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন দুইটী স্ত্রীলোক সেই পর্ব্বতমালার অধিত্যকা প্রদেশের উপর সেই গান গাহিতে গাহিতে নৌকার সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসী শুনিলেন:—

মা বলে ডাক্‌রে সদা মন!
মা বলে পরাণ ভরে ডাক্‌লে পরে
জুড়াবে তাপিত জীবন।
মা যে জীবের জীবন
সার, সনাতন, অমূল্য রতন,

এ জীবন তাঁর (ই) তরে দিলে পরে
লভিব অনন্ত জীবন ॥
মা যে জীবের শক্তি,
জীবন-মুক্তি, শক্তির কারণ,
তাঁরে না ডাক্‌লে পরে, এসংসারে
না হয় শক্তি সাধন ॥

স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাসে প্রকৃতিকে নিস্তব্ধিত করিয়া গান গীত হইতে লাগিল; সেই গানের মোহকর প্রভাবে হউক অথবা পরিধেয় বসনের কোন গূঢ় শক্তিতে হউক সন্ন্যাসীর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল; তিনি ক্রমে ক্রমে সেই নৌকার উপর শুইয়া পড়িলেন।

রমণী নৌকা চালাইয়া কটচক্রের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। যে দ্বারপথে সেই দিন সেই বালিকা মেষ লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা সে দ্বার নহে। ইহা মঠের একটী গুপ্তদ্বার; নদীজল উচ্ছ্বসিত হইয়া এই দ্বারদেশের চতুঃকাষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছে। দ্বারের সম্মুখে তরণী সংলগ্ন হইবামাত্র, কপাট উন্মুক্ত হইল; অমনি চারিজন পুরুষ একখানি ক্ষুদ্র খট্টা লইয়া রমণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণী মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া দিলে তাহারা তাঁহাকে সেই খট্টার উপর ধীরে ধীরে শায়িত করিয়া সুন্দরীর সহিত মঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। তখনই মঠের গুপ্তদ্বার নিঃশব্দে রুদ্ধ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বাহকেরা বিচেতন সন্ন্যাসীকে সেই খট্টা শুদ্ধ লইয়া একটী আলোকিত বিস্তৃত সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অল্প-সময়ের মধ্যেই সেই বৃহৎ বিল অতিক্রম করিয়া একটী সোপানমঞ্চ আশ্রয় করিল, তৎপরে একটী আলোকিত গৃহে যাইয়া উপনীত হইল। গৃহটী এরূপ আলোকিত, হঠাৎ দেখিলে যেন দিবাকাল বলিয়া বোধ হয়। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি দারুময় পর্য্যঙ্ক; তদুপরি কোমল পরিষ্কার শয্যা; শয্যার উপর চারিটী বালিশ সজ্জিত। তাহারা সন্ন্যাসীকে সেই শয্যায় শায়িত করিল এবং গৃহের ভিতর হইতেই কপাট রুদ্ধ করিয়া ভিত্তিস্থিত একটী সুগুপ্ত সুড়ঙ্গ দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। সুড়ঙ্গদ্বার যেমন, তেমনই রুদ্ধ রহিল। গৃহের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ অস্ত্রাধার উদ্ঘাত। অস্ত্রাধারে খড়্গা, তরবার, ছুরিকা, প্রাশ, শূল ও বন্দুক—এই কয়েকটী অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত; তন্নিম্নে একখানি বৃহৎ চর্ম্ম ঢাল; ঢালের দুইপার্শ্বে শরপূর্ণ দুইটী বৃহৎ তূণীর; উভয় তূণীরের পার্শ্বে দুই গাছ বড় ধনু; সর্ব্বোপরি একটী মাতুঙ্গ শিরস্ত্রাণ। খট্টার শিরোদেশে একখানি বড় কাগজে বড় বড় স্পষ্ট অক্ষরে "চক্রের নিয়মাবলি" নামধেয় নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক লিখিত :—

"বিনাপরিণয়ং বীরঃ
শক্তিসেবাং সমাচরন্।
পরস্ত্রীগামিনাং পাপং
প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥
সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে
সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্র
সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক॥
নাত্র জাতি বিচারোঽস্তি
নোচ্ছিষ্টাদি বিবেচনম্।
চক্রমধ্যগতা বীরা
মম রূপা নচান্যথা॥
চক্র মধ্যে বৃথালাপং
চাঞ্চল্যং বহুভাষণম্।
নিষ্ঠীবন মধোবায়ুং
বর্ণভেদং বিবর্জয়েৎ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ
শূদ্রাঃ সামান্যজাতয়ঃ।
কুলধর্ম্মাশ্রিতা যে বৈ
পূজ্যাস্তে দেববৎ সদা।
বর্ণাভিমানাচ্চক্রেতু
বর্ণভেদং করোতি যঃ।
স যাতি ঘোর নিরয়মপি
বেদান্ত পারগঃ॥
চক্রান্তর্গত কৌলানাং
সাধুনাং শুদ্ধচেতসাম্।
সাক্ষাচ্ছিব স্বরূপাণাং
পাপশঙ্কা ভবেৎকুতঃ?
যাবদ্বসন্তি চক্রেষু
বিপ্রাদ্যাঃ শৈবমার্গিণঃ।
তাবত্তু শাস্তবাচারাং
শ্চরেয়ুঃ শিবশাসনাৎ॥
চক্রাদ্বিনিঃসৃতা সর্ব্বে
স্বস্ব বর্ণাশ্রমোদিতম্।
লোক যাত্রা প্রসিদ্ধ্যর্থং
কুর্য্যুঃ কর্ম্ম পৃথক্ পুনঃ॥"

সন্ন্যাসীর শিয়রে দেওয়ালের গায়ে যেখানে এই নিয়মপত্রখানি ঝুলিতেছিল, তাহার ঠিক বিপরীত দিকের ভিত্তিগাত্রে চারিটী দারুময় 'নাগদন্তক নিহিত। নাগদন্তকে দুইটী সাজোয়া,—তন্মধ্যে একটী লৌহজাল জড়িত, অপরটী আয়সপত্রনির্ম্মিত। সেই দাণ্ডার উপর আরও দুইটী পায়জামা, দুইটী কটিবন্ধ, এবং দুইখানি গেরুয়া কাপড়। তন্নিম্নে ভূমিতলে একখানি ছোট চৌকীর উপর দুই প্রকারের দুই জোড়া উপানৎ।

গৃহের অপর পার্শ্বস্থ ভিত্তিগাত্রে ভারতের একখানি বিস্তৃত মানচিত্র লম্বিত। সেই মানচিত্রখানি পৌরাণিক ভূগোল বৃত্তান্তের অনুসারে অঙ্কিত। আধুনিক নগরগুলি ভিন্ন তাহাতে নদ নদী ও ভূধরাদি প্রাচীন নামেই বর্ণিত। সেই হিমগিরি, সেই মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমাণ, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্ররূপ সপ্ত কুলাচল; সেই দর্দ্দুরাচল, বাতন্ধম, তুঙ্গপ্রস্থ, জয়ন্ত, রৈবত ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি শৈল মালা ও কূটাদ্রি। এই সকল পর্ব্বত হইতে যে সকল নদ নদী বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহাদেরও উল্লেখ ও স্থিতিভূমি যথাযথ প্রকটিত হইয়াছে।

মানচিত্রের শিরোদেশে আদর্শ বচনস্বরূপ নিম্নোক্ত কয়েকটী শ্লোক লিখিত ছিল :—

"জানিহি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বূদ্বীপে।
যতো হি কর্ম্মভূমেষা ততোঽন্যা
ভোগভূময়ঃ।
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গ ভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥

আমার প্রাণ।

আমি তো ম'রে আছি,
প্রাণ কেবলি বেঁচে আছে ;
ধড়ের ভিতর ধড় ফড়ানি,
ধড় ছেড়ে প্রাণ গেলে বাঁচে।
খাঁচার পাখী জ্যান্তে মরা,
প্রাণটা আমার তেমি ধারা,
শরীর খাঁচায় কেবল চেঁচায়,
জ্বালায় কাঁদে আমায় খোঁচায়,
বিষাদ হাঁদে কেঁদে কেঁদে,
আধ খানি প্রাণ হ'য়ে গেছে।

২

আমি প্রাণ পুষতে জানি না,
আমি প্রাণ তুষতে জানি না ;
প্রাণের আদর—প্রাণের কদর কিছুই
জানি না,
আমার দরদ, প্রাণ বোঝে মোর,
প্রাণের দরদ, বুঝি না।

৩

কোমল কঠিন এক ঠাঁয়ে কি থাক্‌তে
পারে গো,
আমি কঠিন, বড়ই কঠিন,
প্রাণটি আমার বড়ই কোমল ;
পাষাণ আমি,—লোহা আমি,
প্রাণটী আমার নরম ননী ;
আমি কাঁটা—শক্ত কাঁটা,
প্রাণটি আমার ফুলটি ফোটা,
আমার জ্বালায় দিন দু বেলায়
আকুল বিকুল হ'য়ে ভাসে নয়নধারে গো!

৪

ছি ছি, কি ঘৃণার কথা,
কেবল দি প্রাণকে ব্যথা,
নিজেরটা কেবল বুঝি,
প্রাণের ব্যথা বুঝি না ;
নিজের সুখ কেবল খুঁজি।
প্রাণের সুখটী খুজি না।
বড়ই আমি অবিশ্বাসী,
আমার প্রাণের সুখবিলাসী,
প্রাণের দুখ ভাল বাসি,
প্রাণের—প্রাণ কাঁদানো চোখের জলে
একটি বারত ভিজি না ; —
প্রাণ মজেছে আমার তরে,
তার তরে কই মজি না।

৫

আমার সুখে সুখী আমার প্রাণ,
আমার দুখে দুখী আমার প্রাণ,

আমার পাশে প্রাণের প্রাণের টান,
প্রাণের আমি জ্ঞান,
প্রাণের আমি ধ্যান,
প্রাণের আমি মান,
প্রাণের আমি প্রাণ!
কিন্তু আমার প্রাণের প্রতি আমার
বিষনয়ান।

৬

বড় দুখ রৈল মনে,
কিসের তরে এমন ডর?
প্রাণকে কেন ভাবি পর?
প্রাণ আছে, তাই বেঁচে আছি,
কিন্তু তারেই করি হতাদর।
প্রাণ যদি আজ ছেড়ে পালায়,
তা হলে আর থাকবো কোথায়?
কাঁকের মুখে বাঘ ঢুকে,
ভেঙে যাবে সাধের ঘর;
পঞ্চভূতে লুটবে মোরে,
সাধের শরীর ফেলবে ছিঁড়ে,
চিবিয়ে খাবে যখন্ তা কোরে
অন্ধকারে দেখিয়ে ডর।

৭

তোমরা বল যমের দূত;
আমি বলি—পঞ্চভূত *।
তোমরা বল—যম;
আমি বলি—তম †।

প্রাণ প্রহরী আছে যাই,
এরা আমার কাছে তাই
ঘেঁসতে পারে না;
তাপ করে আছে বসে,
বাগ পেলেই ধরবে কোসে;
কিন্তু আমার প্রাণের ডরে,
এদের প্রাণ পালায় সরে,
আসতে পারে না।

৮

আমার এমন মর্য্যদ প্রাণ,
তার পানে মোর নাইকো টান;
এ প্রাণকে আমি ভুলে আছি,
এখন কবে কদিন বাঁচি?
কাল-সাগরে এল প্রলয় বান,
ডুবলো বুঝি আমার তরী খান!
ও প্রাণ! ও প্রাণ! বাঁচাও মোরে!
ভুলবো না আর এমন কোরে
তোমায়, আমার প্রাণ!
ভ'জবো তোমায়—পূজবো তোমায়
মজবো তোমার গেয়ে গান;
আমার যেমন কর্ম্ম তেমি প্রতিফল,
এখন তোমার পায়ে ঢালচি চোকের জল;
তুমি আমার প্রাণ!
তুমি জগৎ প্রাণ!
তুমি প্রাণের প্রাণ!
তুমি মহাপ্রাণ!
অধম বোলে যদিও ছাড়,
পরলোকে দিও স্থান।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

* ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত।

† জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী ও প্রালয়িক অন্ধকার।

ভারতীয় যুদ্ধরহস্য।

ভারতীতে চতুর্থ প্রস্তাবে ধনুর্বেদের শ্রমবিধি বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল শ্রমক্রিয়া শিক্ষালাভের পরেও অবিস্মরণের জন্য মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাহা অবিস্মরণের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতে হয় তৎসম্বন্ধে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থাটী শার্ঙ্গধর প্রোক্ত ধনুর্বেদ রহস্যের মধ্যে উত্তম রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"এবং শ্রমবিধিং কুর্য্যাৎ
যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শ্রমে সিদ্ধে চ বর্ষাসু
নৈব গ্রাহ্যং ধনুঃ করে॥
পূর্ব্বাভ্যাসস্য শাস্ত্রানাং
বিস্মরণচ্ছেদহেতবে।
মাসদ্বয়ং শ্রমং কুর্য্যাৎ
প্রতিবর্ষং শরদৃতৌ॥
জাতে চাশ্বযুজে মাসে
নবমী দেবতা দিনে।
পূজয়েদীশ্বরীং চণ্ডীং
গুরুং শস্ত্রাণি বাজিনঃ॥"

যতদিন না অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হয়, যত দিন না অস্ত্র সকল সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হয়, ততদিন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রমবিধির অনুষ্ঠান করিবেক। শ্রম ক্রিয়ায় সুসিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ হইলেও অস্ত্রশাস্ত্রের অবিস্মরণের নিমিত্ত বৎসরের মধ্যে দুই মাস করিয়া শিক্ষিতাস্ত্রের পরিচালন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেক। প্রত্যেক বৎসরের শরৎকালে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক এই মাসে পূর্ব্বাভ্যস্ত শস্ত্রাদির শিক্ষানুরূপ পরিচালনাদি করা কর্ত্তব্য। অন্য ঋতুতে কদাচিৎ অনুষ্ঠান করিলেও করিতে পারিবে; পরন্তু বর্ষাকালে কদাচ ধনুর্ধারণ করিবে না। আশ্বিন মাসের নবমী দিনে ঈশ্বরী চণ্ডী দেবীর ও গুরুর পূজা করা কর্ত্তব্য এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি ও অশ্বাদির পরিচর্য্যা করাও কর্ত্তব্য।

সৈন্য বিভাগ।

সেনা গণনার ও সেনা বিভাগের প্রণালীটী নীতিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে উত্তমরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, সেনা গণনায় প্রথম প্রতীক পত্তি। তৎপরে সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ, অনীকিনী, তৎপরে অক্ষৌহিণী।

পত্তি।

পত্তি সৈন্যের ও তাহাদের পরিবারের অর্থাৎ রক্ষক সৈন্যদিগের বিভাগ এইরূপ—

"একো রথো গজশ্চৈকো
নরাঃ পঞ্চ হয়াস্ত্রয়ঃ।
যস্যাং সা পত্তিরে তেষাং.
সহায়ান্ প্রক্রবেহধুনা॥
(বৈ, নীতি।)"

১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি, ৩ অশ্বারোহী এই গুলি একত্রিত বা একযোগ থাকিয়া

পত্তি নামে কথিত হয়। ইহাদের সাহায্যকারী সৈন্যের কথা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে।

সেনামুখ।

"সেনামুখেতু গুণিতা
স্ত্রয়শ্চৈব রথাগজাঃ।
ত্রিংশ ত্রিলক্ষ পদগা
স্ত্রিসহস্রং হি বাজিনঃ॥"

(ঐ)

৩০ রথী, ৩০ হস্ত্যারোহী, ৩০০০০০ পদাতি ও ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সমবেতকে সেনামুখ বলিয়া গণ্য করা যায়।

গুল্ম।

"গুল্মে নব রথাঃ প্রোক্তাঃ
নাগানাং নবতীং বিদুঃ।
অশ্বানাং নবসাহস্র
নবলক্ষাশ্চ পদাতয়ঃ॥"

গুল্ম সৈন্যে ৯ রথী, ৯০ হস্ত্যারোহী, ৯০০০ অশ্বারোহী, ৯০০০০০ পদাতি সৈন্য থাকিবেক।

গণ।

"গণাখ্যেতু শতাঙ্গানাং
বরানাং সপ্তবিংশতিঃ।
ভদ্রেরমানাং দ্বিশতং
সপ্ততিং প্রাহু বার্যকাঃ॥
সপ্তবিংশতি সাহস্রা
গন্ধর্ব্বাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
সপ্তবিংশতি লক্ষাস্তু
স্বতার্থাস্ত্র পদাতয়ঃ।"

[ঐ]

২৭রথী, ২০০হস্তী, ২৭০০অশ্ব, ২৭০০০০ পদাতি সৈন্যের নাম গণ।

বাহিনী।

"বাহিনাং সাঙ্গনাঃ প্রোক্তা
হ্যেকাশীত্যা নিয়োজিতাঃ।
দশোত্তরাষ্টশতকাঃ
পত্তিনশ্চাত্র কীর্ত্তিতাঃ।
একাশীতি সহস্রাস্তু
তুরঙ্গাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একাশীতিক লক্ষা বৈ
বিখ্যাতাঃ পাদচারিণঃ॥"

[ঐ]

৮১রথ, ৮১০ হস্তী, ২১০০ অশ্ব ২১০০০০ পদাতি সৈন্যে এক বাহিনী সৈন্য হয়, ইহা যুদ্ধ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

পৃতনা।

"ত্রয়শ্চ চত্বারিংশচ্চ
দ্বিশতং পৃতনা রথাঃ।
চতুঃশতঞ্চ ত্রিংশচ্চ
দ্বেসহস্রেচ হস্তিনাম্॥
তুরাঙ্গানাং সহস্রাণি
ত্রিচত্বারিংনা দেবতু।
দ্বেলক্ষে চৈব রাজেন্দ্র
দ্বে কোটীচ নৃনাং ভবেৎ॥

(ঐ)

পৃতনা সৈন্যে ২৪৩ রথ, ২৪০০হস্তী, ৪০০০০ অশ্ব এবং ২০০৫০০ পদাতি থাকিবেক।

চমূ।

"চম্বাখ্যে সপ্তম ব্যূহে
গানাং বচিন বিস্তরাৎ।

চম্বাং সপ্ত শতং চৈক-
ন্যূনত্রিংশত্রথাঃ স্মৃতাঃ ॥
সপ্তৈব চ সহস্রাণি
দ্বে শতে নবতিস্তথা।
গজানাং সপ্ত লক্ষাণি
চৈক বোন ত্রিংশ দেবতু ॥
সহস্রাণি হয়ানাঞ্চ
পদাতীনামথো শৃণু।
সপ্ত কোট্যশ্চ দ্বৈকোন
ত্রিংশল্লক্ষাণি ভূপতে ॥"

(ঐ)

চমূ নামক সপ্তম বিভাগে ৭২৯ রথ, ৭২৯০হস্তী, ৭২৯০০ কিংবা ২৯০০ অশ্ব এবং ৭০০০০০০ কিংবা ২৯০০০০ পদাতি সম্মিলিত থাকে।

অনীকিনী।

"অনীকিন্যাং দ্বে সহস্রে
সপ্তাশীত্যধিকং শতম্।
রথানামথ নাগানাং
গণনাং বচ্মিতেঽনথ ॥
একবিংশৎ সহস্রাণি
তথা চাষ্টশতং নৃপ।
সপ্তত্রিংশত্তথাশ্বানাং
সংখ্যাং শৃণু সমাহিতঃ ॥
একবিংশতি লক্ষাণি
সপ্তাশীতিসহস্রকম্।
একবিংশতি কোট্যশ্চ
পদাতীনাং নরাধিপ ॥
সপ্তাশীতিশ্চ লক্ষাণাং
বিদ্ধি বুদ্ধিমতাং বর ॥"

(ঐ)

অনীকিনী নামক বিভাগে ২১৮৭ [illegible], ২১৮১০ হস্তী, ২১৮৭০০০ অশ্ব এবং একবিংশতি কোটী সাতাশী লক্ষ পদাতি থাকে।

অক্ষৌহিণী।

"এক[illegible]
[illegible]।" (ঐ)

উক্ত অনীকিনী [illegible] সৈন্য [illegible] হইলে তাহাকে অক্ষৌহিণী বলিয়া জানিবে।

বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর কৃত ধনুর্ব্বেদসংগ্রহে অক্ষৌহিণীর পরিমাণ যাহা উক্ত হইয়াছে, এস্থলে তাহাও বলা যাইতেছে। শার্ঙ্গধর বলেন যে,—

"দ্যদ্বয়ং স্বরবস্বিন্দু-
নেত্রৈরক্ষৌহিণী মতা।"

শূন্যদ্বয় (০০), স্বর (৭), বসু (৮), ইন্দু (১) নেত্র (২), এই গুলি অঙ্ক বামগাত ক্রমে স্থাপনা করিলে যে সংখ্যা লাভ হয়, তৎপরিমিত সৈন্যের নাম অক্ষৌহিণী। অর্থাৎ ২১৮৭০০ সংখ্যক সৈন্যের নাম অক্ষৌহিণী। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

"অক্ষৌহিণ্যাং প্রদিষ্টানাং
রথানাং ধর্মচারিণাং।
সংখ্যাগণিততত্ত্বজ্ঞৈঃ
সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ॥
উপর্য্যষ্টৌশতান্যত্র-
স্তথা ভূয়শ্চ সপ্ততিঃ।
গজানাঞ্চ পরিমাণমেত
দেব বিনির্দ্দিশেৎ ॥

জ্ঞেয়ং লক্ষং পদাতীনাং
সহস্রাণি তথা নব।
শতানি ত্রীণি পঞ্চাশ-
চ্ছূরাণাং শস্ত্রধারিণাম্॥
পঞ্চষষ্টিসহস্রাণি
তথাশ্বানাং শতানি চ।
দশোত্তরাণি ষট্প্রাহুঃ
সংখ্যাতত্ত্ববিদো জনাঃ॥"

অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে ২১৮০০ রথ, ৭০ রাজা (সামন্ত), উক্ত সংখ্যক হস্তী, ১০৯৩৫০ শস্ত্রধারী পদাতি এবং ৬৫৬১০ অশ্ব বিদ্যমান থাকে।

মহাভারতেও অক্ষৌহিণী সংখ্যার নির্ণয় আছে।

চিহ্নকরণ।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহিত সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রদান করিবে, যথা—

"পত্ত্যাদ্যঙ্গে ধ্বজপটাঃ
পৃথক্ কার্য্যা বিশেষতঃ।
স্বসৈন্যস্য চ শত্রোশ্চ
বৈলক্ষণ্যস্য সিদ্ধয়ে॥"

পূর্ব্বোক্ত পত্তি প্রভৃতি সৈন্যদলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধ্বজপট অর্থাৎ পতাকা স্থাপন করিবেক। যুদ্ধকালে ও ব্যূহরচণার সময় সৈন্য দলের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিবার বিধি থাকায় আপন সৈন্যের ও পরকীয় সৈন্যের বৈলক্ষণ্য বোধক পাতাকাদি চিহ্ন প্রদান করিবেক।

সেনাপতি।

"সর্ব্ব সেনাধিপঃ কার্য্যঃ
কুলপুত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দৃষ্টাপদানো দক্ষশ্চ
রূপবান্ রাজবল্লভঃ॥
লালাটিকশ্চেঙ্গিতজ্ঞঃ
সেনা নয়বিশারদঃ।
ধৃষ্টঃ সান্ত্বয়িতা চৈব
স্বযোধানাং রণাজিরে॥

যত প্রকার সৈন্য থাকুক, রাজা এক জন সদ্গুণান্বিত ব্যক্তিকে তত্তাবতের আধিপত্যে অভিষেক করিবেন। যিনি সৎকুলে ভব, জিতেন্দ্রিয়; (অর্থাৎ লোভক্ষোভাদি-রহিত), যুদ্ধবিদ্যায় ও যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী ও সুনিপুণ, সুন্দরাকৃতি, রাজপ্রিয়, ভাগ্যবান, ইঙ্গিত বোদ্ধা, সৈন্যনীতিতে অভিজ্ঞ, দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ, ঈদৃশ সৎপুরুষকেই রাজা সর্ব্ব-সৈনাপত্য প্রদান করিবেন।

"অক্ষৌহিণীনাং পতয়ঃ
পৃথক্ কার্য্যাস্তথাবিধাঃ।
সেনাপতিবশে তেঽপি
জিতেন্দ্রিয়স্তেন পালিতাঃ॥
পত্তেঃ সেনামুখস্যাপি
গুল্মস্য চ গণস্য চ।
বাহিন্যাঃ পৃতনায়াশ্চ
চম্বাশ্চাপ্যধিপাঃ পৃথক্॥
অনীকিন্যাশ্চ কার্য্যাবৈ
বোধ শিক্ষাসু নিশ্চিতাঃ।
অন্যেষাম্প্রধানাং পতয়ঃ
কার্য্যাঃ কার্য্যানুসারতঃ॥"

যিনি সকল সেনার অধিপতি—তাঁহার নাম সেনাপতি। তদ্ভিন্ন অক্ষৌ-

হিনীপতি, পত্তিপতি, সেনামুখনেতা, গুল্মনায়ক, গণনায়ক, অনীকিনীপতি, চমূপতি,—ইহাঁরা স্ব স্ব সৈন্যের অধীশ্বর এবং ইহাঁরা সকলেই সেনাপতি কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া তদীয় আজ্ঞাধীনে থাকিবেন। রাজা সেনাপতির ন্যায় উপযুক্ত ও দক্ষ ব্যক্তিকে পত্তিসৈন্যের, সেনামুখসৈন্যের, গুল্মসৈন্যের, গণসৈন্যের, বাহিনীসৈন্যের পৃতনাসৈন্যের, চমূসৈন্যের ও অনীকিনী সৈন্যের পৃথক পৃথক অধিপতি নিযুক্ত করিবেন। যাঁহারা শিক্ষা দিতে পারেন, তাদৃশ ব্যক্তিই সপ্তবিধ সেনাপতি পদের উপযুক্ত পাত্র। কার্য্য বিশেষে দুই দুই ও তিন তিন সেনার উপর এক কিংবা ততোধিক অধিপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

"যাদৃক্ সৈনাধিপত্যেন্তু
পূর্ব্বং যোঽধিকৃতো ভবেৎ
স জ্যেষ্ঠভাবে নিয়ত-
স্তৎপাশ্চাত্যস্ত তদ্বশে॥

পূর্ব্বে যিনি যেরূপ সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সৈন্যের প্রতিই তাহার স্বাতন্ত্র্য; পরন্তু তিনি জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে (তাহা অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ সেনাপতি বর্ত্তমানে) সেই জ্যেষ্ঠেরই বশবর্ত্তী থাকিবেন। জ্যেষ্ঠের অভাবে তদ্ভিন্ন সেনাপতিই জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিবেন।

"পত্ত্যাদ্যষ্টপতী নষ্টৌ
অক্ষৌহিণ্যধিপানুগান্।
কুর্য্যা জ্যেষ্ঠানুসারেণ
নিয়ম্যাঃ সর্ব্বসৈনিকা॥"

পত্তি প্রভৃতি আটজন অঙ্গপতি অর্থাৎ স্বল্প সেনাপতি আপন আপন জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিবেন। জ্যেষ্ঠানুসারী থাকিয়া স্ব স্ব সৈন্যদিগের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবেন। যিনি সর্ব্ব-সেনাপতি, তিনি সমুদায় সেনাপতিকেই আপনার অনুগামী করিয়া সৈন্যদিগকে সুনিয়মে অনুশাসন করিবেন।

"অধিপাঃ প্রতি সেনায়াস্ত্রয়ঃ
কার্য্যাঃ সুশিক্ষিতাঃ
উত্তমাধমমধ্যাশ্চ
জ্যেষ্ঠাজ্ঞা বশবর্ত্তিনঃ॥

পত্তি প্রভৃতি প্রত্যেক সৈন্যবিভাগে তিন জন করিয়া অধিপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহার মধ্যে কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ বা অধম (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানীয়)। ইহারা সকলেই আপন আপন জ্যেষ্ঠের (প্রধানের) আজ্ঞাধীন থাকিবেন।

সাঙ্কেত*।

সেনাপতিগণ আপন আপন সৈন্য মধ্যে করিয়া (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন) প্রতিদিন এক একটী করিয়া সাঙ্কেত প্রচার বা সঙ্কেত নির্দ্ধারণ করেন। সেই সঙ্কেত কেবল সেনাপতিরাই জ্ঞাত থাকিবেক, কোন সেনা কি কোন অন্য পুরুষ যেন তাহা জানিতে না পারে।

সৈন্যপালের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

"দিবসে দিবসে সেনাঃ
পরিবর্ত্ত্য প্রযোজয়েৎ।

* ইউরোপীয় সৈন্যগণের মধ্যে এই সংকেত বাক্যের নাম Parole.

একত্র সুস্থিতং সৈন্যং
শঙ্কাং চাস্যাপি সাধয়েৎ॥

সেনাপতিগণ আপন আপন সেনাদিগকে এক স্থানে রাখিবেন না এবং প্রতিদিন তাহাদের পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কেন না সৈন্যগণ একস্থানে ও অপরিবর্ত্তিত থাকিলে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে।

বেতন ও পুরস্কার।

মহর্ষি বৈশম্পায়ন প্রণীত নীতিপ্রকাশিকা গ্রন্থের ধনুর্ব্বেদ বিভাগে যোদ্ধৃগণের বেতনবিধি ও পুরস্কার দানের নিয়ম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা দেখিলে এদেশে তৎকালে কিরূপ ধনোন্নতি ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালের রাজারা যোদ্ধাদিগকে কিরূপ বেতন দিতেন, ইহা জানিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেকেরই কৌতূহল হইয়া থাকে। এই দুই কারণেই আমরা এই প্রস্তাবে বেতন ও পুরস্কার ঘটিত বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

"যুবরাজায় বর্ষাণাং
পঞ্চসাহস্রকী ভৃতিঃ।
সর্ব্ব সেনা-প্রণেত্রে চ
চতুঃসাহস্রকী স্মৃতা॥
[illegible]
বর্ষ [illegible]।
মহারথায় সাহস্রং
[illegible] মাসিকম্॥
বেতনং রথিনাং [illegible]
সাহস্রং গজযোধিনে।
দদ্যাদর্দ্ধং তথাশ্ব
বেতনং শতপঞ্চকম্॥
একৈস্মৈ রথিকায়াপি
তাদৃশে গজসাদিনে।
নিষ্কাণাং ত্রিশতং দদ্যাৎ
যন্তৌ [illegible] কুটুম্বিনৌ॥

সর্ব্বাশ্বাধিপতীরাজ-
স্ত্রিসাহস্রং স বা ইতি।
পাদাতাধিপতিশ্চাপি
দ্বিসাহস্রস্য ভাজনম্॥
পাদাতানাং সহস্রস্য
নেত্রে পঞ্চ শতং স্মৃতম্।
তথা চাশ্বসহস্রেশে
* সহস্রং বেতনং ভবেৎ॥
পদাতয়ে সুবর্ণানাং
পঞ্চকং বেতনং ভবেৎ।
শতপত্যধিপে সপ্ত
বর্ষাণাং হয়চারিণে॥
গজযন্তুঃ সারথেশ্চ
ধ্বজিনে চক্রপায় চ।
পদাতিত্রিশতেশায়
পণিকোষ্ঠচরায় চ॥
বার্ত্তিকাধিপতেশ্চাপি
বেত্রিণাং পতয়ে তথা।
সূতমাগধ বন্দীনাং
পতয়ে বীবধাধিপে॥
সেনায়া ভূতিদাত্রে চ
ভট্টানাং গণনাপরে।
মাসি মাসিতু বর্ষাণাং
দশ পঞ্চ চ বেতনম্॥
তত্তৎ কার্য্যানুসারেণ
কুলপর্য্যায়তস্তথা।
ভট্টানাঞ্চ ভৃতিঃ কল্প্যা
তত্তৎকালানুসারতঃ॥

রাজা যুবরাজকে মাসিক পাঁচ হাজার বর্ণ* এবং প্রধান সেনাপতিকে মাসিক চারি হাজার বর্ণ বেতন প্রদান করিবেন। যিনি অতিরথ† রাজার তাঁহাকে তিন

---

* ইহা এক প্রকার প্রাচীন সুবর্ণ মুদ্রা।

† সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথ-যোদ্ধাকে অতিরথ বলে। ইহার পরিভাষাটী পৃথক স্থানে বর্ণন করা যাইবে।

হাজার বর্ষ মাসিক বৃত্তি এবং যিনি মহারথ তাঁহাকে দুই সহস্র বর্ষ মাসিক বৃত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

যিনি গজ-যোধী ও রথী রাজা তাঁহাকে এক সহস্র বর্ষ এবং যিনি অর্দ্ধ-রথী রাজা তাঁহাকে পাঁচ শত বর্ষ বেতন দিয়া বাধ্য রাখিবেন।

যিনি কেবল মাত্র রথী পরন্তু সুনিপুণ নহেন তাঁহাকে এবং যিনি গজযোধী পরন্তু তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ—একপ ব্যক্তিকে মাসিক তিন শত নিষ্ক প্রদান করা কর্ত্তব্য।

যিনি সমুদয় অশ্বারোহী সৈন্যের অধিপতি, তিনি মাসিক তিন হাজার নিষ্ক পাইবার যোগ্য এবং যিনি সমস্ত পদাতি সৈন্যের অধিনায়ক তিনি দুই হাজার নিষ্ক পাইবার যোগ্য।

যিনি এক হাজার পদাতি সৈন্যের নিয়ন্তা—তাঁহার মাসিক বেতন পাঁচ শত নিষ্কের অধিক নহে। যিনি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক তাঁহাকে সহস্র নিষ্ক বেতন প্রদান কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত ও কৃতযুদ্ধ পদাতি সৈন্যের বেতন পাঁচ সুবর্ণ‡ এবং শত পদাতির অধিপতির বেতন ৭ বর্ষ হওয়া উচিত।

অশ্বনায়ক, হস্তীশিক্ষক, সারথি, চিহ্ন নিয়ামক, চক্ররক্ষক, তিন শত পদাতি সৈন্যের অধিপতি, পথপ্রদর্শক ও পথাভিজ্ঞ, উষ্ট্রচর, বার্ত্তাজীবী বা চরের অধিপতি, বেত্রধারী দলের নিয়ন্তা, সূত, মাগধ ও স্তুতিপাঠকদিগের অধ্যক্ষ, বাদ্য গণের নায়ক, সেনাগণের বেতনদাতা, সৈন্য গণনা কারক (যিনি সৈন্যগণের তালিকা রাখেন),—এই সকল ব্যক্তিকে প্রতি মাসে দশ ও পাঁচ অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত বেতন প্রদান করা উচিত।

যাহা বলা হইল তাহা একটা সাধারণ উল্লেখ মাত্র। বস্তুতঃ কার্য্য, কুল, পদমর্য্যাদা ও অবস্থা অনুসারেই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের এবং অন্যান্য সৈন্যগণের বেতন কল্পনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বকালেও বৃত্তিদান বা "পেনসেন" দিবার রীতি ছিল। প্রত্যেক রাজশাস্ত্রে, বিশেষতঃ নীতিপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে উহার বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"যুদ্ধে স্বাম্যর্থং মৃতা যে চ
শত্রুভিস্তৎস্ববন্ধুষু।
সেবয়া জীবিতা যে চ
দেয়ং তেষাং জীবনম্॥
মৃতানাং জীবিতাঙ্গাপি
পুত্রং সেবাপরাঙ্মনাম্।
তদীয়ানাঞ্চ তেষাং বা
পূর্ব্বভর্ম্মার্দ্ধজীবনম্॥
সংগ্রামেঽভিমুখঃ কৃত্বা
যুবানো ন মৃতা ভটাঃ॥
রাজ্যে সেনাপশক্তা যে
তেষাং পূর্ণার্দ্ধ জীবনম্॥
শত্রূনামুগখ্যাথর্থং তস্য
মর্ম্মাণি বোদ্ধর্পয়েৎ।
স্বৈস্মৈ তস্যাপি কর্ম্মণা
দ্বিগুণা পরিকীর্ত্তিতা॥
শত্রুসেনা বিভেত্তারং
দুর্গারোহণতৎপরম্।
স্বরাজ বৃদ্ধকর্ত্তারং
যোজয়েৎ প্রতিপোষকৈরৈবম্॥"

যে ব্যক্তি রাজার স্বার্থ সংসাধন করিতে গিয়া শত্রু কর্ত্তৃক যুদ্ধে মৃত হইবে রাজা তাঁহার বন্ধুকে অর্থাৎ স্ত্রী, পিতা মাতা অথবা পুত্রকে তদীয় আপন জীবিকা

‡ ইহাও এক প্রকার মুদ্রা। ৮০ রতিওজনের মুদ্রিত কাঞ্চন খণ্ডকে পূর্ব্বে সুবর্ণ বলিত।

প্রদান করিবেন। (যে ব্যক্তি যাহা মাসিক বৃত্তি পাইত সেই মাসিক বৃত্তিই প্রদেয়।) যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজসেবা করিয়া জীর্ণ হইয়াছে, কার্য্যক্ষম হইলেও রাজা তাহাকে সম্পূর্ণ বৃত্তি প্রদান করিবেন।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে বিশেষরূপ সেবাতৎপর ছিল, (অবাধে ও প্রাণপণে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে), সে ব্যক্তি কার্য্য ত্যাগ করিয়া জীবিত থাকুক, অথবা মৃত হউক, তাহাকে অথবা তাহার স্ত্রীপুত্রকে অর্দ্ধ-জীবিকা অর্থাৎ সে যাহা পাইত তাহার অর্দ্ধ-পরিমাণ বৃত্তি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে যোদ্ধা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, যে ব্যক্তি যুবা অথচ জীবিতাবস্থায় কার্য্যকরণে অক্ষম হয়, সে ব্যক্তিকেও পূর্ব্ব বেতনের অর্দ্ধ পরিমাণ বেতন দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি রাজার শত্রু বিনাশে উদ্যত হইয়া শত্রুর মর্ম্ম অর্থাৎ যে ব্যক্তি শত্রু বিনাশে কৃতকার্য্য হয়, হইয়া পুনশ্চ রাজ সেবায় নিযুক্ত থাকে, সে ব্যক্তি দ্বিগুণ বেতন পাইবার উপযুক্ত।

যে ব্যক্তি শত্রুসৈন্য ভেদ করিতে সমর্থ, দুর্গপ্রবেশে তৎপর, রাজ্যবৃদ্ধিকারী, রাজা তাহাকে ভূরি পরিমাণ অর্থের দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিবেন।

পুরস্কার।

"প্রত্যগ্রে কর্ম্মনিষ্কৃতে
শ্লাঘমানঃ কৃতাদরঃ।
যোধেভ্যঃ পূর্ণপাত্রংহি
দদ্যাদ্রাজা বিশেষতঃ॥"
(বৈ, নীতি।

আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিলে, রাজা তাহাকে সমাদর করিবেন। সর্ব্বসমক্ষে প্রশংসা করিবেন, তাহাকে এবং তাহার আজ্ঞাপালক যোধবর্গকে বিশেষরূপ পূর্ণপাত্র (পরিমিত ধন ও দ্রব্য) প্রদান করিবেন।

এই সাধারণ বিধির অন্তর্গত বিশেষ বিধি অর্থাৎ কিরূপ কার্য্যের পুরস্কারার্থ কিরূপ পূর্ণপাত্র (পুরস্কারীয় ধন বা দ্রব্য) প্রদান করা কর্ত্তব্য তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকে প্রকাশিত আছে।

"দদ্যাৎ প্রহৃষ্টো নিযুতং
বর্ম্মাণাং রাজঘাতিনে।
তদর্দ্ধং তৎসুতবধে
সেনাপতিবধে তথা॥
অক্ষৌহিণীপতিবধে
তদর্দ্ধং পরিচক্ষতে।
মন্ত্র্যমাত্যবধেচৈব
তদর্দ্ধন্তু প্রদাপয়েৎ॥
অনীকিনী চমূশ্চৈব
পৃতনাবাহিনীগণাঃ।
গুল্মং সেনামুখং পত্তিরেতেষাং পতিঘাতিনে॥
ক্রমাদর্দ্ধাংশহ্রাসেন
তদর্দ্ধানি প্রদাপয়েৎ।
বেতনাদধিকং চৈতৎ
প্রাপ্য কুর্য্যুশ্চ সদৃশম॥
অক্ষৌহিণ্যাঃ পতিং হত্বা
দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়কম্।
চমেবারধিপতিঞ্চৈব
পৃতনানাং পতিং তথা।
অনীকিনীপর্য্যন্ত যাবৎ
তাবৎ প্রাপ্নোতি রাজতঃ।
ইত্থমগ্রেহপি যোক্তব্যং
সম্মানমধিপাপহে॥
পলায়িতং সায়ুধঞ্চ
ধৃত্বা স্বভটদায়িনে।
বর্ম্মাণাং শতকৈব দদ্যাৎ
তস্মৈ সৎকৃত্য ভূমিপঃ॥
পলায়িতং স্বভূক্তিকং
বিশস্ত্রং দেহশোভিনং॥

ধৃত্বা নিবেদিনে দদ্যাৎ
বর্ষাণাঞ্চ ত্রিকং নৃপঃ॥
গজঞ্চ গজসাদিঞ্চ
মহারথিকমস্তকম্।
ছিত্বা নিবেদয়েদ্রাজ্ঞো
দ্বিসাহস্রং সদা ইতি॥
হয়ারূঢ় বরং হত্বা
পাদাতাধিপতিং তথা।
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রস্য
যোগ্যো ভবতি রাজতঃ॥
শত্রুসৈন্যাৎ কুঞ্জরং বা
রথং বা যঃ সমাহরেৎ।
পঞ্চাশদ্বর্ষসম্মানং স
প্রাপ্নোতীহ রাজতঃ॥
প্রতিপ্রমাণং ভৃত্যানাং
ভক্তং দেয়ং স্থিতৌ নহি।
মার্গায়াসং বিদিত্বৈষাং
বেতনাদধিকং ত্বিদম্॥
অন্যেষু বা সাহসেষু
বেতনাদধিকং নৃপঃ।
লোক সংগ্রহণাঞ্চ
দদ্যাদ্বৈ পারিতোষিকম্॥
ভটেভাশ্চৈব বস্ত্রাণি
রজকানাঞ্চ বেতনম্।
তদ্বেতনৈব কল্প্যানৌ-
ষিধানি চ রোগিণাম্।
পর রাষ্ট্রার্জ্জিতং দ্রব্যমর্দ্ধং
রাজা বিভজ্যতু।
যোধেভ্যোঽর্দ্ধং প্রদেয়ং
স্যাদর্দ্ধঞ্চ স্বয়মাহরেৎ॥
হয়ং বা শকটীং বাপি
হরেৎ যোদ্ধৃভাং ভটঃ।
তদর্দ্ধতুর্য্যাংশং
স লভেৎ রাজসৎকৃতঃ॥
শিথিলানিচ শস্ত্রাণি
লুণ্ঠিতং শত্রুভির্য্যদি।
স্বযোদ্ধানাং নৃপো দদ্যাৎ
বেতনং পরিষ্কাপ্য চ॥”

যে যোদ্ধা শত্রু রাজাকে বধ * করে রাজা তাহাকে হৃষ্ট হইয়া নিযুতসংখ্যক বর্ষ প্রদান করিবেন। যুবরাজ করিলে তাহার অর্দ্ধ এবং প্রধান সেনাপতি বধ করিলেও অর্দ্ধ পুরস্কার দান করা কর্ত্তব্য। নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অক্ষৌহিণীপতি বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ, মন্ত্রী ও প্রধানামাত্য বধকারী-দিগকে তদর্দ্ধ পুরস্কার করা কর্ত্তব্য।

অনীকিনী, চমূ, পৃতনা, বাহিনী, গণ, গুল্ম, সেনামুখ, ও পত্তি,—এই সকলের অধিপদিগকে বধ করিতে পারিলে যথাক্রমে অর্দ্ধার্দ্ধ পারিতোষিক পাইবার যোগ্য হইবে। ইহা তাহা-দিগের অতিরিক্ত লাভ, বেতনের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এবম্প্রকার বেতনাধিক দান করিলে তাহারা অবশ্যই সাহস প্রকাশ করিবে, এতৎকারণে রাজা উক্ত প্রকার পারিতোষিক দান করিবেন।

অক্ষৌহিণী প্রভৃতি সৈন্যগণের তিনটী করিয়া অধিপ থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর উত্তম, মধ্যম ও অধমভাব থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যদলের প্রধান অধি-নায়কদিগকে বধ বন্ধনাদি করিলে পুরস্কার পাইবে, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে ইহাও বলা যাইতেছে যে, সেই সকল সৈন্যদলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিপতিদিগকে বধ বন্ধনাদি

*বধ এই শব্দটী পারিভাষিক। “বধশ্চাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।” বন্ধন, তাড়ন, অবমাননা প্রভৃতি আট প্রকার কার্য্যের উপর বধ এই পরিভাষা স্থাপিত আছে। সুতরাং বধ শব্দ দেখিয়া সহসা প্রাণ বিনাশ অর্থ মনে হইবে বটে; পরন্তু এস্থলে সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া বন্ধনাদি আট প্রকার অর্থই গ্রহণ করা গেল।

করিতে পারিলে তাহারাও আপন রাজার নিকট যথাযোগ্য পুরস্কার পাইবে। এইরূপ যে কোন অধিপতিকে বধ প্রমাদ করিতে পারিলেই পুরস্কারযোগ্য হইবে, ইহা রাজশাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা জানিবে।

কোন সৈন্য অস্ত্র সমেত পলায়ন করিতেছে, এমত অবস্থায় যদি কেহ তাহাকে অস্ত্র সমেত ধৃত করিয়া তাহার দলাধিপতির নিকট প্রদান করে, তবে রাজা সেই ধৃতকারী ব্যক্তিকে পাঁচ বর্ষ পারিতোষিক প্রদান করিবেন এবং বিশেষ সম্মান করিবেন।

কোন সৈন্য অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল মাত্র দেহ লইয়া পলায়ন করিলে যদি কেহ তাহাকে ধৃত করিয়া তদ্দলাধিপতির নিকট প্রদান করে, তবে, রাজা তাহাকে তিন বর্ষ পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

যে ব্যক্তি সৈন্য ভঙ্গকারী শত্রুপক্ষীয় বৃংহগজ, গজযোধী ও মহারথীর মস্তক ছেদন করিয়া রাজার নিকট অর্পণ করে, সে ব্যক্তি রাজার নিকট দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার পাইবার যোগ্য।

শত্রুপক্ষীয় প্রধান অশ্বারোহী বিনাশ করিয়া এবং পদাতি সৈন্যের অধিপতি বধ করিয়া রাজার নিকট সহস্র বর্ষ পুরস্কার পাইবার যোগ্য হয়।

যে ব্যক্তি শত্রু-সৈন্যের মধ্য হইতে যুদ্ধকুশল হস্তী কি কোন প্রধান রথ কাড়িয়া আনে সে ব্যক্তিও রাজার নিকট পঞ্চাশৎ বর্ষ পুরস্কার পায়।

যত বার যুদ্ধযাত্রা হইবে, তাহার প্রত্যেক যুদ্ধযাত্রাতেই রাজা ও সৈন্যগণদিগকে ভক্ত অর্থাৎ আহারাচ্ছাদন স্বকীয় কোষ হইতে প্রদান করিবেন কিন্তু স্থিতিকালে অর্থাৎ যখন কোন কার্য্য নাই, তখন তাহাদিগকে ভক্ত প্রদান করিবেন না, কেবল মাত্র বেতনই দিবেন। (তাহারা তখন আপন আপন বেতনের দ্বারা আহার নির্ব্বাহ করিবে) পথের ও গতিবিধির ক্লেশ বিবেচনা করিয়া বেতনাধিক ভক্ত অর্থাৎ নিজ কোষ হইতে আহারীয় ব্যয় প্রদান করিবেন। এইরূপ, অন্যান্য সাহসিক কার্য্যেও বিবেচনা পূর্ব্বক বেতনাতিরিক্ত পৃথক প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং লোক সংগ্রহের নিমিত্তও রাজার পারিতোষিক দান করা কর্ত্তব্য।

স্থিতিকালে যোদ্ধৃগণের বস্ত্র পরিচ্ছদ ও রক্ষকদিগের বেতন রাজার অধীনে থাকিবে, পরন্তু তাহার ব্যয় তাহাদের নিজ নিজ প্রাপ্য বেতন হইতে কর্ত্তিত হইবে। কোন সৈন্য যদি পীড়িত হয় তবে তাহাদের চিকিৎসাও রাজার অধীনে থাকিবে, পরন্তু ঔষধের ব্যয় তাহার বেতন হইতে প্রদত্ত হইবে।

পররাজ্য জয় হইলে, রাজা লুণ্ঠন দ্রব্য ও লুণ্ঠনলব্ধ ধন সকল দুই ভাগ করিবেন। তাহার একভাগ যোদ্ধাদিগকে এবং একভাগ ধনাগারে স্থাপন করিবেন।

কোন সৈন্য যদি সসজ্জ অশ্ব কিংবা অলঙ্কৃত রথ আহরণ করে, তবে সে তাহার চতুর্থাংশ এবং রাজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে।

যদি কোন সৈন্য আপনার অস্ত্র কিংবা শস্ত্র হারাইয়া ফেলে, অথবা তাহা শত্রু সৈন্যের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় [অর্থাৎ শত্রু পক্ষীয়েরা যদি কাহারও অস্ত্র কাড়িয়া লয়] তবে রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার অস্ত্র প্রদান করিবেন; কিন্তু তাহার মূল্য তাহার বেতন হইতে পরিগৃহীত হইবে।

শ্রীরামদাস সেন।

আর্য্যজাতি ও আর্য্যধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত*।

আদৌ আর্য্যশব্দের ধাতুমূলক ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না, কিন্তু, পরবংশীয়েরা "কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সতু আর্য্য ইতিস্মৃতঃ॥" "অর্থাৎ যিনি কর্ত্তব্যানুষ্ঠানশীল ও অকর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হইয়া সর্ব্বদা সদাচার-নিষ্ঠ, তিনিই আর্য্যনামে অভিহিত হন।" এই রূপে আর্য্যসংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যেরা যে প্রাণান্তেও কর্ত্তব্যরেখা অতিক্রম করিতেন না, সর্ব্বনাশের বিভীষিকাতেও অকর্ত্তব্যানুষ্ঠান হইতে দূরে থাকিতেন, এবং সর্ব্ব অবস্থাতেই প্রকৃত সাধু আচার সংরক্ষণে প্রস্তুত থাকিতেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাঁহাদের শাস্ত্রসমূহে বিদ্যমান রহিয়াছে। সে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, আর্য্যচরিত ব্যাখ্যাকরণার্থ আমি আপনাদিগের নিকট অদ্য উপস্থিত হই নাই। আর্য্যেরা যে জগতীতলে পাদার্পণ করিয়াই ধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, জাতীয় জীবনের অপরিস্ফুট অবস্থাতেই ধর্ম্মধ্বজী বলিয়া পৃথিবীতে অদ্বিতীয় গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তৎপ্রদর্শনই আমার এক মাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, বেদসংহিতার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। "বেদ" শব্দ অপেক্ষা "শ্রুতি" শব্দ অধিক প্রয়োগোপযোগী। কেননা সমগ্র বেদই "শ্রুতি" নামে আখ্যাত। "বেদ" শব্দ উপনিষদের একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হওয়ায়, পশ্চাৎ সমগ্র "শ্রুতি-সংহিতা" "বেদ" নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহাই হউক ইদানীং "শ্রুতি" অপেক্ষা "বেদ" শব্দ সামাজিকগণের নিকট অধিক পরিচিত বলিয়া, আমিও প্রায় অনেক স্থানে "বেদ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি। আদিম আর্য্যজাতির ধর্ম্ম-নৈতিক প্রমাণ প্রদর্শনার্থ অন্যাপেক্ষা "ঋগ্বেদ-সংহিতাই" অধিক উপযোগী। অতএব, সংক্ষেপে ঋগ্বেদ সংহিতার কতিপয় স্থল মাত্র উদ্ধৃত করিয়া সেই প্রাচীনতম মহৎ জাতির ধর্ম্মনীতির সমুৎকর্ষের প্রমাণ দর্শাইতেছি—যে জাতির অধঃপতনের একশেষ হইলেও এখনও পৃথিবীর ইতিহাসে তদীয় নাম বিলুপ্ত হয় নাই, এবং এখনও সুদূর ইয়ুরোপখণ্ডে যে জাতির মাহাত্ম্য অনুদিন কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বোধহয় উপস্থিত সম্মানীয় সভ্য মহাশয়দিগের অনেকেই অবগত আছেন যে, যে আর্য্য জাতির সন্তান বলিয়া আমরা গর্ব্বিত হইয়া থাকি, সেই আর্য্যজাতি এ দেশের আদিম নিবাসী নহেন। কোন্ পুণ্য ভূমিতে সেই পূজ্যপাদ পূর্ব্ব পিতামহেরা

* এই প্রবন্ধ নৈহাটীর একতা-সাধনী সভাতে পঠিত হইয়াছিল। তত্রত্য সমাজের অবস্থানুরূপ কোনও কোনও কথা ইহাতে দৃষ্ট হইবে।—সং।

প্রথমে অধিবাস করিয়াছিলেন, কোন্ দুর্ব্বিপাকে চিরোষিত সেই আদিম বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে শুভাগমনপূর্ব্বক প্রথম কোন্ স্থান পদার্পণানুগ্রহ দ্বারা পবিত্র করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় নির্ণয় করা সুদুঃসাধ্য হইলেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অমোঘ গবেষণা-প্রভাবে অদ্য আমরা হস্তামলকবৎ সেই অতীত ঘটনাসমূহ যেন প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি। আর্য্যেরা যে শীতপ্রধান দেশের আদিম অধিবাসী, তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতার বহু ঋকে উক্ত আছে। সেই সমস্ত উদ্ধৃত না করিয়া, কেবল মাত্র একটী ঋক উদ্ধৃত করিয়া আত্মমত সমর্থন করিতেছি। ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডলের ৬৪ সূক্তের চতুর্দ্দশসংখ্যক ঋক্ এই——"তোকং পুষেম তনয়ং শতং হিমাঃ" "আমরা শত হেমন্ত যেন এইরূপ সন্তানদিগকে পোষণ করি"। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রাচীন আর্য্যেরা শীত ঋতুর সংখ্যা দ্বারা সময়ের নির্ণয় করিতেন। শীতপ্রধানদেশনিবাসী না হইলে শীত ঋতু দ্বারা সময়ের সংখ্যা করা সম্ভবে না। এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত বহুবিধ আনুমানিক প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক ইয়ুরোপীয় মনিবীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রাচীন আর্য্যেরা আসিয়া খণ্ডের মধ্যে হিমানি-সমাচ্ছন্ন "বেলুর্তাগ" ও "মুস্তাগ" পর্ব্বতের পশ্চিম পার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূভাগেই অবস্থিতি করিতেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার-সমূহের কালক্রমে পৃথগন্ন ও বিচ্ছিন্ন হইবার ন্যায় প্রাচীন আর্য্যমহাশয়েরা গৃহবিবাদে আদিম আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে প্রস্থান করিয়া কাল সহকারে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। ইয়ুরোপীয় বুধমণ্ডলীর অনুসরণ করিয়া পণ্ডিতবর বাবু অক্ষয় কুমার দত্তজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কিয়ৎসংখ্যক আর্য্য মহাপুরুষ পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া আসিয়া খণ্ডের পশ্চিমভাগে ও ইয়ুরোপ খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করেন, অবশিষ্ট কিয়ৎসংখ্যক দক্ষিণমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্থান ও ভারতবর্ষমাধ্য প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হন। যাঁহারা ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই আর্য্যসন্তানেরা পশ্চাৎ "হিন্দু" নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই সুপরিচিত "হিন্দু" শব্দ সংস্কৃত শব্দ নহে। বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত শব্দের প্রসঙ্গ নাই। এক অত্যাধুনিক গ্রন্থ মেরুতন্ত্র ভিন্ন, কি প্রাচীন কি আধুনিক কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে "হিন্দু" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ "অবস্তা" নামক প্রাচীন পারসিক ভাষা হইতে "হিন্দু" শব্দের জন্ম হইয়াছে। যাহা হউক, "হিন্দু" শব্দের মূলানুসন্ধান করাও আমাদের অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে। যে ইংরাজজাতি এখন রাজজাতি বলিয়া ভীতিস্থান হইয়াছেন, যে যবনজাতি বিধর্ম্মী ও অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া অবজ্ঞাত

হইতেছেন, ইহাঁরা কেহই আমাদিগের বহিরঙ্গ নহেন। কিন্তু, এ কথা আজ এখানে উচ্চারণ করিতেও ভীতি সঞ্চার হইতেছে। তথাপি, সত্যের অনুরোধে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে যেমন দূরস্থ জ্ঞাতির পরিচয় পাইলে, তাঁহাকে অন্তরঙ্গ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে অভিলাষ জন্মে, সেই রূপ শব্দ-বিদ্যার অলৌকিকী শক্তি প্রভাবে সমুদ্রব্যবহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশ নিবাসী বিভিন্ন জাতির মূল পুরুষের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়া, আর তাঁহাদিগকে বিজাতীয় বলিয়া অমর্য্যাদা করিতে বা বহিরঙ্গ জ্ঞানে দূরে রাখিতে প্রবৃত্তি হয় না।

পূর্ব্ব পিতামহগণের মহত্ত্বাদের মোহ-করী শক্তিতে বিহ্বল হইয়া, মূল উদ্দেশ্য হইতে অতিদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন অতি সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া প্রকৃত কথার অবতারণা করিতেছি। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কোন্ স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদ-সংহিতায় তাহার প্রমাণ আছে। উক্ত সুপূজ্য সংহিতার ৩য় মণ্ডলের ত্রয়ো-বিংশতি সূক্তের ৪র্থ ঋক্ এস্থানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

"নিত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যা ইলায়াস্পদে
সুদিনত্বে অহ্নাং
দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপায়াং সর-
স্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি।"

"হে অগ্নি, আমি শুভ দিনে ইলাস্বরূপা অবনীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমার স্থাপন করিতেছি। তুমি ধনশালী হইয়া দৃষদ্বতী, অপায়া এবং সরস্বতীর মানবময় তটভাগে প্রদীপ্ত হও।" এই ঋকটীতে ঐতিহাসিক সত্য সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই ঋক্ উচ্চারিত হইবার সময় আর্য্য মহাশয়েরা যে দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর সলিলসিক্ত পবিত্র ব্রহ্মাবর্ত্ত ভূমিতে আগমন করিয়াছিলেন, বোধ হয়, আপনারা তাহা একবাক্যে স্বীকার করিবেন। মনুসংহিতায় প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিলে, উক্ত বেদবাক্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ প্রমাণান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ মনু কহিয়াছেন,—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যো-
র্দেবনদ্যোর্যদন্তরং
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং
ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ
পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং
স সদাচার উচ্যতে॥

পুণ্যসলিলা দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদীর মধ্যগত পবিত্র ভূভাগকে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ কহে। ঐ দেশে বিপ্রাদি প্রধানবর্ণ ও শঙ্করজাতির মধ্যে পরম্পরানুক্রমে যেরূপ আচার প্রচলিত আছে, তাহাই সদাচার। অতএব, বেদসংহিতা ও মানব শাস্ত্রের প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে, আর্য্যেরা যে ভারতভূমিতে শুভাগমন করিয়া, ব্রহ্মাবর্ত্ত জনপদে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসংশয়-

সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। বেদ ও মানব স্মৃতিতে প্রবিষ্ট হইলে, আরও অনেক রহস্যোদ্ভেদ করা যাইতে পারে। যে গঙ্গানদীর পবিত্রতা এখন ভারতীয় হিন্দুসন্তানমাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন, তদীয় মাহাত্ম্যাত্মক রাশি রাশি সংস্কৃত শ্লোক নিত্য নিত্য পাঠ করিয়া থাকেন, বৈদিক হিন্দু সমাজে সে গঙ্গানদী সুপরিচিতা ছিলেন না। মানব শাস্ত্রেও জহ্নুতনয়ার গৌরববোধক কোনও শ্লোক দৃষ্ট হয় না। কেবল সরস্বত্যাদি পাশ্চাত্য নদী সকলের স্তুতিবোধক বহুসংখ্যক বেদবাক্য ও ঋষিবচন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হইতেছে যে, আর্য্যসন্তানেরা সরস্বতীতটবর্ত্তী ভূভাগ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত ঋক্ ও ঋষিবাক্য উচ্চারিত ও গীত হইয়াছিল। সত্য বটে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে সরস্বতীর পবিত্র নামের সহিত গঙ্গা ও যমুনার নামও গ্রথিত হইয়াছে, কিন্তু, তাহাতেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করা যাইতেছে যে, আর্য্যসন্তানেরা প্রয়াগের সন্নিধি পর্য্যন্ত পদার্পণ করিলে পর উক্ত ঋক্ গীত হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধে ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইলেও অনাদিত্ব অঙ্গীকৃত না হওয়ায় বঙ্গীয় সামাজিকমহাশয়েরা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠকের বহুমানপূর্ব্বক নিবেদন এই যে, মনুষ্যসমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে। এই প্রবন্ধে সেইরূপ স্বাধীনমত ব্যক্ত করা যাইতেছে। ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ অবশ্যই থাকিতে পারে। তন্নিমিত্ত বিরক্ত না হইয়া, ভ্রম সংশোধনার্থে সদুপদেশ প্রদান করিলে বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ হইবে।

যাহা হউক, এতক্ষণ পরে প্রকৃত কথার অবতারণা করিতেছি। প্রাচীন আর্য্যমহাশয়দিগের ধর্ম্মনীতির অবতারণাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আর্য্যসন্তানগণের ভারতভূমিতে আগমন প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করায় প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে এক পদ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সামাজিকমহাশয়েরা তজ্জন্য অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। যে একমাত্র ঋক্ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রাচীন আর্য্যমহোদয়েরা কেবল প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। তাঁহারা হিমাচ্ছন্ন পার্ব্বত্যভূমিতে বাস করিতেন; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে অগ্নির নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইয়াছিলেন; এবং স্বভাবকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সেই মহোপকারী অগ্নির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ২৬ সূক্তের তৃতীয় সংখ্যক ঋক্ এই—"বীতিহোত্রং ত্বা কবে দ্যুমন্তং সমিধীমহি অগ্নে, বৃহন্তমধ্বরে।" "হে অগ্নি, হে জ্ঞানরূপ, তুমি মহদ্দ্যুতিমান্ ও বীতি-

হোত্র। আমরা তোমাকে যজ্ঞভূমিতে প্রজ্বলিত করি।" ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৪৪ সূক্তের ১৭ সংখ্যক ঋক্ এই—"উদগ্নে, শুচয়স্তব শুক্রা ভ্রাজন্ত ইরতে তবজ্যোতিংষ্যর্চ্চয়ঃ।" "হে অগ্নি, তোমার সুদীপ্ত শুভ্র ও উজ্জল শিখা ও কিরণসকল উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে।" অগ্নির স্তুতাত্মক এবম্বিধ বহু ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। কিন্তু, তাহার প্রয়োজন নাই। অগ্নির পর বরুণ, আর্য্যজাতির আর একটী উপাস্য প্রকৃতি। আর্য্যেরা ইহাঁকেও সমুচ্চ আসন দানপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। বহু প্রমাণ প্রদর্শন না করিয়া এস্থানে একটী মাত্র ঋক্ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তাহাতেই প্রতিপন্ন হইবে যে, বরুণদেবকে আর্য্যপ্রাচীনেরা কিরূপ সম্মান করিতেন। ঋগ্বেদসংহিতার ৫ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের ১ম ঋক্ এই—

প্র সম্রাজে বৃহদর্চ্চা গভীরং ব্রহ্মপ্রিয়ং
বরুণায় শ্রুতায়।
বিযো জঘান শমিতেব চর্ম্মোপস্তিরে
পৃথিবীং সূর্য্যায়॥

সুপ্রখ্যাত সম্রাট বরুণ দেবের উদ্দেশে অতি প্রগাঢ় প্রীতিকর, প্রভূত স্তব উচ্চারণ কর। পশুহন্তা যেরূপ চর্ম্ম বিস্তার করে, বরুণদেব তেমনি সূর্য্যের আস্তরণার্থে অন্তরীক্ষ বিস্তৃত করিয়াছেন। অনন্তবিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল ও বিশ্বম্ভরা পৃথিবীর নিকটও আর্য্য মহাঋষিরা অবনতমস্তক হইয়াছেন; কৃতজ্ঞ চিত্তে এক ঋকের দ্বারা উক্ত উভয় প্রকৃতির যুগপৎ আরাধনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৮৫ সূক্তের ১১ সংখ্যক ঋক এ স্থানে উদ্ধৃত হইল;—

"ইদং দ্যাবা পৃথিবী সত্যমস্তু পিতর্মাত যদিহোপব্রবেবাং।"

"হে পিতঃ দ্যৌঃ, হে মাতঃ পৃথিবী, এই যজ্ঞে আমরা যে স্তুতি করিতেছি তাহা সফল হউক।"

এইরূপে শতসংখ্যক ঋক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, আর্য্য ঋষিরা কেবল প্রকৃতির বাহ্য শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অব্যাজ ভক্তি প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদেরই যশোগান করিতেন। যে একেশ্বরবাদ লইয়া এখন হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন হইয়া থাকে, যে অসংখ্য দেব দেবীর সৃষ্ট মূর্ত্তির উপাসনায় তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিলে হিন্দু সমাজ মহা বিরক্ত হইয়া থাকেন, প্রাচীন আর্য্য মহামতিরা সে একেশ্বরবাদ জানিতেন না,—সে কল্পিত দেবদেবীর পূজা বিষয়েও আস্থা প্রদর্শন করিতেন না। সেই সরলমতি পরমারাধ্য পূর্ব্ব পিতামহেরা কেবল স্বভাবের মোহমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। ভক্তি-বিগলিত চিত্তে সেই স্বভাবেরই উপাসনা করিতেন। হায়! সে অকৈতব আর্য্যধর্ম্ম আজ কোথা? আর্য্যসন্তানগণের ধর্ম্মনৈতিক দুর্দ্দশায় আজ অশ্রু সম্বরণ করা কার সাধ্য?

প্রাচীন আর্য্যসন্ততিগণের সরল ধর্ম্ম ভাবের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল। এ প্রবন্ধে এতদতিরিক্ত বহুল রূপে আর কিছু বলা অসম্ভাবিত। অতঃপর, যে বর্ণবিভাগ লইয়া ইদানীন্তন আর্য্যসমাজ গঠিত, তদ্বিষয়ে বৈদিক সময়ের কিছু ইতিহাস বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। যাঁহাদের বেদজ্ঞান আছে, তাঁহারা অবিসম্বাদিত রূপে স্বীকার করিবেন যে, বৈদিক সময়ের প্রথমে আর্য্যসমাজে বর্ণভেদ ছিল না। ভারতভূমিতে আগমনের পূর্ব্বে আর্য্যসমাজে কোনও রূপ বৈষম্য প্রবেশ করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য্যেরা আদিম নিবাসীদের সহিত বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত হন; বলা বাহুল্য যে, সেই সময় হইতেই আর্য্যসমাজে এই মহানর্থকরী বর্ণভেদ-রীতি প্রবর্ত্তিত হয়; মনুর সময়াবধি সেই কুৎসিত রীতি দৃঢ় বিধি স্বরূপ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মনুর বিধি এই,—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষপ্রসক্তিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিকপথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥"

স্বয়ম্ভূ, ব্রাহ্মণদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষড়্বিধ কর্ম্ম ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষত্রিয়দের প্রজা পালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও স্রকচন্দন, বনিতাদির অনবরত অসেবন, সংক্ষেপে এইরূপ কর্ত্তব্যতা স্থির করিলেন। বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম ও বৃদ্ধ্যর্থে মূল ধন প্রয়োগ এইরূপ বৃত্তি বিধান করিলেন। আর অসূয়াশূন্য হৃদয়ে উপরি-উক্ত ত্রিবর্ণের সেবাই শূদ্রের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইল। সময়ের ও সমাজের আকাঙ্ক্ষানুসারে এবম্বিধ বর্ণবিভাগ ও কর্ত্তব্য বিভাগ হইয়া থাকিলেও, কোনও কালে যে ইহার অন্যথা ভাব হইবে না, বিধিদাতা মনু একবারও ইহা চিন্তা করেন নাই; এবং তৎপরবর্ত্তী সময়েও ঐ সমস্ত বিধি অকাট্য বিধিস্বরূপে সম্মানিত ও আদৃত হইয়া আইসে নাই। মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে স্পষ্ট বাক্যে লিখিত আছে।—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং
সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি
কর্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ॥

এই জগৎ ব্রহ্মময়; ইহাতে বর্ণভেদ নাই। লোকসমুদয় পূর্ব্বে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া, কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে লোক কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ লাভ করিয়াছে। যদি কর্ম্মই বর্ণ-বিশেষ প্রাপ্তির হেতু হয়, তাহা হইলে, অপেক্ষাকৃত হীনবর্ণও কর্ম্ম বিশেষ

দ্বারা উচ্চ বর্ণের আসন লাভ করিবে না কেন? আর পূর্ব্ব কালে ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভূত বিশ্বামিত্র ঋষি যে তপস্যা বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুসন্তান মাত্রেই অবগত আছেন। আবার মহাভারতের শল্যপর্ব্বের ৪০ অধ্যায়ের ৩৬—৩৮ শ্লোক পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, আর্ষ্টিষেণ সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি ইহাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন; কিন্তু পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।—

"আর্ষ্টিষেণঃ কৌরব্য
ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতং।
তপসা মহতা রাজন্
প্রাপ্তবান্ ঋষিসত্তমঃ॥
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষি-
র্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান যত্র
বিশ্বামিত্রস্তথামুনিঃ॥
মহাতেজস্বী ভগবানু-
গ্রতেজা মহাতপাঃ॥

"হে কুরুনন্দন, হে রাজন্ ব্রতপরায়ণ আর্ষ্টিষেণ নামক জনৈক ক্ষত্রিয়সন্তান, ঘোর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাতপস্বী উগ্রতেজাঃ ভগবান্ বিশ্বামিত্র যেরূপ তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপিও তপোবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।" আবার হরিবংশের একাদশ অধ্যায় পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, "নাভাগরিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ॥" নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ১ম অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে—নাভাগো নেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।" নেদিষ্টের তনয় নাভাগ কর্ম্মদোষে বৈশ্য হইয়াছিলেন। ভগবান মনুও একস্থানে স্পষ্ট বাক্যে কহিয়াছেন,—

"যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ং॥"

"যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া যত্নাতিশয় সহকারে অর্থশাস্ত্রাদি শিক্ষা করেন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই পুত্রপৌত্রাদির সহিত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।" এই সকল স্মৃতি ও পুরাণের বচন দ্বারা নিঃসংশয় উপলব্ধ হইতেছে যে, বর্ণবিভাগের প্রয়োজন হইলেও, এবং বস্তুতঃ বর্ণ বিভাগ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিলেও, কর্ম্ম বিশেষ দ্বারা একবর্ণ হইতে বর্ণান্তর প্রবেশ লাভ অসাধ্য হইত না। আর শাস্ত্রানুশীলন করিলে ইহাও দৃষ্ট হইবে যে, যে শূদ্রজাতি এখন নিতান্ত হেয় ও অসম্মানিত হইয়া আছেন, এক সময় ব্রাহ্মণাদি সম্পূজ্য বর্ণত্রয়, সেই শূদ্র জাতির কন্যা গ্রহণ ও অন্ন গ্রহণ করিতেন। মনুর ৩য় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে লিখিত আছে—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য
সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তেচ স্বাচেব রাজ্ঞশ্চ
তাশ্চ স্বাচাগ্রজন্মনঃ॥

শূদ্রের ভার্য্যা শূদ্রাই হইবে। বৈশ্য, বৈশ্যাকে ও শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারেন; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াকে ও বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করিতে সক্ষম; আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে এবং অপর ত্রিবর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী। বহ্নিপুরাণের বৃষ দানাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শূদ্রাস্তু যে দানপরা ভবন্তি
ব্রতান্বিতা বিপ্রপরায়ণাস্তু।
অন্নং হি তেষাং সততং সুভোজ্যং
ভবেদ্দৃষ্টমিদং পুরাতনৈঃ॥"

যে শূদ্র দানশীল ব্রতান্বিত এবং বিপ্র-ভক্তিপরায়ণ, তদীয় অন্ন ব্রাহ্মণাদির ভোজ্য ইহা দৃষ্ট হয়। হায়! এই উন্নত শাস্ত্র সকলের অন্যথা ভাব কেন ঘটিয়াছে, তাহা কেহই একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না। এবং উক্ত শাস্ত্রীয় বিধির বৈলক্ষণ্য সংঘটনে দেশের কি মহানিষ্ট হইতেছে, তাহাও ভাবিতে অবসর পান না।

পরিশেষে আদিম আর্য্যসমাজে স্ত্রী-জাতির কিরূপ অবস্থা ছিল, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যে স্ত্রীজাতির এখন দুরবস্থার একশেষ হইয়াছে, বৈদিক সময়ে ইহাঁরা ঈদৃশ হীনভাবাপন্ন ছিলেন না শুনিলে, বিস্ময়নিমগ্ন হইতে হয়। অত্রিবংশীয় বিশ্ববারানাম্নী এক আর্য্যরমণী ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের অন্তর্গত অষ্টাবিংশ সুক্তটী স্বয়ং রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীজাতির পুংবৎ শিক্ষা-বিধানে মহর্ষি মনুও বিধি দিয়াছেন। তাঁহার ব্যবস্থা এই—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া
শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে
ধনরত্নসমন্বিতা॥

পুত্রের ন্যায় কন্যাও পালনীয় ও যত্ন-পূর্ব্বক শিক্ষণীয় এবং ধন রত্ন সমন্বিত বিদ্যাবিৎ বরকে প্রদানীয়া। তিনি স্থানান্তরে কহিয়াছেন—

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ
পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ
বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্রনার্য্যস্তু পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে
সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

কল্যাণাভিলাষী পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর কর্ত্তৃক রমণীরা ভোজ্য বস্ত্রা-লঙ্কারাদির দ্বারা সম্মানিতা ও ভূষিতা হইবেন। যে গৃহে যোষিদ্গণ সম্মানিতা হন, দেবতারা সে গৃহে প্রসন্ন-দৃষ্টি দান করেন। আর যেখানে স্ত্রী-জাতির মান নাই; সেখানে সমুদয় সৎক্রিয়া ফলবর্জ্জিত হইয়া থাকে। কৈ স্ত্রীজাতির সে শিক্ষায় ব্যবস্থা কৈ? কৈ, স্ত্রীজাতির সে শাস্ত্রোক্ত মানসম্ভ্রম কৈ? হিন্দুসমাজ যেমন অন্য বহু বিষয়ে শুষ্ক ও নীরস হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ স্ত্রীজাতির শিক্ষাবিধানে ও মান

সম্ভ্রম প্রদানে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়াছে, এবং এই দুর্নীতির বিষময় ফল সর্ব্বদা ভোগ করিতেছে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বিধবাবিবাহ লইয়া একটা আন্দোলন চলিতেছে, বৈদিক সময়ে বিধবার কিরূপ গতি হইত। এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সমুদয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। কেবল বেদসংহিতায় এতদ্বিষয়ক যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ষষ্ঠ প্রপাঠক ১ম অনুবাক ১৪ সংখ্যক মন্ত্র এই—

উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোক-
মিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্ত্বমেতৎ
পত্যুর্জ্জনিত্বমভিসম্বভূব॥"

শ্রীমান সায়নাচার্য্য এই বেদবাক্যের উপর যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা এই,—

"তং প্রতি গতঃ সবেদপাণ্য ব ত-পাদেয়থাপতি ইতি। হে নারি, ত্বং ইতাসুং গতপ্রাণং এতং পতিং উপশেষে উপেত্য শয়নং করোষি উদীর্ষ্ব অস্মাৎ পতিসমীপাদুত্তিষ্ঠ; জীবলোকমভিজীবন্তং প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্য এহি আগচ্ছ। ত্বং হস্তগ্রাভস্য পাণিগ্রাহবতঃ দিধিষোঃ পুনর্ব্বিবাহেচ্ছোঃ পত্যুঃ এতৎ জনিত্বং জায়াত্বং অভিসম্বভূব অভিমুখ্যেন সম্যক্ প্রাপ্নুহি।"

অর্থাৎ মৃত স্বামি সমীপে শয়ানা দেবর [illegible] অথবা [illegible] পাঠ কর [illegible] শয়ন করিয়া [illegible]। উত্থিত হইয়া [illegible] নিকট আগমন কর। তুমি সম্যক প্রকারে তোমার পুনঃ পাণি-গ্রহণাভিলাষী [illegible] ভার্য্যা হও।"

ইহা আর্য্যনারীর বৈধব্যদশার পর পুনঃ পরিগ্রহণের বৈদিকী ব্যবস্থা কি না শাস্ত্রদর্শী সামাজিকেরা বিচার করিবেন।

মহাশয়গণ, যদি আপনারা মনুষ্য-নাম সার্থক করিতে চাহেন, যদি জগতীতলে আবার সমুচ্চ আসন অধিকার করিতে চাহেন, তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনী ও তাঁহা-দের [illegible] অনুসরণ করিবেন। এ পৃথিবীতে আপনারা যাঁহার সন্তান [illegible], নিশ্চয় জানিবেন [illegible]—[illegible]—জগৎপূজা ও সভ্যজাতি মাত্রেই [illegible]।

"পরাধীনান্ মলিনান্তি
বিপুল দুঃখার্ব্বধজলে
বলহীনান্ দীনান্
সকল সুখসৌভাগ্যনিচয়ৈঃ
কৃপাসিন্ধো! নাথ!
ত্রিভুবনগুরো! ভারতজনান্
সকৃদ্দীনানেতান্ প্রতি
বিতর কারুণ্যকণিকান্॥

ওয়ালেস্।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

যখন এড্‌ওয়ার্ড অগণ্য সৈন্য লইয়া তৃতীয় বার স্কট্‌লণ্ড আক্রমণ করিলেন, তখন ভীত ও চকিত স্কট্‌লণ্ড ওয়ালেসকে এই ভীষণ বিপদসাগরের একমাত্র কাণ্ডারী বলিয়া স্মরণ করিলেন। সমস্ত স্কট্‌লণ্ডবাসী একবাক্যে তাঁহাকে স্কট্‌লণ্ডের শূন্য সিংহাসনে বসাইবেন স্থির করিলেন। এই সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা ওয়ালেস্‌কে সম্মত করিবার জন্য ফরাশিরাজ ফিলিপের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ফিলিপ্ ওয়ালেসের সহিত বিশ্লিষ্ট হইতে অনিচ্ছুক থাকায় এ সংবাদ ওয়ালেস্‌কে জানিতে দিলেন না।

এদিকে ফরাশিভূমিতে ওয়ালেসের অবস্থিতি নিতান্ত অসুখকর বোধ হইতে লাগিল। ফরাশিরাজ গাইন্ প্রদেশ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সে প্রদেশকে শাসনে আনিতে তাঁহার অনেক শারীরিক ও মানসিক শ্রম ব্যয়িত করিতে হইয়াছিল। ইংরাজেরা এখনও বোর্দোনগর অধিকার করিয়াছিল। আরল্ গ্রষ্টর সেই দুর্গের অধিনায়কপদে অভিষিক্ত ছিলেন। ওয়ালেস ক্রমাগত দুই মাস সেই দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন—কিন্তু দুর্গবাসী সমুদ্রপথে খাদ্য সামগ্রী ও যুদ্ধের উপকরণসামগ্রী পাইতে থাকায় তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইতে লাগিল। অবশেষে ডিউক অব্ অর্লিন্সের উপদেশানুসারে ওয়ালেস দুর্গাবরোধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পারীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফিলিপ্ মহাসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেস স্কাইনন্ প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। একজন নাইট্ সেই প্রদেশের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। তিনি পিতৃ পিতামহিক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া ওয়ালেসের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। অনেক দিন হইতে তিনি এই সঙ্কল্পসাধনের চেষ্টায় ছিলেন, অনেকদিন পরে আজ তাঁহার সেই সুবিধা ঘটিল। এক দিন ওয়ালেস্ কতিপয় মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কেবল তরবারি ও ছুরিকামাত্র ছিল। নাইট্ বহুতর লোকজন সহ জঙ্গলে লুকায়িত

থাকিয়া ওয়ালেসের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ওয়ালেস্ আসিবামাত্র নাইট্ সশস্ত্র পুরুষগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ওয়ালেস্ ভীত হইবার নহেন, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ নিজ অসি নিষ্কোশিত করিয়া একাঘাতে নাইটের দেহকে দ্বিধা-বিভক্ত করিলেন। নাইটের মৃত্যুতেও যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল না। কারণ তদীয় ভ্রাতা সৈন্যসহ ওয়ালেসের সঙ্গে ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু সিংহের নিকট মেষশাবকের বিক্রম কতক্ষণ রহে? অচিরকালের মধ্যে ওয়ালেস্ ও তাঁহার বীর সহচরবৃন্দের খড়্গাঘাতে নাইট্-ভ্রাতা ও তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাদল শমন সদনে প্রেরিত হইলেন। কেবল সপ্তজন মাত্র প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ওয়ালেসের সহচরবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আহত হইয়াছিল, কিন্তু এক জনও হত হয় নাই। ফরাশিরাজ ওয়ালেসের প্রতি এই আক্রমণের সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং ওয়ালেস্‌কে নিজ পরিবার মধ্যে থাকিতে নিতান্ত অনুরোধ করিলেন। বলিলেন যে তাহা হইলে কেহ তাঁহার কেশস্পর্শও করিতে পারিবে না। রাজা ওয়ালেস্‌কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এবং ওয়ালেস্‌কে এইরূপ বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতত চেষ্টা করিতেন। তথাপি ওয়ালেস্‌কে প্রায় মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিপদে পড়িতে হইত।

মৃত নাইট্ ও নাইট্-ভ্রাতার দুই জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রতিহিংসা লইবার জন্য কৌশলে মিথ্যা করিয়া রাজাকে জানাইল যে ওয়ালেস্ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজ পরাক্রম প্রদর্শন করিবার জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক। ফরাশিরাজ তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে অনুমোদন করেন। উক্ত জ্ঞাতি ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিপ্রায় যে ওয়ালেসের ধ্বংস সাধন, তাহা তাঁহার মনে একবারও উদিত হয় নাই। এই জন্য তিনি এই বীরক্রীড়ার জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে আদেশ দেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে রাজা সভাসদ্বর্গ সমভিব্যাহারে রঙ্গ স্থলে উপস্থিত হইলেন। বীরচূড়ামণি ওয়ালেস্ অকুতোভয়ে রঙ্গস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাণের জন্য তিনি কখন ভাবেন নাই, তবে তাঁহার মনে এই ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল যে ফরাশিরাজ তাঁহার মৃত্যু ব্যাপারে কিরূপে অনুমোদন করিলেন। তিনি জানিতেন না যে ফরাশি রাজ প্রতারিত হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাকে কঞ্চুক-রক্ষিত হইয়া কাঠরার ভিতর প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অভিমানভরে বলিলেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। এই বলিয়া সেই নৃসিংহমূর্ত্তি অসি হস্তে কাঠগড়ার ভিতর প্রবেশ করিলেন। অমনি

বাহিনীর দ্বার বদ্ধ হইল। অমনি সে সিংহ প্রচণ্ড বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু বিক্রম কেশরী ওয়ালেস কিছুতেই ভীত হইবার নহেন। তিনি সিংহের কেশর ধরিয়া এরূপ প্রচণ্ড বেগে তাঁহার খড়্গ প্রয়োগ করিলেন যে মুহূর্ত্তমধ্যে সিংহদেহ দ্বিধা বিখণ্ডিত হইল।

এতক্ষণ ওয়ালেসের অভিমানবহ্নি জ্বালামুখী হইয়া উঠিল। তিনি রাজার দিকে আরক্ত নয়ন ফিরাইয়া বলিলেন— 'মহারাজ! আশ্রিত ব্যক্তিকে এইরূপে মারাই কি আপনার অভিপ্রায়? আপনার অন্তরে কি এই গূঢ় অভিপ্রায় যদি তাহাই হয় আমি তাহাতে ভীত নহি। আপনার পশুশালায় যত পশুরাজ আছে এক একটী করিয়া সকল গুলিকে আনিতে আদেশ করুন, আমি এই করাল অসি প্রহারে প্রত্যেককে দ্বিধা বিখণ্ডিত করিব। বিখণ্ডিত করিয়া আজ আমি আপনার নিকট বিদায় লইব। এতদিন আপনি যে আমায় আশ্রয় দিয়াছিলেন তজ্জন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিব। কিন্তু আর আমার এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। পশুগণের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য ওয়ালেসের জন্ম নহে। স্কটলণ্ড অদ্যাপি শত্রুগণের অধীন রহিয়াছে। সেখানে ওয়ালেসের অসি শত্রুমারণকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। আজ আমি আপনার নিকট ও ফ্রান্সের নিকট জন্মের মত বিদায় লইব' এই বলিয়া ওয়ালেস নিরস্ত হইলেন। তাঁহার আরক্ত নয়ন হইতে অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল। সকলে নির্ব্বাক্ ও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ফরাশিরাজ ইহার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ হইয়া ওয়ালেসকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া সেই দুষ্ট পাপিষ্ঠের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি সবিশেষ পীড়াপীড়ি করায় তাহারা আপনাদিগের দোষ স্বীকার করিল। ফরাশিরাজ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন, এবং ওয়ালেসের গাত্র স্পর্শ আর কেহ করিতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হইলেন। কিন্তু ওয়ালেসের মন আর ফরাশিক্ষেত্রে সুস্থির হইল না। স্বর্গাদপি গরীয়সী সেই জন্মভূমি আজ তাঁহার মনে পড়িল। এতদিন তিনি যেন নিদ্রাভিভূত ছিলেন, এতদিন অভিমান তাঁহার প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এতদিনে আবার তাঁহার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন ফ্রান্সের জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি ফ্রান্স তাঁহাকে আপনার বলিয়া লইল না। এই জন্য তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আবার জন্মভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জন্মভূমি শত্রুচরণদলিত হইতেছে—এই কথা স্মরণ হইয়া আবার তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। এবার

জননীর উদ্ধার সাধন বা শরীর পতন করিবেন স্থির করিলেন। এইবার তাঁহার শেষ শবসাধনা—শেষ আত্মবলি।

ফরাশিরাজ ফিলিপ্ যখন দেখিলেন যে ওয়ালেস্ স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন তিনি ওয়ালেসকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিবার জন্য যে সকল অনুরোধ পত্র পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে সে সমস্ত পত্র দেখাইলেন। ওয়ালেস্ আর থাকিতে পারিলেন না। স্বদেশ আবার তাঁহার সেবা গ্রহণে ব্যাকুল হইয়াছেন শুনিয়া আবার তাঁহার চিত্তশলাকা উত্তরাভিমুখিনী হইল। তিনি রাজার নিকট বিদায় লইয়া একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু লঙ্ভিল্ সমভিব্যাহারে স্কটলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সুইস্ বন্দরে জাহাজে চড়িলেন; এবং আরব্‌মাইথ্ বন্দরে গিয়া অবতরণ করিলেন। ওয়ালেস্ ফল্‌কার্ক সমরের পর ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে স্কটলণ্ড পরিত্যাগ করেন; তথায় কিঞ্চিদাধিক দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া ১৩০১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। ফরাশিরাজ ফিলিপ্ তাঁহার বিরহে নিরতিশয় কাতর হয়েন। তিনি ওয়ালেসকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন, এই জন্য স্কটলণ্ড হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধপত্র পাইয়াও তাঁহাকে পাঠাইতে চান নাই, এবং জানিতে পারিলে ওয়ালেস্ পাছে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—এই জন্য সেই সমস্ত অনুরোধ-পত্র তাঁহার নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখেন। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য ওয়ালেসের আত্মবলি প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই আজ ওয়ালেস্ প্রিয়বন্ধু ফিলিপের আগ্রহাতিশয় উল্লঙ্ঘন করিয়াও স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে' নিয়তির গতি কে রোধ করে?

আরবমাইথে নামিয়া ওয়ালেস এল্‌কো নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা ক্রফোর্ডের গোলাবাড়ীতে গিয়া তিনি লুক্কায়িত ভাবে রহিলেন। গোলাবাড়ী এরূপ আঁটা ছিল যে কেহই তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানিতে পারে নাই। কেবল একটীমাত্র ছিদ্র ছিল—সেই ছিদ্র দিয়া নদীতে যাওয়া যাইত, এবং সেই ছিদ্র দিয়া তাঁহাদিগের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রেরিত হইত। ওয়ালেস্ ও লঙ্ভিল এইরূপে সেই গুপ্তাবাসে ৪।৫ দিন যাপন করিলেন। ক্রফোর্ড অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী সেণ্ট জনষ্টন্ হইতে আনিতেন। ইংরাজেরা দেখিল যে তিনি নিজের আবশ্যকের অতিরিক্ত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া যাইতেছেন। দেখিয়া তাহারা সন্দিহান হইল, এবং তাঁহাকে কারাগারে প্রক্ষিপ্ত করিল। অবশেষে ওয়ালেস্ আসিয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার গুপ্তস্থান নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ক্রফোর্ডকে ছাড়িয়া দিলেন। যে পথে ক্রফোর্ড

গেলেন, ইংরাজ সেনাপতি রটলার আটশত সৈন্য লইয়া সেই পথে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অনুসরণকারী ইংরাজ সৈন্যের আগমনে ওয়ালেস্ ক্রফোর্ডের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন—বলিলেন তুমি ইংরাজদিগের হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া জাতি শক্রতা সাধিলে!' কিন্তু ক্রফোর্ড আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে অন্যস্থানে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ওয়ালেস্ পলাইতে অস্বীকৃত হইলেন। তিনি ক্রফোর্ড শুদ্ধ বিশ জন মাত্র সহচর লইয়া সেই প্রকাণ্ড ইংরাজ সেনার সম্মুখীন হইতে কৃতসংকল্প হইলেন।

নিদাঘ-তটিনী।

"Thanks to the human heart by which we live,
Thanks to its tenderness, its joys and fears,
To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears."

Wordsworth.

(১)

বিগত-জীবন-স্রোত অয়ি লো তটিনি!
একি এ ভীষণ ভাব,
কোথা তব সে প্রভাব?
কেন আজি হেরি হায়! ভীম দরশন,—
নিদাঘে শুখায়ে তব গিয়াছে জীবন!
নীরস হৃদয় তব—
একি দশা অভিনব,
কেন আজি হেন দশা অয়ি বিষাদিনি!

(২)

প্রাবৃটের রূপ তব কোথায় এখন?
কোথা সে হৃদয় শোভা,
ভাবুক মানস-লোভা,
কোথা সে রুচির চল তরঙ্গ নিচয়—
সকলি কি একেবারে পাইয়াছে লয়?
সুন্দর তরণী গুলি
বায়ু ভরে পাল তুলি;
নাচিয়া তরঙ্গ সহ করিত গমন,

(৩)

তদুপরি নাবিকেরা বসিয়া হরষে,
উল্লাসে সরল প্রাণ,
কতই করিত গান,
কতই হাসিত হেরি তব চারুগতি—
(বিমল পুলকে মরি, উল্লাসিত অতি),

দেখি সে লহরী-লীলা
কতই করিত খেলা
ক্ষেপণী ক্ষেপণে তব মধুর উরসে!

(৪)

সে সুখের কাল নদি, গিয়াছে কোথায়?
কতবার তব তীরে
হরষে বসিয়া ধীরে
দেখেছি সে কমকান্তি নয়ন ভরিয়া,
তব সনে চিন্তাস্রোত যাইত ভাসিয়া!
দেখেছি সে চিত্তলোভা
নবীন যৌবন শোভা
মোহিয়াছে প্রাণ মম শান্ত সুষমায়।

(৫)

উথলিয়া তীরভূমি যে প্রণয়-বারি
শোভেছিল হৃদি তব,
কোথা আজ সে বিভব?
প্রবাহিয়া ধীরে ধীরে হয়েছে মিলিত
বিশাল জলধি যথা চির-সুশোভিত;
এবারি সে বারি সনে
মিলিয়াছে এক প্রাণে—
কি মধুর আকর্ষণ যাই বলিহারি!

(৬)

প্রেমের আদর্শ-চিত্র ধরেছ ধরায়,
থাকিয়া সুদূর দেশে
তব মত্ত প্রেমাবেশে,
তবু প্রাণ প্রেমভরে সদা ধাবমান—
মধুর উল্লাসে মাতি অধীর পরাণ;
ভুলিয়া আপন মান
ঢালিয়া দিয়াছ প্রাণ
প্রণয়-সাগরে তব মিশাতে যথায়।

(৭)

মানব হৃদয়ে প্রেম শিখাবার তরে
তোমারে এ ভূমণ্ডলে
অপার করুণা বলে,
বিধাতা কি স্বর্গ হতে করিলা প্রেরণ—
তাই কি মরত লোকে তব আগমন?
দেবলোকে মন্দাকিনী
পূত-প্রেম-প্রবাহিনী
প্লাবিয়া ত্রিদিব যথা সতত সঞ্চরে।

(৮)

মানুষের হৃদি হায়! কিন্তু কি কঠিন,
প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি
নাহি তথা পায় স্ফূর্ত্তি
মহান্ উদাত্ত ভাব না পশে তথায়
সদাই নিবদ্ধ তাহা অজ্ঞান সীমায়;
নতুবা এ ভূ-মাঝারে
কভু কি থাকিতে পারে
নীরস, নিস্পন্দ সদা বিষয়-মলিন?

(৯)

চারিদিকে প্রণয়ের পবিত্র প্রকাশ
বিভাসিত সুষমায়,
কিন্তু কে দেখিতে পায়?
সকলেই অন্ধ হায় থাকিতে নয়ন—
সকলেই মৃত নদি! থাকিতে জীবন;
বাহির-দর্শন-জ্ঞান
সবারিত বিদ্যমান,
কে পায় দেখিতে তথা সৌন্দর্য্য আভাস?

(১০)

সুলাবণী, অপ্রেমিক হে মানব কুল!

কতকাল বল হায়!
গাঢ়তম তমিস্রায়
হৃদয় বিহীন হ'য়ে করিবে ভ্রমণ,
কতকাল অন্ধ রবে থাকিতে নয়ন?

অনন্ত প্রেমের দেশে
মত্ত রবে মোহাবেশে
বুঝিবে না এজগতে সকলি অতুল!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

আমার স্বাধীনতা।

একদা নিদাঘ প্রদোষে কলনাদিনী বঙ্গশীলা জাহ্নবীর তীরে বসিয়া বীচি-বিক্ষোভশীতল সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতেছিলাম। নিকটে উন্নতকায় তেজঃপুঞ্জ বিন্ধ্যগিরি রক্তিমমূর্ত্তি অস্তগামী তপন-মুকুটে বীরদেহ বিভাসিত করিয়া বীর দর্পে দাঁড়াইয়া জাহ্নবীর শুভ্র তরঙ্গে চরণ প্রক্ষালণ করিতেছিল। সৌন্দর্য্যময়ী জাহ্নবী হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে অনন্ত উদ্দেশে ছুটিতে ছিল। কত শাখাভ্রষ্ট পত্র, কত লতাবিরহিত সুগন্ধ প্রসূন, কত সৈকতবিচ্যুত শ্যামল দূর্ব্বা সেই অনন্ত উদ্দেশী তরঙ্গের অনন্ত ক্রোড়ে বিলীন হইতেছিল। দেখিলাম, একটী ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ সম্মুখবর্ত্তী বিন্ধ্যগিরির গাম্ভীর্য্যময় অতুল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহার দিকে ছুটিল। বিন্ধ্যগিরি অপর পারে, তাই গঙ্গা পার হইয়া তাহার উপরে যাইবার জন্য সমীর তরঙ্গে ঝাঁপ দিল! কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াই বীচিমালাময়ী গঙ্গার প্রবল তরঙ্গ মধ্যে পড়িয়া গেল। হায়! ক্ষুদ্রশক্তি পতঙ্গ সেই স্রোতরাশি হইতে উঠিবার জন্য কতই চেষ্টা করিল, সেই অতুল গাম্ভীর্য্যময় মহাযোগীর ন্যায় মহান অচলের পানে কত বার মুগ্ধনেত্রে চহিল, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রপতঙ্গ সেই প্রবল তরঙ্গের সঙ্গে কতই যুঝিল। কিন্তু অবশেষে বল হারাইয়া চেষ্টা ছাড়িয়া সেই অনন্ত বিস্তারী স্রোতের বিশাল বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। ইহ জগতে আমার স্বাধীনতা ঠিক অই পতঙ্গের মত! আমি এক দিন ঐ পতঙ্গের মত অভ্রভেদী শৈলরাজের গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অইযে মহাযোগী সংসার মহাগনাচরণে দলিত করিয়া ষড়রিপুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া মোহমায়াকে তৃণবৎ নিক্ষেপ করিয়া অমৃত সাগর মধ্যে যোগাসনে

বসিয়া আছেন এক দিন আমি উঁহার নিকটে যাইবার আশা করিয়াছিলাম। ঐ যে মহাযোগী মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়, শার্দ্দূলচর্ম্মধারী, স্তিমিতোগ্রনয়ন মহাপুরুষ হিমাচলের হৈম শৃঙ্গে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার প্রফুল্ল রাজীব-সৌন্দর্য্যে পাদপ নিস্তব্ধ, পল্লব নিষ্কম্প, দ্বিরেফ নিভৃত, কানন চিত্রার্পিত; যাঁহার সম্মুখে হিমাচল নম্রশির, কন্দর্প ভস্মীভূত, একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিব মনে করিয়াছিলাম। ঐ মহাযোগীর চরণতলে বসিয়া একবার নয়ন ভরিয়া ঐ অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার

"মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি
হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্‌
যমক্ষয়ং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তম্‌
আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম"

সংযমীন্দ্রকে দেখিয়া প্রাণ বিমোহিত করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ পতঙ্গের মত তরঙ্গসমাকুল বিশাল স্রোতে বিক্ষিপ্ত হইলাম। কতবার উঠিবার চেষ্টা করিলাম, হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিলাম, কিন্তু তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। উত্তাল তরঙ্গরাশি সবেগে সদর্পে হীনবল, শরণাপন্ন পতঙ্গের পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতেছে, যেন বলিতেছে, সাধ্য থাকে উঠিয়া যাও—নতুবা এ ঘোর আবর্ত্ত মধ্যে আজীবন ঘূর্ণিত হইতে থাক। কিন্তু উঠিবার বল থাকিলে এত চেষ্টার পর অবশ্যম্ভাবী পতন কেন হইবে? ইহ সংসারে এই আমার স্বাধীনতা! সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক তুমি মনুষ্য জাতির স্বাধীনতা সপ্রমাণ করিবার জন্য ঐ যে সহস্র পৃষ্ঠায় মনোবিজ্ঞান গ্রন্থ সমাপ্ত করিলে, কোথাও কি দেখাইয়াছ, কোন বিষয়ে ঐ ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ অপেক্ষা আমার স্বাধীনতা অধিক! রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত! তুমি বহু পরিশ্রমে বহু মস্তিষ্কব্যয়ে ঐ যে দণ্ডবিধি আইন প্রণয়ন করিলে, বলিতে পার আজি পর্য্যন্ত উহাতে মনুষ্যজাতির অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টস্রোতের কিছুমাত্র প্রতিরোধ ঘটিয়াছে কি? শিক্ষিতাভিমানী সূক্ষ্মবিচারক! ঐ যে অজাতশ্মশ্রু যুবা পুরুষ তোমার সমক্ষে বিচারে নীত হইল ও প্রমাণীকৃত হইল যে ঐ মোহান্ধ যুবক, যে অপ্সরোরূপিণী প্রিয়বাদিনী পিশাচীর রূপমোহ-যজ্ঞে আত্মবলি দান দিয়াছিল, সহসা তাহাকে পরপুরুষের অঙ্কন্যস্ত দেখিয়া চৈতন্য হারাইয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার গরলময় সুকুমার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়াছে, তুমি তাহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলে; ঐ যে দুর্দ্ধর্ষ-পরাক্রম বীর দস্যু নিষ্ঠুর সংসারের অশেষ নির্যাতন সহিয়া, অবস্থানিচয়ের চক্রনেমী পেষণে দলিত হইয়া, সাধ্বী প্রণয়িনীর প্রাণ রক্ষার আশায়, সুকুমার শিশুতনয়ের স্নেহকলিকা অকালে বৃন্তচ্যুত হইবার ভয়ে, অনন্যোপায়

হইয়া স্বভাবসুকোমল হৃদয়কে পুনঃ পুনঃ আঘাতে পাষাণে পরিণত করিয়াছে আজি তুমি তাহাকে তাহার সেই প্রাণের প্রাণ নয়নতারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠাইলে; বল দেখি, তুমি যদি স্বয়ং ঐরূপ অবস্থা-নিচয়ের চক্রোপরি সংস্থাপিত হইতে, ঐরূপ ঘটনাসমষ্টির তরঙ্গমধ্যে বিক্ষিপ্ত হইতে, তবে তুমিও ঐরূপ লোমহর্ষণ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কি না? তখন তোমার স্বাধীন ইচ্ছা ও আত্মাভিমান কোথায় থাকিত! আত্মদর্শী ধর্ম্মযাজক! কালি তুমি মধুর ধর্ম্মোপদেশে শ্রোতৃ-বর্গের চিত্ত হরণ করিয়াছিলে, সংসারের নিকট পূজিত হইয়াছিলে, আজি সেই তুমি মন্মথের ক্রীতদাস, আজি তোমার সেই উচ্চ হৃদয় রমণীর করতলস্থ লীলাকমল! তবে তোমার স্বাধীন প্রবৃত্তির গৌরব কোথায়? আমি স্বাধীন, তবে চরণে এ লৌহশৃঙ্খল কেন? চেষ্টা করিলে সকলি করিতে পারি, তবে এ মৃদুমারুতভরে পড়িয়া যাই কেন? শ্রেষ্ঠতম জীব! তবে ঐ খদ্যোতের মত আলোক দেখিয়া অনলে পড়িতে যাই কেন? নিষ্ঠুর সংসার ক্রোড়ে লইয়া হৃদয়ে ছুরিকা বিদ্ধ করিল, বাহু বিস্তার করিয়া পদাঘাত করিল, তবুও আবার সেই সংসারের চরণ লেহন করিতে ছুটিলাম! নিয়তির চক্রনেমীপেষণে লোষ্ট্রবৎ দলিত হইলাম, ঘটনাসমষ্টির ঘূর্ণা বায়ুতে বালুকাকণার ন্যায় অসীম শূন্যে বিক্ষিপ্ত হইলাম, অদৃষ্ট তরঙ্গের প্রবল স্রোতে অতল জলধিতলে নিমজ্জিত হইলাম, নিষ্ঠুর সংসারের কষাঘাতে মুমূর্ষু দশায় পতিত হইলাম, তবুও আবার সংসারের পাষাণবক্ষে আশ্রয় লইতে চলিলাম। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিবিধানের জন্য এ ঘোর সংগ্রামে হৃদয় আত্ম-রুধিরে প্লাবিত করিলাম! হৃদয় নৈরাশ্যের দাবানলে উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হইল, তবুও আশার মুকুল শুখাইল না! এ ভীষণ মরুভূমিতে ঐ যে সম্মুখে নয়নতৃপ্তিকর কল্লোলিনী দেখিতেছি নিশ্চয় বুঝিতেছি, উহা তৃষিত পথিকের মায়া মরীচিকা বই আর কিছুই নয়, জানিয়াও উহার জন্য ছুটিতেছি। যত দিন এ মরুভূমিতে পর্য্যটনের অবসান না হইবে ততদিন এইরূপে ছুটিতে হইবে! প্রতি মুহূর্ত্তে দেখিতেছি, বুঝিতেছি যে "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

এ কথা বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়াও এমন সাধ্য নাই যে কার্য্যক্ষেত্রে দেখাইব যে এ কথা বুঝিতে পারিয়াছি! অনন্ত শোভার আস্পদ হিমাচল! দেবেন্দ্রপূজিত মহাযোগি! আমার ভ্রম হইয়াছিল, তাই তোমাদের দিকে চাহিতে সাহস করিয়াছিলাম! তখন জানিতাম না যে এ সাগর মধ্যে আমি ঐ আকাশ-তরঙ্গে প্রধমান মুমূর্ষু পতঙ্গের মত স্বাধীন! আমি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত ক্ষুদ্র-

শক্তি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাই না বুঝিয়া এ প্রবল তরঙ্গের সঙ্গে যুঝিয়াছিলাম। আর্য্যগণের নিকট শুনিয়াছিলাম অদৃষ্ট লিপির খণ্ডন করে কাহার সাধ্য। "ললাটে লিখিতং ধাত্রা বদ কেন নিবার্য্যতে।" তখন এ কথার অর্থ বুঝি নাই, ইহার যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করি নাই! জানি না, বিধাতঃ! তোমার এ কিরূপ সৃষ্টিকৌশল! বুঝিতে পারি না কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে এ হৃদয় সংগ্রাম-পর ও বৃত্তিনিচয়ের রণক্ষেত্র করিলে! যদি আজীবন এই আকাশকুসুম, এই আশা-মরীচিকার অনুসরণ করিতে হইবে, যদি চিরদিন দুরাশার দাস প্রভু-হন্তা (Macbeth) ম্যাক্‌বেথের ন্যায় অনিল-অঙ্গে লম্বিত অসি ধারণ করিবার প্রয়াস পাইতে হইবে তবে গ্রীকরাজের (Damoclis) ন্যায় মস্তকোপরি সূত্র-ভারে লম্বমান তিক্ষ্ণফলক তরবারি দেখিয়া সিহরিতে হয় কেন? যদি আমাকে এতই ক্ষুদ্রশক্তি, এতই হীনবল করিয়া সৃষ্টি করিলে তবে সম্মুখে ঐ অতুলগাম্ভীর্য্যময় বিন্ধ্যগিরিকে কেন রাখিলে? ঐ যে গগনস্পর্শী উন্নত অচল সুধাময় শান্ত-রসে ক্ষুদ্র পতঙ্গেরও প্রাণ বিমোহিত করে, উহার পার্শ্বদেশে ঐ নৃত্যগীতি-শীলা, বীচিমালাভূষিতা সৌন্দর্য্যময়ী স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি কেন করিলে? ঐ যে সুখের আলয়, শান্তির আস্পদ, মহামুনির পবিত্র আশ্রমের সৃজন করিলে, উহার নিকটে আবার ঐ অনঙ্গের লীলা-নিকেতন অনাঘ্রাত কিশলয়ের সৃষ্টি কেন করিলে? ঐ যে হিমগিরির তুঙ্গ শৃঙ্গে মহাযোগী যোগাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার পার্শ্বে ঐ যে বসন্তপুষ্পাভরণে অবনম্রবদনা* সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় মোহিনী কুসুম করে, মদনের কার্মুকের ন্যায়, নিতম্বভ্রষ্ট বকুলমালা ধারণ করিতে করিতে, লীলাপদ্ম সঞ্চালনে সুগন্ধি নিশ্বাসগন্ধে প্রমত্ত দ্বিরেফদলকে বিম্বাধর হইতে নিবৃত্ত করিতে করিতে, ধীরে ধীরে আসিতেছে উহার সৃষ্টি কেন করিলে? আর তাহার অপর পার্শ্বে ধনুর্ব্বাণ হস্তে দিয়া ঐ কন্দর্পকে কেন আনিলে?

যদি হিমানীসিক্ত, তুষারধবল শ্বেত দ্বীপে জন্মিতাম, তপোবৃত্তি ও যোগবল যে দেশের লোকের নিকট শিশুর স্বপ্ন, ধনতৃষ্ণা যাহাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা, জলধিতল যাহাদের যোগাভ্যাসের একমাত্র স্থান, যদি সেই দেশের তুষার-শীতল শোণিত এ হৃদয়ে বহিত, তাহা হইলে নয়ন সমক্ষে অবিরত এই আর্য্যভূমির মহাযোগীর তেজঃপুঞ্জ মহান হৃদয় দেখিয়া এ বিশাল সংগ্রামে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করিতে হইত না, তবে নয়ন মুদিয়া সংসার সুখের তরঙ্গে ধনতৃষ্ণার স্রোতে আমরা সন্তরণ দিতাম। জানি না, প্রভো! কোন পাপে, মহাশক্তি, মহাযোগক্ষম "বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম" রাজর্ষির শোণিত এ দুর্ব্বল দেহে, এ ক্ষীণ ধমনীতে প্রবাহিত করিলে?

পরিব্রাজক।

যোগাঙ্গ-বীরাচার বিচার।

তন্ত্রানভিজ্ঞ অনবধৃতেরা বলেন যে বীরাচারকে ধর্ম্ম ও পুরাণ শাস্ত্রে দোষাকর ও ঘৃণাকর বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছে। পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে সকলে বেদমূলক বলিয়া জানায় বীরাচারকে বেদবিরুদ্ধ বোধ করেন। এতদ্ভিন্ন যে সকল তন্ত্রে বীরাচারের প্রশংসা ও তৎপ্রতিপালনের বিধি করা হইয়াছে, সে সকল তন্ত্র স্থানবিশেষের ও সময়বিশেষের জন্য আর পাষণ্ড মোহনার্থ করা হইয়াছে। ঐ সকল তন্ত্র ভারতের, বর্ত্তমান সময়ের ও আর্য্য জাতির জন্য হয় নাই। ইহার প্রমাণ যথা—

সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং
তন্ত্রং বৈ বেদসম্মতং।
কীর্ত্তনং দেবদেবস্য
হরস্য মতমেবচ।

—মৎস্য সূক্ত তন্ত্রম্।

কালী বিলাসকাদীনি
তন্ত্রাণি পরমেশ্বরি।
কালক্রমে সুসিদ্ধানি
অশ্বক্রান্তাসু ভূমিষু॥

—মহাসিদ্ধসার স্বতন্ত্রম্।

চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি
যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানীহ বারাহে
বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥—ঐ তন্ত্র।

কল্পভেদেন তন্ত্রাণি
কথিতানিচ যানি চ।
পাষণ্ডমোহনায়ৈব
বিফলানীহ সুন্দরি॥—ঐ তন্ত্র।

বরাহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বিষ্ণুক্রান্ত ভূমির জন্য চৌষট্টি রকম তন্ত্র, আর যামল, ও ডামর ইত্যাদি যে আছে তৎসম্মত ক্রিয়া করিলে তাহা সফলই হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি তন্ত্র কল্প বিশেষের জন্য আর পাষণ্ড মোহনার্থ প্রকাশ হয়। এ কালের নিমিত্ত তাহা বিফল॥

জম্বুদ্বীপকে বরাহমূর্ত্তি হরি উদ্ধার করিয়াছিলেন আর উহাতে বিষ্ণু নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া উহাকে বিষ্ণুক্রান্ত বলা যায়। ইংরাজেরা উহার আসিয়া নাম দিয়াছেন।

উক্ত ভূমিতে নিস্ত্রৈগুণ্য পথের পথিক সিদ্ধযোগী সকল বীরাচার অবলম্বন করিলে প্রত্যবায়ভাগী না হইয়া সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন ইতি—

এতদুত্তরে প্রতিবাদীদিগের মত—

তন্ত্রবল, যামলবল, ডামরবল, সকলই অথর্ব্ব বেদানুযায়ী। বেদবিরুদ্ধ নহে। বেদে ও যজ্ঞস্থলে মদ্য মাংসাদি ভক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। যজ্ঞীয় সোমরস, সুরা বৈ আর কিছুই নহে। সোমের

অশ্বমেধ যজ্ঞের গো আর অশ্ব মাংস ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য তাহা কি বাদীরা জানেন না?

সত্য, কতকগুলি তন্ত্র পাষণ্ড মোহনার্থ প্রকাশ হয়। তাই বলিয়া সকল তন্ত্র ত তাহা নহে। তবে যে সকল তন্ত্রে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা আর ঐহিক সুখ সাধন বৈ অন্য কিছুই নাই সেই গুলিকে প্রকৃত পাষণ্ড মোহকারক তন্ত্র বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যে চৌষট্টি রকম তন্ত্রবাদীর মতে বিষ্ণুক্রান্ত স্থানে প্রসিদ্ধ, সে সকল তন্ত্রেও পঞ্চমকার সাধনার পদ্ধতি দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে পঞ্চমকার সাধনা বেদবিরুদ্ধ যদি হইত তাহা হইলে ঐ চৌষট্টি রকম তন্ত্রে ও যামল আর ডামরে উহার প্রসঙ্গও থাকিত না। এমতাবস্থায় বাদিগণ পঞ্চমকারের উপাসনার কথায় যে অধর্ম্ম আরোপ করেন সে তাঁহাদিগের ফল্গুধার্ম্মিকতা অর্থাৎ গোঁড়ামী মাত্র। অপরঞ্চ এই ঘোর কলিযুগের লোক সকল অল্পায়ুঃ, দুর্ব্বল, সাহসহীন, আবালী, নির্ধন, বীরত্ববিহীন, ইহারা যম নিয়মাদিযোগসম্পন্ন হইয়া চিত্তস্থৈর্য্য করিতে তাদৃশ পারগ নহে। এজন্য দেবাদিদেব মহাদেব উহারা যাহাতে অনায়াসে যোগসিদ্ধ হইতে পারে তদর্থ মন্ত্রযোগসাধনাতে পঞ্চমকারকে প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাহার সাধনাপদ্ধতি প্রচার করিয়া দেওয়ায় মন্ত্রযোগসাধনা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। যমনিয়মাদিতে যেমন চিত্তবৃত্তির দমন হয় বৈধরূপে পঞ্চমকার সেবা করিলেও তদ্রূপ হইতে পারে। পঞ্চমকারসাধনা যে সে গুরুর দ্বারা হয় না। কৌলিক সিদ্ধ গুরুই এ কার্য্যের উপযুক্ত গুরু।

অপিচ মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এই পঞ্চমকারের কষ্ট কল্পনা করিয়া বাদিগণ যে অর্থ করেন তাহা যদি সত্যই হইত তাহা হইলে মদের শাপোদ্ধার করিবার আবশ্যক আর বজ্র পুষ্পের বিধান থাকিত না। স্বয়ম্ভু পুষ্পও বজ্রপুষ্পতুল্য। আদ্যা আর দ্বিতীয়া বিদ্যার, সকল রকম উপাসনায় উক্ত উভয় প্রকার পুষ্পের অতীব মাহাত্ম্য। এমন কি দ্বিতীয়া বিদ্যার উদ্দেশে যে কোন দ্রব্য দান করিবে তাহাতে বজ্র পুষ্পের নাম না করিলে সে দ্রব্য তাঁহার অগ্রাহ্য। বিশেষতঃ পঞ্চমকারের অন্ত্য মকারের ক্রিয়া নিষ্পন্ন না হইলে স্বয়ম্ভু পুষ্প লাভ হয় না। পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র উক্ত পুষ্পদ্বয়-জননী কুলবৃক্ষকে স্পর্শ ও তাহার ছায়া মাড়াইলে অতি গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের বিধান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পুরাণ আর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতারা কি অভিপ্রায়ে ওরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা যদি সকলে বুঝিতে পারিত তাহা হইলে সকলেই মন্ত্রযোগ সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে পারিত। ওরূপ ব্যবস্থাসকল যোগবিঘ্ন মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তবে যে যোগশাস্ত্রে মাদক দ্রব্য সেবন ও যোষিৎস্পর্শ করিতে দৃঢ়রূপে

নিষেধ হইয়াছে তাহা মহাবিদ্যা আর কতিপয় ভৈরব মন্ত্রযোগ সাধনা ব্যতীত অন্যান্য যোগ সাধনা পক্ষে।

মহাবিদ্যা আর ভৈরবদিগের মন্ত্র যোগ সাধনায় যদি পঞ্চতত্ত্ব অনাদৃত হইত তাহা হইলে ঐ সকল দেবী ও দেবতাদিগের কস্মিন কালে মন্ত্রযোগ সিদ্ধ হইত না। মন্ত্রচৈতন্যের কারণই পঞ্চমকারের বিধি হইয়াছে। পঞ্চমকারকে যথারীতি ব্যবহার যাহারা না করিয়া স্বেচ্ছাচারানুসারে ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধি হইয়াছে। যোগসাধনার্থ বৈধরূপে পঞ্চমকারের উপাসনা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষজনক।

শবসাধনাপ্রকরণে চণ্ডাল শবই যোগীর পবিত্র আসন। আর মদ্য মাংসই এ কার্য্যের প্রধান উপকরণ। এতদ্ভিন্ন অন্যাসন আর উপকরণ শবসাধনোপযোগী হইতে পারে না। এমতাবস্থায় ফল্গুধার্ম্মিকেরা শবসাধনাকেও প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া তাহা করিতে ত' নিষেধ করিতে পারেন না।

মহরাজা রামকৃষ্ণ ১৩টি শবসাধন করিয়াছিলেন। অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও ৭। ৮ শব সাধন করিয়া বিঘ্ন বিড়ম্বনা প্রযুক্ত বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন।

এ সকল তান্ত্রিক কার্য্যে যদি- বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত তাহা হইলে উক্ত মহাত্মারা ওরূপ নিষিদ্ধ কার্য্য অর্থব্যয় ও প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া করিতেন না। শবসাধন ভিন্ন পীড়াবিশেষে ও রণজয়ার্থ সুরা সেবন প্রচলিত আছে। পীড়ায় আর যুদ্ধে অশোধিত সুরা পান করিলে যখন পাপিষ্ঠ হইতে হয় না তখন ইষ্টারাধনায় সংশোধিত সুরা সেবনে কি জন্য পাপভাগী হইতে হইবে? ইতি—

বীরাচার সম্বন্ধে বাদী ও প্রতিবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন আর যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন স্বস্ব মতে সকলই বলবান বটে, কিন্তু সমাজ রক্ষার্থ শিষ্টাচারই বলবান্ হেতু পঞ্চমকার সাধনাটি সাধারণ সমাজের আদৃত না হইয়া সমাজ বিশেষের আদরণীয় প্রযুক্ত বেদবিরুদ্ধাচার মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। যে আচার সমাজবিশেষের, স্থান বিশেষের ও লোক বিশেষের অতি সংগোপনে করিতে হয় সে কর্ম্মকে সাধারণ লোকে বেদবিরুদ্ধ জ্ঞান করে বলিয়া উহা নিন্দনীয় মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোকে এই বোঝে যে "যং ন গোপ্যং মহাজনে" অর্থাৎ যে কর্ম্ম মহাজনের নিকট গোপন করিতে না হয় সেই কর্ম্মই শাস্ত্রসম্মত। পঞ্চমকার সাধন অতি গোপনে করিবে। এমন কি পুত্রের বীরাচার পিতামাতারও অজানিত হওয়া চাই। ভ্রাতার আচার ভ্রাতাও জানিতে পারেন না। কেবল ধর্ম্মপত্নী আর কুলীনেরাই জানিতে পারেন। বীরাচার এতাধিক গুপ্ত বিষয়। এই কুলাচার প্রকাশ হইলে পাপভাগী হইতে

হয় আর কার্য্যের হানি হয়। অন্যচ্চ—

কালমাহাত্ম্যে বর্ণ, আশ্রমাদি ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া যাওয়ার যোগীর মধ্যে অনেকেই ভোগবিলাসী হইয়া পড়ায়, বীরাচারী যোগীদিগের অত্যাচারে সতীত্ব ধর্ম্মেরও বিশৃঙ্খল দেখা যায়। তাহাতে নিরীহ প্রতিবাসীরা উক্তাচারের পক্ষে বীতরাগ হওয়ায় ও তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় ঐ ধর্ম্মকে কপট ধর্ম্ম বলিয়া জানে। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি উদাহরণও দেখা যায়। অতএব বীরাচার এই সকল কারণেই নিন্দাভাজন ও পাপজনক মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ এ দলের বল ও ব্যক্তিসংখ্যাও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। যখন এ দলের দৈববল অধিক ছিল তখন বীরাচার অত্যাদরের সামগ্রী ছিল।

তন্ত্রশাস্ত্রে বীরাচারের আত্যন্তিক প্রশংসাবাদ আছে দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, উক্তাচার যোগীদিগের আচরণীয় যে ছিল তাহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, বলরাম, শুক্রাচার্য্য, বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়ী, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকল যে বীরাচারী ছিলেন তাহার প্রমাণ তন্ত্র ও পুরাণ। আমার মতে যমনিয়মাদি দ্বারা যোগ সাধনা করাই প্রধান বল। যমাদিতে যাঁহারা অক্ষম তাঁহারা যদি বীরাচার অবলম্বন করিয়া যোগসাধনায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন গুরু যদি এমন বোধ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে বীরাচারী করিবেন; নতুবা যে সে ব্যক্তিকে বীরাচারী করিলে সমাজের যথেষ্ট হানি ও আচারেরও সম্পূর্ণ অখ্যাতি হইতে পারে।

অধিকন্তু আচারকে তন্ত্রাদি শাস্ত্রে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। দীব্য, বীর, পশু, আর মিশ্রাচার। বর্ত্তমান সময়ে কেবল মিশ্রাচারই প্রবল। দীব্য বীর পশ্বাচার অবিমিশ্রভাবে প্রায় দেখা যায় না। যে ২।১ জন বীরাচারী দেখা যায় তাঁহারাও শিশ্নোদরপরায়ণ ক্রীয়াহীন। এই সকল কারণে সমাজ ও সামাজিক শাস্ত্র বীরাচারকে দুরদৃষ্টজনক বলিয়াছেন বলিয়া বিচারে বীরাচারকে দুর্ব্বল বোধ হইল। কিন্তু তন্ত্র মাত্রেই বীরাচারের বশম্বদ। বিশেষতঃ কলিযুগের পক্ষে বীরাচার কোন মতে অপবিত্র নহে॥

শ্রীকালী কমল সার্ব্বভৌম।

আগুন খাইতে পার?

সতত্তই শুনি, বাঙ্গালা ভাষার আদর নাই! বাঙ্গালা দেশের আদর নাই! বাঙ্গালীর আদর নাই!—ইংরাজি ভাষার আদর! ইংরাজের দেশের আদর! ইংরাজের আদর সর্ব্বত্র! কিন্তু শ্বেতদ্বীপ, তোমার বিদেশীয়, বিজাতীয়, অসম্পূর্ণ

ভাবা আজ ভারতে এতাধিক আদরণীয় কেন? তোমার নামই বা আজ এত মধুময় কেন? কেনই বা আজ ভারত-সন্তান, ভারতের আশা ধন, ইংরাজ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মাতৃভূমির বক্ষে পদাঘাত করতঃ সপ্ত সমুদ্র পারে প্রস্থান করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন? কেনই বা ইংরাজ জাতি আজ জগতের মুকুট-মণি হইয়া উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত? যে দেশে একদিন সূর্য্য-বংশচন্দ্রবংশোদ্ভব রাজনিকর প্রজা-কুলের পূজনীয় ছিলেন; কেনই বা আজ সে দেশে ম্লেচ্ছপদ পরিপূজিত? আর ভারত! তোমার বলবীর্য্য আজ কোথায়? তোমার শিরঃস্থিত সেই দিনার্দ্ধ-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডলবৎ বিজয়কিরীট কে অপহরণ করিল? কেন আজ তোমার জগদ্বিখ্যাত অক্ষয় তূণ শূন্য? কেনই বা আজ তোমার হৃদয়পঞ্জর ভগ্ন? কেনই বা তোমার হৃৎপিণ্ড বিদারিত? মুখ ম্লান, কর্ণ বধির,—শোণিতসম্পাতাধিক্য-জনিত নির্জীবনিভ দুরবস্থাপন্ন? আজ তুমি ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরাজ মন্ত্রে দীক্ষিত, ইংরাজি সজ্জায় সজ্জিত! তথাপি তোমার অবস্থা এত শোচনীয় কেন? ইহার একই উত্তর, প্রকৃত অনুকরণ কাহাকে বলে ভারতবাসী তাহা জানে না। যে অনুকরণ-পথের পথিক হইয়া রুসিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা, রোম, গ্রীস, ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সভ্যতার সীমায় সমুপস্থিত হইল, সেই অনুকরণের অনুপম আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভারতবাসী নিশীথ নিদ্রায় নিদ্রিত! ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনুকরণই যে ভারতের উন্নতি-সোপানারোহণে একমাত্র শিক্ষা বিধান, মুক্তকণ্ঠে কে না স্বীকার করিবে? বলিতে কি, গবর্ণমেণ্ট কালেজসমূহ বিলুপ্ত হয়, হউক; উচ্চ শিক্ষা উঠিয়া যায়, যাউক; যাহার মনোমন্দিরে যে মন্ত্র জাগরিত, তৎ সমুদয় সিদ্ধ হয়, হউক তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু ইংরাজানুকরণের একটি সমুচিত শিক্ষা বিধান ভারতে প্রবর্ত্তিত হউক, ইহাই আমাদিগের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা। হ্যাট কোট চুরট-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া দীন ভারতের জীবন সর্ব্বস্ব, আশা ধন, কত শত যুবক পিতামাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব, স্বদেশ স্বজন, অবশেষে স্ব-সম্মান পর্য্যন্ত বিস্মৃতি সাগরে বিসর্জ্জন দিয়া, কপর্দ্দকের বিনিময়ে অমূল্য রত্নে জলাঞ্জলি দিতেছেন, ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়! আমরা পদদলিত সিগার খণ্ড প্রত্যাশায় মাত্র ইংরাজের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকি, কিন্তু যদি একবার সেই রাজপুরুষের বদনভাতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিতাম, তবেই বুঝিতে পারিতাম, ইংরাজ কি গুণে গুণবান্? কি ধনে ধনবান? কেনই বা বাঙ্গালী তাহার পদানত?

যদি স্বদেশভাষার প্রতি অনুরাগ দেখিতে চাও, দেখ ইংরাজের লেখনীতে.

উহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান! যদি একাধারে ধৈর্য্য বীর্য্য উৎসাহ সাহস অধ্যবসায় দেখিতে চাও, দেখ তৎসমস্ত ইংরাজের মুখে মূর্ত্তিমান! যদি আত্মসম্মান বুঝিতে চাও, যাও দেখ ইংরাজ সন্নিধানে উহা দেদীপ্যমান! যদি পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিতে চাও, দেখ ইংরাজের খেতোপল মণ্ডিত ভুজযুগলে উহা বিদ্যমান, আর ভারতের ললাটফলকে চিরাঙ্কিত!

যদি বাঙ্গালীর গুণ দেখিতে চাও, একটি বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল দেখ, দেখিবে শত শত বঙ্গীয় যুবক বিজাতীয় ভাষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাতৃভাষায় কেমন আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন! এই ত প্রবেশিকার কথা, অতঃপর যেরূপে বঙ্গীয় যুবকের মাতৃভাষায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া থাকে তাহা বোধ হয় সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। পুনশ্চ, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ স্বদেশভাষানুরাগের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছেন। অদ্য দেখ বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন,—কি? না, একখানি নূতন সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম দিবস, দ্বিতীয় দিবস, তৃতীয় দিবস গত হইল, চতুর্থে আর তাহার নাম গন্ধও নাই! কি হইল? কাগজ আর চলিল না। চলিল না? কাহার দোষ? সম্পাদকের? কখনই নহে! উৎসাহের যে নবাঙ্কুর বঙ্গীয় সম্পাদকের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বঙ্গবাসী তাহাতে জল সেচন করিল না। কেহ তাহা গ্রহণ করিল না। কেহ কহিলেন, এরূপ কাগজের উৎসাহ দেওয়া দেশের সর্ব্বনাশ করা মাত্র।—একেবারে সম্পূর্ণ বিলাতি কাগজ না হইলে আর গ্রাহ্য হইল না! কেনই বা হইবে? উৎকৃষ্ট তর ইংরাজি সম্বাদপত্র সকল বঙ্গভূমে বক্ষ করিতেছে; কে তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া, বঙ্গের প্রতি দৃকপাত করে? সত্য; কিন্তু একবার ইংরাজের দিকে দৃকপাত কর দেখি; কত জন ইংরাজে বিদেশীয় বিজাতীয় পত্র পড়িয়া থাকে? আমরা নীর-ক্ষীর-জ্ঞান-প্রলুব্ধ মার্জ্জারবৎ স্বকার্য্য বিস্মৃত হইয়াছি! আমরা আপন বক্ষ চিরিয়া হৃদয়শোণিত অপব্যয় করিতেছি! আমরা অজ্ঞান, অন্ধ ও বধির হইয়াছি! নতুবা, যে স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষের সুখ সম্ভোগ প্রত্যাশায় আজ সমস্ত জগৎ উন্মত্ত, ও ধন জন, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, ভারতবাসী আজ সেই ভারতের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পর-বাদিত্র-ঝংকার শ্রবণে নৃত্য করিতেছে? হায় হায়! আমরা স্বদেশ-গৌরবে, স্বজাতি-প্রেমে, স্বদেশের অতুল সুখ সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিলাম কেন? "আমরা শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

আর বঙ্গবাসীর উৎসাহ, সাহস, অধ্যবসায় মাত্র অঙ্গনার অঞ্চলান্তরালে! বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ যাও, ইংরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; দেখিবে শ্বেতাঙ্গের কেমন

রমণীগত মান, রমণীগত প্রাণ। আমরা অঞ্চলান্তরালে অবস্থান করি, তাহারা দিবা যামিনী কামিনী-কায়ে সম্মিলিত। শয়নে, ভোজনে, উত্থানে, উপবেশনে, গমনে কামিনীই তাহাদিগের চিরসঙ্গিনী! তথাপি তাহারা প্রশংসনীয়, আমরা নিন্দনীয়! তাই বলি, আমরা প্রকৃত অনুকরণ জানি না।

আমাদের আবাস-প্রাঙ্গণ অকূল জলধি! গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া মানব-লীলা সম্বরণ হয়, তথাস্তু; তথাপি সে জলধি অতিক্রম করিতে পারিব না! সংকোচ, তুমি আমাদের গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া যতই আকর্ষণ কর না কেন, আমরা কোন ক্রমেই সে জলধি পারে গমন করিতে পারিব না; কারণ ইহা আমাদিগের অদৃষ্ট গ্রন্থে নিষিদ্ধ! যে মূঢ় তোমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে সে নিতান্ত ক্ষীণবল, তোমাদিগের আকর্ষণে গৃহ হইতে বহির্গত হয় মাত্র! আমরা কখন যাইব না।

কিন্তু ভারতবাসী, বর্ত্তমান সময়ে বড় বিপদ উপস্থিত। আমাদিগের সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। এক্ষণে উপায় কি? এত দিন ধনধান্য পরিপূর্ণ ভারত-বর্ষের পর্ণকুটীরেও অন্নচিন্তা ছিল না। উন্নতি অবনতি বুঝিতাম না। সভ্যতার ধার ধারিতাম না। গৃহে বসিয়া যৎকিঞ্চিৎ অন্নসংস্থানেই পরিতৃপ্ত ছিলাম। কিন্তু সে দিন ত আর নাই। এক্ষণে ইংরাজের সুশাসন, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিস্তার; দেখিয়া শুনিয়া ভারতের রাজলক্ষ্মী অন্তর্ধান হইলেন। এক্ষণে এক সন্ধ্যা সংগ্রহ হয় ত অপর সন্ধ্যায় হয় না। সুশাসনে, সভ্যতায়, রাজকার্য্য কলাপে আশা ভরসা, যত্ন পরিশ্রম, সমস্তই বিফল হইল! আজ ভারতবাসী পর-প্রত্যাশী কারাবাসীর ন্যায় অর্দ্ধ ভোজনে জীবন যাপন করিতেছে! ওরে উপল হৃদয়, এখনও তোর বাঁচিবার সাধ? তোর মুখের গ্রাসে ছাই পড়িয়াছে, বুঝিয়াও বুঝিলি না? মাতঃ, ভারতভূমি, আর কি বলিব, তুমি সাহারার মহামরু হইয়া অবস্থিতি কর; আমাদের হৃদয়কঙ্কাল, সুশাসন ও সভ্যতার মৃগতৃষ্ণিকা নিরীক্ষণ করিতে করিতে তোমার হৃদয়ে বিলীন হইয়া যাউক।

হায়, মিথিলাপতে! হায়, অযোধ্যা-জীবন! হায় পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! তোমরা কোথায়? না জানি তোমরা কি মন্ত্র-বলে ভারতে সভ্যতা সংস্থাপন করিয়া-ছিলে। সভ্যতার সুশীতল ছায়ায় যে প্রজাকুলের সুখ সম্পদের সীমা ছিল না, আজ সভ্যতা আশ্রয় করিতে গিয়া তাহাদিগের অন্নাভাবে জীবন শেষ হয় কেন? আজ ভারতের এ দুর্দ্দশা কেন? ইংরাজ-রাজ কি সুশাসনে অক্ষম? কখনই বলিতে পারিব না। তবে ইহার কারণ কি? আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলাম না! বলিয়াও বলিতে পারিলাম না।

আমরা বলিতে পারি আর না পারি,

আমাদিগের অতীব সৌভাগ্য, যে এক্ষণে আমরা ইংরাজপ্রসাদাৎ সমস্তই বুঝিতে শিখিয়াছি। আমরা ইংরাজ-আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহার অনুকরণ করিতে পারি আর না পারি, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগরিত হইয়াছে। আমরা ইংরাজানুকরণ করিব কেন? ভারত কি আদর্শের কাঙ্গাল? হে সূর্য্যবংশাবতংস, হে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ, তোমাদিগের ইতিহাস কি বিলুপ্ত হইয়াছে? না, কখনও হইবে না! আমাদিগের পূর্ব্বস্মৃতি সবিতার কিরণসম্পাতে প্রগাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ হইল! কিন্তু এখনও কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হয় না কেন? আর্য্যকুল, কতদিনে তোমাদিগের পূর্ণ বিকাশ মনোমন্দিরে সন্দর্শন করিব? আর কতদিন? ভারত ধৈর্য্যাবলম্বনে অক্ষম! হে পাণ্ডবরাজ, তোমার শান্তিনিকেতন হইতে ঊষরভূমি ভারতবর্ষের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর; দেখ তুমি কায়মনোবাক্যে এই স্বর্ণ ভূমিতে যে সত্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে,—আমরা আর কাহার দোষ দিব? সমস্তই ভারতের নিয়তি!—আমরা স্বহস্তে তোমার সেই চির কীর্ত্তি-মঠ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, বালুকার উপর প্রবঞ্চনা-গৃহ পত্তন করিয়াছি! আবার ঐ দেখ, ধবলগিরিমধ্যে এক শ্বেতাঙ্গ-সাগরবেলা ভারত-মহাসাগরে সমুত্থিত হইয়াছে। দেখিলে হৃদয় কম্পিত হয়। আমাদিগের ঘরদ্বার ভাসিয়া যায় যাউক আমরা ঐ সাগরবেলাই আশ্রয় করিব। কিন্তু না জানি কোন দিন আমাদিগকে কর্দ্দমে বসাইয়া জোয়ারের জল সরিয়া যাইবে, মনে করিয়া হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতেছে। আর্য্য, বিপদে পড়িয়া বহুদিনের পর তোমাদিগের কথা স্মরণ হইয়াছে; সূক্ষ্মভাবে আমাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তোমার ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার সাধন কর; আমাদিগের এই প্রার্থনা।

ভারতবাসী, একবার ভগবান ভীষ্মের কথা স্মরণ কর। স্মরণ করিয়াও যদি মানবলীলা সম্বরণ করিতে পার, তাহা হইলেও তোমার জীবন সার্থক! এখনও ত আমাদিগের জীবনী শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও ত প্রাণের আগুন নির্ব্বাণ হয় নাই। এখনও ত নয়ন অন্ধ হয় নাই! শ্রবণ বধির হয় নাই! হস্তপদ অচল হয় নাই!—দেহের শোণিতস্রোত কি একেবারে শুষ্ক হইয়াছে? ধমনী কি অচল হইয়াছে? বিবেক কি বিলুপ্ত হইয়াছে? কখনই না। এখনও জীবন আছে। এখনও আমরা বুঝিতে পারি। তবে একবার প্রাণের আগুন জ্বালিয়া দেও দেখি; আমাদের কি আর দুর্গতি হইবে না? জ্ঞান বিকাশ কি হইবে না? সত্যপরায়ণ হইতে কি আর পারিব না? আর্য্য নাম কি দিন দিন বিলুপ্ত হইবে? মহাসূর্য্য একবার অস্তমিত হইলে কি পুনরুদিত হয় না? দিন গেলে কি আর দিন পাওয়া যায় না? নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। অচিন্ত্যরূপ বিশ্বনিয়ন্তা সকলেরই

পুনঃ সম্ভাবনা করিয়াছেন। তবে কি করিলে ভারতের দিন ফিরিয়া আসিবে?

কি করিলে ভারতের দিন ফিরিয়া আসিবে? ঘোর পরিবর্ত্তন চাই। তাহা সামান্য নহে, ইচ্ছামত নহে। অসম্ভবকে সম্ভব করা চাই। একেবারে সম্পূর্ণ রূপে হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভারতবাসীর অন্তর রাজ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে। ভিতরের ঘর বাহিরে আসিবে; বাহিরের ঘর ভিতরে যাইবে। বাহিরের চর্ম্ম অন্তরে যাইবে, অন্তরের অস্থি বাহির হইবে! ঊর্দ্ধভাগ অধঃ হইবে, অধোভাগ ঊর্দ্ধ হইবে! পূর্ব্ব ঘুরিয়া পশ্চিমে যাইবে; পশ্চিম ঘুরিয়া পূর্ব্বে আসিবে! "দিবসে শশী সঞ্চার" ও "রজনীতে সূর্য্যোদয়" হইবে! জীবিত লোক মৃত এবং মৃত লোক জীবিত হইবে! শুষ্ক তরু অঙ্কুরিত হইবে। হাস্যপরায়ণ রোদন করিবে, রোদনপরায়ণ হাস্য করিবে। আকাশের তারা ভূতলে পড়িবে; ভূতলের বালুকা আকাশে উঠিবে! সহায় লাগিবে না; সম্পত্তি লাগিবে না, কেবল বাতাস ধরিয়া বিমানে উঠিতে হইবে। ভারতবাসী, তুমি কি তাহা পারিবে না? যদি না পার, আকাশ ভাঙ্গিয়া তোমার মাথায় পড়িবে! প্রাণ থাকিতে "পারিব না" বলিও না। একবার হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াও দেখি; উৎসাহের রথে আরোহণ কর, জ্ঞান-বর্ম্ম পরিধান কর, সাহসের চর্ম্ম ধারণ কর, আর উৎপন্ন বুদ্ধির অসি চালাও দেখি? পাপীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া; মূর্খের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে জ্ঞানের পথে উত্তোলন করিয়া; অলসতা, কাপুরুষতা, সমাজ-প্রথার মেষপাল বিস্মৃতি-মশানে বলিদান দিয়া জীবনের রণক্ষেত্রে অগ্রসর হও দেখি! তুমি পারিবে না? "পারিব না" বলিলে আর কিছুই হইবে না। একটী বার বল দেখি "পারিব" "করিব"; একটিবার বল দেখি "ভারত আমার", "ভারতের সুখসম্পদ আমার", "ভারতের যত লোক আমার", "ভারত আমার সর্ব্বস্ব", তবেই দেখিবে, আপনা হইতেই হৃদয়-নিহিত বহ্নিরাশি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে! আভ্যন্তরিক বল বীর্য্য চতুর্গুণ হইয়া উঠিবে! একটিবার মাত্র মুখে বল "পারিব" "করিব," অমনি দেখিবে চতুর্দ্দিক হইতে স্বর্গীয় বল তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকিবে! তোমার ধর্ম্মের জন্য, স্বীয় আত্মার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া একবার গাত্রোত্থান কর; আর্য্যচরণ স্মরণ করিয়া, আর্য্যবলে বলবান হইয়া ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও; যাহা পঞ্চাশ বৎসর পরে সংঘটন হইবে তাহা পঞ্চবিংশতি বৎসরে সমাধা করিতে প্রয়াস পাও; যাহা পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে ঘটিবে তাহা দশ বৎসরে সম্পন্ন কর; যাহা দশ বৎসর পরে হইবে তাহা অদ্যই সম্পন্ন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হও; এইরূপে দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের

কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী কর; আপনার বল, বীর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, রক্ত, মাংস, অস্থি পর্য্যন্ত মাতৃভূমিতে বিসর্জ্জন দেও, আপনার কার্য্য বুঝিয়া দেখ; ইহা ভিন্ন ইহলোকে মানবের আর কি কার্য্য আছে ?

অলসতা পরিহরি, বাজায়ে বিজয়-ভেরী,
গভীর গর্জ্জন করি, দেখ মন উঠিয়া;
কিবা কার্য্য আপনার, সংসারের কিবা সার,
উরসেতে যশোহার রাখ রাখ ধরিয়া।
মিথ্যা জীবকায়া, মিথ্যা ভবমায়া,
অমূলক ছায়া, ঈশ্বরের দয়া নাই;
সংসার দুঃসহ, স্বল্পস্থায়ী দেহ,
মৃণ্ময় গেহ, কহিওনা কেহ ভাই!
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, দেখ তন্ন তন্ন করে,
পঙ্কজে পঙ্কিল সরে পরিমল নিহিত;
মধুমত্ত ভৃঙ্গগণে, সে মধুর তত্ত্ব জানে,
হায়রে সে সুধাপানে বায়সেরা বঞ্চিত!
বিদ্যা বুদ্ধি ধনে মানে, প্রণয় প্রমোদ জ্ঞানে,
মমতা পান ভোজনে কি আনন্দ জান না?
স্বল্পস্থায়ী করি মনে, এ সব স্বর্গীয় ধনে
তুলনা তাড়িত সনে দিওনারে দিও না!
ক্ষীণজীবী প্রাণী সত্য বলে মানি;
চন্দ্র সূর্য্য জিনি ক্ষমতা এমনি আছে!
অপার্থিব ধন মানব জীবন,
পেয়েছ যখন বলনা তখন কিছে!
সংসার সমুদ্রতীরে, বসিয়া তরঙ্গ হেরে,
হায় তুমি আপনারে ক্ষুদ্র বলি ভেব না;
তুমি অতি নীচমতি, তাইরে নরকগতি!
"সহায় জগৎপতি"—এ কথাটি ভুল না।
কর মিথ্যা পরিহার, ধর সত্য-তরবার,
ন্যায় যুদ্ধে কভু আর ভয়ে ভঙ্গ দিও না।
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বিশ্বের কারণ ধরি,
যাও প্রাণ পণ করি, কিছু শঙ্কা কর না।
সাধিবারে কর্ম্ম, রাখিবারে ধর্ম্ম,
পর জ্ঞানবর্ম্ম, আছে কোন কর্ম্ম আর?
পাপ চিন্তা ছাড়ি, পাহাড় উপাড়ি,
চন্দ্র সূর্য্য পাড়ি, সাধ কার্য্য আপনার।
জীর্ণদেহ তুচ্ছ মানি, অমরাত্মা মনে জানি,
পরমাত্মারূপ যিনি তাঁরে কভু ভুল না।
এ ভববৈভব তব, অপার্থিব রত্ন সব;
সুখবার্ত্তা কারে কব! কভু ছাড়ি যাবনা।
বিমানে বালুকা তুলি, নক্ষত্র টানিয়া ফেলি,
আশার আগুন জ্বালি, অগ্রসর সঘনে।
প্রচণ্ড প্রতাপ সহ কর শ্রম অহরহঃ,
যে কদিন থাকে দেহ, অবহেলি শমনে।
যতক্ষণ প্রাণে সহে, এদেহে শোণিত রহে,
যতক্ষণ শ্বাস বহে, রাখ শির পাতিয়া;
তরবার খরধারে, প্রহারে প্রহারে শিরে,
হোক বার্থ, ফেল তারে, চূর্ণ চূর্ণ করিয়া।
পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বাল বৃদ্ধ সঙ্গে করি,
সারি সারি নর নারী ধরাসনে শয়নে;
ঝরে আঁখি মন দুঃখে, মাতৃ ভূমি-নাম মুখে,
শক্তিশ বিদ্ধান বুকে, দেখাওরে ভুবনে!

শ্রীকুমারনাথ শর্ম্মা।

বিধবা-বিবাহ।

আমরা পূর্ব্বে "বাল্য-বিবাহ" শীর্ষক প্রস্তাবে "মানবতত্ত্ব" লেখকের তদ্বিবাহ-সাপক্ষ যুক্তি সকলের বিচার করিয়াছি, এ প্রস্তাবে তাঁহার বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধীয় বিপক্ষ কথা গুলির বিচার করিব।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে হিন্দু জাতির মধ্যে বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য অথবা সহগমন—এই তিন প্রকার নিয়মই প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মচর্য্য এবং সহগমনের ফল আমাদের শাস্ত্রে অধিকতর উক্ত হওয়াতে ক্রমশঃ বিধবা-বিবাহ রহিত হইয়া ঐ দুই নিয়মই প্রচলিত হয়। এক কালে বিধবা-বিবাহ যে প্রচলিত ছিল "মানবতত্ত্ব"-লেখকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে চিরকালই বিধবা-বিবাহের বিধি অনুজ্ঞা মাত্র ছিল। সকল বিধবারই যে বিবাহ দিতে হইবে এমত কথা নহে, তবে যাহাদের পুনর্ব্বিবাহ না দিলে চলে না, সমাজে গুরুতর পাপের বৃদ্ধি হয়, তাহাদের বিবাহ জন্য শাস্ত্রাদেশ ছিল। আজিও যে সকল দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানেও এই নিয়ম। আমাদের সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগরমহাশয় এই আদেশ প্রবল করিতে চাহিয়াছিলেন। নহিলে তিনি এমত কথা বলেন নাই যে, সকল বিধবারই বিবাহ হওয়া উচিত।

আমাদের প্রাচীন বিধি যে অতি শুভ ছিল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে, তবে কালক্রমে উহা রহিত হইয়া পড়িয়াছে। রহিত হওয়াতে শাস্ত্রকারেরা যে জন্য বিধবা-বিবাহ কোন কোন স্থলে বিধেয় বলিয়া বিধি দিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সেই সেই স্থলে ঘোর সামাজিক অমঙ্গল ঘটিতেছে এবং পাপস্রোতের বৃদ্ধি হইতেছে। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি পুনরায় প্রচলিত করা উচিত। সহমরণের ঘোর পাপ চিরস্মরণীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রযত্নে রহিত হইয়া গিয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভ্রূণহত্যার ঘোর পাপ নিবারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই দেখুন বিদ্যাসাগর মহাশয় কি জন্য বিধবাবিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা

বোধ করি চক্ষু-কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব হে পাঠক মহাশয়বর্গ আপনারা অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন যে, এমতস্থলে দেশাচারের দাস হইয়া শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করা এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত, অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত? এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন। আর আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, আমাদিগের দেশের আচার একবারেই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না যে, সৃষ্টি কালাবধি আমাদিগের দেশে আচার পরিবর্ত্ত হয় নাই, এক আচারই পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিলে আমাদিগের দেশের আচার কত পরে পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে।"

যে জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন। যে কারণে বিধবা-বিবাহ পুনঃ প্রচলন করা শ্রেয়, তাহা যদি অতি প্রবল কারণ বলিয়া প্রতীত হয়, তবে দেশাচার পরিবর্ত্ত করা যে উচিত, তৎপরে তিনি তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। এই দেশাচার পরিবর্ত্তের আর একটি যুক্তি তিনি তাঁহার "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না" নামক দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ প্রকরণে দিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণকার নব্য সম্প্রদায় যে কি জন্য বাল-বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কথার মীমাংসা করিতে বলিয়াছেন, "মানবতত্ত্ব"-লেখক তাহার কিরূপ বিচার করিয়াছেন? এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা এক্ষণে আবশ্যক। এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে বিবেচক মাত্রকেই বিদ্যাসাগরের পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়। বিদ্যাসাগর বাল-বিধবা-বিবাহ পক্ষে যে কতিপয় হেতু দেখাইয়াছেন সে সমস্ত হেতু অত্যন্ত প্রবল। ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা এবং বালবিধবাগণের অশেষ যন্ত্রণা—এ সমস্ত ঘোর সামাজিক দোষ, বাস্তবিক অমঙ্গল, এবং প্রতিদিন প্রতি লোক দেখিয়া শুনিয়া বাধিত হৃদয়ে মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেছেন। "মানব

তত্ত্ব”-লেখক কি এমত কোন উপায় স্থির করিয়াছেন যদ্দ্বারা এই সকল দুষ্কৃতির নিরাকরণ হইতে পারে? এরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করা দূরে থাকুক, তিনি এক চমৎকার যুক্তি দেখাইয়া আমাদিগকে বিধবাগণের দুঃখ অম্লানবদনে সহ্য করিতে বলেন। তিনি বলেন “বিধবাদিগের অপেক্ষাও পৃথিবীতে অনেক দুঃখী আছে। কত ব্যক্তি চিরজীবন দারিদ্র্য ও রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছে, বিধবাদিগের অগ্রে তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত।” কেন, বিধবাগণও কি সমাজভুক্ত নহেন? তাহাদিগের দুঃখ কি দুঃখ নহে? তাহাদিগের জন্য কি আমরা নিজে দুঃখ পাই না? তাহাদিগের দুঃখ দেখিলে যে আমাদিগের হৃদয় ফাটিয়া যায়, তাহাদিগের ব্যভিচার যে আমাদিগের অসহ্য, তাহাদের ভ্রূণহত্যায় ও ব্যভিচারে আমরা যে পাকতঃ সাহায্য দান করিয়া আসিতেছি। আর দারিদ্র্য ও রোগ যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য কি আমরা যত্ন ও চেষ্টা করি না, কিন্তু বিধবাগণের দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা কি যত্ন করিয়া থাকি? বিধবাগণের দুঃখ নিবারণ করা কি অসাধ্য? তাহা যে অনায়াসেই নিবারণ করা যাইতে পারে। তবে কেন তদ্রূপ উপায় অবলম্বনে বিরত হই? লেখক যদি মনে করেন যে পৃথিবীর সকল দুঃখ নিবারণ করা অসাধ্য, তথাপি সেই দুঃখের ভাগ যত হ্রাস করা যায়, তজ্জন্য যত্ন ও চেষ্টা করা কি উচিত নহে? সকল দুঃখ নিবারণ জন্য যেমন চেষ্টা করা উচিত, তেমনই বিধবাগণের দুঃখ এবং তৎসঙ্গে আপনাদেরও দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। সে চেষ্টা কি?—সে চেষ্টা বিধবার বিবাহ। কিন্তু লেখক ত তাহা বলিতেছেন না। লেখক বলেন সর্ব্ব প্রকার দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিও, কিন্তু বিধবাগণের দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিও না। তিনি বলেন পৃথিবীর অন্য সর্ব্ববিধ দুঃখ নিবারণ করা অসাধ্য, এই অসাধ্য কার্য্য অগ্রে ধর, অগ্রে ধরিয়া দেখ যে, তাহা অসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল অতএব বিধবার দুঃখ নিবারণ করিতে আর যাইও না। তাহার যুক্তি এই,—যাহা অসাধ্য তাহা পারিলাম না, তবে যাহা সাধ্য তাহাও করিব না। তিনি বিধান দিতেছেন, যাহা অসাধ্য তাহা আগে কর, তাহার পর যাহা সাধ্য তাহা করিও। সুতরাং তিনি পাকতঃ বলিলেন যাহা অসাধ্য তাহা ত কখন করিতে পারিবে না, তখন যাহা সাধ্য তাহা করা তোমার ঘটিয়া উঠিবে না। “ন মন তেলও পুড়িবে না রাধাও নাচিবে না।” লেখকের এই চমৎকার বিধানানুসারে লোকে কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহে। লোকে বলিবে যাহা সাধ্য তাহা করি, অগ্রে বাল-বিধবাগণের বিবাহ দিই, তৎ পরে যাহা অসাধ্য, পৃথিবীর

দারিদ্র্য ও দুঃখ-নিবারণ,—নিদান তাহার কিয়দংশও সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু যদি এমত হয় যে, বিধবাগণের দুঃখ নিবারণ করিতে গিয়া, সমাজমধ্যে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করিতে গিয়া, পৃথিবীর অন্যান্য দুঃখ ও অমঙ্গলের বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে কি প্রথমোক্ত দুঃখ নিবারণ করিতে চেষ্টা করা উচিত? কখনই না। মানবতত্ত্ব-লেখক ঠিক ঐ কথা বলিতেছেন। তিনি বলেন, যখন বিধবার বিবাহ দিলে পৃথিবীর অন্যান্য দুঃখের ভাগ বর্দ্ধিত হয়, যখন এক প্রকার দুঃখ নিবারণ করিতে গিয়া অন্য প্রকার দুঃখের বৃদ্ধি হয়, তখন বাস্তবিক দুঃখ নিবারিত হইল কই? এক প্রকার দুঃখ কমাইলাম বটে কিন্তু অন্যবিধ দুঃখ বাড়াইলাম। সুতরাং এরূপ কার্য্য কখন উচিত হইতে পারে না। বিধবার দুঃখ মোচন করিতে যাইলে, যে কয়েক প্রকার দুঃখের বৃদ্ধি হয় তিনি তাহাদিগের এই প্রকার গণনা করেন। তিনি বলেন, বিধবাগণের বিবাহ দিলে পৃথিবীতে প্রজাবৃদ্ধি হেতু দুর্ভিক্ষ ও মহামারী বাড়িবে, এবং অনেক কুমারী ও পুরুষ অবিবাহিত থাকিবে। সুতরাং দুই পাঁচটা ভ্রূণহত্যা নিবারণ করিতে গিয়া দেশমধ্যে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ আনা উচিত নহে। দুই পাঁচ ভ্রূণ হত্যা নিবারণ করিতে গিয়া [illegible] লোকের প্রাণনাশের চেষ্টা করা উচিত নহে। তিনি বলেন, বিধবাবিবাহের অর্থ এই যে, কতকগুলি লোকের (বিধবাগণের) দুই বার করিয়া বিবাহ হউক, আর কতকগুলি লোক চিরকাল অবিবাহিত থাকুক। বিধবাবিবাহের যদি এই অর্থ হয়, তবে কি বিধবাবিবাহ উচিত? কখনই নহে। তাঁহার মতে বিধবাবিবাহ না হইলে সকল লোকের একবার করিয়া বিবাহ হয়, সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে পৃথিবীতে বিবাহ না হইল বলিয়া আর কাহারও দুঃখ থাকে না। অতএব বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কথার মীমাংসা করিতে বলিয়াছেন, মানবতত্ত্ব লেখক সে কথা এইরূপে উড়াইয়া দিয়াছেন। মানবতত্ত্ব লেখকের কথাগুলি যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা বিদ্যাসাগরের পক্ষ অবলম্বন করিতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু মানবতত্ত্ব-লেখক যে সকল ভয় দেখাইয়াছেন, তাহা কি বাস্তবিক ভয়, বাস্তবিক কি সেইরূপ ঘটে? যদি ঘটে, তবে মানবতত্ত্ব-লেখকের পক্ষ অবলম্বনীয়, নচেৎ বিদ্যাসাগরের পক্ষ অবলম্বনীয়। এক্ষণে দেখা যাউক মানবতত্ত্ব-লেখকের কথা কতদূর গ্রহণীয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা পরিষ্কার করিয়া লিখিলে এইরূপ দাঁড়ায়। বালবিধবাগণের বিবাহ দিলে তাহারা যাবজ্জীবনব্যাপী অনর্থক বৈধব্যযন্ত্রণার

হাত হইতে মুক্ত হয়েন এবং মনুষ্য সমাজ হইতে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। মানবতত্ত্ব-লেখক বলেন, সত্য, ঐ প্রকার দুঃখ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু অন্যবিধ গুরুতর দুঃখ সমাজমধ্যে আসিয়া পড়ে। সমাজে প্রজাবৃদ্ধি হেতু দুর্ভিক্ষ, ও মড়ক নিবন্ধন অনেক প্রাণনাশ হয় এবং সমাজের বহুলোকের আদৌ বিবাহ হয় না। সুতরাং এ গুরুতর দুঃখ নিবারণ জন্য বিধবাগণের বিবাহ নিবারণ করা উচিত।

মানবতত্ত্ব-লেখক বিদ্যাসাগরের কথা অংশ স্বীকার করেন, কারণ বঙ্গসমাজে বালবিধবাগণের যন্ত্রণা ও ক্লেশ এবং ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা কাহারও অবিদিত নাই। এ দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ; কিন্তু মানবতত্ত্ব-লেখক যে দুঃখের কথা বলিয়াছেন তাহা কি বাস্তবিক? বাস্তবিক কি বিধবাবিবাহ নিবন্ধন পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ, মারীভয় ঘটে এবং সমাজমধ্যে অনেকের পরিণয় মূলেই হয় না? পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় হয় বটে, কিন্তু তাহা কি বিধবাবিবাহ নিবন্ধন, পৃথিবীতে অনেকে অবিবাহিত থাকে বটে কিন্তু তাহা কি বিধবাবিবাহ নিবন্ধন? এই কথা যথাসাধ্য বিচার করা যাইতেছে।

পৃথিবীর মধ্যে কতটুকু জায়গায় বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত? ভারতবর্ষের সকল দেশেও নহে। ভারতের কতিপয় প্রদেশে কেবল বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত। অতএব পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্রতম অংশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। এক্ষণে কথা এই, মানবতত্ত্ব-লেখকপ্রথিত দুঃখ যদি বাস্তবিক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্রই বিধবাবিবাহ ক্রমশঃ রহিত হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা যখন ঘটে নাই, তখন মানবতত্ত্ব-লেখকের কথা সত্য নহে। তবে হিন্দু সমাজের কিয়দংশে যে বিধবাবিবাহ রহিত হইয়াছে তাহার অবশ্য অন্য কারণ আছে। সেই অন্য কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক হইতেছে না; মানবতত্ত্ব-লেখক যে কারণ বলিতেছেন, তাহা না হইলেই আমাদের কথার মীমাংসা হইল। সকল জনসমাজ কি অন্ধ, যে তাহারা দেখিতে পায় না যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত বলিয়াই তাহাদের দেশের দারুণ দুর্ভিক্ষ ও মারী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে? তাহারা কি বঙ্গদেশের সহিত তুলনা করিয়া দেখে না যে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই বলিয়া দুর্ভিক্ষ ও মারী এখানে আদৌ ঘটে না, অথবা এখানকার দুর্ভিক্ষ ও মারী অন্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম? মানবতত্ত্ব-লেখক কি প্রকৃত অঙ্কপাত দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে যখন বিধবাবিবাহ রহিত হইল, সেই সময় হইতে দুর্ভিক্ষ ও মারী ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে? তিনি এ সমস্ত কথা কিছুই প্রমাণ করেন নাই। প্রকৃত অঙ্কপাত ও তালিকা দ্বারা তাঁহার

দেখান উচিত, বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ ও মারী ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং পৃথিবীর অন্য সর্ব্বত্রই তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত থাকিয়াও যখন বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ ও মারী সর্ব্বদা উপস্থিত হয়, তখন অবশ্য বলিতে হইবে ঐ ঘটনার সহিত বিবাহের অল্প সম্বন্ধই আছে। কিন্তু গ্রন্থকার বলিতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষ ও মারীর অপরাপর কারণ থাকিলেও প্রজাবৃদ্ধিকে তাহাদের অন্যতম কারণ বলিতে হইবে। জনসমাজে লোকবৃদ্ধি হেতু দুর্ভিক্ষ ও মারী উপস্থিত হয়, একথা যদি সত্য হয়, তবে বিধবাবিবাহ হেতু যখন লোক বৃদ্ধি হইতেছে, তখন বিধবাবিবাহ দুর্ভিক্ষ ও মারীর অন্যতম কারণ নয় কেন? গ্রন্থকারের এ যুক্তি তাঁহার নিজ কথার বিরোধী। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই, স্ত্রীজাতির দুইবার বিবাহ হওয়াতে প্রজাবৃদ্ধি ঘটে। বিবাহ যদি প্রজাবৃদ্ধির কারণ হয়, বিবাহ না হওয়া তবে অবশ্য প্রজাহ্রাসের কারণ। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যে দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে সে দেশে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের আদৌ একবারও বিবাহ হয় না। যদি বিবাহ না হইল, তবে অবশ্য প্রজাহ্রাস হইবে। সুতরাং একদিকে বিধবাবিবাহ নিবন্ধন যেমন প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি অন্যদিকে অনেক লোকের একেবারে বিবাহ না হওয়াতে প্রজাহ্রাস হইয়া যাইতেছে। তবে আর প্রজাবৃদ্ধি ঘটিল কই? সুতরাং তাঁহার উক্তিসকল পরস্পর সঙ্গত নহে। অতএব, বিধবাবিবাহ নিবন্ধন যে প্রজাবৃদ্ধি হয় একথা গ্রন্থকার নিজেই বলিতে পারেন না।

আবার দেখুন। হিন্দুসমাজে পূর্ব্বে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। তৎপরে তাহা রহিত হইল। গ্রন্থকার কি দেখাইয়াছেন যে, যখন বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল তখনকার লোকসংখ্যা অপেক্ষা, এক্ষণকার হিন্দুসমাজের লোকসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে? এ কথা তিনি কখনই প্রমাণ করিতে পারিবেন না। বরং আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে এক্ষণকার হিন্দুসমাজে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। বিগত একশ বৎসর বরাবর হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত, কিন্তু এই একশ বৎসরে লোকসংখ্যা হ্রাস হওয়া দূরে থাক, বরং তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু গ্রন্থকারের যুক্তি অনুসারে সেই লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমাই উচিত ছিল। গত দশ বৎসরে কিরূপ ঘটিয়াছে গবর্ণমেণ্টের লোকসংখ্যা গণনায় তাহা প্রতীত হইবে। অতএব, বিধবাবিবাহের সহিত লোকসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির যে কোন সম্বন্ধ আছে এমত প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইলেই বা কি? প্রজাবৃদ্ধি হইলেও কি দুর্ভিক্ষ ও মারী-

ভয় নিবারণ করা যায় না? ইংলণ্ডের প্রজাবৃদ্ধি হেতু কি তদ্দেশে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। সেখানে ত দুর্ভিক্ষ এবং মারীভয় সর্ব্বদা ঘটে না, অথচ সে দেশের লোকগণনায় প্রতীত হয় যে তাহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছে। দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় নিবারণের কি উপায় নাই? কিরূপে ইংলণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইয়েছে? অনুর্ব্বর ইংলণ্ডে যদি দুর্ভিক্ষ না ঘটে, তবে উর্ব্বরা বঙ্গদেশে কেন ঘটিবে? যদি ঘটে, তবে তাহা অবশ্য অন্য কারণ নিবন্ধন ঘটিবে। শুদ্ধ প্রজাবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ের একমাত্র কারণ নহে। অথবা প্রজাবৃদ্ধি হেতু দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় অনিবার্য্য নহে।

লেখক বলেন, পুনর্ব্বিবাহ হইলে প্রজাবৃদ্ধি হয়; এবং তদ্ধেতু দুর্ভিক্ষ ও মারী ভয় উপস্থিত হয়। যত দুর্ভিক্ষ, মারী, আকাল, অমঙ্গল কি স্ত্রীজাতির পুনর্ব্বিবাহের বেলা? তাও আবার সকল বিধবার বিবাহের কথা হইতেছে না। পুরুষজাতি দশবার বিবাহ করিবে তাহা ভাল, এককালীন দশটা বিবাহ করিবে তাও ভাল। পুরুষের বহুবিবাহে কোন অমঙ্গল নাই। তাহাতে প্রজাবৃদ্ধি নাই, মহামারী নাই, দুর্ভিক্ষ নাই, কোন প্রকার অমঙ্গল নাই। কিন্তু যেই এক জন দশমবর্ষীয়ার পুনর্ব্বিবাহের কথা উপস্থিত, অমনি পৃথিবীর যত অমঙ্গল, যাহা অপেক্ষা অমঙ্গল আর নাই সেই দুর্ভিক্ষ, মহামারী সমুদায় আসিয়া উপস্থিত। আমরা পরের বেলা যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাহির করিয়া কথা কই, আপনাদের বেলা কি ততদূর হাবা হইয়া থাকি, এই আশ্চর্য্য! এই দেখুন লেখক পুরুষজাতির বেলা কি বলিতেছেন। "ভারতীয় ঋষিগণ, এত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন না যে, কেবল আপনাদের সুখের জন্য বিধবাদিগকে কষ্ট দিয়াছেন। পুরুষে পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দেখিয়া অনেকে ঐরূপ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক পুরুষের পুনর্ব্বিবাহে ঐ সকল দোষ লক্ষিত হয় না বলিয়া উহার নিষেধ হয় নাই। * * * কিন্তু তথাপি অধিক বয়সে ও উপযুক্ত পুত্রাদি বর্ত্তমানে পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ করা অনুচিত।" লেখক পুরুষে পুনর্ব্বিবাহের বেলা কোন দোষই দেখেন নাই। যে স্থলে পুরুষের বিবাহ অনুচিত বলিয়াছেন সে স্থলে স্ত্রীজাতির বিবাহও আমাদের শাস্ত্রমতে অনুচিত। যে স্থলে হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বিধানিত হইয়াছে। কিন্তু বালবিধবাগণের পক্ষেও কি সেই ব্যবস্থা? তাহা কখন ন্যায্য হইতে পারে না। আমরাও বলি ভারতীয় ঋষিগণ এত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন না যে, কেবল আপনাদের সুখের জন্য পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং স্ত্রীজাতির জন্য করেন নাই। স্ত্রীজাতির জন্যও সে অনুজ্ঞা দেওয়া ছিল।

নষ্টে, মৃতে, প্রব্রজিতে,
ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং
পতিরন্যো বিধীয়তে॥
পরাশর।

মনুও অনেক স্থলে স্ত্রীজাতির পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন। তবে ব্রহ্মচর্য্যের অধিকতর ফল নির্দ্দিষ্ট থাকাতে কালক্রমে স্ত্রীজাতির পুনর্ব্বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণকার কালে মানবতত্ত্ব-লেখকের মত একজন কৃতবিদ্য লোক যে অগ্রসর হইয়া বলিবেন, স্ত্রীজাতির পুনর্ব্বিবাহ কোন ক্রমেই ভাল নহে এই বড় আশ্চর্য্য! যদি পুনর্ব্বিবাহ মহামারী ও দুর্ভিক্ষের হেতু হয়, তবে অবশ্য পুরুষের বেলাও তদ্রূপ হইবে। তজ্জন্য পুরুষেরও পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু লেখক যখন পুরুষের পুনর্ব্বিবাহে কোন দোষ দেখেন নাই, তখন তিনি পাকতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, পুনর্ব্বিবাহ জন্য প্রজাবৃদ্ধি হয় না এবং তদ্ধেতু দুর্ভিক্ষ ও মারীভয়ও ঘটে না। সুতরাং লেখক আপনার কথায় আপনিই বিরোধী হইয়াছেন।

মানবতত্ত্ব-লেখক কিরূপ অলীক ভয় দেখাইয়া লোকের মনকে ভ্রান্ত করিতে চাহেন এবং বঙ্গসমাজের একটি অত্যাবশ্যকীয় মহাকল্যাণকর সমাজসংস্কার হইতে লোককে ফিরাইতে চাহেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। তাঁহার প্রথম হেতু যেমন নিরর্থক এক্ষণে দেখাইব তাহার দ্বিতীয় হেতুও তদ্রূপ। তাঁহার দ্বিতীয় হেতু এই যে, বিধবাগণের বিবাহ হইলে অনেক কুমারী ও পুরুষ অবিবাহিত থাকে। এখন দেখা যাউক, একথাও কতদূর সত্য।

মানবতত্ত্ব লেখকের এই আর একটি অলীক কল্পনা। তিনি কোথা হইতে জানিতে পারিলেন বিধবাবিবাহ হইলে অনেক ব্যক্তি অবিবাহিত থাকে? তিনি বলেন, "সকল নারীর চিরকাল স্বামিসহবাস ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।" আমরা ত জানি মানবতত্ত্ব-লেখক আদৌ ঈশ্বর মানেন না। তবে তিনি আবার আপনার কথায় ঈশ্বরের দোহাই দিয়া লোককে ভ্রান্ত করিতে যান কেন? তার পর দেখুন ঈশ্বরের দোহাই দিয়া তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন সকল নারীর চিরকাল স্বামীসহবাস ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তিনি যে হেতু এইরূপ অভিপ্রায় বাহির করিয়াছেন সেই হেতু অনুসারেও বলিতে পারেন না যে সকল পুরুষের চিরকাল পত্নীসহবাসও ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। কারণ, কোন দেশেই, কোন কালে সকল পুরুষ চিরকাল পত্নীসহবাস লাভ করিতে পারে না। এ কথা যদি স্থির হয় যে পুরুষের চিরকাল পত্নীসহবাস লাভ করা দুরূহ, তাহা হইলে বরং বিধবাবিবাহ চলিত থাকিলে পুরুষের চিরকাল পত্নী-সহবাস লাভ করা অনেক সহজ হইয়া আইসে। মানবতত্ত্বলেখক যখন পুরুষের বেলা

অত্যন্ত দয়াশীল, তখন তিনি এই যুক্তি ধরিয়া পুরুষের সুখের জন্য বিধবা-বিবাহের পোষকতা করেন না কেন? তিনি তাঁহার হেতু'ক পুরুষের দিকে উল্টাইয়া ধরিলেই এই যুক্তিপথ দেখিতে পাইতেন।

বাস্তবিক কি বিধবাবিবাহ হইলে অনেক লোকের বিবাহ হয় না? কই লোকগণনায় যে ফল বাহির হইয়াছে, তাহাতে ত এরূপ শিক্ষালাভ হয় না। গত বারে গবর্ণমেণ্ট যে লোকগণনা করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে কোন চিন্তাশীল লেখক যে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহা ১১ই অগ্রহায়ণ (১২৯০) তারিখের "নববিভাকরে" তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বিষয় সম্বন্ধে যে শিক্ষলাভ হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়াই উচিত। বঙ্গে বিবাহিত নরনারীর সংখ্যাগত তারতম্য নাই বলিলেই হয়। তাহার উপর আবার দেখ, অবিবাহিত পুরুষ যে দেশে ১৬০৯৮৬০৫ জন, সেই দেশে অবিবাহিত রমণীর সংখ্যা ১০৩৩১৮১১ জন বই নয়। অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষের অধিক। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, অনেক আইবড় পুরুষের ভাগ্য ফেরে। এ দেশে ৭৩৯৭৬৪৭ জন বিধবা আছে, কিন্তু গৃহিণীশূন্য পুরুষ ১৩৭৪১৮৪ জন বই নাই। সুতরাং হিসাবে পতিহীনার সংখ্যা পত্নীহীনের অপেক্ষা ৬০ লক্ষেরও অধিক জেয়াদা, তবেই দেখা যাইতেছে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে বেশ সামঞ্জস্যটী হইয়া যায়। হয় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কর, না হয়, নারীজাতির বহুবিবাহ কর। পুরুষের বহুবিবাহ ত আর কোন মতেই চলিতে পারে না।"

এই গণনায় মোট স্ত্রীহীন পুরুষ ১৭৪৭২৭৮৯ জন এবং মোট পতিহীনা স্ত্রী১৭৭২৯৪৫৮ জন দাঁড়ায়। যথা—

গৃহিণীশূন্য পুরুষ—১৩৭৪১৮৪
অবিবাহিত পুরুষ—১৬০৯৮৬০৫

মোট স্ত্রীহীন পুরুষ—১৭৪৭২৭৮৯

বিধবা— ৭৯৯৭৬৪৭
অবিবাহিত স্ত্রী— ১০৩৩১৮১১

মোট পতিহীনা স্ত্রী ১৮৩২৯৪৫৮

সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে সকল পুরুষের বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু লেখক বলিতে পারেন স্ত্রী প্রায় ২॥ লক্ষ পতিহীনা থাকে। এ কথার মীমাংসা করা যাইতেছে।

বঙ্গে হিন্দু পুরুষের সংখ্যা ২২৫৭৮৫৪৪ জন, কিন্তু স্ত্রীর সংখ্যা ২২৮১৪২৬২ জন। এগণনায়ও দেখা যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী ২॥ লক্ষ অধিক। এক এক জন পুরুষের যদি এক এক স্ত্রী হয় তাহা হইলেও ২॥ লক্ষ স্ত্রীর পুরুষ মিলে না। কিন্তু কথা এই বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রকার বিধবাবিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে কেবল বালবিধবাগণেরই

বিবাহ হইবে। বালবিধবা ধর ১০ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত। কিন্তু পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ ১০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে। সুতরাং যদি ১০ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ হইতে বাদ দেওয়া যায় তবু পুরুষের পক্ষে ২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পুনর্ব্বিবাহ উদ্বৃত্ত থাকে। ১০ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত কি বিধবা, কি পত্নীহীন পুরুষ, উভয়েই ত বিবাহ হইল, সুতরাং তাহাদের উভয় পক্ষীয় সংখ্যা সমান ধরিলে অনায়াসে বাদ পড়িতে পারে। কিন্তু ২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত পত্নীহীন পুরুষ বেশী থাকে। ১০ হইতে ২০ বৎসরের অন্তর ১০ বৎসর, কিন্তু ২০ হইতে ৪০ বৎসরের অন্তর ২০ বৎসর। আর মৃত্যু ১০ হইতে ২০ পর্য্যন্ত যত হইবে ২০ হইতে ৪০ পর্য্যন্ত অবশ্য তদপেক্ষা বেশী হইবে। সুতরাং ১০ হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত যত স্ত্রী পতিহীনা অথবা যত পুরুষ স্ত্রীহীন হয়, ২০ হইতে ৪০ বৎসরে তদপেক্ষা অবশ্য প্রায় ২॥ গুণ অধিক হইবার সম্ভাবনা। যখন ২০ হইতে ৪০ বৎসরের বিধবার বিবাহ হইতেছে না কিন্তু সেই সময়ের পত্নীহীন পুরুষের শুদ্ধ বিবাহ হইতেছে, তখন ধরিতে হয় তদ্রূপ পুরুষসংখ্যা প্রায় ২॥ গুণ বাড়িল। সুতরাং সেই বয়সের পুরুষসংখ্যা বিবাহ সম্বন্ধে ২॥ গুণ বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি এরূপ হয়, তবে কি স্ত্রীর উদ্বৃত্ত (প্রায় ২॥ লক্ষ) অংশের পুরুষ মিলিতেছে না? সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যার বেশ সামঞ্জস্য ঘটিতেছে। অতএব বিদ্যাসাগর-প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে লোকসংখ্যাগত বিবাহ বিষয়ক ন্যূনাধিক্য একেবারে বেশ মিটিয়া যায়। সকল পুরুষের বিবাহ হয় এবং সকল নারীরও বিবাহ হয়। অথচ যে সকল বিধবার বিবাহ হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং সামাজিক কল্যাণবিধায়ক সে সকল বালবিধবাও অবিবাহিত থাকে না।

লোকগণনার বাস্তবিক ফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। মানবতত্ত্ব-লেখক আরও বলেন :—

"অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, সকল দেশেই কতকগুলি করিয়া স্ত্রীর বিবাহ বন্ধ থাকে, অর্থাৎ দেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ এমত কতকগুলি নিয়ম আছে যে, তদবলম্বনে চলিলে সকল স্ত্রীর বিবাহ হইতে পারে না।"

এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমরা জানি না। আমরা অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহা দেখাইলাম। আমরাও অনুসন্ধানে দেখিতে পাই যে যদি অনেক দেশে কতকগুলি স্ত্রীলোকের বিবাহ না হয়, তদ্রূপ অনেক পুরুষও আইবড় থাকে; আর লেখক যদি দেখিয়া থাকেন যে দেশ বিশেষে

কতকগুলি নিয়ম বশতঃ অনেক স্ত্রী অবিবাহিত থাকে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে সেই নিয়মেরই দোষ। নিয়ম সংশোধন করিলেই চুকিয়া যায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লেখক ইংলণ্ডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাল সেই দৃষ্টান্তই ধরুন। লেখক আশ্চর্য্য হইয়া বলেন "ইংলণ্ডে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তথায় কত কুমারী চিরকাল অবিবাহিত থাকে!" অনেক থাকে বটে, কিন্তু ততোধিক পুরুষও কি অবিবাহিত থাকে না? ইংলণ্ডের অবিবাহিত নারীর সংখ্যা এত কেন? সেখানে অনেকে ইচ্ছা করিয়াই বিবাহ করে না, বিবাহ বন্ধনের ভিতর ঢুকিতে চায় না বলিয়া বিবাহ করে না। অনেক পুরুষ সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। অনেকে ধর্ম্মোদ্দেশে চিরকৌমার্য্য গ্রহণ করে। অনেকে উপযুক্ত পাত্রাভাব জন্যও বিবাহ করে না, উপযুক্ত পাত্র পাইলে যত বয়সেই হউক বিবাহ করে। এইরূপ নানা কারণে ইংলণ্ডে অনেক কুমারী দেখিতে পাওয়া যায়। নহিলে পুরুষের সংখ্যা ও স্ত্রীর সংখ্যার ন্যূনাধিক্য জন্য যে সেখানে অনেক স্ত্রী অবিবাহিতা থাকে, এ কথা সপ্রমাণ হয় না। এ জগতে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা কখন স্থির নাই। সর্ব্বদাই পরিবর্ত্ত হইতেছে। লেখক কি বলেন, ইংলণ্ডে পুরুষের সংখ্যা নারীর সংখ্যা অপেক্ষা চিরকালই কম আছে, সেই জন্য সেখানে সকল স্ত্রীর বিবাহ হয় না? যদি তিনি এ কথা বলেন, তবে তাঁহার সে কথা প্রমাণ করা চাই। আর যদি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা বরাবর কিঞ্চিদধিক প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও যে বিবাহের গোল মিটিতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

লেখক আরও বলেন যে "ভারতে বহুবিবাহ প্রচলিত ও বিধবাবিবাহ নিষেধ আছে, তথাপি কন্যার বিবাহের জন্য কোন্ ব্যক্তি চিন্তিত না হয়েন? পশ্চিমদেশের লোকেরা কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবার জন্য কত কন্যার প্রাণ নষ্ট করে। এরূপ অবস্থায়, অর্থাৎ যখন কতকগুলি স্ত্রীকে স্বামীসহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে, তখন কুমারীর বিবাহ বন্ধ না রাখিয়া বিধবাবিবাহ বন্ধ রাখাই উচিত।" "পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ সত্ত্বেও যখন কন্যার পাত্রের অসদ্ভাব, তখন পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ বন্ধ হইলে আরও পাত্রের অসদ্ভাব হইবার সম্ভাবনা।" সত্য, কিন্তু কি জন্য পাত্রের অসদ্ভাব ঘটে? পুরুষসংখ্যা কম বলিয়া কি অসদ্ভাব ঘটে? না, এতদ্দেশের আচার ব্যবহার দোষে মনোমত পাত্রের অভাব ঘটিয়া উঠে? যদি শেষ কারণ ঠিক হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে দেশের আচার ব্যবহারের সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে। সেই আচার

ব্যবহারের সংশোধন হইলে সকল রকম অসুবিধা মিটিয়া যাইবে। আমরা সেই রূপ সংশোধনেরই পক্ষপাতী। সংখ্যার ন্যূনাধিক্য বশতঃ যে পাত্রের অসম্ভব ঘটে না, তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং লেখক যে বলিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে অনেক লোক অবিবাহিত থাকিবে তাঁহার সে কথার অর্থ স্বতন্ত্র। তিনি বোধ হয় এমত কথা বলিতে চাহেন না যে, পুরুষ অভাবে তাহারা অবিবাহিত থাকিবে। তাঁহার কথার অর্থ যদি এরূপ হয় যে, দেশাচার নিবন্ধন অবিবাহিত থাকে, তবে সেই দেশাচার সংশোধন করিলেই ত সকল গোল মিটিয়া যায়। বিধবা-বিবাহ বন্ধ থাকা উচিত হয় কেন? আর বিদ্যাসাগরমহাশয় আমাদের শাস্ত্রসম্মত যে সকল বিধবাগণের পুনর্বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছেন, সে সকল বিধবা ত কুমারীর মধ্যেই গণ্য। মন্ত্রপূত গোটাকতক ফুল গায়ে ফেলিয়া দিলেই কি বিবাহ সার্থক হইল? মন্ত্রপূত গোটাকতক ফুল গায়ে ফেলিয়া দিলে যদি বিবাহ সার্থক না হয়, তবে অল্পবয়স্কা বিধবাগণকে কুমারীর মধ্যেই ধর না কেন? যদি তাহারা কুমারীর মধ্যে গণ্য হয় তবে কি তাহাদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহ হওয়া উচিত নহে? যদি উচিত হয়, তবে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রীজাতির পুনর্বিবাহ দিলেই এ সংসারে যত আপদ বিপদ এবং যত অমঙ্গল ঘটিবে, মানবত্ব-লোপকর এই কুসংস্কার কেমন অলীক, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। তৎপরে গবর্ণমেণ্টের লোক-গণনা হইতে দেখাইয়াছি, বিধবার বিবাহ দিলে এ সংসারে যে কতকগুলি লোক অবিবাহিত থাকে, এ কথাও মিথ্যা। গ্রন্থকার এই প্রকার ভয় দেখাইয়া এবং একটি মিথ্যা আপত্তি তুলিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই। বিধবা-বিবাহ হইলে সংসারমধ্যে তাঁহার বিবেচনায় কি কি অসুবিধা পর্য্যন্ত ঘটে, তাহাও তিনি একে একে গণনা ও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে দেখা যাউক, তিনি যে অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক কি না, এবং সেই সামান্য অসুবিধার জন্য সমাজ-মধ্যে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যা পাপ স্রোত চলিতে দেওয়া বিধেয় কি না।

লেখক একটী অসুবিধা এইরূপ লিখিয়াছেন। "বিধবাবিবাহের প্রধান দোষ এই যে, উহা প্রচলিত থাকিলে, গার্হস্থ ধর্ম্মের আদৌ দৃঢ়তা থাকে না। গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী-জাতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে গৃহের নির্দ্দিষ্টতা থাকে না। স্ত্রীজাতি বাল কালে পিতৃভবনে থাকে, পরে স্বামি-ভবনে আসিয়া স্থির হয় বলিয়া, স্বামি-ভবনের শৃঙ্খলা সম্পাদনে তাহাদের যত্ন হয়, পিতৃগৃহের কোনও কার্য্যে

[illegible] মনে বিশেষ হয় না। কিন্তু স্ত্রী যদি জানে যে, স্বামী মৃত্যু হইলে তাহাকে অন্য স্থানে যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে গৃহকার্য্যে দৃঢ়রূপে মনোযোগী হইবে কেন? স্বামী কোন কার্য্যেই তাহার মনোযোগ হইতে পারে না। আবার স্বামীও যদি জানেন, যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী অন্যত্র গমন করিবে ও সংসঙ্গে তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তাহা হইলে তাহারও স্থায়ী গৃহনির্ম্মাণে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাও তাহার প্রমাণ। এথায় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়া এখাকার প্রায় কোন লোকেরই স্থায়ী স্বকীয় বাসগৃহ নাই। সকল লোকেই চিরকাল ভিন্ন ভিন্ন সরাই প্রভৃতিতে বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করে।”

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং আমাদের অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকগণ যে প্রকার অল্পবয়স্ক পতিপুত্রহীনা বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ দিবার প্রস্তাব ও চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই বিধবাগণ সম্বন্ধে কি উক্ত অসুবিধা কিছু মাত্র ঘটিতে পারে? সংসারে প্রবেশ না করিতে করিতে যাহাদের সংসারে বজ্রাঘাত পড়িয়াছে, যাহাকে লইয়া কল্পনারূপে হইয়া তাহারা সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, যখন সেই স্বামীই পরলোকগত হইয়াছেন তখন তাহাদের আর সংসারধর্ম্ম কি? কাহাকে লইয়া সংসারযাত্রা করিবে? তাহাদের সে স্থায় বিশৃঙ্খলা তাহারা আবার কিসের বিশৃঙ্খলা করিবে? যাহাদের স্বামীই দুই দিন বাঁচিলেন না, অর্থোপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন, তিনি কি রূপে স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন? যাহার পুত্র নাই তাহার আবার পুত্রের জন্য ভাবনা কি? সুতরাং পতিপুত্রহীনা অল্পবয়স্কা নারীর পক্ষে গ্রন্থকারোক্ত অসুবিধা কিছু মাত্র ঘটে না। ইহা যদি সত্য হয় তবে কি গ্রন্থকারের বলা উচিত ছিল না যে, ঐ প্রকার বিধবার পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত? তাহা হইলে কেহই তাঁহার কথায় আপত্তি করিত না। কিন্তু তিনি যখন বিধবা বিবাহ একেবারেই বিধেয় নয় বলিয়াছেন তখন তাঁহার কথা কখনই গ্রহণীয় হইতে পারে না।

একণে বয়স্কা বিধবার কথা। যে দেশে বিধবাবিবাহ চলিত আছে সে দেশে যে এ প্রকার সকল বিধবা বিবাহ করে এমত নহে। বয়স হইলে, পুত্র কন্যা হইলে, সকল গৃহশূন্য পুরুষও পুনর্বিবাহ করে না। ভারতের খানিকটা জায়গা ছাড়া, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ত বিধবাবিবাহ প্রচলিত। তবে কি কুটীর-পরিপূর্ণ বঙ্গদেশ ব্যতীত কোন দেশের লোকেরা সংসার ধর্ম্ম করে না, বঙ্গদেশের মত ঘরের ঘর ও চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া সংসার করে না? এ পৃথিবীতে সর্ব্বত্রই কি

সংসারধর্ম্ম বিশৃঙ্খলায় চলিতেছে? লেখকের কি ভ্রান্তি! স্ত্রীর সহিত গৃহ নির্ম্মাণের সম্বন্ধ কি? যখন পুত্র পৌত্রাদি আমার, যখন আমার সুখের জন্য ভার্য্যাগ্রহণ, যখন আমার সুখের জন্য সংসার, যখন আমার জীবতকালের সুখের জন্য সকল ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন, যখন পুত্র পৌত্রাদির জন্য বিষয় সম্পত্তি আবশ্যকতা, যখন তাহাদের সুখভোগে সংসারের ও সকল শ্রমের সার্থকতা, তখন আমি গৃহনির্ম্মাণে ও সংসারধর্ম্মে মনোযোগী হইব না কেন? আমার সংসারধর্ম্মে স্ত্রীর কোন্ স্থায়ী কার্য্যে মনোযোগ আবশ্যক? সংসারের সকল স্থায়ী কার্য্য ও বিষয় সম্পত্তি ত স্বামীই করে। স্বামী কি সকলই স্ত্রীর উদ্দেশে করে? না হয় বঙ্গদেশে যাহা স্ত্রীধন বলিয়া খ্যাত আছে তাহার সংগ্রহে স্বামী ব্যস্ত না হইলেন। কিন্তু তদ্ব্যতীত ত সকলই স্বামী ও তাহার পুত্রাদির সুখের জন্য। সংসারকার্য্যে স্ত্রীর কি হাত আছে যে তিনি মনোযোগ না দিলে কোন স্থায়ী কার্য্য হইবে না? স্ত্রী কি নিশ্চয় জানে, তাহাকে বর্ত্তমান স্বামী ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে? তাহার কি বর্ত্তমান পুত্র কন্যার প্রতি কিছুই স্নেহমমতা নাই যে তিনি সংসারের সকল কার্য্যে উদাসীনা থাকিবেন? তাহার অর্থ কি? বর্ত্তমান জীবিতকাল, সুখে, স্বচ্ছন্দে অতিবাহন করা যদি তাহার [illegible] উদ্দেশ্য হয়, তবে কি স্ত্রী সেই সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি উদাসীনা হইতে পারেন? হন্, তিনি আপনিই অসুখী হইবেন। তাহার পুত্র কন্যা কষ্ট পাইবে, তাহাদের কষ্ট জনিত দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু সকল স্নেহমমতাশূন্যা হইয়া কোন স্ত্রী সেরূপ উদাসীনা হইয়া থাকে? ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তজ্জন্য কে বর্ত্তমান সুখে জলাঞ্জলি দেয়? যখন যে স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া কয়েক বৎসরাবধি সংসারধর্ম্ম করিতেছে, তখন সে সর্ব্বদাই আশা করে, চিরকাল সেই পুত্র কন্যা লইয়া ও সেই স্বামী সহবাসে সুখিনী হইয়া আপন জীবন অতিবাহিত করিবে। স্বামীর মৃত্যু হওয়া ও তাহার পর স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করা আকস্মিক ঘটনার কথা মাত্র। রাত্রিদিন তাই ভাবিয়া কোন স্ত্রীলোক বর্ত্তমান সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় না। এই সমস্ত কারণ জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সংসারধর্ম্ম সুচারুরূপে চলিতেছে। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই সর্ব্বদাই অট্টালিক পূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও ধন ধান্যে সমৃদ্ধিশালী। সুতরাং লেখকের কথা মিথ্যা।

আর বঙ্গদেশে বিধবাগণই না, স্বামীর সংসারধর্ম্মে একান্ত মনোযোগী এবং পিতৃকুলের সংসারধর্ম্মে একেবারে উদাসীনা হয়? এখানেও নারীগণ পিতৃকুলের সুখ চাহিয়া তবে স্বামীর সংসারধর্ম্ম সম্পন্ন করে। তাহারা

জানে বিধবা হইলে, তাহাদের সেই পিতৃকুলে দাঁড়াইতে হইবে। তখন স্বামীর সংসার কোথায় থাকিবে? তাহারা আরও জানে, স্বামীর দুর্দ্দিন অনাটন হইলে পিতৃকুলে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, সময় অসময় পিতৃকুলই তাহাদের প্রধান সহায়। তবে তাহারা কিরূপে সর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া একাত্মমনে কেবল স্বামীর সংসারেই মনোযোগী হইতে পারে? কই বঙ্গ-সমাজে ত এরূপ ঘটে না। লেখক কোথা হইতে এক সৃষ্টিছাড়া কথা আনিয়া ফেলিলেন!

লেখক দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "তথায় বিধবাবিবাহ আছে বলিয়া তথাকার কোন লোকেরই স্থায়ী বাসগৃহ নাই।" কোনও লোকেরই যদি স্থায়ী বাসগৃহ নাই, তবে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং আয়র্লণ্ড এত অট্টালিকা-ময় কেন? এত বাসগৃহ কাহাদের? যাহাদের বাসগৃহ আছে, তাহারা কেন তন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল? আর যাহাদের নিজস্ব বাসগৃহ নাই, তাহারা কি দেশে বিধবাবিবাহ চলিত আছে বলিয়াই তাহা নির্ম্মাণ করে নাই? বঙ্গদেশের মত ১০০৲ টাকা দিয়া দুই খানা কুঁড়ে বাঁধে নাই সত্য, ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত লোকের অনেকের নিজস্ব বাড়ী নাই সত্য, কিন্তু সে কি জন্য? ইংলণ্ড বঙ্গদেশ নয়। ইংলণ্ড বাণিজ্যপ্রিয়, বঙ্গদেশ কৃষি-শালিনী। ইংলণ্ডে লোকে অর্থের ব্যবহার জানে, তাহারা টাকা গাড়িয়া রাখিতে চাহে না। বঙ্গদেশের বৃহৎ অট্টালিকার যে মূল্য, ইংলণ্ডে সেই মূল্যে সেই অট্টালিকাতলস্থ ভূমিখণ্ডও মিলে না। ইংলণ্ডবাসীরা বলে, বাঙ্গালীরা যে টাকা গাড়িয়া বাসগৃহ অট্টালিকা বানায়, আমরা সে টাকা মূল ধন স্বরূপ পাইলে ভারতবর্ষের একজন রাজা হইতে পারি। লেখক কি এ সকল কথা ভাবেন নাই? এ সমস্ত স্পষ্ট কারণ দেদীপ্যমান থাকাতেও লেখক কিরূপে বলিলেন যে, অনেক ইংলণ্ডবাসীর যে নিজস্ব বাসগৃহ নাই, সে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলনই তাহার কারণ? ইং-লণ্ডের সর্ব্ব লোকের বাসগৃহ নাই বলিয়া কি তদ্দেশে জাতীয় ধন কিছু কম? না, তথাকার সংসারধর্ম্মের কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে? ইংলণ্ডবাসীরা কি পারিবারিক সুখ-আস্বাদনে সুখী নহে? হায়, কি ভ্রান্তি!

লেখক বলিয়াছেন "কিন্তু স্ত্রী যদি জানে যে স্বামীর মৃত্যু অন্তে তাহাকে অন্য স্থানে যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে গৃহকার্য্যে দৃঢ়রূপে মনোযোগী হইবে কেন?" স্বামীর মৃত্যু অন্তে বঙ্গ স্ত্রীকে অন্য স্বামী গৃহে যাইতে হয় না বটে, কিন্তু বিধবা হইলে অনেককেই কি পিতৃগৃহে যাইতে হয় না? আর তাহারা গৃহকার্য্যে দৃঢ়রূপে মনোযোগী কি হইবে? বঙ্গস্ত্রী গৃহস্থালী কার্য্য

সকল যেরূপে সম্পন্ন করেন, একজন ইংরাজ স্ত্রী কি তদপেক্ষা কম মনোযোগ দিয়া সম্পন্ন করেন? ইংরাজ গৃহের গৃহস্থালী কার্য্য সকল কি কম পরিপাটি-রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে? লেখকের অভিজ্ঞতা কিরূপ আমরা তাহা জানি না, কিন্তু লেখক যে ইংলণ্ডে যান নাই তাহা আমরা জানি। তিনি সে দেশে না গিয়া, গৃহস্থের গৃহস্থালী কার্য্য না দেখিয়া বলিয়াছেন যে "তথায় (ইংলণ্ডে) গার্হস্থ্য প্রণালীর এত বিশৃঙ্খলা"। কিরূপ বিশৃঙ্খলা আমরা জানিতে চাই? আর আমাদেরই বা কি প্রকার সুশৃঙ্খলা? লেখক কি বলিতে চান, একজন বঙ্গস্ত্রী ইংরাজস্ত্রী অপেক্ষা রন্ধনকার্য্য, তৈজসাদি মার্জ্জন কার্য্য, গৃহপরিষ্কারকার্য্য, সন্তানাদি প্রতিপালন কার্য্য প্রভৃতি কার্য্য সকল অধিকতর মনোযোগ দিয়া সম্পন্ন করেন? কই, আমরা এমত কথা বলিতে পারি না? আমরা জানিতে চাই বঙ্গস্ত্রী কোন্ কার্য্য দৃঢ়রূপ মনোযোগ দিয়া করেন এবং ইংরাজপত্নী কোন্ কার্য্য কম মনোযোগ দিয়া করিয়া থাকেন।

লেখক আরও বলেন যে, "স্ত্রী যদি জানে যে স্বামীর মৃত্যু অন্তে তাহাকে অন্য স্থানে যাইতে হইবে, তাহা হইলে স্বামি[illegible] কোনও কার্য্যেই তাহার মনোযোগ হইতে পারে না"। এ সকল কথা বুঝিতে [illegible], কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, কোন দেশে স্থায়ী কোন কার্য্য সম্পাদন করিবার হাত অংদৌ স্ত্রীজাতির আছে কি? স্থায়ী কার্য্য-সকল ত পুরুষজাতিই সর্ব্বদেশে করিয়া থাকেন। স্থায়ী কার্য্য করিবার হাত, মনে কর কেবল বঙ্গস্ত্রীর আছে, কিন্তু তাহা হইলেও বঙ্গস্ত্রী তাহা করিবে কেন? বঙ্গস্ত্রীর যে আবার সপত্নীর ভাবনা আছে। বঙ্গস্ত্রী বিলক্ষণ জানেন, তাঁহার মৃত্যু অন্তে স্বামী আবার ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিবেন, এবং যে সংসার তিনি আমার বলিয়া আজ করিতেছেন, কাল তাঁহার সেই সোণার সংসার পরের হইয়া যাইবে। সে সংসারে আর এক গৃহিণী হইবে, আর এক জনের সন্তানাদি সে চাঁদের হাট পূর্ণ করিয়া দিবে। এই সকল ভাবনায় কি বঙ্গ স্ত্রী সর্ব্বদা ব্যথিত থাকেন না? যাহার হৃদয়ে এরূপ ভাবনা সে স্ত্রী কি কোন স্থায়ী কার্য্যে মনোযোগিনী হইতে পারেন? লেখক বলিয়াছেন, পুরুষের পুনর্ব্বিবাহে দোষ নাই। যখন তিনি বিধবাবিবাহের "প্রধান দোষ" দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন কি তিনি পুরুষের পুনর্ব্বিবাহের দোষের কথা ভাবিয়াছিলেন? তাহা ভাবিলে তিনি কখনই বলিতেন না যে, কেবল বঙ্গদেশেই স্থায়ী গৃহস্থ কার্য্যে পুরাঙ্গনাগণের মনোযোগ আছে। লেখকের কি বলা উচিত ছিল না যে যেমত স্ত্রীজাতির বিধবাবিবাহ উচিত নহে, তেমনি পুরুষেরও পুনর্ব্বিবাহ

উচিত নহে? তাহা হইলে তাহার উপস্থিত বিধবাবিবাহ-প্রতিকূল যুক্তির কিছু বল হইত। কিন্তু পুরুষের পুনর্ব্বিবাহে লেখক কোন মতেই দোষ দিতে পারেন না। কেন না, পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ বন্ধ হইলে সংসার চলে কই? বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ যে নিয়মে ব্যবস্থিত তাহাতে পুরুষ, স্ত্রী ভিন্ন কখনই সংসারী হইতে পারেন না, এবং সংসারী না হইলে সামাজিক সুশৃঙ্খলা থাকে না। সুতরাং পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ অত্যাবশ্যক। পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ যদি অত্যাবশ্যক হয়, তবে কিরূপে বলিতে পার যে বঙ্গস্ত্রীর স্থায়ী গৃহকার্য্যে অন্য দেশীয় স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ। আমরা দেখাইয়াছি, তাঁহার সে প্রকার মনোযোগ সম্ভব নহে।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে সংসারকার্য্যে যে প্রকার অসুবিধা ঘটিবে লেখক বলিয়াছেন, আমরা দেখাইলাম তাহাও সর্ব্বৈব মিথ্যা। তিনি প্রস্তাবের উপসংহার কালে বলিয়াছেন "অতএব যাঁহারা বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিধবাবিবাহের চেষ্টা করেন, তাঁহারা কি কুমারীদিগের ও অবিবাহিত পুরুষদিগের দুঃখে দুঃখিত হইবেন না? দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়িতদিগের ভয়ানক কষ্টে কি তাঁহাদের চিত্ত আর্দ্র হইবে না? অথবা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের শিথিলতা নিবন্ধন দরিদ্র গৃহে অন্ন হেতু মানবের দারুণ দুঃখে ব্যথিত হইবেন না? তাঁহারা কি জানিতেছেন না, যে, এক বিধবাদিগের দুঃখ মোচন করিতে গেলে ঐ সমস্ত প্রকার দুঃখের বৃদ্ধি হইবে? অতএব বিধবাবিবাহ কোন প্রকারে চলিত হওয়া উচিত নহে।" গ্রন্থকারের এ যুক্তি কেমন দুর্ব্বল ও অসার তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। আমরা দেখাইয়াছি গ্রন্থকার যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ভয় দেখাইয়াছেন তাহার সর্ব্বৈব মিথ্যা; তিনি যে কুমারীগণের দুঃখ দেখাইয়াছেন তাহাও মিথ্যা, আর গৃহস্থ কার্য্যের কেমন শিথিলতা ঘটে তাহা আমরা দেখাইয়াছি। সুতরাং গ্রন্থকারের হেতু সকল গ্রহণীয় নহে। গ্রন্থকার জগৎ শুদ্ধ লোকের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন, কেবল দীন হীন কাঙ্গালিনী বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন নাই। সে দুঃখ নিবারণ করিতে যাহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা অবশ্য পূজার্হ দেবোপম লোক।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অল্পবয়স্কা বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ পক্ষে যে তিনটি হেতু দিয়াছেন সে তিনটি হেতুই অত্যন্ত প্রবল এবং সকলগুলিই বাস্তবিক হেতু। মানবতত্ত্ব-লেখকের হেতুগুলি আনুমানিক ও মিথ্যা। সুতরাং বিদ্যাসাগরের পক্ষই অবলম্বনীয়।

বিদ্যাসাগরমহাশয় প্রথম হেতু স্বরূপ যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ সেই হেতুমধ্যে অনেক বিষয় বিদ্যমান আছে। তাহার প্রথম

হেতু এই যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে বিধবাগণ বৈধব্য দশার অশেষ যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত হয়েন। এই বৈধব্য দশার একটি বিষয় দেখুন। অনেক বিধবা পতির মৃত্যুতে একেবারে হয় ত অনাথিনী ও সর্ব্বসহায়-বিহীনা হইয়া পড়ে। তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় মাত্র নাই। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে ব্যভিচার সেরূপ বিধবার জীবিকা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ বিধবাগণ ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য হন। সেরূপ নিরুপায়, অনাথিনী বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ ব্যতীত জীবিকা নির্ব্বাহের আর কি সদুপায় আছে? সুতরাং এরূপ স্থলে বিধবাবিবাহ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। আমাদের জানা উচিত, পুরুষের সুখের জন্য তাহার বিবাহ, কিন্তু নারীর জীবিকার জন্য তাহার বিবাহ। অতএব পুনর্ব্বিবাহ কাহার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয়? পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ যদি সমাজের মঙ্গল হেতু প্রয়োজনীয় হয়, তবে সেই সমাজের অর্দ্ধ ভাগের জীবনোপায়ের জন্য স্ত্রীজাতির পুনর্ব্বিবাহ অধিকতর প্রয়োজনীয় হইতেছে।

শুদ্ধ আমাদের অল্পবয়স্কা বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ জন্য বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব ছিল। এ দেশে বালবিধবার সংখ্যাও কিছু সামান্য নহে। বিস্তৃত গবর্ণমেণ্ট "সেন্সস্ রিপোর্ট" পাঠে নব বিভাকর বলেন "১০ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে যাহাদের বয়স, এমন ছেলে এখনও শতকরা ৭১টী অবিবাহিত, কিন্তু এমন মেয়ে শতকরা ৭৬টি বিবাহিত; আর ৪টী বিধবা; সুতরাং শতকরা ২০টী বই আইবড় নহে।" বঙ্গদেশে যখন হিন্দু নারীর সংখ্যা ২০৮৭৪২৩২ জন, তখন তন্মধ্যে ১০ হইতে ২০ বৎসরের নারীর সংখ্যা কিছু কম হইবে না, এবং তাহার শতকরা যদি ৪টী করিয়া বিধবা হয়, তবে বঙ্গে বাল বিধবার সংখ্যা কত অধিক হইয়া দাঁড়ায়! বঙ্গদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিলে কত সহস্র বালবিধবার যে দুঃখ মোচন হইত তাহা কে বলিতে পারে? সমাজের কত ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার নিবারণ হইত তাহা কে বলিতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে যে মহোদয়গণ বিধবাগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া, সমাজের দুঃখে দুঃখী হইয়া, নিজ নিজ মনোবেদনায় কাতর হইয়া বিধবাবিবাহ রূপ সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদিগকে মনের সহিত ধন্যবাদ দিয়া ও সরল ভক্তিচিত্তে নমস্কার করিয়া এ প্রস্তাব অদ্য সমাপন করিলাম। আবশ্যক হইলে পুনরায় লিখিব।

শ্রীশ—

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

গো-তত্ত্ব*—আমরা বিশেষ আহ্লাদ ও সমাদরের সহিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির অভ্যর্থনা করিতেছি। গোধন ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন; সেই অমূল্য ধন রক্ষার্থে যত্নশীল ব্যক্তিমাত্রেই আমাদিগের অকপট গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাজন; জ্ঞানেন্দ্র বাবু এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের সেই শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর পক্ষে আরও গৌরবের কথা এই যে তিনি সাধারণ জমীদারবর্গের ন্যায় আলস্যে কালক্ষেপ না করিয়া স্বদেশের উন্নতি পক্ষে কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ আছেন।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে গো-তত্ত্ব লিখিত ও প্রকাশিত হইল"। গ্রন্থকার যদি কিছু দীর্ঘকাল লইয়া পুস্তকখানি আরও পুষ্টাবয়ব এবং বিস্তৃত করিতে যত্ন করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত; কেননা তিনি যে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা অতি বিস্তৃত, এবং সে বিষয় যত বাহুল্যরূপে লিখিত হইতে পারে ততই ভাল। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। বর্ত্তমানকালে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে গোজাতির উৎকর্ষ ও উন্নতি হইতে পারে সে বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু গ্রন্থকার অতি সংক্ষেপে ২। ১ কথায় তাহা শেষ করিয়া দিয়াছেন [৪৩। ৪৪ পৃষ্ঠা]; এ বিষয়টি এত প্রয়োজনীয় যে আমরা ইহার বিস্তৃত সমালোচনা দেখিতে না পাইয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছি। গোজাতির খাদ্যের ব্যবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক আমরা আশা করি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এ সমস্ত দোষগুলির পরিহার করা হইবে।

গ্রন্থখানি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত:—প্রথম উপক্রমণিকা; দ্বিতীয় গো-বিবরণ; তৃতীয় গো-সেবা; চতুর্থ গো-চিকিৎসা; পঞ্চম গো-দুগ্ধ এবং তজ্জাত দ্রব্য; ষষ্ঠ গো-হত্যাকারী এবং গো-খাদকদিগের পাপ; সপ্তম গো-হত্যা নিবারণোপায়।

সংক্ষেপে, বিশদরূপে গ্রন্থকার এই কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গো-চিকিৎসা অধ্যায়টি বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং গ্রন্থকার উহাতে যে সমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহাতে গৃহস্থের পক্ষে বিশেষ উপকার দেখিবে এবং অনেক সময়ে চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকেও অনেকে গো-চিকিৎসায় সক্ষম হইবেন। গো-তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য অতি সরল ভাষায় লিখিত এবং ইহার মূল্যও অতি স্বল্প। আমরা আশা করি এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানি প্রত্যেক গৃহস্থই আপন গৃহে রাখিবেন।

* গো-তত্ত্ব—শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত; ৫৫নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীমোহিনী মোহন মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵ ছয় আনা।